জেমস জে. নোভাক

বাংলাদেশ

জলে যার প্রতিবিম্ব

বাংলাদেশ: জলে যার প্রতিবিম্ব বাংলাদেশ এবং এর মানুষ সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত এবং অন্তর-অনুসন্ধানী বিবরণী। এই বইয়ে জেমস জে. নোভাক দেশটির অর্থনীতি, জনগণের জীবনধারায় ও মনস্তত্ত্বে ঋতু বৈচিত্র্যের গুরুত্ব, ইতিহাস, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, কাব্য, চিন্তাধারা এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি বিবৃত করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে একটি অপূর্ব বিশ্লেষণও তিনি উপস্থাপন করেছেন। দেশটির আধুনিক ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত এটিই বোধকরি একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ। কবিতা, গদ্য এবং গানে বিধৃত এই জাতীয়তাবাদ। একে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে ধর্ম, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, কবিতা এবং শিল্পকলার মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে চিত্রায়িত করার জন্যে, তেমনি ব্যবহার করা হয়েছে সংস্কৃতির রাজনৈতিক চিন্তার রূপান্তরকে মূর্ত করে তোলার জন্যে।

—রাহাত খান

www.pathagar.comটাকা ৩৫০.০০

বাংলাদেশ: জলে যার প্রতিবিম্ব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

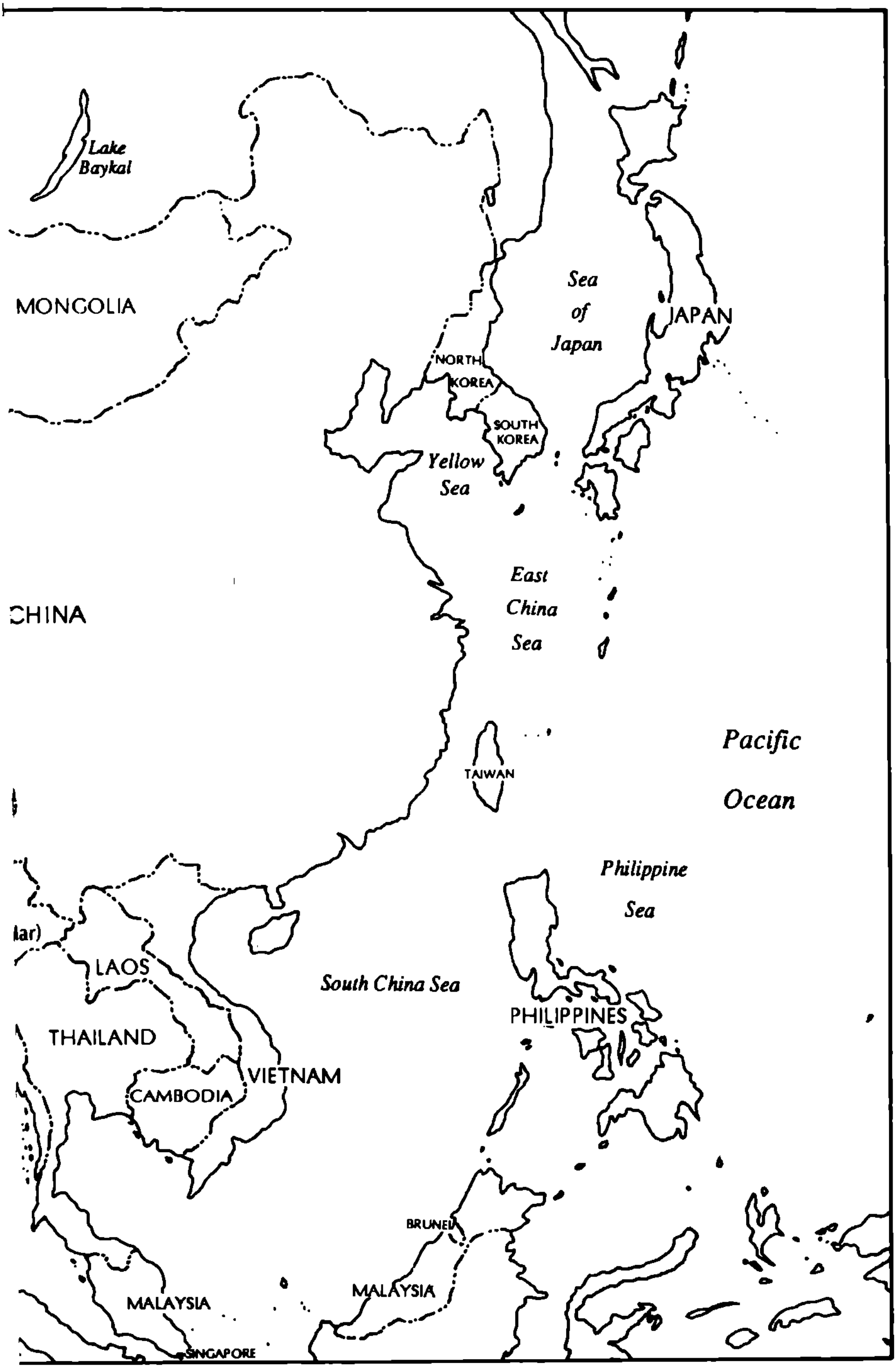

www.pathagar.com

বাংলাদেশ
জলে যার প্রতিবিম্ব

জেমস জে. নোভাক

সম্পাদনা
রাহাত খান

অনুবাদ
সালাহউদ্দীন আইয়ুব
শেখ আবদুর রহমান
নিয়াজ মোরশেদ
কায়কোবাদ মিলন

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

www.pathagar.com

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট হাউস
৬১ মতিঝিল বা.এ.
ঢাকা ১০০০
ফ্যাক্স : (৮৮ ০২) ৯৫৬৫৪৪১, ৯৫৬৫৪৪৩, ৯৫৬৫৪৪৪
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com

তৃতীয় মুদ্রণ : ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২০০৮
বাংলা অনুবাদ : ১৯৯৫, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ : ইংরেজিতে ১৯৯৩

© ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন ও ইন্ডিয়ানাপোলিস

প্রচ্ছদ : তোফাজ্জল হোসেন

ISBN 978 984 506 184 1

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্ট হাউস, ৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০। কম্পিউটার কম্পোজ ও ফরমেটিং: অসীম কুমার বিশ্বাস। এএমএস এন্টারপ্রাইজ-এর তত্ত্বাবধানে একতা অফসেট প্রেস, ১১৯ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Bangladesh: *Jale Jar Pratibimba* (Bangladesh : Reflections on the water), edited by Rahat Khan, published in November 1995 by Mohiuddin Ahmed, The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C.A., Dhaka 1000.

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক জেমস জে. নোভাক রচিত 'বাংলাদেশ: জলে যার প্রতিবিম্ব' বইটি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রথম প্রকাশ করে ১৯৯৩ সালে ইংরেজি ভাষায়। ১৯৯৫ সালে বইটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের সহায়তায়। বইটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন দৈনিক ইত্তেফাক-এর সম্পাদক জনাব আনোয়ার হোসেন। অনুবাদে প্রেরণা ও উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও তিনি নানা সহযোগিতার সূত্রে বই-এর প্রকাশনার সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। বইটির সম্পাদক হিসাবে এই সুযোগে তাঁর প্রতি আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সম্পাদক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভূমিকা: ডেভিড আই. স্টেইনবার্গ	xi
মুখবন্ধ	xv
দৃশ্যপট	১
ঋতুচক্র	২৯
গর্ব ও দারিদ্র্য	৬৭
বাংলাদেশের মন	১০৫
আমি সাইক্লোন; আমি ধ্বংস	১৭৫
খুন ও রাজনীতির আরো গল্প	২৩১
বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র	২৫৩
বাংলাদেশ টিকবে তো?	২৬৭
বিনিয়োগ এবং ভ্রমণ	২৮৩
সাহায্যকারী গ্রন্থাদি সম্পর্কিত বিবরণ	২৯১

www.pathagar.com

ভূমিকা

ডেভিড আই. স্টেইনবার্গ

গণতন্ত্রের কাম্য: শিক্ষিত এবং অবহিত জনগোষ্ঠী। এই গণতান্ত্রিক অনুশাসন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের চেয়ে বৈদেশিক পলিসির ক্ষেত্রে বেশি প্রাসঙ্গিক। অথচ মার্কিন শিক্ষাব্যবস্থা দুঃখজনকভাবে বৈদেশিক ব্যাপারগুলোকে উপেক্ষা করে; যে কারণে, দেখা যায়, অন্য দেশ ও মানুষ সম্পর্কে এই শিক্ষার আগ্রহ একেবারেই কম। অবশ্য অতিসম্প্রতি কৌতূহল কিছু বেড়েছে মনে হয়।

ভিন্ন দেশ সম্পর্কে কম জানা বা না-জানা এক কথা; 'এশিয়া' বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা বিশেষভাবে দুর্ভাগ্যজনক। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক এশিয়ায় বাস করে; গোলার্ধের বিবর্ধমান এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নতিশীল অঞ্চলে, এই বিপুল জনগোষ্ঠীর অধিবাস। এই শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় অনেক যুদ্ধ করেছে: এর কারণ এবং ফলাফল অধিকাংশের কাছে এখনো অস্পষ্ট। অন্যদিকে মার্কিন সমাজে এশীয়রা গুরুত্বপূর্ণ মাইনরিটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাজেই এশিয়াকে জানা এবং বোঝা আজ অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া এশিয়াকে উপেক্ষা করার কোনো হেতুই তো নেই। এশিয়ার আছে অনেক সমৃদ্ধ লিখিত দলিল, দস্তাবেজ, রেকর্ড; আছে সম্পন্ন মৌখিক ঐতিহ্য; আছে পুরাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্ভার; উপরন্তু, বহু শতাব্দী ধরে পশ্চিমের গুণীজন এশিয়ার সভ্যতা-সংস্কৃতির গবেষণার সঙ্গে যুক্ত। কাজেই গণতান্ত্রিক দেশের সভ্য-শিক্ষিত-অবহিত মানুষ আরেকটা দেশের আলাদা জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আরো বেশি জানবে, বুঝবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

তবে সমস্যা হলো, এ বিষয়ে কে লিখেছে সেটা একটা বড় কথা। এসব বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিত ব্যক্তিরা লেখেন: সেই লেখা বেশিরকম উচ্চমার্গীয়, বিশেষজ্ঞ-সর্বস্ব দুর্বোধ্য, কিছুবা দুর্গম, এমনকি পণ্য হিসেবে তার দামও চড়া। তবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের একটা যুক্তি আছে। যেমন আমরা যারা এরকম প্রতিষ্ঠান এবং এরকম বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারা প্রায়ই বলি যে আমাদের কাজের ভাষা, বাকভঙ্গি ও প্রকাশ-পদ্ধতি ওরকম মার্গীয় না হলে চলে না। লেখার মধ্য দিয়ে আমরা কেবল জ্ঞানকেই তুলে ধরি না, বরং এ-ও জানিয়ে দেই যে আমরা একটি বিশেষ বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

শ্রেণীর অন্তর্গত, বিশেষ ডিসিপ্লিন এবং বিশেষ ধরনের গবেষণা জগতের বাসিন্দা। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিশেষজ্ঞতার একটা খোঁড়া যুক্তি আছে; তা হলো, সামাজিক গবেষণা একান্তভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক, সে গবেষণার লক্ষ্য প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সমর্থন, তার উদ্দেশ্য কখনোই লোকসমাজে কিংবা আমজনতায় জ্ঞান বিস্তার নয়– তা একান্তই একাডেমিক দায়ভাগ থেকে রচিত ও প্রকাশিত।

কিছুকাল আগে বিভিন্ন ইউরোপীয় সমাজ সম্পর্কে অনেকগুলো ভালো বই আমার চোখে পড়ে এবং আমি খুব অবাক হই। এসব বইয়ের বৈশিষ্ট্য যেমন জ্ঞান, তেমনি আবেগও; এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়ে বইগুলো সুখপাঠ্য এবং সাধারণবোধ্য হয়েছে। এই বইগুলো থেকে ওসব সমাজের অনেক জটিল ব্যাপার স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। সামাজিক গবেষণার দিক থেকে এগুলোর গুরুত্ব মোটেও কম নয়, যদিও এতে আছে সাহিত্যেরও একটা স্বাদ। সাহিত্য ও গবেষণা দুই বিপরীত মেরুর জিনিস হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে কোনো সংঘাত ঘটেনি। আমাকে খুব মাতিয়ে দিয়েছে বারযিনির 'দি ইটালিয়ানস'। ঠিক 'এশিয়া' বিষয়ে এই ধরনের কোনো বই কেউ লিখতে পারেননি।

একবার এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করে বসেন এমন একক কোনো বই আছে কিনা, যেটি পড়ে বিশেষ কোনো একটি এশীয় সমাজ গভীরভাবে বোঝা যাবে। এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই আমাকে বিব্রত করে; মাঝে মাঝে মনে হয় তাদেরকে ওরকম কোনো বইয়ের পরামর্শ দেয়া মানে এশিয়ার দিকে ধাবমান দীর্ঘ ক্লান্তিকর বৈমানিক যাত্রায় উঠিয়ে দেয়া; যেখানে আছে ভোজনের পর ভোজন, সিনেমা এবং বাচ্চাদের কলরব। তাছাড়া অনেক বই এমনও আছে যেগুলো ভালো হলেও প্রথাগত এবং পুরনো। যেমন ধরুন 'বার্মা' বিষয়ে লেখা ১৮৮২ সালে প্রকাশিত একটি বই; এটি বার্মা বিষয়ে সবচেয়ে ভালো বই হলেও এর কোনো আধুনিক উপযোগ দেখি না। বইটির ভেতর চিন্তা-ভাবনা বলতে কিছুই নেই, ফুলানো-ফাঁপানো এক টেক্স্ট; নির্ভুল তথ্য সমাবেশের কারণে গ্রাজুয়েট বা আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ে এটা ব্যবহার্য হতেও পারে; কিন্তু এর আয়তন যেমন স্ফীত, বিবরণও তেমনি মন্থর, নিশ্চল। বর্তমানে এশীয় সমাজ বিষয়ে কিংবা এশীয় সমাজের বিশেষ বিশেষ ধরন সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিতদের ধারণা দেয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

এই কাজ করতে হলে আলোচ্য সমাজ সম্পর্কে সহানুভূতি থাকা প্রথম শর্ত; তাছাড়া লেখকের ঝোঁকটাও বিবেচ্য, দৃষ্টিকোণটাও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোনো একক ফর্মুলা প্রস্তাবিত হতে পারে না; এশীয় সমাজ বিভিন্ন, তাদের বিন্যাসও বহুরকম– কোনো একটিমাত্র ছকে তাকে ধরতে গেলে বিপদ আছে। ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেসের উৎসাহে আমরা ইতিমধ্যে বেশ কিছু লেখক

www.pathagar.com

পেয়েছি, যাঁরা এশীয় সমাজ বিষয়ে কাজ করেছেন; যাঁদের কাজের একদিকে আছে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে ওই সমাজের বাঞ্ছিত বিশ্লেষণ।

এশিয়া বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্যে; এবং আমাদের বিশ্বাস এশিয়া সিরিজ প্রকল্পে প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থমালা থেকে ইংরেজিভাষী পাঠকেরা এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

'বাংলাদেশ' বলতে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী-মড়ক প্রভৃতি, একগুচ্ছ ছবি। কোনো কোনো সময়ের জন্যে এসব সত্য ঘটনা হলেও, এইটেই বাংলাদেশের একমাত্র রূপ নয় : এসব ধারণা বাংলাদেশ নামক দেশটির ঐশ্বর্যময় অতীত এবং স্পন্দ্যমান বর্তমানকে ঝাপসা করে দেয়। জেমস নোভাক বাংলার অতীত, তার ঐতিহাসিকতা এবং তার সম্পর্কে চালু হয়ে যাওয়া বিভিন্ন খণ্ডিত ধারণা বেশ ভারসাম্যপূর্ণ এবং উদার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। নোভাকের এ বই আমাদের জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ পৃথিবীর এক অপরূপ ভূখণ্ড, বিচিত্র সংস্কৃতির সমাবেশ ও সমন্বয় যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং উপযুক্ত ব্যাখ্যার জন্যে যা আজও অপেক্ষমাণ; অথচ কৃত্রিম আধুনিকতা ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি দেশটিকে আমাদের চোখের একেবারে আড়ালে রেখে দিয়েছে।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে ভ্রমণ এবং বসবাস, সে দেশের অনেক গুণীজন ও ঐতিহাসিক ব্যক্তির সঙ্গে অন্তহীন আলাপ এবং একজন অপণ্ডিতের পক্ষে শোভন ও সম্ভবপর পাঠ ও পড়াশোনা : এসবের যৌগপদ্যে তৈরি হয়েছে এ বই 'বাংলাদেশ : জলে যার প্রতিবিম্ব'। এ বই কোনো মৌলিক গবেষণার ফল নয়, বরং বর্ণনামূলক এক ভাষ্য; আর এটি লেখাও হয়েছে বিভিন্নজনের গবেষণা উপাত্ত ব্যবহার করে।

প্রায় বিশ বছর ধরে বাংলাদেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ; তবে দেশটির প্রতি আমার প্রথম আকর্ষণ জন্মে একটা ছবি দেখার ঘটনায়। ১৯৪৭ সালে আমার ভাই মাইকেল সাউথ বেন্ড নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়; সে সময় আমার বয়স আট, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাফেটেরিয়ার দেয়ালে বাংলাদেশের একটি ম্যুরাল দেখি। ম্যুরালে বাংলাদেশের একটা জঙ্গলের দৃশ্য, তাতে শোভমান কিছুসংখ্যক মিশনারীর ছবি : তারা বাঙালিদের চিকিৎসা এবং শিক্ষাদান করছে। মিশনারীদের পোশাক শাদা এবং মাথায় হেলমেট : তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় ছবিটি সম্ভবত তিরিশ দশকের। আজকের অনুভূতি থেকে দেখলে ছবিটিতে পাক্কা সাহেবদের যে প্রতিকৃতি আছে, তা খুব বিব্রতকর ঠেকবে। আমরা দু'ভাই অবাক হয়ে ক্যাফেটেরিয়ার ওই ছবিটি দেখতাম।

অনেক বছর পর আমার আরেক ভাই রিচার্ড, হলিক্রস মিশনারী হিসেবে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশ) যায়; বাংলাদেশ বিষয়ে আমার মতোই তার আগ্রহ এবং কৌতূহল ছিল। রিচার্ডের বাংলাদেশ যাওয়া নিয়ে আমাদের পরিবার খুব উদ্বিগ্ন ছিল না; কেননা হলিক্রস ফাদারের একটা মিশন ছিল ওদেশে, এবং তারা আর্থিক সাহায্য চেয়ে নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন; তাছাড়া ছুটিতে যেসব মিশনারী আসত, তাদের থেকেও খবরাখবর জানা যেত। দেশটি বিষয়ে আমিও পড়াশোনা করতে লাগলাম কৌতূহলী তরুণের মতো, আর প্রায়ই যেতাম ক্যাফেটেরিয়ায় ওই ম্যুরালটির কাছে, ছবিটির নিচে বসে দুপুরের খাবার খেতাম।

ধর্ম-বিদ্যা সম্পন্ন করার পর ১৯৫৫ সালে আমার ভাই রিচার্ডের হঠাৎ ইচ্ছে হলো মিশনারী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান যাবার। বাবাকে সে কথা বলতেই একদিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমরা তখন বেনিংটনের 'নোভি-শিইট হাউস' অতিক্রম করছি, বাবা হঠাৎ রাস্তার পাশে গাড়ি থামালেন। তারপর সে কি কান্না!

www.pathagar.com

বাবার এই আচরণ একেবারে অপ্রত্যাশিত, বাবাকে এরকম কখনো দেখিনি। শান্ত করার পর বাবা বললেন, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, আজকে মনে হচ্ছে সেটা সত্যি হতে চলেছে। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন আমার ভাই ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে। আমার বাবা দিব্যদ্রষ্টা লোক ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত সুশৃংখল প্রাতিষ্ঠানিক ভদ্রলোক; কিন্তু তাঁর এই আবেগ এবং আচরণ আমাকে খুব প্রভাবিত করে। এর ন'বছর পর ১৯৬৪ সালে যখন আমি জার্মানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে কর্মরত, বাবা আমাকে খবর দিলেন 'পূর্ব পাকিস্তানে রিচার্ড খুন হয়েছে।' বললাম– 'ছুরিকাঘাতে?' বাবা বললেন: 'কি করে জানলি তুই?' বাবা অতদিনে ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের কথা, আমি মনে করিয়ে দিলাম। (আমার বাবা এবং মা রিচার্ডের খুনের জন্যে দায়ী দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন; ৭ বছর জেলে থাকার পর ১৯৭১ সালে এ দুজন আসামী ছাড়া পায় : তখন বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে বন্দীরা মুক্ত)।

রিচার্ড ছিল অসীম সৌজন্যসম্পন্ন সুরসিক একজন মানুষ; তার আকস্মিক প্রয়াণ আমার ভেতর প্রতিক্রিয়া জাগালো ভিন্ন : পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান বিষয়ে ব্যাপক পড়াশোনা শুরু করলাম আমি। কেননা, পাকিস্তানে যাবার এবং কিছুদিন থাকার ইচ্ছে তৈরি হলো আমার মধ্যে। অগত্যা বাংলাদেশ বিষয়ে বইপত্র, ম্যাগাজিন পড়া এবং বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে আটলান্টিকের এপারে যারা আসে তাদের সঙ্গে আলাপ করা আমার জীবনযাপনের অংশ হয়ে উঠল। সেনাবাহিনী ছাড়ার পর বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ফিয়ার-এ আমার চাকরি হয়, তার ফলে পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ তো হচ্ছিলই; উপরন্তু ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে কর্মসূত্রে হংকং-এ থাকতে হলো; আর হংকং থেকে অবিরাম বাংলাদেশে যাওয়া-আসা ছিল সে সময় আমার প্রধান একটা কাজ। আমার পড়াশোনা বেড়ে গেল আরো, অনেক লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পরিচয়ের ফলে এক্ষেত্রে ভালো নির্দেশনাও পাই। প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশ যেতাম আমি, এরপর ফিয়ার কোম্পানির নোকরি ছেড়ে দিয়ে আমি বাংলাদেশে এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি নিযুক্ত হই। অতঃপর বাংলাদেশেই আমার সার্বক্ষণিক বসবাস। এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি হওয়ার সূত্রে বাংলাদেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিকদের সাহচর্যে আসার সুযোগ ঘটে। লাইব্রেরিতেও যাতায়াত শুরু করি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলোতে। ১৯৮৫ সালে হার্ট অ্যাটাক হলে পর ঢাকা ছাড়তে হয় আমাকে; কিন্তু তার পরও ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত, বছর বছর আমি বাংলাদেশ গেছি এবং দু-আড়াই মাস থেকেছি।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ বিষয়ে আমার লিখতে বসার একমাত্র কারণ 'ভালোবাসা'। বস্তুনিষ্ঠতায় স্খলন ঘটতে পারে ভেবে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে লেখা

www.pathagar.com

বাদ দিই। কাজেই বস্তুনিষ্ঠতা যে সর্বত্র নেই বা থাকা সম্ভব নয়, এ বই যিনি পড়বেন সেটা তাঁর বুঝবার কথা। আমার ধারণা বিশ্লেষণের চাইতে ভালোবাসাই বাংলাদেশের জন্য অধিক বাঞ্ছিত।

অত্যন্ত সৌভাগ্য যে, আমারই জীবদ্দশায় আমার পুত্র যোশেফ ফরেন সার্ভিস অফিসার হিসেবে বাংলাদেশে নিয়োগ পেল (গ্রীষ্ম ১৯৯২)। যোশেফ আমাদের পরিবারের দুই প্রজন্মের তৃতীয় ব্যক্তি, যে বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে।

যাঁদের কারণে এ বইটি লেখা সম্ভব হলো, এবার তাঁদের কথা বলি। মনে পড়ে প্রফেসর রিচার্ড বাকস্টারের কথা; পূর্ববাংলার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় যিনি বনানীতে আমার বাসায় অনেকগুলো সন্ধ্যা কাটিয়েছেন। রিচার্ড একজন প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যক্তি। বাংলাদেশ বিষয়ে যাঁর গ্রন্থ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৯৩)। বাংলাদেশের জন্যে তারও গভীর মমতা ও দরদ; এই মমত্ব আমাকেও অনুপ্রাণিত করেছে বর্তমান রচনায়। আরেকজনের কথা মনে পড়ে, তিনি চট্টগ্রাম ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিউদ্দিন আহমেদ : তাঁর সঙ্গে অনেক আলাপ হয়েছে আমার, অনেক রকম আলোচনা, তর্ক ও বিশ্লেষণ; বাংলাদেশে ইসলাম বিষয়ে সেমিনার করেছেন তিনি (১৯৮২-৮৫), তা থেকেও আমি উপকৃত হই; তদুপরি সম্প্রতি আমার এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি তিনি পড়েছেন, বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন তিনি, তাঁর সৌজন্যে অনেক রকম ভুলত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ হয়, বিভিন্ন বানান বিভ্রাটও তাঁর কারণে এড়ানো গেছে, তাঁর সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু অংশ পরিমার্জিত-পরিশীলিত করা সম্ভব হয়েছে।

কান্তা ভটিয়ার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে তাঁর সৌজন্যে পেন্সিলভেনিয়ার ভান পেলট লাইব্রেরি ব্যবহার করার কথা; কান্তা নিজে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. আবদুল মোমিন চৌধুরী আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন; তাঁর সহযোগিতায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রিসার্চ রুমে অধ্যায়ন করার সুযোগ পাই, তাছাড়া বাংলাদেশ বিষয়ে বিভিন্ন বইপত্র এবং গবেষণা সম্পর্কেও তিনি ব্যাপকভাবে আমাকে অবহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফজলুল হালিম চৌধুরীকেও ধন্যবাদ; তাঁর সৌজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার এবং গবেষণাকর্মে সুবিধে আমি পেয়েছি। তাছাড়া প্রাক্তন শিক্ষাসচিব কাজী জালালউদ্দিন আহমদও আমাকে এই গবেষণা কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন; আর অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর দাক্ষিণ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কবিদের ভূমিকা বিষয়ে অবহিতির সুযোগ হয় আমার।

গভীরভাবে স্মরণ করি প্রয়াত চাচা জ্যাকবের ('ইয়াকুব' নামেই যিনি অধিক পরিচিত অনেকের কাছে) কথা, যিনি নিউইয়র্কের রক ফার্নিচারের প্রধান অর্থ-কর্মকর্তা

www.pathagar.com

ছিলেন, তাঁর সৌজন্যে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ইস্পাহানী ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান জনাব সাদরি ইস্পাহানীর কাছাকাছি যাবার সুযোগ পাই এবং ধীরে ধীরে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হই; ইস্পাহানী সাহেবও আমার জন্যে অনেক কিছু করেছেন, মগবাজারে তিনি আমাকে থাকবার সুযোগ করে দেন এবং তাঁর আতিথ্য ও পারিবারিক বন্ধুত্বে আমি মুগ্ধ। তাছাড়া সাদরি এবং আমার বন্ধু, ফাইজারের হুমায়ূন কবিরও প্রায় বিশ বছর ধরে বাংলাদেশ বুঝতে সাহায্য করেছেন আমাকে। প্রাক্তন মন্ত্রী ও লেখক জনাব এ.এম.এ. মুহিতের কাছেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা; মুহিত সাহেব রাজনৈতিক কারণে যখন নিউইয়র্কে বাস করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় এবং তাঁর সঙ্গে আলাপের ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসের বহু বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি। নিউইয়র্কে নেলী, মোহাম্মদ ইকরামুল্লাহ এবং তাঁদের পুত্র শাকিব (রাজন)– লিউকেমিয়ায় যে মারা যায়, এই পরিবারের সঙ্গে আমি আবেগময় সম্পর্কে যুক্ত।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ১৯৮৮ সালে রাজনের মতো উজ্জ্বল, সুন্দর, অতুলনীয় শিশুটি মারা যায়। রাজন আমাকে অনেকভাবে উদ্দীপিত করেছে।

এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্মিজ স্টাডিজের খ্যাতিমান অধ্যাপক ডেভিড স্টেইনবার্গের হস্তক্ষেপ ও ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডেভিডই আমাকে বর্তমান প্রকাশকের কাছে নিয়ে যায় এবং তার সক্রিয় উদ্যম ও অনুপ্রেরণায় এটি বর্তমান রূপ লাভ করে। ডেভিড একজন সত্যিকার বন্ধুর পরিচয় দিয়েছে আমাকে, তার কথা কখনোই ভুলা সম্ভব নয়; কেননা আমি যখন এ বইয়ের প্রকাশনা বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তখনই সে আমাকে উদ্ধার করে। একইভাবে ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেসের পরিচালক জন গালমানের কথাও স্মরণ করি; তাঁর সুবুদ্ধির ফলে এ পাণ্ডুলিপি আগের চেয়ে উন্নত করা সম্ভব হয়। এ বইয়ের প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেন বাংলাদেশের সম্মানিত ফটোগ্রাফার এইচ.এম. আমীর, তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে, সবচেয়ে বেশি করে, আমার সহধর্মিণীর কথা বলব; যারা আমাকে চেনেন, আমার সহধর্মিণীর ভূমিকার কথা তাঁদের সবারই জানা। আমার স্ত্রী নাওমি রক নোভাক আমার লেখা শুধু সংশোধন বা সম্পাদনাই করেননি, বর্তমানে এ পাণ্ডুলিপি যা দাঁড়িয়েছে, তার অনেকখানি কৃতিত্ব তাঁরও। নাওমির সাহায্য ছাড়া এ বই কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারত না। এ বইয়ের মধ্যে যদি ভালো কিংবা মানবিক গুণ কিছু থেকে থাকে, তা প্রধানত আমার সহধর্মিণীর সজীব অনুপ্রেরণার শস্য।

বলা বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থের সকল দায়িত্ব আমার; এর যা কিছু ত্রুটি, যেসব অসম্পূর্ণতা– সব আমারই; যাঁদের কথা উপরে বলেছি, সেটি শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ

www.pathagar.com

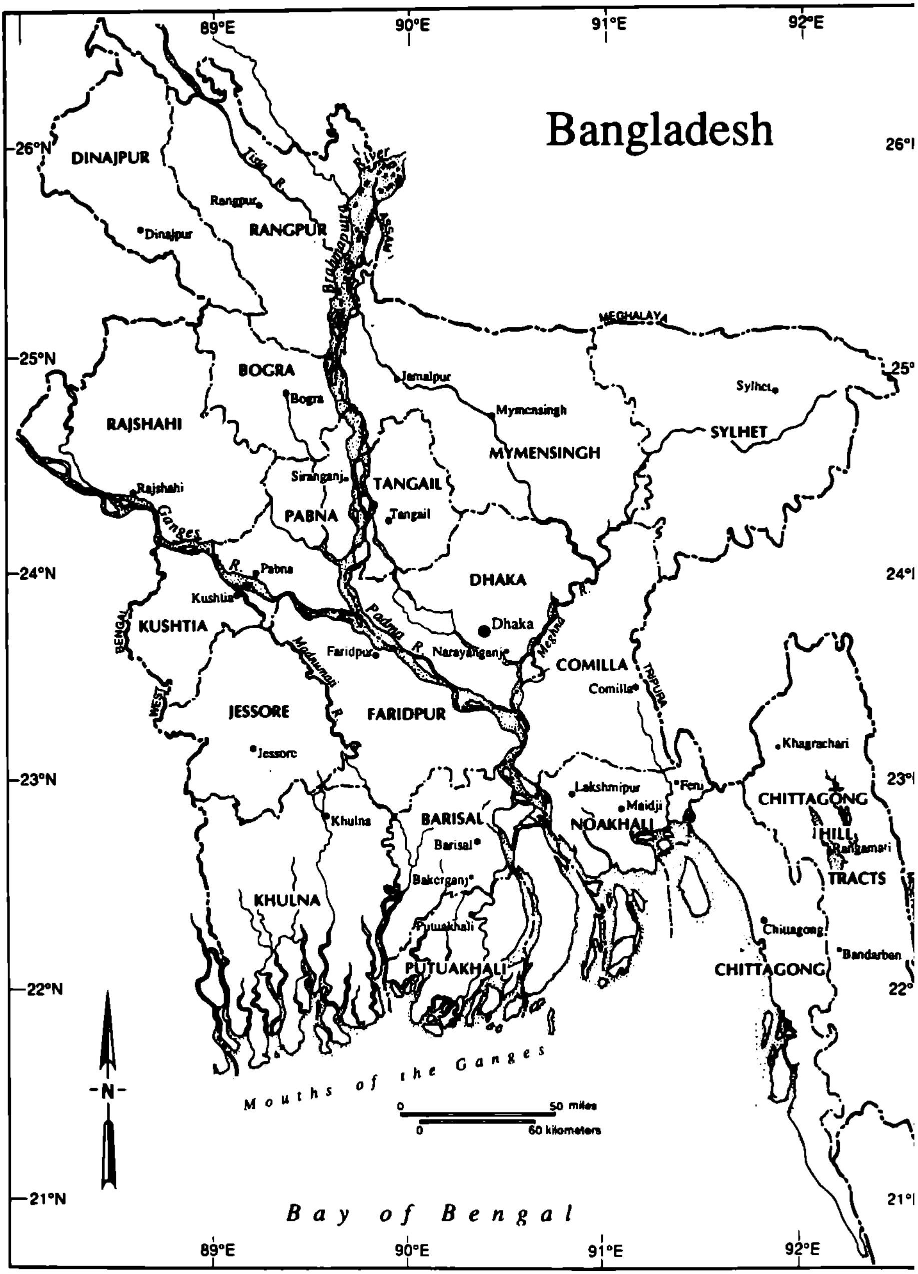

www.pathagar.com

দৃশ্যপট

ফি বছর তারা আসে। সাধারণত শীতকালেই তারা আসে; বাংলার এই উপত্যকায় বেড়িয়ে যাবার জন্যে শীতের সময়টা সবদিক থেকে উপযুক্ত। কেননা, বাংলায় তখন শীতকাল হলেও শীত নেই; ওরকম শুভ্র তুষার, হিম বরফ আর কনকনে ঠাণ্ডা নেই। রোদ্দুরের ভেতর আবহাওয়া আর পরিবেশটা বড় মনোরম। এ ধরনের শীত, রোদ্দুরের ছটা, সহনীয় উত্তাপের আমেজ সব বিদেশীদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। তারাই আসে, যারা ওদেশের অসহ্য গরম আর বৃষ্টির ছোবল থেকে বাঁচতে চায়। এই সময়টায় সব বিদেশীর মনে ঘর ছাড়ার সাধ জাগে; মে মাসের গ্রীষ্মেই বেরিয়ে পড়ে তারা, আকাশযানে; পাড়ি দেয় সাগর-মহাসাগর, ফেনিল সমুদ্র, জনপদ, অতঃপর সোজা এই শ্যামল উপত্যকায়। বাংলাদেশের শীতকালেই তারা আসে; কেননা শীতকাল খুব আনন্দময়, ফ্লোরিডা এবং উত্তর আফ্রিকার মতো; তারা আসে কেননা তারা টোকিও, জেনেভা এবং নিউইয়র্কের শীতের ছোবল থেকে বাঁচতে চায়। এরা কারা? কারা আসে এখানে? ট্যুরিস্টরা নয়। এরা সবাই অফিসিয়াল কর্তাব্যক্তি। এরা হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কর্মকর্তা, কিংবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কর্মকর্তা, কিংবা জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির কর্মকর্তা, যেমন ইউনিসেফ কিংবা ইউএনডিপি'র কর্মকর্তা। কিংবা হয়তো বিভিন্ন সরকারি অনুদান এজেন্সির অফিসার, যেমন ইউএসএআইডি, কিংবা ইউকে-ওডিএ, কিংবা জেআইসিএ; এরা হতে পারে সুইডিশ, কানাডীয় কিংবা অস্ট্রেলিয়ান (সিআইডিএ)। এদের ভেতরেই আবার ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের বায়ার, যাদের লক্ষ্য খুচরো বিক্রয়ের তদবির, কিংবা গ্রীষ্মকালের জন্যে কোনো অর্ডার বায়াররা নিয়ে আসে ইউরোপ থেকে এবং আমেরিকা থেকে; তাদের হাতে শোভা পায় অত্যাধুনিক ফ্যাশনের বিভিন্ন নমুনা বই, ওসব ফ্যাশন অনুসারে কাপড় তৈরির নির্দেশ দিয়ে যায় তারা। সেলস্‌ম্যানও এর মধ্যে আছে; তারা আমদানি বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে কিংবা অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্পে কোনো প্রস্তাব তোলে বা আমন্ত্রণ জানায়। আসেন প্রতিবেদকেরাও; তারা আসেন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, প্লাবন কিংবা নির্বাচনের

www.pathagar.com

ওপর রিপোর্ট লেখার অভিপ্রায়ে। স্কলার আসেন খুবই কম; এমন বিশ্লেষকের উপস্থিতিও নগণ্য, যারা খুব সিরিয়াস, যাদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও তির্যক।

তবে যারাই আসুন, তাদের সংখ্যা মোটেও বেশি নয়, এত বেশি নয় যে, ঢাকার দুটো বৃহত্তম হোটেলে তাদের ঠাঁই হবে না। কনফারেন্স হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। ঢাকায় অবশ্য বহু ধরনের সেমিনার-কনফারেন্স হয়; যেমন জোটনিরপেক্ষ জাতিসমূহের কনফারেন্স, অনুন্নত দেশগুলোর কনফারেন্স, ইসলামী জাতিপুঞ্জের সেমিনার। কালেভদ্রে মহাঅতিথিরও আগমন ঘটে : যেমন ইংল্যান্ডের রাণীর আগমন, ফরাসী প্রেসিডেন্টের আগমন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আগমন, চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর আগমন। এই সবকিছুর ব্যবস্থাপনার জন্যে ঢাকায় দুটো হোটেলকে প্রায় যথেষ্টই বলতে হয়; এখনো পর্যন্ত তৃতীয় বড় কোনো হোটেল নির্মাণের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

পর্যটক খুব কমই আসে ঢাকায়, যারা আসে তারা এই দেশ এবং এখানকার মানুষদের দেখার জন্যেই আসে। অধিকাংশই আসে কাজের প্রয়োজনে। বয়স্ক ঝানু পর্যটক কিংবা প্রেমোন্মাদ যুগলের দেখা কমই পাওয়া যায়। তাছাড়া আগতদের অধিকাংশই দায়িত্বের তাড়ায় আসে। বাংলাদেশে অবতরণের পর প্রথম প্রথম তারা খুবই সৌজন্যসম্মত চলাফেরা করে; তবে কাজকর্ম কমই থাকে, অধিকাংশের সিডিউল খুব সংক্ষিপ্ত এবং সীমাবদ্ধ; তড়িঘড়ি ওসব তারা সেরে ফেলে। যেমন কিছু অঙ্গীকার, কিছু জরুরি ব্যাপার, কিছু অনুমান এবং পর্যবেক্ষণ। তবে কাজ না হলে সাহেবদের সৌজন্যবোধ অবিচলিত থাকে না; বিভিন্নভাবে তারা ক্ষুব্ধ হয়, রাগ করে, রাগ ঝাড়ে। এমনকি জাপানীদের শান্ত-স্থিরতাও মাঝে মাঝে টলে যায়।

এ সকল অফিসার সকলেই গুরুত্বপূর্ণ, স্থিরলক্ষ্য। তাদের এই আকাঙ্ক্ষা একেবারেই অবাঞ্ছিত নয়, যখন তারা বলে বাঙালিরা তাদের তাই দিতে বাধ্য– যা তারা চায়। কেননা, সবকিছুর পরও বাংলাদেশ একটা উন্নয়নশীল দেশ; পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি; এদেশের মানুষের বার্ষিক গড় আয় ২০০ ডলার মাত্র, আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪ শতাংশ; যার সারাংশ হলো ২৯ বছরের মাথায় এ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। কোনো বাঙালির এ অবস্থা নেই যে, সে একজন বিদেশীকে যাচ্ছেতাই বলতে পারে। বিদেশীদেরও এই অসহায় অবস্থা ভালোই লাগে এবং তারা এতে অভ্যস্ত। তবে পর্যটকেরাও এই দেশ বা এই দেশের মানুষ দেখতে এখানে আসে না, বাঙালিরাই বরং তাদের দেখে শেখে।

এখন এদেশে দু'ধরনের পর্যটক আছে। তবে ১৯৪৭-৪৯-এর পর কেউই এখানে ইমিগ্রান্ট হতে চায়নি, কিছু বিরল দম্পতি ছাড়া। সেক্ষেত্রেও বিদেশীরা আসল পাসপোর্ট সঙ্গে রাখে। এক ধরনের পর্যটক আছে, যারা আগেও এখানে বেড়িয়ে

www.pathagar.com

গেছে; এবং গত সফরের পর আবার হাওয়া-বদলের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একবার যে এখান থেকে ঘুরে গেছে, সে-ই এক্সপার্ট; আবার যখন এখানটায় সে এসেছে, তাকে বিশেষজ্ঞই বলতে হবে। আরেক ধরনের পর্যটক হলো, যারা প্রথমবারের মতো এখানে এসেছে; যারা ধরে নিয়েছে এদেশ তাদের পছন্দ হতেই হবে। গোড়া থেকে দেখলে পর্যটকদের এই দুই ধরনের মধ্যে আদতে কোনো তফাৎ নেই, তারা এখানে এসেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করার মানসে।

তবে সত্য হলো, তাবৎ বিদেশীই এখানে পর্যটক। বহিরাগত। তারা দৃশ্যের অংশ নয়। তারা অংশ হতেও চায় না, কেবল মিশনারীরা ছাড়া; তারা ব্যতিক্রম এবং তারা সংখ্যায় অল্প। যে ব্রিটিশরা প্রায় দু'শতাব্দী ধরে এখানে শাসন করেছে, তারাও বাংলার মাটিতে শেকড় গাড়তে চায় না। কিছু ব্যতিক্রম বাদে, তাদের সবাই স্বদেশে ফিরে গেছে দীর্ঘদিন একটানা বসবাস করে। কাজ থেকে অব্যাহতি নিতে তারা নিজ দেশে চলে যায়। এমনকি পাঞ্জাবীরাও, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে, যখন এদেশ পাকিস্তানের অর্ধাদেশ ছিল, এখানে থাকেনি, কিছু দুর্ভাগা দম্পতি ছাড়া। সেই অবস্থাই এখনো চলছে; ব্রিটিশ চলে গেছে ৪৫ বছর আগে, বিশ বছর হলো পাকিস্তানীরা গেছে; কিন্তু কোনো পর্যটকের অভিরুচি হয় না এখানে থাকার। তারা থাকে হয়তো তিন কি চার বছর; ব্রিটিশদের মতো দীর্ঘকাল নয়। তারপর নিজ দেশে ফিরে যায়। পর্যটক হিসেবে তারা আসে, পর্যটক হিসেবেই তারা রয়ে যায়; বাংলা বলতে পারুক আর না পারুক, কিছু আসে যায় না।

পর্যটকদের অধিকাংশই কিন্তু পুরুষ; অতিসম্প্রতি নারীরাও আসছে। অধিকাংশ মহিলাই প্রবীণ; দেখতে তারা ডিপ্লোম্যাটদের স্ত্রীদের তুলনায় কম আকর্ষণীয়, ভিডিও স্ক্রিনে যেমন রমণীর দেখা মেলে, তাদের তুলনায়ও অসুন্দর। পুরুষরা সেই রকম। বিভিন্ন এজেন্সির কিছুসংখ্যক তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের কথা বাদ দিলে, অধিকাংশই প্রথাগত অফিসারদের মতো দেখতে রসকষহীন, টেকো, নিরাভরণ। মেয়েরাও অভ্যেসমতো খারাপ পোশাক পরে; আর পুরুষদের পোশাক দু'রকম: কেউ স্যুট-টাই পরে, কেউ সাফারি স্যুট। যারা স্যুট-টাই পরে তাদের সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য ফ্যাশন বদলাতে থাকে; কিছুদিন পূর্বেও সাফারি স্যুটের বেশ কদর ছিল; একে ভাবা হতো সর্বাধিক সৌজন্যপূর্ণ পোশাক বলে। হোটেলের লবিতে বসে বসে পর্যটকদের আনাগোনা ভালো উপভোগ করা যায়।

বিগত বছরগুলোতে পর্যটকদের আনাগোনা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, যেখানে আগেকার পর্যটকদের অধিকাংশই ছিল পশ্চিম দেশের, সেখানে বর্তমানে বিমিশ্র পর্যটকদের দেখা যায়, 'ওয়েস্ট'র মতো 'ইস্ট' থেকেও পর্যটকরা আসছে। জাপানী, দক্ষিণ কোরীয়, সিঙ্গাপুরবাসীদের মতো পূর্ব এশীয়রাও এখন একটা মস্ত ব্যাপার;

www.pathagar.com

কেননা পর্যটকদের পঞ্চাশ ভাগ 'ইস্ট' থেকে আসছে। বাংলাদেশে সামরিক চাহিদা মেটায় ব্রিটিশদের মতো চীন দেশও, চীন এবং জাপান বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি অনুদান প্রদান করে; চীনারা মূলত সামরিক সাহায্য যোগায়, সামরিক যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে পাঠায় তারা– অনুদান অতটা নয়; দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুর মূলত বাণিজ্য কারবারে লিপ্ত; দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুর বাংলাদেশে বস্ত্রকারখানা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অটো এবং অন্যান্য শিল্প-কারখানায় বাণিজ্য করে। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা যেহেতু তাই, বলা বাহুল্য, এটা অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ব এশীয় সজীবতা ও চাঞ্চল্যের উৎস। এক সময় এখানে প্রতাপশালী ছিল ব্রিটিশ, মার্কিন, রুশরা, এখন দৃশ্যপট থেকে তাদের অন্তর্ধান ঘটেছে; বাংলাদেশের বড় বড় প্রজেক্টসমূহ এখন জাপানীদের কব্জায়, যেমন চট্টগ্রামে তারা বৃহত্তর সার কারখানা বানিয়েছে, মেঘনা নদীর ওপর বিরাট বড় সেতু নির্মাণ করেছে (১৯৯০)। এমনকি কুর্মিটোলার গল্‌ফ ক্লাবের বড় সুইমিং পুলও জাপানী অনুদানে নির্মিত।

পর্যটকদের মধ্যে শতকরা দশভাগ বোধহয় ঢাকা থেকে বাইরে যায়, দেশের অন্য অঞ্চল দেখার জন্যে। দাতা-দেশগুলোর যেসব এজেন্সি অফিসার এখানে আসে, তাদের মধ্যে অল্পই দেশের অনত্র ঘুরতে বেরোয়; চাই তারা ওয়েস্টার্ন হোক, অথবা পূর্ব এশীয়। জাপানী বা পশ্চিমদেশীয় পর্যটকরাও নগর এলাকার বাইরে ক্বচিৎ যায়, চট্টগ্রামে কেউ কেউ যায়, কেউ কেউ হয়তো ঘোড়াশালে। ঘোড়াশালে যায়, কেননা ওখানে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে এবং সোভিয়েত উপস্থিতিও লক্ষণীয়। বিদেশীদের সকলে ঢাকা এবং ঢাকার হোটেল ছেড়ে দূরে বেরোতেই চায় না; দূরত্ব দেখলেই তারা থেমে যায়। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে সবাই। অটোযানের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য, শহর থেকে ১০ মাইল দূরে কোনো 'অটো' যায় না; পাজেরো, কার, মোটরযানের সংখ্যা তো নেহাৎই অল্প। 'অটো'র অনুপস্থিতি তাৎপর্যবহ : অটোর অনুপস্থিতি নির্দেশ করে বিদেশীদের অনুপস্থিতি; বিদেশীদের সঙ্গে যুক্ত বাঙালির সংখ্যাল্পতারও নির্দেশক এই অনুপস্থিতি। ঢাকা অবশ্য ভিড়ে ভরা একটা শহর, তবে আরিচা গেলে পর যান দুর্ভোগ বেড়ে যায়, ঢাকা থেকে দু'ঘণ্টার পথ আরিচা। চট্টগ্রাম বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর হলেও, এখানে কার-এর সংখ্যা খুবই কম।

এ সকল কথা উন্নয়শীল অন্য যে কোনো দেশের বেলায় সত্য : যেসব দেশ সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, হংকং এবং থাইল্যান্ডের মতো উন্নত, সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, ফিলিপিন, অংশত ইন্দোনেশিয়া– এখনো তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত এসব দেশে বিপুলসংখ্যক বিদেশীর উপস্থিতি নিত্যকার ঘটনা; এসব বিদেশী সকলেই ব্যবসায়ী নয়, অনেকেই অফিস কর্মকর্তা– যারা এখানে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে

www.pathagar.com

লিপ্ত, বিশেষত অনুদান-সাহায্য কর্মসূচীতে। 'অনুদান' হলো এমন একটা ক্ষেত্র যা অফিসারদের আকৃষ্ট করে হরদম; অনুদান তৈরি করে রাজধানী শহর : এ ধরনের শহরই বিদেশীদের টানে। প্রমোদ ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশে যা কিছু নির্মিত হয়, তার অধিকাংশই অনুদাননির্ভর : এমনকি হোটেলগুলো, কুর্মিটোলা-চট্টগ্রামের গল্‌ফ কোর্স– এগুলোও বিদেশী সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে; কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায়। উন্নয়নমূলক কাজের নব্বই ভাগ অনুদান-সাহায্যে সম্পাদিত।

বাংলাদেশ বিদেশী সাহায্যনির্ভর দেশ; ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ ১৬ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেছে– ১১০ মিলিয়ন লোকের জন্যে বছরে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলার; গড়ে ৮ ডলার। জামানত বা অঙ্গীকার অবশ্য প্রতিবছর ৮০০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি। মোট অর্থ অংশত তুলনীয় হতে পারে ইজরায়েলের সঙ্গে; ইজরায়েল তিন মিলিয়ন লোকের জন্যে তিন বিলিয়ন অর্থ সাহায্য নেয়; অথবা তার চেয়ে ২ বিলিয়ন বেশি যায় মিসরে; কিংবা বিশ্বব্যাংক সাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক লাতিন আমেরিকার দেশগুলো 'ঋণ' হিসেবে যে পরিমাণ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ যে অর্থ সাহায্য পায় তা যথেষ্ট বিবেচনাযোগ্য; কেননা বাংলাদেশ সরকার লোকদের কাছ থেকে কোনো ট্যাক্স নেয় না; আর অর্থ সাহায্য ব্যবহার হয় উন্নয়ন কাজে। অনুদান-অর্থ সাহায্য ইত্যাদি সম্পূর্ণত সরকারনির্ভর; সরকারই এসব নিয়ন্ত্রণ করে– আর সেজন্যেই ঢাকার গুরুত্ব; সেজন্যেই 'ঢাকা' শহর দেখলে বোঝা যায় সরকারের অস্তিত্ব, ঢাকার বাইরে গেলে বোঝা যায় যেন সরকারের হাতে এগুলো নিয়ন্ত্রণ হয় না।

বাংলাদেশ একটা অনুদাননির্ভর দেশ, এদেশের সরকার অনুদাননির্ভর সরকার, অন্যদিকে বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট ট্যাক্স নেয় না জনগণ থেকে, স্বাভাবিকভাবে বিদেশী এজেন্সীগুলো এবং তাদের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের ওপর বিরক্ত। একজন রবার্ট ম্যাকনামারার পক্ষে ওয়াশিংটনে হয়তো সকল ব্যাংক অফিসারের নাম জানা সম্ভব নয়, কিন্তু ঢাকায় তা সম্ভব।

বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বার্ষিক প্রতিবেদনের রাজনীতির সংবাদই থাকে বেশি; ওই রিপোর্ট নেতিবাচক হলে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয়ের সচিবদের তৎপরতা খানিকটা বেড়ে যায়। সত্য হলো, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থ সাহায্য প্রদানকারীদের বিরক্ত করে বাংলাদেশে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। ভাইসরয়বৃন্দ কেবল দেশের ম্যাক্রো-ইকনোমিক পলিসিই নির্দেশ করেন না; তারা সরকারের চাকরি নির্ধারণ ও কোটা প্রদান এবং মাইনরিটি বিষয়ক দেশের অন্তরঙ্গ প্রশ্নেও হস্তক্ষেপ করেন। দেশের অন্তরঙ্গ বিষয়ের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত; এক্ষেত্রেও বিদেশীরা মহিলাদের পিল খেতে এবং পুরুষদের কনডোম

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে বলে। তারা ঠিক করেন কখন এবং কোথায় সেতু নির্মাণ করা হবে, যেমন যমুনা সেতু বিষয়ক সাম্প্রতিক বিতর্ক; আমদানির ক্ষেত্রে কোথায় কোথায় শুল্ক ধরা হবে, তা-ও তারা ঠিক করে দেন। এক কথায় জীবনের এমন কোনো স্তর নেই, যেটা তারা লক্ষ্য করেন না। তারা এমনকি দেশের নির্বাচনেও হস্তক্ষেপ করেন, বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পাঠিয়ে; তারা দেখতে চান অনুদাননির্ভর সরকার প্রতারণা করছে কিনা; কেউ কেউ এমনও বলেন, নির্বাচনে কোন দল জিতবে, তার ওপরেও তাদের প্রভাব রয়েছে।

বিদেশী সাহায্য একটা স্টাইলের জন্ম দিয়েছে, তার নাম 'পাজেরো'। একটা সময় এই স্টাইল ছিল ল্যান্ডরোভার এবং টয়োটা জীপ। এখনকার স্টাইল পাজেরো : শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বিলাসবহুল আসন ব্যবস্থা, স্টেরিও সিস্টেম ইত্যাদি। পাজেরো জানান দেয় ঢাকার বিত্তবৈভব। মার্সেডিজ এবং টয়োটা ক্রাউন এখনো চলে যদিও; তবু এগুলোতে পাজেরোর তুলনায় অ্যাকশন নেই; ওরকম খেলায় আমেজ পাওয়া যায় না এতে। দ্বিতীয়ত, পাজেরো দেখে বোঝা যায় এর পেছনে অনুদানের অর্থ এবং সরকারের যোগ রয়েছে; আর পাজেরো তাঁরই থাকবার কথা, যিনি বহুকাল ধরে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদস্থ ব্যক্তি। অবশ্য অধিকাংশ পাজেরো ঢাকার বাইরে যায় না। কেন্দ্রে ভালো সড়কগুলোতে পাজেরোর চলাচল। এরকম গাড়ি দেখলে বুঝতে হবে গাড়ির ভেতরের ব্যক্তিটি অত্যন্ত ক্ষমতাবান, গাড়ি দেখে চেনা যায় : কার কি ক্ষমতা, কে কোন পদে আছে। পাজেরোতে যারা চড়েন, তারা সবার ওপরে; নিশান প্যাটরল মাঝামাঝি পর্যায়ের; ল্যান্ডরোভারে চড়েন তার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকেরা।

মোটরযান ইংগিত দেয় বিদেশী অফিসার এবং তাদের কনসালট্যান্টদের পার্থক্য এবং পদের স্তরভেদ। অফিসাররা বাইরে থেকে আসেন সিদ্ধান্ত দেবার জন্যে। তারা বলতে গেলে কোনো কাজই এখানে করে না; তবে তাদের চেয়ে নিম্নস্তরে যারা কাজ করে, তাদেরকে তারা নির্দেশনা দেয়। নিম্নস্তরের এই বাহক কর্মকর্তাদের তারা নাম দেয় 'কনসালট্যান্ট'। কনসালট্যান্টরা পৃথক একটা শ্রেণী : এজেন্সি কর্মকর্তারা স্যুট-টাই পরে, কনসালট্যান্টরা স্পোর্ট সাফারি স্যুটে অভ্যস্ত।

অর্থ-অনুদানের পৃথিবীতে বাস্তবে অফিসাররা খুব কম কাজই করে থাকে। এইড এজেন্সিগুলো কনসালটিং সংস্থাগুলো প্রকল্প নির্ধারণ, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, খরচ-খতিয়ান এবং চাকরি-বাকরি ক্ষেত্র খোঁজার জন্যে ডাকে; কনসালটিং সংস্থাগুলো অর্থনীতিবিদ, প্রকৌশলী, সমাজ-অর্থনীতিবিদ, ব্যয়-নির্ধারণকারী, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের কর্মক্ষেত্র ঠিক করে। কনসালট্যান্টরা খুব মেধাবী নয়। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অল্প সময়ের জন্যে যায় : তারপর তারা দেশের

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা করে, প্রকল্পের ব্যয় বাবদ কত যাবে তা ঠিক করে, প্রকল্প বিশ্লেষণ করে, প্রকল্প উদ্যোগের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে; এর মধ্যে চিকিৎসকেরা আছেন, যারা ল্যাব-রিপোর্ট নিয়ে হাজির হন এবং বিভিন্ন মানুষের শরীরের ব্যাধি বিষয়ে প্রতিবেদন লেখেন। কনসালট্যান্টরা সারা পৃথিবীতে যাওয়া-আসা করে। অধিকাংশই পৃথিবীর পঞ্চাশটির মতো দেশে গেছে; প্রথম শ্রেণীর হোটেলে থেকেছে এবং একই রকম অফিসারদের সঙ্গে কাজ করেছে। তারা যা করে, সে বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা অনেকান্ত; এসব তারা বহু দেখেছে, করেছে, এসব দাতাসংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাদের অনেকদিনের যোগাযোগ। তারা অমেধাবী, তারা এমনকি ক্লান্ত।

অফিসারদের আগমনের পূর্বে কনসালট্যান্টদের জানিয়ে দেয়া হয় কি তারা করবে এবং কি সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে। তারপর তারা অফিসারদের বাঞ্ছিত প্রতিবেদন তৈরিতে লেগে যায়। এরা কেউই অদক্ষ-অর্বাচীন নয়; তারা জানে সাহায্য সংস্থার অফিসারদের অনেক ধরনের এজেন্ডা রয়েছে ক্লায়েন্টের জন্যে। দৈনিক বেতনের ভিত্তিতে কনসালট্যান্টরা কাজ করে, তাদের গুরুত্বও অনেক; এইড এজেন্সিগুলোর সঙ্গে তাদের যে উঠা-বসা আছে, যে সম্পর্ক আছে সেটা তারা নষ্ট করতে চায় না। এমন কোনো সুইডিশ সাহায্য সংস্থার কথা ভাবা যায় না, যারা এমন কোনো প্রকল্পের অনুমোদন করবে– যে প্রকল্পে সুইডিশ পণ্য বা সামগ্রী ব্যবহার হবে না। সুইডিশরা অন্য এজেন্সিগুলোর মতোই।

আর এটাই হলো সকল সমস্যার মূল। প্রকল্প শুরু হয় পণ্যসামগ্রীর ব্যবহার ও উপযোগ দেখে; এজেন্সিগুলোও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোকে নিজেদের উৎপাদিত ব্যবহারের কাজে লাগায়। যদি হল্যান্ড যথেষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে থাকে, কিংবা ব্রিটেন যদি বার্মিংহাম থেকে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ সামগ্রী দিতে চায়, তাহলে এইড এজেন্সিগুলো এগুলোকেও সাহায্য বলে গণ্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খাদ্যদ্রব্য পাঠায় সাহায্য হিসেবে। কেননা গুদামে রাখার চেয়ে পাঠিয়ে দেয়ার খরচ অনেক কম। ইউএসএআইডি'র পরিচালককে ঈশ্বর মঙ্গল করুন, কেননা খাদ্য সাহায্য সংকোচনের প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে ধমক দিয়ে থাকবে, না হলে তিনি এই সংকোচনের কথা বলবেন না। কনসালট্যান্ট ঝামেলায় পড়েন যখন তিনি এমন সামগ্রীর কথা বলেন, যেটা তার দেশের প্রজেক্টের জন্যে অপ্রযোজ্য এবং যেটা কর্মকর্তারা যে পণ্যসামগ্রী ব্যবহারের কথা বলেছেন তার বিরুদ্ধে যাবে। অনুদান গ্রহীতার বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন হয় না। এই বাছাই সবসময় মন্দ নয়, আর বাংলাদেশের জন্যে এটাই স্বাভাবিক। যদিও দেশের নেতারা অন্য ধরনের বাছাইয়ের কথা বলেন।

বাংলাদেশ যেহেতু দরিদ্র, তাই বাংলাদেশ কোনো অনুদানই ফিরিয়ে দিতে পারে না। এমনকি কোনো প্রকল্প যদি তার স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তবু। যেমন,

www.pathagar.com

মার্কিন খাদ্য সাহায্য সরকারকেই দেয়া হয়; এই খাদ্যদ্রব্য মুক্তবাজারে বিক্রি হয়, নগদে ঘাটতি পূরণের জন্যে। প্রথম অশুভের সূচনা সেই জায়গায়, যেখানে কৃত্রিমভাবে এর মূল্য নির্ধারণ হয় এবং দাম কমে যায়। স্থানীয় কৃষকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি; এরা দেশের নব্বই শতাংশ মানুষ, এদের জমিজমা বলতে অল্পই আছে। খাদ্যের এই বিপুল সরবরাহের কারণে বাংলাদেশ সরকার খাদ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে ট্যাক্স নিতে অনুৎসাহী। আবার অনুদান দেয়া হয় দ্রব্যের আকারে : যেমন দেয়া হয় বীজ– যেটা খেটে-খাওয়া লোকেরা হয় নিজেরা সাবাড় করে অথবা ডিলারদের কাছে নগদ টাকায় বেচে দেয়। একজন ইউএনডিপি অফিসার তাই বলেন, যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য বা অনুদান বাংলাদেশ পায়, তা দিয়ে বাংলাদেশের সকল প্রকার উন্নয়ন ব্যয় এবং সরকারের সম্পূর্ণ বাজেট বহন করা সম্ভব।

এভাবে অনুদান কারখানা এবং কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত ও কলুষিত করে; এভাবে গরীব দেশের রাজনীতি নষ্ট হয়। কোন অর্থে তবে গণতন্ত্র থাকে, মানুষদের যদি ট্যাক্স না দিতে হয় কিংবা দিতে না চায়। একজন অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছেন, এক্সাইজ এবং ট্যাক্স ছাড়া, অন্য কর আদায়ের ব্যয় রাজস্বের সমান। কৃষকদের ভূমিকর দিতে হয় না। ঋণও অনুদাননির্ভর সরকার মওকুফ করে দেয়; কাজেই গতবছর যে টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, তার ট্যাক্সও দেয়া লাগে না।

ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছ থেকে নেয়া ঋণ শোধ করে না; ব্যবসায়ীরা জানে অচিরেই বিদেশের অনুদান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনবে এবং তাদের ঋণ ব্যাংক মাফ করে দেবে। এরকম রাজক্ষমা এবং করহীনতা আশ্চর্য রকম দয়িত্বহীনতার পরিস্থিতি তৈরি করেছে বাংলাদেশে। এই হলো বাংলাদেশের অনুদাননির্ভরতার পরিণতি। ঋণ নিলে তা ফেরত দিতে হয় না, এ এক আশ্চর্য মানসিকতা; এই মানসিকতার ফলে দেশের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ আজ ক্ষতিগ্রস্ত। বাংলাদেশের আইন এবং আদালতের অবস্থাও এক কথায় শোচনীয়। আইনগত পদক্ষেপ নেয়া এখানে সব সময়েই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়; এক শিল্পমন্ত্রী প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠেছিলেন এক বিচারপতির সামনে, কেননা ঐ বিচারপতি ইচ্ছাকৃতভাবে একজনের বিরুদ্ধে আনীত একটা কেস অহেতুক; কিন্তু স্বেচ্ছায় দেরি করাচ্ছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ওই মন্ত্রীর সে রাতেই হার্ট অ্যাটাক হয়।

বিদেশী সাহায্য বাংলাদেশী এলিটদের জন্যে ঈভের আপেলের মতো। দেশের এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশের ফরেন এইডকে তুলনা করেছেন চেতনানাশক ইনজেকশনের সঙ্গে। তবে এসবের অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশের সকল বিদেশী সাহায্য নষ্ট হয়ে যায়। বরং বাংলাদেশ আগের তুলনায় অনেক বেশি এখন

www.pathagar.com

ঐশ্বর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে বড় রকমের এক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল অর্ধশতাব্দী পূর্বে, আর আঠারো বছর আগে দুর্ভিক্ষের মতোই খাদ্যাভাব দেখা দেয় বাংলাদেশে। ধান উৎপাদনের তুলনামূলক তথ্য দেয়া যেতে পারে। ১৯৮৯ সালে যেখানে ১১০ মিলিয়ন লোকের জন্যে ১৯ মিলিয়ন টন ধান ছিল, সেখানে স্বাধীনতার বছর অর্থাৎ ১৯৭১ সালে ৭৫ মিলিয়ন লোকের জন্যে ধান ছিল মাত্র ৮ মিলিয়ন টন। কাজেই খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় বেশি, তা দেখাই যাচ্ছে। ১৯৮৯ সালে খাদ্যশস্য সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় দশ শতাংশ বেশি; এর ফলে এই সঞ্চয় থেকে দৈনিক ১.১ পাউন্ড শুকনো ধান প্রত্যেক নারী, পুরুষ, শিশুকে দেয়া সম্ভবপর। এক পাউন্ড চালে কিন্তু অনেক ভাত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার বদৌলতে বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করা হয়; তারপর পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমগ্র দেশ এখন বিদ্যুতায়িত; দেশের আনাচে কানাচে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাপ্ত হয়েছে। প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় এখন বিদ্যুৎ আছে; তবে ৬৫ হাজার গ্রামের মধ্যে বিশ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে। সড়ক উন্নয়ন হয়েছে, বড় বড় নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হয়েছে; মেঘনা, যমুনা, গোমতি এবং কর্ণফুলীর ওপর সেতু তৈরি করা হয়েছে। সেতু নির্মাণের ফলে এখন আর ফেরির জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরক্তিকরভাবে বসে থাকতে হয় না। দেশের যে কোনো স্থানে টিউবওয়েল দেখা যাবে; ক্ষেতে পানি সরবরাহের কাজেও তা কার্যকর। আর বিদেশী অর্থ সাহায্যের প্রশংসা করতেই হয়, কেননা দেশের ভেতর বিদেশী সাহায্যে অনেকগুলো সার কারখানা গড়ে উঠেছে। বিদেশী অর্থ সাহায্যে অনেক পাওয়ার জেনারেটিং প্লান্টও গড়ে উঠেছে। রেলওয়ে ব্যবস্থাও এখন আগের তুলনায় অনেক উন্নত ও অগ্রসর এবং বিমানবন্দরসমূহ এখন অনেক বেশি আধুনিক।

যে কোনো দিক থেকে বাংলাদেশ এখন অতীতের পাঁচ, দশ, বিশ বছরের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে। মানুষের আয়ু বেড়েছে, মানুষ খাচ্ছে-দাচ্ছে যথেষ্ট; প্রত্যেকের শরীরে ভালো জামাকাপড়ও শোভমান; যোগাযোগ ব্যবস্থা ও চিকিৎসার সুবিধে আগের তুলনায় যথেষ্ট বেড়েছে। তাছাড়া ট্রেন, নৌকা, বাস এবং বিমানে করে দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত করা এখন অনেক সহজ। কিন্তু বাংলাদেশীরা ট্যাক্স দেয় না, এইডের ওপর তাদের সবটুকু নির্ভরতা।

তবে এমন নয় যে, বাংলাদেশ চাইলেই আজ বিদেশী অর্থ সাহায্য ত্যাগ করতে পারে। তার কারণ দেশের ভেতর দুর্যোগের পর দুর্যোগ লেগেই আছে। তাছাড়া এ কথাও সত্য নয় যে, সব এইডই নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা ধনীদের পকেটে ঢোকে। কিছু নষ্ট হয়। কিছু ধনীদের কব্জায় যায়। তবে বিদেশী অর্থের সিংহভাগ উন্নয়ন

www.pathagar.com

কাজে ব্যয়িত; ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাঙালির জীবনে যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, এইডের ফলে ওরকম দুর্যোগ এখন যে কোনো সময় মোকাবিলা করা সম্ভব। সেই মহাদুর্ভিক্ষের সময় দরকার ছিল বিদেশী অর্থ সাহায্যের; কিন্তু মানুষ তা পায়নি– ফলে মরে যায় পাঁচ মিলিয়নের মতো আদম সন্তান। তবে যে কোনো কারণেই হোক বাংলাদেশের মানুষেরা এইডের জন্যে সবসময়ে কাতর; বিদেশী অর্থের কাছে বাঙালিরা কৃতজ্ঞ।

তবে বিদেশী অর্থ সাহায্য একমাত্র বাস্তবতা নয়। বিদেশী অর্থের বাইরে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য বিজনেস সেক্টর আছে; উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বিজনেস সেক্টরকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। বহুকাল ধরে পাট এবং চা বিদেশী মুদ্রালাভের প্রধান একটা উপায়; কাজেই চা এবং পাট বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান সূত্র। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সূত্রপাত থেকে বাংলাদেশের পাট এবং চায়ের প্রতি অনেক বিদেশী পর্যটকেরই নজর পড়ে; চা এবং পাটের কারবার দেখার জন্যে লন্ডন, স্কটল্যান্ড, ডান্ডি, থ্রেডনিডেল স্ট্রীট থেকে অনেকে এদেশে এসেছে। মনে রাখা দরকার, অতিসম্প্রতি ব্রিটেন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রুটের জন্যে কয়েকটি টারবো-প্রপ জেট বিক্রি করেছে। ব্রিটিশ প্রভাবের কথা বাদ দিলেও, এমনিতে পাট এবং চা দেখার জন্যে অনেকে কৌতূহলী হয়ে এদেশে আসে। তাদের ভেতর টিপিক্যাল পর্যটক আছে, যেমন ভালো পোশাক-আশাকের নারী-পুরুষ, যাদের উচ্চারণ ব্রিটিশদের মতো কিংবা স্কটিশদের; যারা ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার পরে এবং ব্লেজার গায়ে দেয় এবং যারা খুব ভদ্রলোক।

এ তো গেল এক ধরনের পর্যটকের কথা; আরেক রকম বিদেশী আছেন, যারা মূলত এদেশেরই পাট বা চা-পরিবারের আমন্ত্রণে এখানে আসেন; ব্রিটিশ হাইকমিশনে ডিনার সেরে তাঁরা বেড়াতে বের হন কুলাউড়া, সাতগাঁও, গাজীপুর, মির্জাপুর, নারায়ণগঞ্জ, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায়। এসব স্থানে পাট এবং চা'র চাষ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন। চা এবং পাটের বিনিময় নিয়ে তাঁরা আলাপ করেন, টি বোর্ড এবং জুট বোর্ডেও তাঁরা মিটিং-এ মিলিত হন। তাছাড়া শিকারের শখও এঁদের থাকে, যদিও সম্প্রতি শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বহু বছর ধরে পাট বাংলাদেশের একমাত্র রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য। সোনালী আঁশের খোঁজে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে লোকেরা এখানে আসে। কার্পেট, তামাক, থলে, বস্তা, হ্যান্ডব্যাগ বা ক্যামোফ্লেজের জন্যে পাটের ব্যবহার বহুবিদিত। পাট বাংলাদেশের বহু প্রাচীন এক শস্য, স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলাদেশে পাটের চাষ হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীতে, প্রধানত ডাচ ব্যবসায়ীদের কারণে পাট উৎপাদন প্রচণ্ড বেড়ে যায়; তখন ভারতবর্ষে ডাচদের বাণিজ্য ঘাঁটি ছিলো, এবং বাংলাদেশের পাট

www.pathagar.com

তখন চালান হতো, এমনকি ইন্দোনেশিয়ায়। সেই সঙ্গে স্কটল্যান্ডে পাট উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নয়ন পাটের একটা আন্তর্জাতিক চাহিদা তৈরি করে, সে কারণে এক সময় সমস্ত পাট বিশ্ববাজারে বিক্রি হতো। ১৮৫৪ সালে ভারতে প্রথম পাট কারখানা স্থাপিত হয় এবং 'ডানডি' হয়ে উঠলো ক্রমশ পাটের ব্যবহার উপযোগী প্রক্রিয়ার একমাত্র কেন্দ্র। তবে এই বিশেষ প্রযুক্তি ভারতেও চলে আসে এবং এখন এই প্রযুক্তি বাংলাদেশেও আছে। ১৯৫০ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম পাট কারখানা ও পাট উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু হয়; যদিও বাংলাদেশ বহুকাল থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ, তবু পাটের শিল্পায়ন, প্রযুক্তি ও কারখানা সাম্প্রতিক ঘটনা।

প্রায় দু'শতাব্দী ধরে এখানকার চাষীরা প্রধান শস্য হিসেবে পাট চাষ করে আসছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পাট হয়ে ওঠে 'সোনালি শস্য'; সোনালি শস্য কেবল এজন্যে নয় যে, পাটের ফুলের রং হলুদ, বরং এজন্যেই যে, পাটের বিশ্বব্যাপী চাহিদা একে সোনালি শস্যের সম্মান এনে দেয়। কৃষকরা আন্দাজ করে নিতে পারে কি পরিমাণ এবং কতটুকু জমি এবার তারা পাট চাষের জন্যে ব্যবহার করবে, কতটুকু ধান চাষের জন্যে। গত বছরে পাটের দাম কি ছিল, তার লাভ-ক্ষতি থেকে কৃষকেরা পাট চাষের আন্দাজ পায়। পাট চাষ করা হয় শুকনো মৌসুমে, এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে; জুলাইয়ের শেষে পাট পরিপক্ক হয়। জুলাইয়ের শেষেও বিলের মধ্যে গভীর পানি রয়ে যায়, যদিও ততদিনে পাটগাছের ফুল শুকিয়ে এসেছে। পাট উৎপাদনের মাধ্যমে বাঙালি জীবনে স্বর্ণযুগ নেমে আসে, ১৮৯০ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সময়কাল সেই ঐতিহাসিক স্বর্ণযুগ। সে সময় এদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্গত এবং সে সময় দেশের এই অংশ শিক্ষা, দীক্ষা, বিত্ত ও সমৃদ্ধিতে সবচেয়ে অগ্রসর ছিল। ব্রিটিশ রাজের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব এখান থেকেই সংগৃহীত হয়। 'পাট' চাষ এবং 'চা' পাতার উৎপাদন ভিন্ন ভিন্ন। পাট ক্ষুদ্র চাষীদের নগদ শস্য। তবে বর্তমানে পাট-চাষীদের দুর্ভোগ অনেক বেড়েছে, তার কারণ পাটের চাহিদা এখন আগের চেয়ে কমে গেছে এবং সিনথেটিকের ব্যবহার বাড়ায় পাট তার প্রাক্তন গুরুত্ব হারিয়েছে। আগের পাট-চাষীরা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিল, এখন তারা দুর্ভাগা। বিশ্ববাজারে পাটের দাম অসম্ভব কমে যাওয়ায় দেশের গরীব চাষীরা আজ বিপন্ন। এমন আর কোনো শস্য নেই, যেটা পাটের বিকল্প হতে পারে। পাট চাষের এই অবস্থা অনেক কৃষকের জীবনে সর্বনাশ এনেছে এবং এর ফলে অনেক চাষী শহরে চলে এসেছে জীবিকার অন্বেষণে। পাট ক্ষেতের সংকট দিন-মজুরের চাহিদা নষ্ট করেছে, অন্যদিকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর যে আড়ম্বর, তাতে দেখা যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ খাটাখাটুনির পর গরীব মহিলাদেরকে

www.pathagar.com

সামান্য কিছু গম দিয়ে বিদায় করা হচ্ছে। দেশের দারিদ্র্যের এ বড় করুণ এক পরিণতি, বিদেশী অর্থ সাহায্যের যে দাসত্ব, তার অত্যন্ত স্বাভাবিক রূপ এটা। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর দরকার হলো কেন? এটা কি এজন্যেই নয় যে, পাট এবং পাটের সম্ভাবনা দেশে ধ্বংস হয়ে গেছে? কাজের বিনিময়ে খাদ্য আরেকটা সংকটের কথা জানান দিয়ে যায়, তা হলো নগদ টাকার অভাব। মোটকথা, পাট পড়ে গেছে বলে দেশের এই দুর্যোগ।

অন্যদিকে বাংলাদেশে অনেক পাট কারখানা আছে, এগুলোর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সরকার ক্রমাগত ভর্তুকি দিয়ে ওগুলো চালাচ্ছে; ভর্তুকি সম্ভব হচ্ছে 'এইড'র কারণে; এসব কারখানা থাকা বা না-থাকা সমান। এখনো ওসব কারখানায় শ্রমিক নেয়া হচ্ছে, সরকারি ভর্তুকিতে তাদের বেতন দেয়া হচ্ছে। এসব কারখানার ক্ষমতা অনেক, উৎপাদনও যথেষ্ট, সরকারি মালিকানাধীন কারখানাও অনেক; কিন্তু কারখানার লাভের অঙ্ক কষতে হয় 'এইড'র টাকা দিয়ে। কিন্তু সরকার এসব কারখানার লে-অফ-এর আতঙ্কে সর্বদা তটস্থ থাকে এবং গবেষণা ও উন্নয়ন পর্যালোচনার মাধ্যমে সিনথেটিকের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবেশ অনুকূল পাটজাত দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন বা তাগিদ এখানে দেখা যায় না। বস্তুত, বাংলাদেশের পাটশিল্পের বিকাশের জন্যে যোগ্য নেতৃত্বের আজ খুব প্রয়োজন। কিন্তু বিদেশী অর্থ সাহায্য হাতকড়া লাগিয়ে দিয়েছে; এইড উৎপাদনমূলক মুনাফার অন্তরায়।

চা-শিল্প বাংলাদেশে উন্নতি লাভ করেছিল ব্রিটিশদের সূত্রে। বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তে আসামের কাছাকাছি পাহাড়ী এলাকায় চা উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের চা-পাতার বিরাট আমদানীকারক হতে পারে চীনের মতো দেশ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা লক্ষ্য করে যে, এদেশের বনাঞ্চলে আপনা-আপনি চা-পাতার গাছ জন্মায়; তখনই ব্রিটিশরা চা-বাগানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এভাবে সুশৃংখল পদ্ধতিতে চা-পাতার চাষ আরম্ভ হয়। আর তখন থেকেই বড় বড় চা-বাগান গড়ে ওঠে এবং উপযুক্ত সহায়ক গাছের বেষ্টনীতে চা-চাষ শুরু হয়। চা-বাগান তো এক অপরূপ সবুজ মরুদ্যানের মতো; সেই বাগানে যখন মেয়েরা পাতা তুলতে নামে, তখন একটা অসাধারণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো বাগানে চা-পাতার প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থাও আছে; সেসব বাগানে কেবল চা-পাতা সংগ্রহই করা হয় না, ভালো ব্যবস্থাপনায় তা শুকানো হয় এবং ব্যবহার উপযোগী করা হয়। বাংলাদেশে বিরাট আকৃতির ১৬০টি চা-বাগান আছে এবং চট্টগ্রামে চায়ের বড় বাজার গড়ে উঠেছে।

চা-বাগানগুলো শহর থেকে দূরে। স্বাভাবিকভাবে চা-বাগানের শ্রমিক ও উৎপাদনকর্মীরা বাংলাদেশের ধান চাষের আবহাওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। চা-বাগান অনেকটা ভূ-স্বামীদের ফিউডাল সম্পত্তি; ফিউডাল মালিকেরা যদি চায় তাহলে

www.pathagar.com

চা-বাগান কর্মীদের খাদ্য, আহার, আবাস, শিক্ষা ও জীবনব্যাপী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে এবং তার ফলে এসব শ্রমিকের আর বিকল্প কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তির দরকার হয় না। চা-বাগানের মালিকেরা পুরোপুরি একটা সামন্ত পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে চা-বাগানগুলোতে; এখানকার শ্রমিকদেরকে 'দাস'-এর মতো ব্যবহার করা হয়, তাদের জন্যে ফিউডাল পদ্ধতির শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তাদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়; যেমন– যদি কোনো শ্রমিক চা-বাগানের মালিকদের নির্যাতনের কবল থেকে বাঁচতে বা পালাতে চায়, তাদের জন্যে ভূ-স্বামীরা এই সামন্ত প্রকৃতির নির্যাতন ব্যবস্থা রেখেছে। দেখা যাবে চা-বাগানে অনেক অনেক শ্রমিক বিদেশ থেকে আগত; বিদেশ থেকে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অনেকটা দাসের মতো এখানে তারা এসেছে, তাদের ভাষাও ভিন্ন; যে ভাসায় তারা কথা বলে, সে ভাষা আশপাশের অন্য মানুষেরা বোঝে না। সেদিক থেকে চা-বাগানের কর্মীরা মালিকদের ভাড়াটে দাস, শ্রমিক, ব্রাত্যজন।

চা এবং পাটের ক্রয়কারীরা বর্ষাকালে কিংবা বর্ষাকালের শেষে আসে। তারা তখনই এদেশে পা রাখে যখন শস্য কেটে গোলাজাত এবং প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। কারণ, গোলাজাত না করে দাম নির্ধারণ করা যায় না। চট্টগ্রামে টি এক্সচেঞ্জ কেন্দ্রে নিলাম ডাকার মাধ্যমে চা রপ্তানির কার্যক্রম চলে; নিলাম ডাকার প্রথাও অদ্ভুত : একটা অন্ধকার কক্ষে একটা আখরোট কাঠের ডেস্কের ওপর হাত রেখে নিলাম আহ্বান করা হয়; যিনি নিলাম ডাকেন তিনি দাম চড়ানোর চেষ্টা করেন অনেক; কিন্তু পারেন না, অভিজ্ঞ ব্রোকাররা তাঁকে থামিয়ে দেয় বিভিন্নভাবে।

বর্তমানে আবার বাংলাদেশের আরেকটা শিল্প বিদেশীদের বেশ টানছে। সেটা গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইলস। বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য বাংলাদেশে নতুন নয়; কিন্তু বিদেশী ক্রেতারা এসে এখন যেভাবে কাপড় তৈরির অর্ডার দেয়, যেভাবে মার্কিনরা রেডিমেড আইটেম বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যায় পৃথিবীর বাজারে সেটা নতুন এবং বছর দশেকের মতো হলো বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বেশ অগ্রসর হয়েছে। আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক যাচ্ছে এবং পোশাক তৈরির পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। বস্ত্র রপ্তানির জন্যে আকাশ ও সমুদ্রপথে নতুন এক ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে বলতে হবে। গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির কারণে স্থানীয় কারখানাগুলোর মধ্যেও কাপড়, বোতাম ও অন্যান্য বস্ত্র-উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে একটা গতি সঞ্চার হয়েছে। চাহিদা পূরণের জন্যে স্থানীয় বস্ত্র কারখানার শিল্পপতিরা সাউথ কোরিয়া অথবা হংকংভিত্তিক চীনাদের কাছ থেকে সেলাই যন্ত্রসামগ্রী কেনে। সাউথ কোরিয়ার দাতাসংস্থা এবং কারখানাসমূহ বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। কে শার্ট এবং ব্লু জীন উৎপাদনকারী

www.pathagar.com

বড় বড় শিল্পপতিরা বাংলাদেশে তাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল এক্সপার্ট এবং সুপারভাইজারদের পাঠায়; যাতে তাদের নির্দেশনায়, তাদের চাহিদামতো ঠিক সময়ে ঠিক পোশাকটি তারা বাংলাদেশ থেকে বানিয়ে নিতে পারে। বাংলাদেশের লেবেল এখন পৃথিবীর সর্বত্র চোখে পড়ে।

গার্মেন্টস টেক্সটাইল বিষয়ে আসল কথা হলো, এই ইন্ডাস্ট্রি যদিও এখন এখানে বেশ রমরমা, কিন্তু মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে এক সময় সুতি কাপড় উৎপাদনের মনোপলি ছিল। সেটা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিককার কথা। ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থে বাংলাদেশের এই ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস করে দেয় এবং মধ্য উনিশ শতকে ঢাকার জনসংখ্যা অকস্মাৎ হ্রাস পায়। সে যাই হোক, তাঁতীদের দক্ষতা তো আর ধ্বংস করা যায়নি, গার্মেন্টস শিল্পের সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে ওই বিশেষ দক্ষতার ঐতিহাসিক যোগ আছে। বর্তমানে বস্ত্র কারখানা এবং পোশাক শিল্পে সবরকম আধুনিক প্রযুক্তিই ব্যবহার হচ্ছে।

গার্মেন্টস শিল্পের পাশাপাশি একটা নতুন ব্যবসাও দেখা দিয়েছে, তা হলো সুতা বয়ন এবং সিনথেটিক সুতার উপযোগ। এসব সুতার কিছু পরিমাণ বাংলাদেশেই ব্যবহার হয়, কিছু পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি; রপ্তানি হচ্ছে বটে, কিন্তু বৈধভাবে নয়– চোরাইপথে বেশির ভাগ ভারতে চলে যায়। ভারতে কাপড় উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরো সূক্ষ্মতর কৌশল রয়েছে। সুতা ব্যবসার এই ক্ষেত্রটি নতুন এবং এই সুতা ব্যবহার হয় আমদানিকৃত কাপড়ে এবং এখন মনে হয়, বাংলাদেশ যদি ধীরে ধীরে পোশাক শিল্পে আরো উন্নতি করে, তাহলে পরবর্তী তিরিশ বছর বাংলাদেশ এক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। তাই বগুড়া থেকে আরিচা অবধি বস্ত্র কারখানাগুলো আজ স্বতই চোখে পড়ে।

চট্টগ্রামে ভ্রমণ করা সাম্প্রতিককালে সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রামে একটা নতুন এক্সপোর্ট জোন খোলা হয়েছে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের শিল্পও গড়ে উঠেছে। ওসব শিল্প-কারখানার উৎপাদন সামগ্রীও বিচিত্র; যেমন ভিডিও প্লেয়ার, ভিডিও রেকর্ডার, রেডিও, বৈদ্যুতিক বাতি এবং আরো অনেক রকম প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী। টেলিভিশন সেটও ওখানে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সরঞ্জামে প্রস্তুত করা হচ্ছে। একটা কোম্পানি চট্টগ্রামে এখন যে মানের টেনিস ও এথলেটিক জুতো বানায়, তা বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ জুতোর সঙ্গে তুলনীয়। এই জোনকে ঘিরে নতুন নতুন কারখানাও গড়ে উঠেছে এবং এসব খবর পৃথিবীর লোকদের কানে পৌঁছে গেছে। এমনও শোনা যায় যে, এই জোন বিক্রি হয়ে গিয়ে সেখানে নতুন জোন গড়া হবে। এসব ইলেকট্রনিক সামগ্রীর জন্যে বাংলাদেশের নতুন ক্রেতা শ্রেণীও তৈরি হয়েছে। জানা যায়, চট্টগ্রামে এখন আরো অধিকতর

www.pathagar.com

প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে; এমনও শুনি যে, টেলিভিশনের স্ক্রিন এবং তার অভ্যন্তর যন্ত্রাংশ তৈরিরও প্রস্তুতি চলছে। যদিও এখনো কেউ 'সিলিকন ভ্যালি'র কথা বলছেন না, তবে মনে হয় এই ব্যবসার দরজা অচিরেই খুলে যাবে। ইলেকট্রনিক ক্ষেত্রে এই উৎপাদনশীলতার জন্যে এখন এক্সপোর্ট জোনে জাপানী, চীনা, থাই, ভারতীয় এবং সিঙ্গাপুরবাসী ব্যবসায়ীদের আনাগোনা দেখা যায়।

বাংলাদেশে লোহা এবং ইস্পাতের ইন্ডাস্ট্রি আছে। এ হলো অকেজো জাহাজ খুলে নেয়ার কাজ; এ বড় পরিশ্রমসাধ্য কাজ। যেসব জাহাজ আর চলে না, সেই জাহাজগুলোকে সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম আনা হয় এবং তার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রাংশগুলো কখনো আলাদারূপে, কখনো তার আকার ও গড়ন পরিবর্তিত করে বাজারে আনা হয় কিংবা বিশ্ববাজারে আবার বিক্রয় উপযোগী করে তোলা হয়। কখনো কখনো শিল্প-কারখানার অন্য উৎপাদন সামগ্রী হিসেবেও এর ব্যবহার চলে।

বরিশাল এবং ঢাকার মূল নদীর পাশাপাশি অন্য ধরনের কিছু শিল্প-কারখানাও গড়ে উঠেছে; এসব স্থানে ইটের কারখানা, জাহাজ ও নৌকা নির্মাণ কেন্দ্র, ইস্পাতের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন প্রভৃতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। মংলার নতুন বন্দরও সম্ভাবনাময় শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে নেয়া যেতে পারে; কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হলো, মংলার সঙ্গে অবশিষ্ট দেশের সড়ক যোগাযোগ নেই।

চামড়ার কারখানাও বাংলাদেশে আছে। যদিও বাংলাদেশে ২২ মিলিয়ন গরু ও মহিষ এবং ১৩ মিলিয়ন ছাগল আছে; তবু ওগুলোর চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি এবং সেই জুতো বিদেশে রপ্তানি করা সাম্প্রতিক ঘটনা। তবে যে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয়নি, তাতে ট্যাক্স ধরা হয় না; কিন্তু প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ওপর সরকার শুল্ক বসায়। বাংলাদেশ চামড়া শিল্পে অচিরেই উন্নতি করবে, হোটেল লবিগুলোতে ঘোরাফেরা করলে তা টের পাওয়া যায়। চামড়া বর্তমানে ক্রমশ রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত হচ্ছে। অনেক ক্রেতা এবং যন্ত্র বিক্রেতা প্রায়ই স্থানীয় কারখানা খোঁজেন, যেখানে জুতো এবং চামড়াজাত অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করা যাবে এবং যেসব সামগ্রীর রপ্তানিযোগ্যতা থাকবে। এসব ক্ষেত্রে এখনই অনেক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, নিউইয়র্কের অনেক ব্যবসায়ীও এখন হোটেল কক্ষ ভাড়া করছে। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের এখনো শৈশবকাল, তবে অচিরেই এই শিল্প যৌবনে উন্নীত হবে।

বাংলাদেশে কেউ কেউ আসে চা, পাট, গার্মেন্টিস, ইলেকট্রনিক্স প্রভৃতির জন্যে; আবার অনেকে আসে হস্তশিল্পজাত সামগ্রী, ব্যাঙের পা এবং চিংড়ি কেনার জন্যে।

www.pathagar.com

চিংড়ি সমুদ্রে তো প্রচুর আছেই, এখানকার জলাশয়েও পিসিকালচারের মাধ্যমে প্রচুর চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

আরেকটা 'এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি' বাংলাদেশে আছে, তা হলো মধ্যপ্রাচ্য এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে জনশক্তি রপ্তানি। বাংলাদেশ থেকে যারা বিদেশে কাজ করতে যায় তাদের সামর্থ্য, পরিশ্রম ও দক্ষতা প্রশংসিত হয়; এদের অনেকে আবার ইংরেজি ভাষাটাও জানে। ম্যাট্রিক পাস করা এই বাঙালিদের পৃথিবীর বহু জায়গায় দেখা যায়; তাদের কেউ হয়তো গাড়ি চালায়, কেউ কেউ অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তিতে কাজ করে, কেউ কেউ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশে শিল্পের ক্ষেত্রে জরুরি কথাটা হলো, এই দেশ রপ্তানিমুখী। এই রপ্তানিই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। রপ্তানির মাধ্যমেই বাংলাদেশ স্বনির্ভর হতে পারবে, ঋণ শোধ করতে পারবে, দাতা দেশগুলোর সাহায্য থেকে বাঁচতে পারবে। ব্যবসাবাণিজ্যের পর্যটকেরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, এইড এজেন্সির অফিসারেরা নয়। বিদেশীদের সূত্রে যে ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠেছে, সেটাই উন্নতির পথ এবং পৃথিবীর বুকে স্থান করে নেবার উপক্রমণিকা; কেননা গত একশ' বছরে এমন কোনো দেশ অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারেনি, যে দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়নি।

অন্য এক ধরনের পর্যটক বাংলাদেশে আসে, যাদের লক্ষ্য বিভিন্ন আমদানিজাত সামগ্রী বিক্রি করা। এই সেল্‌সম্যান পর্যটকেরা এশিয়া থেকেই আসে। এরা মূলত জাপান, ভারত, সিঙ্গাপুর এবং হংকং-এর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের অনেক সামগ্রীর বাজারও বাংলাদেশে আছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদেশী পণ্য প্রধানত পূর্ব এশিয়ার, অর্থাৎ জাপানের। প্রায় সকল কার, ইলেকট্রনিক্স, ঘড়ি প্রভৃতি জাপান থেকে আসে এবং এসব দ্রব্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠিত ইমপোর্ট হাউসের মাধ্যমে বাজারজাত হয়। সারা বছর ধরে পূর্ব এশীয়দের দেখা যাবে হোটেলে এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসে; কেননা সরকারের রয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জের বিভিন্ন উৎস, আর অন্যদিকে গভর্নমেন্টের রয়েছে প্রচুর প্রয়োজন, আর দাতাদের অর্থ সাহায্য থেকেই যা মেটানো সম্ভব। সোভিয়েত থেকেও কেউ কেউ আসে, কিন্তু তারা আসে মূলত পণ্য বিনিময়ের জন্যে, কিংবা সরকারি শিল্প-কারখানাগুলোতে গভর্নমেন্ট-টু-গভর্নমেন্ট সম্পর্কের খাতিরে।

চীনা এবং ব্রিটিশরা, কখনো কখনো পাকিস্তানীরা, অস্ত্র বিক্রয় করে বাংলাদেশে; বাংলাদেশে কিছুসংখ্যক অস্ত্র ডিলার আছে। ওদের পাওয়া যাবে কুর্মিটোলা গলফ এবং অফিসার্স ক্লাবে। চট্টগ্রামে চীনাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য; বাংলাদেশের নৌবাহিনীর সঙ্গে তাদের অনেক ব্যবসাবাণিজ্য আছে। চীনের চীফ-অফ-স্টাফ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিছুদিন আগে বাংলাদেশ বেড়িয়ে গেলেন, বহু প্রাচীন চুক্তি নবায়ন

www.pathagar.com

করে নেয়ার জন্যে। মনে রাখা দরকার, বহু যুগ আগে থেকে এদেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক, সেটা প্রায় দশক শতাব্দীর কথা, যখন চীনা পর্যটকেরা বৌদ্ধবাদ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বাংলার এই অঞ্চল বিষয়ে বৃত্তান্ত রচনা করে। ভারতীয় উপমহাদেশ বিষয়ে চীনের আগ্রহ সর্বসময়ের; আর একবিংশ শতাব্দীর এশিয়ায় ভারতের চেয়ে এগিয়ে থাকতে হলে বাংলাদেশকে ধর্তব্যে রাখা বাঞ্ছনীয়; আর চীন বিষয়ে বাংলাদেশের আগ্রহ অন্য কারণে; যেহেতু তিন দিক থেকে ভারত বেষ্টন করে আছে বাংলাদেশকে, কাজেই ভারতকে সংযত রাখার জন্যে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক অনিবার্য। বাংলাদেশের বিমানবাহিনী চীনের নির্মিত 'এফ-এইট মিগ'-এর উপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশরা এবং সুইডিশ বফোর্স ফার্ম বাংলাদেশের সামরিকবাহিনীতে বন্দুক, বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, ট্রাক এবং ইলেকট্রনিক গিয়ার সরবরাহ করে। ব্রিটিশরা তাদের হাইকমিশনে যদি বাংলাদেশী কাউকে নেয়, তবে ব্রিগেডিয়ারের নিচে কাউকে নেয় না। আর যে সুইডিশরা এত এত শান্তির কথা বলে, তারাও শেষ পর্যন্ত অস্ত্রই বেচে বাংলাদেশে! লক্ষণীয়, আমেরিকা বা রাশিয়া বাংলাদেশে কোনো অস্ত্র বিক্রি করে না।

ব্রিটিশদের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। অবশ্য আগের চেয়ে বাংলাদেশের বাজারে তাদের উপস্থিতি কমে গেছে। তবু ব্রিটিশরা বাংলাদেশে চা এবং পাটের জন্যে বিভিন্ন সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের ইংল্যান্ডে প্রস্তুত দ্রব্য, যেমন সিগারেট কিংবা দামী ঔষধ, শোধনাগার সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, শিল্পজাত পণ্য বিক্রি করে। বেশি দিন আগের কথা নয়, ব্রিটিশরা বাংলাদেশে টারবোপ্রপ প্লেনও বিক্রি করেছে।

ডাচরা ভালো ক্রেতা এবং ভালো বিক্রেতা। বাংলাদেশের স্থানীয় চলাচলের জন্যে তারা ফকার এয়ারক্রাফট সরবরাহ করে আসছে অনেকদিন ধরে। অবশ্য আমেরিকায় নির্মিত ডিসি-টেন বিমান বাংলাদেশের একমাত্র লাভজনক আন্তর্জাতিক আকাশযান। এই অঞ্চল বিষয়ে ডাচদের অভিজ্ঞতা অনেকদিনের। বাংলাদেশের সঙ্গে ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামেরও সম্পর্ক আছে। বেলজিয়াম বাংলাদেশ থেকে অনেক দ্রব্যের ক্রেতাও বটে। ডেনিশদের একটা বাণিজ্য ঘাঁটি আছে ভারতে; আর ভারতবর্ষে বেলজিয়ানরা শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন কলকাতার কলেজে অনেক ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক নেতা একদা ওসব কলেজের ছাত্র ছিলেন।

আর জাপান? জাপান বাংলাদেশে কেবল কার বিক্রি করে না, দুটি বড় বড় সেতুও জাপানের উদ্যোগে নির্মিত। একটি মেঘনার ওপর, আরেকটি গোমতির ওপর। এই দুটো কাজ বিরাট ব্যাপার। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে সবচেয়ে

www.pathagar.com

বেশি অর্থ সাহায্য দেয় জাপান। জাপানীদের অন্য একটা মাস্টার প্লানও আছে, তা হলো ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ ও সড়কপথের পাশাপাশি হাল্কা পরিশ্রমের কৃষিভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা; তাদের ধারণা, এসব পথের পার্শ্ববর্তী অনেক ভালো জমি তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে উপযোগী এবং এসব জায়গায় কম টাকায় শ্রমিক বাগানো যাবে।

প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন (অর্থাৎ আজকের রুশ ফেডারেশন) বাংলাদেশের অন্যতম সাহায্যদাতা ছিল; বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শ দূরে রেখেও এ কথা বলা যায় যে, ঘোড়াশালের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে কিংবা চা ও পাট বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের যে অবদান, তা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ছিল। সেই পুরনো সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হতে পারে কিনা, তার আলোচনা এগোচ্ছে শুনতে পাই।

বাংলাদেশের কৃষকেরা বর্তমানে যে গভীর নলকূপ ব্যবহার করে, তা চীনে নির্মিত, এবং তা মূলত চীনই সরবরাহ করে বাংলাদেশে। এই নলকূপগুলোর দাম খুব কম। বাংলাদেশের সর্বত্র কৃষিকাজে এই নলকূপের ব্যবহার হচ্ছে। যে কোনো জমিতে এই নলকূপ চোখে পড়বে। এই সেচযন্ত্র নৌকাতেও ব্যবহার হচ্ছে; নৌকাতে ব্যবহার করার কারণে নৌকা ভ্রমণেও বিপ্লব সাধিত হয়েছে, দূর দূরান্তে যন্ত্রচালিত নৌকাতে করে যাতায়াত করা যাচ্ছে। চীনা সেচযন্ত্রের কারণে কৃষিক্ষেত্রে এসেছে অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন; এক সময় শুষ্ক মৌসুমে চাষবাস ছিল অকল্পনীয় কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে হাজার হাজার একর জমিতে অনায়াসে ধান চাষ হচ্ছে। নলকূপ যন্ত্রের ফলে ১৯৮৩ সালে ১.৬ মিলিয়ন একর জমি, ১৯৮৭ সালে ২.৪ মিলিয়ন একর জমি, ১৯৯০ সালে ৩ মিলিয়ন একর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। মাত্র দু'দশক পূর্বে উত্তরবঙ্গের বিপুল পরিমাণ জমি শুষ্ক মৌসুমে খাঁ খাঁ করতো, আজ সেই বিশাল জমিতে সবুজের সমারোহ : যতদূর চোখ যায়, নয়নাভিরাম সবুজাভা অবাক করে দেয়। ডিজেলচালিত এই অতি সাধারণ সেচযন্ত্রকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

আরেক ধরনের পর্যটকও বাংলাদেশে আসে-যায় : তাদের হিসেব হোটেলে নেই, পরিসংখ্যানে নেই। তারা কোনো সেমিনার করে না, অর্থনীতির তত্ত্ব দেয় না, কিন্তু বাংলাদেশের ব্যবসাবাণিজ্য অর্থনীতিবিদের চেয়ে বেশি বোঝে তারা। এরা হলো স্মাগলার, এক কথায় অর্থনীতির নায়ক। বাংলাদেশের রয়েছে বিরাট সমুদ্র উপকূল, ভারতের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত এবং বার্মার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চল। স্মাগলারদের বহু প্রাচীন বাণিজ্য ঘাঁটি আছে ভারতে, বার্মায়, তিব্বতের পাহাড়ী অঞ্চলে, নেপালে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– চাল,

www.pathagar.com

পাট, সাদা পলিস্টার কাপড় এবং পশ্চিম থেকে আসা বিভিন্ন দ্রব্য সীমান্ত পথে ভারতে চলে যায়, তার বদলে বাংলাদেশে আসে গরু এবং কারখানাজাত সামগ্রী। দাপ্তরিক হিসেবে যে ব্যবসাবাণিজ্যের পরিসংখ্যান থাকে, তার বাইরে প্রায় শতকরা ২২ ভাগ স্মাগলারদের ব্যবসা। বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ লোক কোনো না কোনোভাবে স্মাগলিং-এর সঙ্গে সম্পর্কিত; এমনকি মন্ত্রী থেকে সামরিক লোকেরা পর্যন্ত এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। স্মাগলিং কঠিন নয়, কেননা সীমান্ত পথের রক্ষীবাহিনী এবং দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চলের অফিসার ও কর্মকর্তারা একে সহযোগিতা করে থাকে।

সীমিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির পর্যটকেরা বাংলাদেশে আসে; এরা মূলত সুপারভাইজার, অডিটর অথবা টেকনিশিয়ান: নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্যে তারা আসে। দেশটি যদি দীর্ঘদিন ধরে স্থির থাকে, তাহলে বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানির সংখ্যা বাড়তেও পারে; বর্তমানে বাংলাদেশে বহুজাতিক কোম্পানির সংখ্যা বেশি নয়; এক ডজনের বেশি নয়। কয়েকটি ব্যাংক, কিছু ঔষধ কোম্পানি, এইমাত্র।

দপ্তরের রেকর্ড অনুসারে, ১৯৯০ সালে ব্যবসা উপলক্ষে বাংলাদেশে আসা পর্যটকদের সংখ্যা ৪৯ হাজারের মতো হবে। এমন পর্যটক কমই এসেছে যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রাচীন উত্তরাধিকার, সুন্দর সমুদ্রসৈকত বা চমৎকার খাবার-দাবারের বিষয়ে কৌতূহলী। অথচ দৈনিক ১ হাজার টাকা খরচ করে একটা লোক মফস্বল শহরে গিয়ে থাকতে পারে এবং পর্যটন হোটেলে রাত্রিযাপন করতে পারে। পর্যটন হোটেলগুলো ন্যাশনাল ট্যুরিস্ট বোর্ড কর্তৃক নির্মিত এবং তাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। বাংলাদেশে দেখার জিনিস অনেক : আছে ভগবান বুদ্ধের স্মৃতিবাহী প্রাচীন নগর (বলা হয় ওখানে বুদ্ধ চলাফেরা করেছেন), আছে প্রাচীন মসজিদ, মুসলিম সন্ত-পীরের মাজার, হাজার বছর পূর্বেকার হিন্দু মন্দির। দেখার আছে বাংলার গ্রাম, ছবির মতো সুন্দর সেই গ্রাম দেখার উপযুক্ত বাহন হলো নৌকা।

কি, এবং কোথায় বাংলাদেশ?

যদিও বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী বহু পুরনো এবং প্রাচীন, কিন্তু বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছে অল্প কিছুকাল আগে। প্রায় দুই শতাব্দী, প্রায় ১৯০ বছর, বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল। ২৪ জুন ১৭৫৭ থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। লোকেরা ইংরেজি পড়েছে এবং ইংরেজের আইনের অধীনে জীবনযাপন করেছে। এশিয়ার অন্য কোনো দেশ বা দেশের মানুষ সম্ভবত এত দীর্ঘকাল বিদেশী শক্তির উপনিবেশ ছিল না।

www.pathagar.com

এই দীর্ঘ ঔপনিবেশিক সময় পূর্বে বাংলাদেশ 'বঙ্গ' নামক বিরাট ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চল ছিল। বাংলার পশ্চিমাংশ হিন্দুগরিষ্ঠ, তাই ব্রিটিশ বাংলাদেশ ছেড়ে যাবার সময় ওই অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেটা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ নামে পরিচিত এবং তার রাজধানী কলকাতা। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বৃহৎ ভারতের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে, আর পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকার পক্ষে ভোট দেয়। পাকিস্তানের লোকেরা অধিকাংশই মুসলিম এবং সে কারণে ধর্মভিত্তিক ঐক্যের রাজনীতিতে বাংলাদেশের মুসলমানেরা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তখন পাকিস্তান দুটি অঞ্চলে বিভক্ত হয় : পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান, যদিও পূর্ব পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশ) থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের দূরত্ব ১১ শত মাইল।

১৪ আগস্ট ১৯৪৭ থেকে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যদিও বাঙালিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে; কিন্তু তবু পূর্ব পাকিস্তান শাসিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে। পাকিস্তানীরা ধর্মের দিক থেকে মুসলমান হলেও, পাকিস্তানীদের এথনিক উৎস বিভিন্ন : যেমন পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বেলুচী। অন্যদিকে বাংলাদেশের লোক এবং পাকিস্তানীদের ধর্ম এক হলেও জাতিসত্তা ভিন্ন, সংস্কৃতি-সভ্যতাও আলাদা। পাকিস্তানীরা ঔপনিবেশিক পর্বে (১৯৪৭-৭১) বাঙালিদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, বাঙালিদের মাতৃভাষার বদলে 'উর্দু' ভাষা গ্রহণের জন্যে চাপ প্রয়োগ করেছে, অথচ 'উর্দু' হলো উত্তর ভারতীয় মুসলিম এলিটদের ভাষা, বাঙালিদের নয়। যেহেতু পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু এবং সেটা সম্ভবত 'উর্দু'র ধর্মীয় চরিত্রের কারণে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তনের পাকিস্তানী উদ্যোগকে বাংলাদেশের বাঙালিরা নিজেদের সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে বিরাট অবজ্ঞা হিসেবে গণ্য করে। ঠিক এই সময় থেকেই বাঙালিরা বুঝতে পারে দেশভাগের মুহূর্তে পাকিস্তানীদের সঙ্গে বসবাসের সিদ্ধান্ত কি পরিমাণ ভুল ছিল; বাঙালিরা বুঝতে পারে পাকিস্তানের অংশ হয়ে তারা মূলত এক উপনিবেশ ছেড়ে আরেক উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাকিস্তান পর্বের বাংলাদেশ ছিল পাঞ্জাবী এলিটদের নির্যাতনকলে বাঁধা, কেননা দেশভাগের পর পাঞ্জাবীরাই দেশ শাসনের শিরোভাগে থাকে, বড় বড় পদও তাদের ছিল এবং উন্নয়নও ছিল তাদের কজায়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর থেকে পাঞ্জাবীরাই পাকিস্তানের রাজনীতি সবদিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বাংলাদেশের বাঙালিরা যখন বৃহত্তর স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করল এবং তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে এককভাবে বিজয়ী হলেন, তখনই পাকিস্তানের সামরিক সরকার তাদের চরম নির্যাতন ভূমিকায় আবির্ভূত হলো। ২৬

www.pathagar.com

মার্চ ১৯৭১ সালে রাত্রিবেলায় পাক-বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র। শুরু হলো বাঙালি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের নিধনযজ্ঞ। মার্চের পর পরবর্তী নয় মাসে পাক-বাহিনী পঁয়ত্রিশ হাজার বাঙালি বুদ্ধিজীবী : ডাক্তার, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক, হিন্দু নেতা এবং শিল্পী-সাহিত্যিকদের হত্যা করে। সবাই বলেছেন, ৩ লাখ থেকে ১ মিলিয়ন পরিমাণ বাঙালি এই মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়; এবং বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনী যোগ দিলে পাক-বাহিনী পিছু হটতে এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। অধিকতর স্বাধীনতার জন্যে বাঙালিরা যে সংগ্রাম শুরু করেছিল, একটা নতুন জাতির জন্ম তার উজ্জ্বল পরিণতি।

হ্যাঁ, জন্ম হলো বাংলাদেশ ও তার জাতির। পৃথিবীর বুকে জেগে উঠলো নতুন একটি স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ; স্বাধীন হলো বটে; কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা তাকে জানলো পৃথিবীর দরিদ্রতম, জনসংখ্যাবহুল (বর্গমাইলপ্রতি দুই থেকে তিন হাজার মানুষ) দেশ হিসেবে, অথচ বাংলার এই অঞ্চল ব্রিটিশপর্বে সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যা জানে না এবং জানতে চায় না, তা হলো বাংলাদেশের এই ঐশ্বর্য ব্রিটিশদের যাবার আগেভাগেই ফুরিয়ে যায়; উপরন্তু পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ব্রিটিশদের ভেদনীতির ফলে, পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক দুর্ভোগ ঘটে। ভেদনীতির ফলে পূর্ববাংলা আনুপূর্ব কৃষিনির্ভর হয়ে থাকলো, আর কলকাতা গণ্য হলো মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা হিসেবে। দেশভাগের পর অব-উন্নয়নের পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে আরো কয়েক দশক।

অধিকাংশ মানুষ বাংলাদেশকে চেনে তার দারিদ্র্যের জন্যে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা; এটা জানে না যে, বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জাতি, ভাষা, গোষ্ঠী এবং ইতিহাসের দিক থেকে অভিন্ন বাঙালি জাতির বসবাস আছে; যদিও দুই প্রান্তের বাঙালিদের ধর্ম আলাদা, তবু অন্য অনেকদিক থেকে মিল বিদ্যমান। দুই প্রান্তের লোকেরাই বাঙালি এবং উভয়ের ভাষাও বাংলা। পার্থক্য কেবল এই যে, বাংলাদেশের বাঙালিরা অধিকাংশ মুসলমান, সীমান্ত পারের বাঙালিদের অধিকাংশ হিন্দু। অধিকন্তু বিশ মিলিয়নের মতো বাংলাদেশের বাঙালিদের রক্ত সম্পর্কীয় ভাইবেরাদর ভারতের বিহার-উড়িষ্যার নিকটে বাস করে। এই ভাইয়েরা অহমীয় এবং উড়িয়া নামে পরিচিত। এরা যে ভাষায় কথা বলে, সেটাও বাংলা, কিংবা বাংলার কাছাকাছি। ব্রিটিশরা প্রথম ভারতবর্ষে আগমনের পরও দেখা যায় বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলার লোকেরা একটা স্বতন্ত্র ধরনের রাষ্ট্র গঠন করেছে, যাদের সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ক্ষীণ। মুর্শিদাবাদ ছিল তার রাজধানী, যা এখন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত; মুর্শিদাবাদের পর 'ঢাকা' হয় তার রাজধানী। বাংলাদেশের বাঙালিদের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তের আসাম, ত্রিপুরা,

www.pathagar.com

মেঘালয় এবং অরুণাচল প্রদেশের লোকদের ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারও সম্পূর্ণ মিলে যায়।

কাজেই 'বাংলাদেশ' হলো একটা রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিণতি; যে বাস্তবতার কারণে বাঙালিদের ৬০ ভাগ লোক এখানে থাকে, আর ৪০ ভাগ থাকে প্রতিবেশী অঞ্চলে। বাংলাদেশে অবতরণের এই কথাটা মনে রাখতে হবে যে, একই বাঙালি জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক ভাগের কারণে পড়ে গেছে অন্যত্র, প্রতিবেশী দেশে। অর্থাৎ এক অভিন্ন বাংলার পূর্বাংশেই 'বাংলাদেশ' নামক দেশটির অবস্থান। ভারতের মানচিত্র দেখলেও বোঝা যায়, বাংলাদেশকে রাজনৈতিক দুর্বুদ্ধিতে ছিঁড়ে ভাগ করা হয়েছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মানচিত্রের দিকে তাকালে এও বোঝা যাবে, ভারতের পশ্চিমের উত্তর প্রদেশ একরকম; আর পূর্বাঞ্চলের বিহার, উড়িষ্যা, হিমালয়ের পাদদেশের এলাকা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ট্রাইবাল রাষ্ট্রগুলোর ভাষা, সংস্কৃতি, আবহাওয়া, পোশাক-আশাক, সবদিক থেকে পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় কত আলাদা। ব্রিটিশরাও ভারতবর্ষে এসে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় শুষ্ক আবহাওয়ার এলাকা খোঁজে; সেই এলাকা তারা খুঁজে পায় উত্তর প্রদেশে; বেনারস বা বারাণসীতে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (পাঞ্জাব এবং রাজস্থান) থেকে শুরু করে উত্তর প্রদেশের পূর্বসীমা পর্যন্ত এলাকাও শুষ্ক আবহাওয়ার দেশ। এখানে বৃষ্টি-বাদল কিছুই নেই, খুব কম; এখানে উৎপন্ন হয় যব ও ভুট্টা। এদের নির্ভর বৃক্ষ এবং গাভীর ওপর, ঘরবাড়ীগুলোও মাটির ইট দিয়ে নির্মিত, লম্বা লম্বা ওকগাছ সর্বত্র দেখা যাবে। আর ভূ-দৃশ্য? সে তো খাকী রঙের, প্রায় মধ্যপ্রাচ্যের মতো দেখতে। এদের রং উজ্জ্বল, নাক খাড়া, প্রায় ইউরোপীয়দের মতো গড়ন। মেয়েরা খাটো ব্লাউজের ওপর শাড়ি পরে, আর পুরুষের পরিধেয় হলো কোর্তা-পাজামা।

পূর্ব ভারত কিন্তু আবহাওয়ার দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের চেয়ে ভিন্ন। এ অঞ্চল শুষ্ক নয়, অতটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় নয়; ফলে মানুষের গাত্রবর্ণ ও আহার-পরিচ্ছেদও আলাদা। গাত্রবর্ণ কাল, এ অঞ্চলের প্রধান উৎপাদন ধান চাষ, এবং গরুর স্থানে মহিষের ব্যবহার এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ঘরবাড়িতে বাঁশের বেড়া দেখা যাবে, আর ঘরের ছাদ নিচের দিকে ঢালু। পুরনো ঘরবাড়িগুলো টেরাকোটা চালবিশিষ্ট। সিক্ত জমি সর্বত্র, আর বৃষ্টি ও বৃষ্টির জল নিত্য ঘটনা। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল গড়ে উঠেছে এখানে, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পাশে। মেয়েরা শাড়িই পরে এখানে (তবে আগে পরতো ব্লাউজের মতো একটা খাটো পোশাক); ছেলেরা ধুতি পরে, যদি হিন্দু হয়; আর মুসলমানেরা পরে লুঙ্গি। ক্ষেতে কাজ করার সময় পুরুষেরা পরে চোগা। ধুতি আর লুঙ্গি অনেকটা কাছাকাছি ধরনের পোশাক; ধুতি

www.pathagar.com

অনেকটা রোমানদের টোগার মতো, আর লুঙ্গি দেখলে মনে পড়বে স্যারঙের কথা। গ্রামগুলো দেখা যাচ্ছে সবুজ বৃক্ষে আচ্ছাদিত; গ্রামের ঘরবাড়ী উঁচু উঁচু ঢিবির ওপর নির্মিত– ঘরবাড়ির ভিত্তি উঁচু করার কারণ বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া পশ্চিম ভারতকে পূর্ব ভারত থেকে আলাদা করে ফেলেছে; দেখা যায় গরম আবহাওয়া পশ্চিম ভারতের জন্যে স্বাভাবিক হলেও, পূর্বাঞ্চলের বাংলার, আমাদের উড়িয়ার লোকদের কাছে ভীষণ অসহ্য ঠেকে। এসব অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ; যেমন বাংলাদেশের আবহাওয়া। বাংলাদেশের আবহাওয়া, জলবায়ু, ভাষা, সংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। অথচ যেসব অঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও সংস্কৃতির দিক থেকে অভিন্ন, রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে সেই বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রাজনৈতিক সীমানা যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য তাতে বিনষ্ট হয়নি। বেতার, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, টেলিফোন আর গসিপ এই রাজনৈতিক ভাগকে অতিক্রম করে গেছে, অন্তত স্বীকার করেনি।

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা; যাঁর জন্ম বাংলাদেশে নয়, কলকাতায়– অথচ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের জনয়িতা তিনিই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও লিখেছেন : কিন্তু ভারতের বিশ্বকবি হয়ে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত লেখা, আর স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের জনয়িতা হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং লালন শাহ– এ তিনজন বাংলাদেশের সংস্কৃতির মর্মমূলে, অথচ শেষোক্তজন ব্যতিরেকে বাকি দুজন পশ্চিমবঙ্গের সন্তান হয়েও বাংলাদেশের সংস্কৃতির আকাশ আলো করে আছেন। কাজী নজরুল ইসলাম হয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি, আর রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা। সাংস্কৃতিক অভিন্নতার আরো দৃষ্টান্ত হলো, কলকাতার লোকেরা দূরদর্শনের চেয়ে বাংলাদেশের অনুষ্ঠান বেশি দেখে; বেতার এবং সংবাদ অনুষ্ঠানেও উভয়ের মধ্যে বিনিময়ধর্মিতা আছে। তাছাড়া অনেক বাংলাদেশী তরুণ এখন কলকাতায় পড়াশোনা করতে যায়।

আঠারো শতকে 'কলকাতা'কে গড়ে তোলে ব্রিটিশরা। এই নবনির্মিত কলকাতা হয়ে উঠল বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সূতিকাগার ও বিকাশস্থল। বাংলাদেশের অনেক অনেক লোক কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনা করেছেন, এখনো অনেকে উচ্চশিক্ষার্থে কলকাতায় যান। এই কলকাতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বাংলাদেশের সেক্যুলার রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতায় যে রাজনীতি তৈরি হয়েছে, বাংলাদেশের অনেক নেতার রাজনৈতিক পাঠক্রমে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্মের ভিন্নতা থাকলেও, উভয় দেশের বিভিন্ন মিল অস্বীকার

www.pathagar.com

করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এখনো আগের মতোই যেন অখণ্ড বাংলার অখণ্ড সংস্কৃতিই রয়ে গেছে। এক দেশের অন্তরে আরেক দেশের স্থান চিরতরে আঁকা হয়ে আছে যেন। বাংলাদেশের অনেকে শিক্ষালাভ করেছেন কলকাতায়, কলকাতার অনেক লেখক বাংলাদেশের হৃদয়ে চিরদিনের জন্যে স্থানপ্রাপ্ত : সেক্ষেত্রে দুই দেশের ঐক্য অস্বীকার করা যাবে কিভাবে বলুন।

তবে আমার আলোচনা থেকে কেউ এ কথা ভাববেন না যে, দুই বাংলা আবারো এক হয়ে যেতে পারে। সেটা পারে না; রাজনীতি তা বলে না।

নতুন কেউ বিদেশ থেকে যদি আসেন, ঢাকার আধুনিকতা ও জীবনযাপন তাঁকে অবাক করে দেবে। এত সুন্দর বিমানবন্দরে কাস্টম অফিসারদের কর্মতৎপরতা, বিমানবন্দরে গ্রীন চ্যানেলের উপস্থিতি, আলোকিত ও সুসজ্জিত পথ-ঘাট, পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে সড়কপথ, প্রথম শ্রেণীর হোটেল, নগরের শোভা ও সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রথমবারের মতো আসা যে কোনো বিদেশীকেই বিস্মিত করবে। কারণ বিদেশীরা এখানে আসার আগেই ধরে নেন, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্লাবনের মরণ কামড়ে বাংলাদেশ মুমূর্ষু : কারণ বিদেশের টেলিভিশনে বাংলাদেশ তাই, এইড এজেন্সিগুলোও সেভাবেই বাংলাদেশকে বিজ্ঞাপিত করে। বিমানবন্দর থেকে অবতরণ করে যে কারো মনে হবে : একি! বাংলাদেশ এরকম বলে তো শুনিনি, এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত; যে রকম এবং যতটা শুনে এসেছি, বাংলাদেশ সেরকম এবং অতটা মন্দ নয়। বাংলাদেশীরা যতটা গরীব হোক, দিনে দু'বার গোসল করে তারা, সন্ধ্যার আগে কাপড় ধুয়ে নেয়।

বিদেশীরা বেড়াতে এসে দেখে বাঙালি গরীবদের চাহিদা খুব বেশি নয়, সামান্য; তাছাড়া তাদের কাজের সামর্থ্যও আছে। বিদেশী পর্যটকেরা বুঝতে পারে কিভাবে এইড এজেন্সি বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছে, তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে দিচ্ছে না, তাদের কাজের ক্ষমতা লুপ্ত করে দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। দাতাদের সাহায্যে সে আর যাই থাক, মঙ্গলের চিহ্ন নেই, তা বুঝে যায় তারা।

বাংলাদেশ যদিও জাপান, তাইওয়ান কিংবা দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে দরিদ্র; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশ দরিদ্র নয়। সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশের গরীব মানুষেরা নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য বা অথর্ব নয়। বাংলাদেশের লোকেরা যে অনেক পরিশ্রমী এবং বেশ সমর্থ, অনেক বহুজাতিক কোম্পানি এবং বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান তা এখন বুঝতে শুরু করেছে। বাঙালিদের কাজের একটা এথিক আছে, যদিও তা প্রয়োজনতাড়িত, যদিও তাতে বেঁচে থাকার দায় একটা প্রধান সত্য; তবু কাজের মধ্যে গৌরবও বোধ করে বাঙালিরা এবং বাঙালিদের জীবনযাপনে কাজ সম্মানিতও বটে, আর চ্যালেঞ্জও বটে।

www.pathagar.com

অপরাধ যে নেই তা নয়, আছে; তবে বাংলাদেশের অপরাধ অন্য জায়গার মতো ভয়াবহ কিংবা সংগঠিত নয়। মধ্যরাতের পূর্বে শহরের রাস্তা নিরাপদ, আর দেশের গ্রামাঞ্চল সবসময়েই নিরুপদ্রব, শান্ত। শ্রমিকেরা সৎ, আর কৃষকেরা ঋণ নিয়ে যথাসময়ে তা শোধ করে দেয়। ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার বিরাট কোনো সমস্যায় পড়ে না; রিপোর্ট, প্রতিবেদন, উপাত্তব্যবস্থাপনাও প্রশংসনীয়। হ্যাঁ রাজনীতিবিদ, সৈনিক, সিভিল সার্ভিস এবং পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি আছে; কিন্তু উন্নয়নের এরকম পর্যায়ে সেই দুর্নীতি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়; তবে একটা নতুন শ্রেণীর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্নীতি দুঃখজনকভাবে খোলামেলা, বৈধ, প্রকাশ্য হয়ে পড়েছে। বিদেশীরা বাংলাদেশের অফিসারদের ভালো আচরণে বেশ সন্তোষ বোধ করে এবং ব্যবসায়ীরাও খুশী হয় এ দেশের অফিসারদের কাজকর্মে। কেননা, বাংলাদেশের অফিসারেরা মনোযোগী এবং যুক্তিশীল; ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের মতো উদ্ধত নয়, কিংবা নয় পাকিস্তানী অফিসারদের মতো কর্তৃত্ববাদী।

অতীতের তুলনায় বাংলাদেশ এগোচ্ছে, মানতেই হবে। একদিক থেকে সেই প্রগতি এমন কিছুই নয়, কেননা এশিয়ার অন্য ব্যাপক অংশের তুলনায় বাংলাদেশ দরিদ্রতর। অধিকাংশ বাংলাদেশী সে খবর জানেও না অবশ্য। তারা দেখে কেবল কি কি বদলালো তার। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানী শাসনকালের তুলনায় বাংলাদেশ এখন এগিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। তাছাড়া স্বাধীনতার পরেই এগোতে পারে একটা দেশ; সেদিক থেকে বাংলাদেশের অগ্রগতির সূচনা ঘটেছে জানুয়ারি, ১৯৭২ সাল থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাংলাদেশের প্রগতি বিবেচনা করতে হবে।

যেসব গ্রামদেশের বাঙালি নিজেদের জমিজমার ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না, তারা চলে আসে শহরে। এই চলে আসা হঠাৎ করে হয়ে যায় না; এমন নয় যে আসতে চাইলো, আর চলে এলো। শহর যাত্রার কাহিনী এরকম : লোকটি প্রথমে জমিনির্ভরতা ছেড়ে ক্ষুদ্র গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কাজের চেষ্টা চালায়; যেমন কৃষিকাজ, রাস্তা বানানো, অথবা ব্যক্তিগত কোনো উদ্যোগ। কেউ কেউ ওভাবে থেকে যায়, কেউ কেউ চলে আসে উপজেলা শহরে : উপজেলা শহর ইতিপূর্বে সরকারি কর্মকেন্দ্র ছিল। উপজেলায় কাজ জুটেও যায় হয়তো; কিংবা ওখানে সুবিধে না হলে লোকেরা বগুড়া, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, সিলেটের মতো মফস্বল শহরে চলে আসে। চূড়ান্ত পর্যায়ে সবাই অবশ্য ঢাকাগামী হয়, গ্রামত্যাগী শহরমুখোদের বস্তি দিয়ে বেড়ে উঠছে রাজধানী শহর ঢাকা। শহরদিকে ধাবমান এই জনগোষ্ঠী এবং বিবর্ধমান বস্তি বাংলাদেশের একটা বড় বাস্তব। বিদেশ থেকে বেড়াতে এলে যে কারো চোখে পড়বে ছিন্নমূল মানুষদের মানবেতর জীবনযাপন। ছিন্নমূল মানুষদের শহর যাত্রা বাংলাদেশেই কেবল নয়, অন্যান্য উন্নয়নশীল অঞ্চলেও সাধারণ ঘটনা;

www.pathagar.com

সিউল থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত তা চোখে পড়বে সবার। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও এটা ঘটেছে। এ বড় কঠিন, আর দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু এটা উন্নয়নেরই একটা চিহ্ন, পৃথিবীর অন্য জায়গায় এভাবে উন্নয়ন হয়েছে। ছিন্নমূলদের আবির্ভাবে ঢাকা শহরের ভেতরের দারিদ্র্য আপনাতেই ভেসে ওঠে; ১৯৭২ সালের পর থেকে গ্রাম থেকে মানুষদের আসা শুরু হয়। কিন্তু ঢাকায় এদের জন্যে কোনো কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নেই; গরীবেরা এখানে আসে কাজ পাবে বলে। এই আসা তাদের জাগিয়ে তুলেছে ঢাকা শহর নিজেই; স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবেই; ১৯৯২ সালে রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা বেড়ে চার মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। দু'দশকের মধ্যে ঢাকা শহরের পরিধিও বেড়েছে অনেকখানি। ঢাকা শহর অনেক স্থিতিশীল।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও রয়েছে; যদিও মাঝে মাঝেই সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে নেয়, কিংবা আবির্ভূত হয় স্বৈরাচারী সরকার। তবে মাঝে মাঝেই হরতাল পড়ে, ধর্মঘট ডাকা হয়, মিছিল-মিটিং দেখা যায়, যেরকম আরো অনেক গরীব দেশে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবচেয়ে উৎকণ্ঠাময় স্থান; বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে জ্ঞানচর্চার চেয়ে রাজনীতির জন্যে বেশি পরিচিত এবং আলোচিত। তবে এসব বাদ দিয়ে নেটিভদের মতো একজন বিদেশী বাংলাদেশের দিকে তাকান, দেখবেন গ্রামগুলো শান্ত, নিশ্চল, মধুর।

তবে পরিবহন, সার, বীজ-উপকরণ, তেল, গ্যাস লাইন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, সড়ক ও নদীপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো। নদীর ওপর বড় বড় সেতু তোলা হয়েছে। রেল ব্যবস্থা নিরাপদ, উন্নত, সুশৃংখল; রেল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে ত্রাণসামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্য ঠিকঠাক পৌঁছে যায় দুর্গত অঞ্চলে। চিকিৎসাক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে, তবে খুব উন্নতি হয়নি। তবে আগে যেরকম কলেরা, মহামারীতে বহুলোক মারা যেত, এখন মরে না। স্বলপক্সের প্রকোপ কমে গেছে। তবে ব্যাপক অপুষ্টি এখনো সর্বত্র; শহরে কর্মহীন সাধারণ মানুষদের মধ্যে অপুষ্টি বেশি।

বিপরীত বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা কমে যাওয়ায় জুট ইন্ডাস্ট্রী পড়ে গেছে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাস, সেশনজট, আগের তুলনায় লেখাপড়ার মান এবং পরিস্থিতি দুটোর অবনতি ঘটেছে; মাদকাসক্তি বাড়ছে শহরে; আর তার সঙ্গে বাড়ছে জনসংখ্যা; কিন্তু শিল্পায়ন বাড়ছে না আশানুরূপ। শহরকে কোনোমতেই দেশের প্রতিভূ বলা চলে না। এমনকি ঢাকা শহর, বাংলাদেশের অন্যান্য শহরের প্রতিনিধিও নয়। কয়েক বছরের মধ্যে ঢাকা শহরে বিত্তবৈভব বেড়ে গেছে ঢের এবং ঢাকা শহর এখন দেশের অন্য অঞ্চলের মানুষের চোখে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

www.pathagar.com

এলিটরা জনজীবন বিচ্ছিন্ন এবং তারা অদ্ভুত উন্নাসিকতায় আচ্ছন্ন– অনেকটা ওয়াশিংটনের বেল্টওয়ে অথবা টোকিওর টাওয়ারের মতো। তবে ঢাকা শহর ছেড়ে কিছুদূর এগোলেই বোঝা যাবে এসব উন্নাসিক জলুস কত ফাঁপা, নিরর্থ, মিথ্যা।

বাংলাদেশের আনন্দ বোধহয় ঢাকার বাইরেই পড়ে আছে। ঢাকার বাইরে জীবন অনেক সুন্দর, সহজ; লোকেরা অনেক অমায়িক, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসায় নিবিড়; ঢাকার বাইরে সবুজ আর খোলা বাতাসের উদোম করা হাতছানি, নদীর বহতা-স্রোত চোখ জুড়িয়ে যায়। বাংলাদেশের আত্মা ও ঐশ্চর্য ছুঁতে গেলে ঢাকা নগরীর বাইরে যেতে হবে, তখনই উপলব্ধি হবে কেন একদা মোগলরা একে 'অমরাবতী' মনে করেছিলেন!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঋতুচক্র

মনোহর আবহাওয়া ও নির্ভেজাল সৌন্দর্যের কারণে বাংলাদেশের মতো সুন্দর দেশ এই ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয়টি নেই। ছয়টি ঋতুর প্রতিটি ঋতুর পরিক্রমায় বিচিত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে ওঠে দেশটি। ঋতুসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, জুন থেকে আগষ্ট পর্যন্ত বর্ষাকালে মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর শরৎকাল ধান ও পাট কাটার মৌসুম। অক্টোবর-নভেম্বর হলো পুনর্বার চাষাবাদের সময়। নভেম্বর-ডিসেম্বর শীতকাল। ফুল ফোটে। বসন্তকাল অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারিতে আবহাওয়া থাকে শীতল, ঠাণ্ডা। তখন বিয়ে-থা হয়। মার্চ-মে গ্রীষ্মকাল। এ সময় আবহাওয়া থাকে উষ্ণ। এই সময় গাছের পাতা ঝরে।

বর্ষা

বাতাস, পানি, মাটি, আগুন– এই চারটি উপাদানকে শ্রেষ্ঠ ধরে বিচার করলে এবং প্রতীকী অর্থে বাংলাদেশের কথা উঠলে পানির কথা বলতে হবে। বাংলাদেশের ভূমি কতটা পানির উপরে এ কথা না বলে বাংলাদেশের ভূমিতে কতটা পানি, এ কথা বলাই সংগত। ৫৫ হাজার বর্গমাইলবিশিষ্ট বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশে শুকনোকালে পানি থাকে। কিন্তু বর্ষায় বাংলাদেশের শতকরা ৭০ ভাগ এলাকা জলমগ্ন হয়। পানি আসলে বাংলাদেশের প্রধান বাস্তবতা। পানির অপ্রতুলতার কারণে যেমনটি সৌদি আরবকে চেনা যায়। বাংলাদেশে শতকরা ১০ ভাগ লোকের বাস নৌকায়। শতকরা ৪০ জনের জীবন-জীবিকার উৎস হলো সমুদ্র ও নদী এবং শতকরা ১০০ জনই খাদ্যের জন্য বৃষ্টি ও বন্যার উপর নির্ভরশীল। সব ধরনের আমিষের প্রধান উৎসই হলো এই পানি। পলিমাটি দেয় এই পানি। যাবতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মূলে পানি। প্রশ্নাতীতভাবে পানি বাংলাদেশের সম্পদের প্রধানতম উৎস। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শস্য : ধান, পাট, চা প্রভূত পরিমাণে পানির উপর নির্ভরশীল। দুটি কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অনন্য। নদীমুখস্থিত বদ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ। নদীর পানি এত বেশি সমুদ্রে পতিত হওয়ার নজিরও অন্যত্র নেই। নদী, সমুদ্র, বৃষ্টিপাত, ঝরনা, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, শিশির কণা, আর্দ্রতা,

www.pathagar.com

হিমালয়ের ভাঙা বরফ– বাংলাদেশের পানির এরকম অনেকগুলো উৎস বিদ্যমান। পানির স্বাদ ও রং ভিন্নতর। যেমন পরিষ্কার পানি, লোনা পানি, নীল, সবুজ, মেটে, বাদামি ধূসর বর্ণের পানি।

কিন্তু অধিকাংশ পর্যটকই এই বাস্তবতা পরখ করার সুযোগ পান না। বাংলাদেশে পর্যটকরা বেড়াতে আসেন গ্রীষ্মকালে– নভেম্বর থেকে জুন মাসের মধ্যে। অথবা শীতল আবহাওয়ায়– জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। হোটেল থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায় বেশি পর্যটক আসেন ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে সবচেয়ে কম। অনেক পর্যটক কখনই জানতে পারেন না মৌসুমী বৃষ্টিপাত কিংবা বর্ষার প্রথম ভারী বৃষ্টিপাত উপভোগের আনন্দ। পর্যটকরা ওই সময়েই আসেন যখন গ্রীষ্মকাল, আকাশ থাকে নীল, সমুদ্র ও নদী থাকে তেজহীন। ভাগ্যবান পর্যটকদের কেউ কেউ নৌকাযোগে পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ অসংখ্য উপনদী ভ্রমণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। যদি এ সুযোগ কারো ভাগ্যে না জোটে সে দুর্ভাগা। পানির দেশ, পানির উপরে ভাসমান একটি জাতি সম্পর্কে সে অনবহিত থেকে যাবে। বাংলাদেশের সত্যিকারের 'ধাত' তো এই। বসন্তকালের সবুজ এবং বর্ষার গাঢ় সবুজের মধ্যে পার্থক্য সে কোনোকালেই অনুধাবনে সক্ষম হবে না। বর্ষা ও বন্যার শুরুই এখানে জীবনের প্রকৃত শুরু। বর্ষায় মানুষ গৃহে যেমন থাকে, তেমনি থাকে নিজের অনেক কাছাকাছি। তার-আমার কাছাকাছি।

মে এবং জুন মাসের শুরুতে মাটি থাকে কঠিন। নদীতে পানি যায় কমে। মাছ শিকার কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পুকুর ও দীঘি শুকিয়ে যায়। বড় মাছ সটকে পড়ে। নলকূপের পানি দিয়ে পাথরসম কৃষিক্ষেত্রে সেচব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়াস নেয়া হয়। জীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ। মহিলারা উনুনের আঁচ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বসার স্থান ও উনুনের মাঝখানে খড়ের বেড়া সৃষ্টি এর মধ্যে অন্যতম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত গরমে কাবু হয়ে যায়। নদীর কাছাকাছি বাস হলুদ ঠোঁটবিশিষ্ট পাখির স্বর হয়ে ওঠে অনুচ্চ। অসহ্য গরমে গরুর পক্ষে জাবর কাটা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা, গরুর মুখগহ্বর যায় শুকিয়ে। মধ্যাহ্নের সূর্যের প্রখর রৌদ্র-তাপও পৃথিবী দেয় ফিরিয়ে। ধূসর বর্ণের শস্যের মাঠে ধূলিময় বাতাস বয়। অথচ কিছুদিন আগেও হয়তো এই শস্যক্ষেত ছিল সজীব। গরমে অতিষ্ঠ মহিষ শুধু চোখ ও শিং দুটো বাইরে রেখে পুরো শরীর পানিতে ডুবিয়ে রাখে। পানিই হয়ে ওঠে মহিষের প্রধান আবাসস্থল। এই অসহনীয় অবস্থার পরেই বৃষ্টি নামে। কয়েক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি শুরুর লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে থাকে। মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই বায়ু প্রবাহ গরম বাতাস বলতে গেলে এই উপমহাদেশ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আবহাওয়া ধারণ করে রুদ্ররূপ। সৃষ্টি হয়

www.pathagar.com

ছোট আকারের ঘূর্ণিঝড়। প্রবলভাবে বজ্রপাত হতে থাকে। বিদ্যুৎ চমক আকাশকে বিদীর্ণ করে। প্লেন চালনা পর্যন্ত এই সময় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঝড় শেষে অবস্থা শান্ত হয়ে আসে। কাকসহ কয়েক শ্রেণীর পাখির কণ্ঠে ভেসে ওঠে ক্ষোভমিশ্রিত ডাক।

প্রথমকিদকার বৃষ্টি ধুলা শুষে নেয়। কেননা মাটি থাকে উষ্ণ ও শক্ত। মাটি এত শক্ত থাকে যে, ওই বৃষ্টিতে মাটি 'বিকৃত' হয় না। ওই বৃষ্টির পানি আসলে বাষ্পায়িত হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করেই প্রকৃতিতে আসে পরিবর্তন। পরিবর্তন আসে মাটির রঙে। তীরের ন্যায় পতিত বৃষ্টি শেষে মাঠের দিকে তাকালে মনে হবে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে ট্রাক্টর চালানো হয়েছে মাটিতে। মাটি থেকে বেরুতে থাকে সোঁদাগন্ধ। বৃষ্টির প্রথম আধঘণ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহের সৃষ্টি হয়। শোনা যায় কুলুকুলু ধ্বনি। ক্রমান্বয়ে তা সঙ্গীতের কিঙ্কিনীর মতো কানে বাজতে শুরু করে। ছনের ঘর কিংবা টিনের চালের এই বৃষ্টির শব্দ মিলেমিশে কলকল শব্দে এগিয়ে গিয়ে আরো তীব্র হয়ে খাল-বিল পেরিয়ে বেগে সম্মুখে প্রবাহিত হয়ে ভীষণ গর্জনে নদীতে গিয়ে পড়ে। বাদামি, ধূসরসহ নানা রঙের মেঘ যেন 'দম্ভপূর্ণ' সূর্যের অস্তিত্বকে ঢেকে দেয়। কয়েকদিন আগে যা ভাবা যেত না। দিন ছোট হতে থাকে ২৪শে জুন থেকে। প্রতিবছর ঠিক এই সময়েই বৃষ্টি শুরু হয়ে থাকে।

মধ্য জুন থেকে অক্টোবরের শেষার্ধ এই সময়টা হলো নদীর। নদী এই সময় ভয়ংকর ও স্ফীত হয়ে ওঠে। ওদিকে অবিরল বৃষ্টি পড়তে থাকে। মেঘ বলতে গেলে পল্লীর মানুষের ছাদের কাছাকাছি নেমে আসে। সবুজ ও হলদে শৈবালে গাছ ও গৃহের সর্বত্র পূর্ণ হয়ে যায়। স্ফীত নদীর মাটি বর্ণ জলস্রোত সমস্ত ভূ-ভাগকে ধৌত করে তা নিয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়। বৃষ্টি যত অব্যাহত থাকে মাঠ-ঘাট তত পানিতে ভরে যেতে থাকে। এই পানিতে প্রথমে ডোবে নিচু এলাকাগুলো। আস্তে আস্তে প্লাবিত হয় উঁচু এলাকা। ঢিবি এলাকাগুলো শুধু পানির নাগালের বাইরে থাকে। অত্যল্প সময়ে সমস্ত ভূভাগ পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। পানি মাপতে হয় মিনিটের ব্যবধানে। গৃহপালিত প্রাণী গরু-ছাগল দেখলে ভ্রম হতে পারে এগুলো জলজ প্রাণী কিনা। মোরগ-মুরগি খাঁচায় করে ঘরের মাচায় রাখা হয়। ঘাটের নৌকা বাঁধা হয় ঘরের খুঁটিতে। নৌকায় রাখা হয় গৃহের মূল্যবান অনেক সামগ্রী। উনুন ধরানো এই বৃষ্টিতে এক কষ্টকর অভিজ্ঞতা। তুষ, শুকনো খড়, বেশ শুকনো লাকড়ি দিয়েও উনুন ধরানো কষ্টকর হয়ে ওঠে। প্রধান খাদ্যের বিকল্প হিসাবে শুকনো খাবার যেমন– চিড়া, মুড়ি প্রভৃতির উপর মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সময় প্রচুর কাঁঠাল পাকে। এটিও প্রধান বিকল্প খাদ্যে পরিণত হয়। বর্ষাকালে শাকসবজি দুর্লভ হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, মাছ-মাংস সারা বছরই এসব মানুষের ধরা-ছোঁয়ার

www.pathagar.com

বাইরে থাকে। যেসব এলাকায় বন্যার আশংকা কম, সেখানে তিন থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে শোয়ার বিছানা করতে হয় এবং এজন্য মইয়ের দরকার পড়ে। বসতবাটি হয় মাঠ থেকে কিছুটা উঁচু জমিতে। যখন সারা এলাকা ডুবে যায় তখন একেকটি গ্রাম ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হয়। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতে নৌকা অপরিহার্য। গ্রামবাসীর কাছে মনে হতে পারে এটাই সবটুকু পৃথিবী, কেননা তামাম সভ্যতার সাথে সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চিকিৎসা সুবিধা লাভের উপায় তিরোহিত। বর্ষার এই তিন মাসে চিকিৎসা সুবিধা তাই পাওয়াই যায় না। বৃষ্টির পানি বেড়ে বেড়ে তা কুঁড়েঘরের দ্বারে দ্বারে গিয়ে পৌঁছায়। কৃষকের একাধিক ঘর একেকটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রান্নাঘরে যেতে হয় সেতুর উপর দিয়ে।

বৃষ্টি হয় রাতেও। প্রাণ জুড়ানো শীতল বাতাসে সারাদিনের তপ্ত দেহে আসে স্বস্তি। মনে হয় শীতল বাতাস ফুঁড়ে ফুঁড়ে দেহে প্রবেশ করছে। বৃষ্টি নামে টিনের চালে টুপুর-টাপুর নূপুর ছন্দে, শুকনো খড়ের চালে চাপা শব্দে। গড়িয়ে নামে সেই বৃষ্টির ধারা। কোণের বাঁশের খুঁটি বেয়ে নেমে পড়ে উঠোনে। মাটির পায়ে চলার পথ দিয়ে এগিয়ে যায় কুলকুল শব্দ তুলে খাল কেটে বাইরে। গাছে গাছে ভেজা পাতার ছপছপ আওয়াজ। ধান ক্ষেতগুলো উঁচু নিচু। উঁচু ক্ষেতের পানি নিচুতে, এক স্তর থেকে আরেক স্তরে সবুজ ঘাসের চারাগুলোর ফাঁক গলে পানির স্রোতে আওয়াজ তোলে। শোনা যায় দূরে বন্যাপ্লাবিত নদীর পানির চাপা গুড়গুড় কলরোল। এসবই নিশুতি রাতের শব্দসঙ্গী। বর্ষার শব্দে প্রতিটি কুটিরে নিয়ে আসে একান্ত পরিবেশ। যা পরিবারের সবাই মিলে নীরবতার সেই একান্ত সঙ্গ উপভোগ করে। প্রেমিক-প্রেমিকা মাদুরে শুয়ে তন্দ্রার মাঝে বৃষ্টির বেড়ে ওঠা অনুভব করে। বৃষ্টির শব্দ কুটিরের প্রতিটি মানুষকে নৈঃশব্দ আস্বাদন করায়।

বাংলাদেশে যারা এই প্রথম এসেছেন, নদীর জলস্ফীতির সাথে বর্ষার একটা নিবিড় যোগসূত্র আছে বলেই তাদের কাছে মনে হবে। সত্যিও অংশত। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের সর্বত্র নদীর পানি বৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে দূর উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের বরফ গলার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। আর পর্বতের এই বরফ গলার জায়গা বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বহু দূরে বিশাল হিমালয়ের সুউচ্চ প্রদেশে– যেখানে গ্রীষ্মের সূর্যের প্রখর তাপে শেষ পর্যন্ত হিমাঙ্কের বরফ গলিয়ে দেয়। আর এভাবে যখন বর্ষা ঋতুর বর্ষণ শুরু হয় তখন দেখা যায় ইতিমধ্যেই নদীতে জলস্ফীতি শুরু হয়েছে। বর্ষা ও স্ফীত নদী কোনো কৃত্রিম কার্যকারণের ফল নয়। তবু ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। জলস্ফীতি ও বন্যার একমাত্র কারণ মনে হয় বৃষ্টির পানির পরিমাণ। পশ্চিম হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে বার্ষিক গড়ে ৬০ ইঞ্চি থেকে পূর্ব আসামের পাহাড়ী অঞ্চল বরাবর ১৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত ঘটে। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকের

www.pathagar.com

ভূমিকাটি পালন করে বিশ্বের বৃহত্তম ও উচ্চতম পর্বতমালার শীর্ষদেশে শীতকালে জমে ওঠা বিপুল তুষার ও বরফ রাশি এবং বসন্ত ও সূর্যের আরো বরফ গলার পরিমাণ। বৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কারণ একে খোদ প্লাবনই ধরে নেয়া যায়। তবু হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ বিভাজিক অঞ্চল দিয়ে নেমে আসা বরফগলা বিপুল জলরাশি এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচক হিসাবে কাজ করে।

এ কথা গঙ্গার বেলায় সত্যি সত্যি, পদ্মার ক্ষেত্রেও। বস্তুত গঙ্গা এ অঞ্চলে পদ্মা নামেই পরিচিত। এই গঙ্গার যাত্রা শুরু হয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের সুদূর কারাকোরাম পর্বতমালার উৎসস্থল থেকে। আর এ নদী জলপুষ্ট হয়েছে অনেক উপনদীর ধারাপ্রবাহে। এভাবে পদ্মা পেরিয়েছে ১৮০০ মাইলের পথ। পদ্মা ব্রহ্মপুত্রের তুলনায় কম গতিতে নগর জনপদ পরিপুষ্ট করেছে, তবে সেটি করেছে সুনিশ্চয়তার সাথে; রাজকীয় মহিমায় গাঙ্গেয় বদ্বীপ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে মিলিত হবার সময়। এ নদী বয়ে এনেছে ভারত থেকে পলি আর লাখো হিন্দুর ভস্মাবশেষ। প্রতিবছর গঙ্গা, যমুনার শ্মশানঘাটগুলোতে বিশেষ করে গঙ্গার বেনারস তীর্থে এ ধরনের শ্মশানঘাটে বহু হিন্দুর চিতা ছাইভস্ম পুণ্য গঙ্গার পানিতে বিসর্জন দেয়া হয়। সম্ভবত বিশ্বের আর কোনো নদীর পানি মানব দেহের এত বেশি ছাইভস্মের আধার নয়। নদীর পানির প্রবল তোড়ে এই ছাইভস্ম পরিবাহিত হয় ফারাক্কা বাঁধ ও ভারত পার হয়ে বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, রাঢ়, নদীয়া, মালদহ, ত্রিপুরা, কামরূপ এবং আজকের বাংলাদেশে যেসব প্রাচীন রাজ্য ছিল সেসব দেশে। গঙ্গা, পদ্মা ঠিক একটা নদীমাত্র নয়, হেমাব : বঙ্গে, শেষ বিশ্রামস্থলও বটে। এ হলো ভারতীয় ইতিহাসে বহতা ধারা। পনের ও ষোল শতকে এই প্রমত্তা নদী একাধিকবার এর গতি পরিবর্তন করে এখন তার বর্তমান অবস্থানে এসেছে। গঙ্গা ভারতীয় উপমহাদেশের জীবন প্রবাহের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিশেষ। এ নদী এর শাখা ও উপনদীগুলোর গতিপথ অনুসরণ করে এ ক্ষেত্রে মানুষের দল যা আজকের বাংলাদেশের জনসংস্কৃতি। এরা একদিন এদেশে আসে পশ্চিমের উচ্চ পার্বত্য ও শুষ্ক ভূমির সংস্কৃতি ছেড়ে। তাদের সেই আগমন পথগুলোর চিহ্ন আজও কলকাতার অদূরবর্তী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

তবু পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী নয়। এ মর্যাদা ব্রহ্মপুত্রের। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এ নদ যমুনা নামে পরিচিত। আসলে এ ব্রহ্মপুত্র পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের প্রধান নদ। এ নদ হিমালয়ের পাষাণ কেটে গভীর খাত তৈরি করে বেরিয়ে এসেছে আসামের সমভূমিতে। তারপর মেঘালয়ে শিলং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অবশেষে এসে পড়েছে বাংলাদেশের মাটিতে। বাংলাদেশে কোনো পর্বত নেই। সত্যিকার অর্থে কোনো পাহাড় পর্যন্ত নেই। বাংলাদেশে আসলে বন্যাবাহিত পলির একটি সমভূমি, বদ্বীপ। যুগ-যুগান্তর ধরে পদ্মা, যমুনা সঙ্গমে নরম পলিমাটিতে গড়ে উঠেছে এই

www.pathagar.com

দেশ। এই দুই প্রবল নদ-নদীর মিলিত জলধারার মিলনকে এদেশের বাউল সম্প্রদায় তাদের মরমী লোকগীতিতে মানবরূপী চিরন্তন প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল-মিলনের প্রতীকী তাৎপর্য আরোপ করেছেন। বাংলাদেশের নাওয়ের মাঝির উদাত্ত সুরেলা গান এদেশের কাব্যের প্রাণ ও জীবনের দর্শন। এ দর্শন আজও বাংলাদেশের মানুষকে ভাব-বিহ্বল করে তোলে। যমুনার (ব্রহ্মপুত্র) চেয়ে প্রমত্ত, প্রবল নদী আর নেই। এ নদ সকল নদ-নদীর পিতৃপুরুষ। এই ব্রহ্মপুত্র– এই যমুনাই বাংলাদেশকে পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে ভাগ করেছে।

পরিশেষে মেঘনা। এই মেঘনা পদ্মা ও যুমনার সাথে তাদের সঙ্গমস্থলে মিলিত হয়ে সম্মিলিত ধারার আকারে দক্ষিণমুখী হয়ে সাগরে মিশেছে। প্রমত্তা মেঘনা– এ নামে ডাকা হয় মেঘনাকে। এটি দৈর্ঘ্যে ও পানি বহনের পরিমাণের দিক থেকে পদ্মা, যমুনার সমকক্ষ নয়। এর উদ্ভব উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বাংলাদেশের সিলেটের নিকটবর্তী আসামের পাহাড়, পশ্চিম ঢালে। এ নদী পদ্মা, যমুনার সাথে মিলিত হবার পর বাংলাদেশের ৮০ মাইল ভূখণ্ড পেরিয়ে মিলিত হয়েছে। এই নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত সাগরের মতো বিস্তীর্ণ, বিশাল। স্থানটি বাংলাদেশের বলতে গেলে হৃদয় কেন্দ্রে। এখানে নদীর মাঝ বরাবর এলাকা থেকে কূলের দেখা মেলে না প্রায়। বাংলাদেশের অন্যান্য নদ-নদীর মতো মেঘনারও রয়েছে নানা উপনদী। এ নদীতে এসে পড়েছে নানা স্রোতস্বিনীর স্রোতধারা। এগুলো সব মিলিয়ে জালের মতো শাখা-প্রশাখা হিসেবে গড়ে উঠেছে যা দেশের গোটা জল ব্যবস্থার যোগাযোগের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ। মেঘনা গাঙ্গেয় বদ্বীপের তৃতীয় নদী। এই তৃতীয়ত্বের এক তান্ত্রিক তাৎপর্য রয়েছে। এ হলো বাউল মরমী মাঝি ত্রিবেণী। ত্রিবেণী– এই শব্দে নিহিত রয়েছে কামজ তাৎপর্য যার সাথে সম্পর্ক রয়েছে বিরহ ও প্রেমের।

মেঘনা পারের পূর্বের ভূভাগ অপেক্ষাকৃত উঁচু। দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে ফেনী, কর্ণফুলী ও নাফ নদীর মতো অন্যান্য নদী। নাফ নদীর উৎপত্তি পূর্ব ভারত ও বার্মার আরাকান পাহাড়ে। দৈর্ঘ্য ও ব্যাপ্তিতে বাংলাদেশের প্রধান ও প্রবল নদ-নদীর সমকক্ষ না হলেও এই নদীগুলোও বাংলাদেশের কাহিনী ও সংস্কৃতিতে একটি ভূমিকা পালন করে। এই নদীগুলোর রয়েছে সম্ভবত বিশ্বের সুন্দরতম কিছু ভূভাগ। যেমন কর্ণফুলী নদী বরাবর গুমাই বিল ও ত্রিপুরা সবুজ সমভূমিকে জলবিধৌত করে আসছে। এসব নদী, তাদের বদ্বীপের বাস্তবতা বাংলাদেশের বাস্তবতা। তেমনি বর্ষা ও আর্দ্রতাও এই বাস্তবতার অংশ।

জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষার প্রতাপ চলে। আর বাস্তবিক পক্ষেই জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অবধি এদেশ থাকে বন্যাশাসিত। বাইবেলে কথিত নূহের বন্যার মেয়াদ ছিল ৪০ দিন ও রজনী। বাংলাদেশের বর্ষার মেয়াদ তার চেয়েও বেশি। সম্ভবত নূহ তাঁর চরম দুর্দিনেও বাংলাদেশে তাঁর মহানৌকা নিয়ে আসতে চাইতেন না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বর্ষার ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে এককালে দিল্লীকেন্দ্রিক থেকে হানাদার শক্তিকে বলতে বাধ্য করেছে 'দোযখ-ই-নিয়ামতপুর', অর্থাৎ নানা সম্পদে পূর্ণ নরক। এদেশে যে মানুষ মাটিতেই শুধু বাস করতে চায় তার জন্যে এদেশ দোযখ তুল্য। এদেশ দোযখ তাদের জন্যে যারা বাংলার রাজকীয় পান্নার সবুজের চেয়ে ম্রিয়মাণ সবুজ চায়। এজন্যে আয়ার বা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার সাথে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার গাঢ় সবুজ রং তুলনা করে দেখলেই চলে। দেখা যাবে বাংলাদেশের সবুজ কোনো আটপৌরে সবুজ নয়, এ রং যেন গাঢ় সবুজ। বাংলাদেশের ঘরে যে মানুষ বাস করে বহুলাংশেই মাটির মানুষ তাকে বলা যায় না। কেননা, এদেশের মানুষ হয় নাবিক, সমুদ্রচারী, নদীর নাওয়ের মাঝি। বস্তুত এদেশের প্রতিটি মানুষই যেন প্রকৃতিগতভাবে উভচর। এদেশে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জিনিস নদীশাসিত। বৃষ্টিই আবাদী জমি সিঞ্চিত করে। বৃষ্টির পানিই এদেশের খাল, বিল, পুকুর, জলা পানিতে পূর্ণ করে দেয়। বদ্বীপ দেশে নদী ও বন্যার পানি সম্মিলিতভাবে বছরের একটি সময়কে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। বৃষ্টি এদেশের মাটিকে শীতলতা ফিরিয়ে দেয়। বর্ষার পানিতে ভিজে মাটির উর্বরতা ফিরে আসে। উর্বরতা আসে মাটিতে, মাটির মানুষের সাথে। মাঝ রাতের শীতল বাতাসে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের সান্নিধ্যে উষ্ণতা খোঁজে। এভাবে বর্ষা হয়ে ওঠে ভালোবাসা ও ভালোবাসার ফসলের কাল। এ বর্ষার আর্দ্রতা নারীর মতো, নীরবতার মতো। বর্ষার প্লাবিত রাস্তাঘাট চলাচলের জন্যে কিছুটা যখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গ্রামের কিষাণ-কিষাণী তাদের কুঁড়েঘরে নিবিড় বাস শুরু করে। এ অনেকটা প্লাবনের পানি সরে যাওয়ার মতো এক নিভৃত অবসরকাল। এই সময় চারদিক পানিতে সয়লাব। বর্ষা দেখার চোখ, শোনার কান ভরিয়ে দেয়, আর্দ্রতার পরশ দেয়। নাসারন্ধ্রে দেয় সজীব সোঁদাগন্ধ, রসনার পরিচ্ছন্নতা।

বৃষ্টিতে পুকুর, ডোবা, নালা ভরে যায়। গ্রীষ্মকালে একদিকে পানির অপ্রতুলতা এবং পানির উষ্ণতায় জীবন যেখানে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, বর্ষার ফলে হঠাৎ করে শীতল ও স্বস্তিকর অঢেল পানির সমারোহ যেন উৎসবের আমেজ আনে। শিশুরা উলঙ্গ হয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে স্নান করে। যুবতী মহিলারা গোসল সারে মনের আনন্দে। পুরুষরা শরীরে প্রচুর সাবান মাখে। পরনে থাকে লুঙ্গি। ডুব দিয়ে দিয়ে গোসল করে। পুকুরের নিশ্চল পানিতে গোসল করা আরেক অনির্বচনীয় আনন্দ। গোসল মানেই এখানে আনন্দ। জীবনের প্রকৃত বিলাসিতা যেন স্নান। একখানা ভালো সাবান, একটি টুথব্রাশ কিংবা মাজন, একখানা চিরুনিতে জীবনের অনেক চাওয়া-পাওয়া যেন পূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে স্নান এই বর্ণনারও অধিক। স্নান হলো শুদ্ধতা। পবিত্র হওয়ার সুযোগ। একটি দিন শুরু ও শেষ হওয়ার সাথে স্নানের

www.pathagar.com

গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। স্নানের সময়ই পানিতে থাকা অবস্থায় অনেকের নিজ নিজ শাড়ি-লুঙ্গি ধোয়ার কাজটা সারে। এবার বৃষ্টির বিরতিতে কিংবা শরীরের তাপে সেই কাপড় শুকানোর পালা। পশ্চিমা বাথরুম সম্পর্কে সাতকাহন করার সুযোগ থাকলেও, হলফ করে এ কথা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের মানুষ যে প্রক্রিয়ায় স্নান করে তার কোনো তুলনা হয় না। কিষাণ-কিষাণী, তাদের ছেলেমেয়েরা কুটিরের অদূরবর্তী স্থানের সঞ্চিত পানিতে সহজেই স্নান সম্পন্ন করতে পারে। স্নানের সময় পুরুষে পুরুষে, মহিলারা পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়ে গল্প করে থাকে। অপূর্ব সে দৃশ্য। আড্ডা, গল্প-গুজব স্নানের সময় সম্পন্ন হয়। খ্রিস্টধর্মে প্রাতে এবং সন্ধ্যায় পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পবিত্র হওয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এদেশের মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আপন মনে অবচেতনভাবে পানি দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করে থাকে। দেহ, পোশাক, ঘরবাড়ি, পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে তাদের যে আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা তা বাংলাদেশের মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। বাংলাদেশের মানুষের স্নানের দৃশ্য হলিউডের চিত্রনির্মাতারা পর্নোগ্রাফিতে রূপান্তরিত করার কথা ভাবতে পারে, এদেশের প্রেমোপাখ্যানে স্নান বিশেষ স্থান দখলও করে আছে বটে। কিন্তু এর মধ্যে যৌনতার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের লোকশিল্প, নৃত্যশিল্পের অনুগামী, সব মিলে যেন এইসব আচরণ। একই সাথে তা মর্যাদাপূর্ণও।

মাঝি-মাল্লারা বাংলাদেশের প্রধানতম চালিকাশক্তি। বাংলাদেশে অসংখ্য অগুণতি মাঝি-মাল্লা-সারেং রয়েছে। এরা এদের কাজে খুবই দক্ষ। স্রোতের চাতুর্য, পানি ও বন্যা হতে উদ্ভূত বিপদ সম্পর্কে এরা সবিশেষ ওয়াকিবহাল। রাস্তা দিয়ে মানুষ যেমন স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে বাংলাদেশের মানুষ অতটাই স্বচ্ছন্দে নদীপথে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে থাকে। ইউরোপের অধিবাসী একজনকে নৌকায় চড়তে দিলে কেমন অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। যদি সে নৌকায় চড়তে অভ্যস্ত না হয়। কিন্তু বাংলাদেশী একজন গর্ভবতী মহিলার পক্ষেও নৌকায় চড়া কোনো সমস্যা নয়।

ব্যালে নৃত্যশিল্পীর মতো পরিহিত শাড়ি বাতাসে উড়িয়ে গর্ভবতী মহিলাদের নদীপথে এক স্থান হতে অন্যত্র যাওয়ার দৃশ্য প্রায়শই চোখে পড়বে। যারা নদীপথে চলাচল করে তারা ভরসা করে মাঝি-মাল্লার উপর আর গুরু পীর ফকিরের দোয়ার উপর। অনেক প্রকার বাহন নদীপথে চলাচল করে। প্রতি সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে খুলনার পথে স্টীমার ছেড়ে যায়। কিছু ডিঙ্গি নৌকায় ইঞ্জিন লাগিয়ে চালানো হয়। চার গাড়ি বেয়ে নিয়ে যায় দেশের পুরনো আমলের নৌকা। এর হাল ধরেন একজন। স্রোতের প্রতিকূলে মাল বোঝাই নৌকা এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। নদীর তীরে মাল্লারা গুন টেনে এসব নৌকা এগিয়ে নিয়ে যায়। আসলে মাঝি-মাল্লারাই

www.pathagar.com

দেশের প্রধান চালিকাশক্তি। এরা যেমন স্বাধীন তেমনি সুশৃঙ্খল। পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে এদের কাজ করতে হয়। পাঁচ পীর, পীর বদরের নাম স্মরণ করে এদের যাত্রা শুরু হয়। তারা মনে করে পাঁচ পীর হলেন সকল মাঝি-মাল্লার সাহায্যকারী। সমুদ্রের সবকিছুরই মদদদানকারী হলেন পাঁচ পীর।

এই পানির নিচেই মাছ। যীশু ও বিষ্ণুর প্রতীক হলো মাছ। মাছকে জলের আত্মা বা রুহ্ বলা যেতে পারে। নদী বা সমুদ্রের এই মাছ ধরা হয় বঁড়শি বা জালের সাহায্যে। দিন-রাতে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জেলে এই মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত। মাছ এদেশের মানুষের প্রধান আমিষের যোগান দেয়। জীবনের 'তেল' হলো মাছ।

বন্যার সময় পাটগাছ পাকে এবং কাটতে হয়। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল হচ্ছে পাট। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের পাট আধুনিক শিল্পের আওতায় আসে। বর্ষার আগে পাট বুনতে হয়। যেসব জায়গায় বন্যার পানি গভীর হবে যেমন খালে কিংবা নদীর তীরে- সেসব জায়গা দেখে দেখে পাট বুনতে হয়। বর্ষার পানিতে পাট কয়েক ফুট পানির নিচে থাকে। কোথাও কোথাও কিষাণ আট-নয় ফুট পানির নিচের পাট কেটে আনে। ডুব দিয়ে পাটের গোড়ায় গিয়ে কেটে তবে তা ডাঙায় তুলতে হয়। কাঁচা পাট সেতু সড়কে মেলে দিয়ে শুকানোর ব্যবস্থা করা হয়। গভীর পানিতে ডুব দিয়ে এই সোনাসম পাট যে সবল কিষাণ কেটে নিয়ে আসে তারা সংগত কারণেই দক্ষ সাঁতারু এবং বিশ্বের দুঃসাহসী কৃষকদের একেকজন। জেলে, মাঝি, অবগাহনে আসা নর-নারী, পানিতে ডুব দিয়ে পাট কাটা কৃষি মজুর, তাদের সকল কার্য, শিল্প সৃষ্টি, গান, সবকিছুরই উৎস তাদের জলময় দেশ। দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই। রবিঠাকুর প্রভাবিত হয়েছিলেন বাউল কবি ও সঙ্গীত সাধক লালন শাহের শিল্প সৃষ্টিতে। তারই সুর মূর্ছনায় অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ভরে ওঠে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। সেই লালন প্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন এই দেশেরই জলচর মাঝি ও জেলেদের মুখের সরল সহজ ভাষা থেকে। লালন শাহের কাছে বাংলাদেশের প্রায় সবকিছুই লীলা লাস্যময়, আবার নিকষিত হেম, নিষ্কামও, মৃদু, মিষ্টি মধুর। এমনই চিরায়ত কালের ধ্যানমগ্নতায় চির প্রবহমানতা নদীর সাথে সম্পর্কিত। সম্পর্কিত সূচনা থেকে শেষ অবধি ঋতুর অপরিবর্তনীয় ধারাবর্তনের সাথে। ঋতুর ছায়াপাত ঘটে নদীর দর্পণতুল্য বুকে, সাগরে প্রাণের বহতা ধারায়। ওখানে নদীর স্রোতধারা মহাসঙ্গমে মিলিত হয়, হয়ে যায় এক, একাকার। দিগন্তছোঁয়া ফসলের ক্ষেত, ঝোপ-ঝাড়ের যত সবুজ, পথের সব গোলাপী আভা, পাকা ধানের সবল সোনারঙ, শীতের ফুলের সব শুভ্রতা উঠে আসে জল থেকে। সবল সঙ্গীত, সবল লোকনৃত্য, গ্রাম্য গায়কের সবল মূর্ছনায় প্রসূতি জল। ধ্যানমগ্নতার ভাবময় সবকিছুই প্রভু

www.pathagar.com

বুদ্ধের স্মৃতিময়– যে বুদ্ধের শূন্যপদ সম্পর্কে ধন্য হয়েছিল এদেশের মাটি। এদেশের মাটিতে এ সবকিছুই অংকুরিত, বিকশিত, পুষ্পিত হয় যেমন এসবই শত উদ্ভাসে, এসবই নন্দন বন্দনা করেছিল বুদ্ধ সিদ্ধার্থকে– যখন তিনি নিরন্তর প্রবাহিনী নদীমুখী হয়ে ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। নদী মানুষকে ক্ষমা করার জন্যেও যেন অপেক্ষমাণ। পূর্নিমার রাতে একদল মানুষ, যদিও তাদের সংখ্যা কমে আসছে– পাপ ক্ষয়ের জন্যে এদিন নদীতে স্নান করে। জানুয়ারি ও মার্চের পূর্ণিমার রাতে বিশেষ সময়ে নদীর জল পবিত্র হয়ে ওঠে বলে তারা মনে করে। ইংরেজি এপ্রিল মাসের অর্থাৎ ৮ই চৈত্রের রাতকে পাপ ক্ষয়ের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে করা হয়। চাঁদের জ্যোৎস্নায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কয়েক লক্ষ লোক নদী তীরে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে তাদের পাপ ক্ষয়ের জন্যে প্রার্থনা করে। কামনা ওই একটাই– পাপ ক্ষয়।

নদী যেমন সৌন্দর্য ও পবিত্রতার প্রতীক, অন্যদিকে তেমন ভয়ংকরও। প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া যেন কেঁদে কেঁদে আছড়ে পড়ে নদীতটে। এর ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় গোটা একটি গ্রাম। নদী তার গতিপথ বদলাতে গিয়ে মাঠের মধ্যে দু'মাইল প্রস্থের জায়গা নিয়ে ঢুকে পড়ে। শতাব্দীকাল সেই নতুন অবস্থান থাকে তার দখলে। বাংলাদেশের নদীর রয়েছে এমন শক্তি– যখন যা খুশি সে করতে পারে। এই নদীকে শান্ত করার উপায় নেই। প্রলোভন দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। নদীর কাছে যে প্রার্থনা করা হয় তাও সে দেখে না, শোনে না। নদী চলে তার আপন খেয়ালে। কোনো কিছু প্রাপ্তির আশায় নদীকে ভালোবাসা অর্থহীন।

নদীর পরেই আসে সমুদ্রের কথা। বাংলাদেশের সমুদ্র এক ভয়ংকর বাস্তবতা। বদ্বীপবিশিষ্ট বাংলাদেশের নদী যে শুধু সমুদ্রে পানি প্রবাহিত করে তা-ই নয়, সমুদ্রও নদীকে পানি উপহার হিসেবে দেয়। লক্ষণীয় বিষয় হলো– বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির সাথে নদীর মিঠা পানি একাকার হয়ে যায়। একই কথা প্রযোজ্য যখন সামুদ্রিক মাছের সাথে পাহাড়ী এলাকার মাছ একত্রে চরে বেড়ায়। এই সেই ভূখণ্ড যেখানে সমুদ্রের কচ্ছপের সাথে জংগলের কচ্ছপের দেখা মেলে। কুমীর এবং মিষ্টি পানির মাছ এখানে একত্রে বসবাস করে। বস্তুত এই বদ্বীপের পানি, ভূমি, শস্য একক, অবিভাজ্য নয়, মিশ্রণ বিদ্যমান। নদী ও সমুদ্রের বন্ধন, বৃষ্টি এবং নদীর পানির মিশ্রণ, পানি ও পৃথিবীর বন্ধন, মানুষের দেহের ভস্মীভূত ছাইয়ের সাথে হিমালয়ের মাটির যোগসূত্র এবং এই সেই দেশ যেখানে গভীর পানি ছাড়া ধান ও পাট হয় না, বৃষ্টির এই দেশ যেখানে তুষার কণা ভেসে আসে– সত্যিই এই দেশের কোনো তুলনা চলে না। বিভিন্ন নদীর স্রোতধারার সম্মিলন, লবণাক্ত ও মিঠা পানির মিশ্রণের মতোই এদেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানেরা লালন করেছে এবং প্রত্যেকেই তাদের সময়ে

www.pathagar.com

এই ভূখণ্ডকে সমৃদ্ধ করেছে। বন্যা যে পলিমাটিকে রেখে গেছে সেই পলিই এই দেশের জনগোষ্ঠীকে এ অব্দি লালন করে আসছে। নদী অনেকটাই দেশের রাজনীতির মতো– অশেষ স্বার্থের উৎস, সমৃদ্ধ পলির স্রোতধারা, আর বিশ্বাসঘাতক তরঙ্গ ও কাল জলোচ্ছ্বাস– যে কোনো দেশে চক্রান্ত, শত্রুতা, প্রতিশোধপরায়ণতা রাজনীতির চালিকাশক্তি। কিন্তু বাংলাদেশে একটু আগে শান্ত নদীর ওপর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের মতো, রক্তপাতের মতো তীব্র সংঘাতময় ঘটনার সহিংসতার সৃষ্টি হয়। জলোচ্ছ্বাসের মতোই দুই কূল বরাবর সংহার মূর্তি ধরে। সবকিছু তছনছ করে দেয়। এই মাটি এতই সমৃদ্ধ যে, বছরের পর বছর ধরে পুরুষ, মহিলা, শিশু নির্বিশেষে মাথাপিছু প্রতিদিন এক পাউন্ড চালের সংস্থান করে চলেছে। লাখ লাখ টন শাকসবজি ফলছে এই মাটিতে। প্রচুর হাঁস-মুরগি ও মাছের সংস্থান হচ্ছে। এখানে এমন আবহাওয়া বিদ্যমান যেখানে সাধারণ সামগ্রী দ্বারা নির্মিত কুটিরগুলো বসবাসের উপযুক্ত এবং এক সালের জন্যে যথেষ্ট। আর সবকিছুর মূলে যে বৃষ্টি তা বলাই বাহুল্য। এদেশে অতিবৃষ্টির ফলে মানুষ অনাহারী থাকে, অল্প বৃষ্টিতে মানুষের ফসলের ক্ষতি হয়– আহার জোটে না। বলা বাহুল্য, সমুদ্র ও নদীর ওপরে বাংলাদেশ নির্মিত।

বন্যা সম্পর্কিত বিদেশী সাংবাদিকদের ধারণা বস্তুনিষ্ঠ নয় এবং এদেশের বন্যা প্রসঙ্গে যেসব লেখালেখি হয় তাও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাধ্যমগুলোতে বাংলাদেশের বন্যা নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সত্যি বলতে কি, বন্যা ঠেকিয়ে দেয়া যায় বা প্রশমনের ব্যবস্থা আছে এমন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। বিদেশী সাংবাদিকরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে যেন এক ধরনের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করলেন এই মানসিকতা নিয়ে লিখে থাকেন যে বন্যা ঠেকিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু মুষ্টিমেয় রিপোর্টার ও সম্পাদক জানেন এবং বোঝেন যে, এদেশের বন্যার উপযোগিতা কতখানি। খুব কমসংখ্যকই জানেন যে, বন্যার পানিতে পলিমাটির যে ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয় তা দেশের ধান, পাটসহ বিভিন্ন শস্যের জন্যে খুবই উপকারী। ভূগর্ভস্থ পানির আধার প্রয়োজনীয় মাপে রাখতে এই বন্যার পানি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে এ কথাও জানেন খুব কম লোক। কিছু লোক মনে করেন বন্যা হওয়ার চেয়ে অনাবৃষ্টি আরো ক্ষতিকারক।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে ১৭৬৯-৭০ সালে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাবৃষ্টির কারণে মারা গিয়েছিল। ১৯৪৩ সালে অনাবৃষ্টিকালে মারা যায় ৫০ লাখ লোক। সপ্তদশ শতাব্দীতে গঙ্গা তার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে গঙ্গার এই গতিপথ পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করছে।

www.pathagar.com

১৯৮০-র দশকের প্রথমার্ধে ভারত গঙ্গার ওপর বাঁধ দিয়ে পশ্চিবঙ্গকে নাব্যতাদানের উদ্যোগ নিয়েছে। এই বাঁধের মাধ্যমে তারা পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশকে গঙ্গার পানি থেকে বঞ্চিত করছে। বাংলাদেশে বন্যার কারণে যে ক্ষতি হয় এই বাঁধের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির পরিমাণ তারচেয়ে বেশি। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল যা একদা ছিল যথেষ্ট উর্বর এই বাঁধের ফলে ওইসব এলাকা অনুর্বর হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের সামনে আরো বিপদ আছে। ভারত ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) ওপর বাঁধ দিতে যাচ্ছে। এই নদীর পানি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে নাব্য রাখত। এবং একদিন বাংলাদেশের অস্তিত্ব গভীর সংকটের মুখোমুখি হবে।

খুব কম সাংবাদিকই জানেন যে, গত দশকে বন্যা-উদ্ভূত মৃত্যুর হার বাংলাদেশে কমেছে। সরকারের কর্মতৎপরতা এজন্যে ধন্যবাদার্হ। সরকার এক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্য ও ঔষধ সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছে। স্থানীয় জনগণও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। যেমন আশ্রয়ের জন্য নৌকা ক্রয় করছে ইত্যাদি। দুই শতাব্দীর দুটি ভয়াবহ বন্যার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১৯৮৮ সালের বন্যায় দুই হাজারেরও কম লোক নিহত হয়েছে। পক্ষান্তরে ১৭৮৭ সালে ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বন্যায় তখনকার সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল। বিদেশী সাংবাদিকরা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে বড় একটা সফরে যান না। এই অঞ্চলের অর্থাৎ রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী বিভাগের অন্যান্য জেলা ব্রহ্মপুত্র, গাঙ্গেয় বদ্বীপের একটি প্রাচীন অংশ আর সে কারণেই এখানকার ভূভাগ উঁচু। এ অঞ্চল বরেন্দ্র নামে পরিচিত। স্বাভাবিক কারণেই এখানে তেমন বন্যা হয় না। বদ্বীপের কেন্দ্রীয় এলাকার আশপাশের পূর্বাঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত হয় সে তুলনায় বরেন্দ্র ভূমিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অর্ধেকেরও কম। এখানে বন্যারোধক বাঁধ নয়, এখানে ব্যারেজ, সেচ ব্যবস্থা ও খালের আবশ্যকতা রয়েছে। বিদেশী সাংবাদিকরা দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকাগুলোতেও যান না। সেখানকার পানির স্তর সমভূমি অঞ্চলের চেয়ে দ্বিগুণ। এসব এলাকায় বনভূমিতে ঢাকা পাহাড়গুলোতে বিপুল মৌসুমী বৃষ্টিপাত ঘটলে পাহাড়ী নালা ও স্রোতস্বিনীগুলো থেকে প্রচণ্ড বেগে ঢল নামে। আর তাতে নিচের সমভূমিতে ব্যাপক জীবন ও সম্পদহানি ঘটায়।

এ কথা অনস্বীকার্য, বাংলাদেশের মতো জলবেষ্টিত একটি দেশের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরো বাঁধ নির্মাণ, নদীর নাব্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে বন্যার আশংকা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এদেশের প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও প্রচলতি কৃষিব্যবস্থাকে বিঘ্নিত না করেও তা সম্ভব। তবে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে

www.pathagar.com

তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রতিবছরই বাংলাদেশের বন্যার উত্তেজনাকর খবর বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। বিভিন্ন সরকার ও সাহায্যদাতা সংস্থাগুলোর কাছে বন্যার উদ্ভূত কারণে সাহায্যের জন্যে যে আকুল আবেদন জানানো হয়ে থাকে তা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। বাংলাদেশের বন্যা মোটেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়। এদেশের ভূপ্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য (ইকোসিস্টেম) তাতে বন্যা অপরিহার্য এবং তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের অনুরূপ ঘূর্ণিঝড় ফ্লোরিডাসহ যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র উপকূলীয় এলাকা, ফিলিপাইন এবং চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রে এই ঘূর্ণিঝড় হ্যারিকেন নামে খ্যাত এবং চীনে এই ঘূর্ণিঝড়কে টাইফুন বলা হয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, এহেন ঘূর্ণিঝড়ে নৌকা, ফেরী ইত্যাদি ডুবে যায়, রেল দুর্ঘটনা ঘটে। জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেক মানুষ। ১৯৮৫ সালের জলোচ্ছ্বাসে বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটে অবস্থিত নিম্নাঞ্চলগুলো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব এলাকা প্রকৃত অর্থেই প্রচুর পলিমাটিতে পূর্ণ। উড়িরচর সত্যিই খুব উর্বর এলাকা। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের ব্যস্ততম পর্যটন এলাকা কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড়ে এক লাখ লোক নিহত হয়। এই হিসেব হয়তো প্রকৃত হিসেব নয়। কেননা, প্রকৃত সংখ্যা কখনোই জানা যাবে না। কারণ হলো অধিক সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা যেমন বাড়িয়ে বলা হয় তেমনি এসব গ্রামের রেকর্ড হয়তো আদমশুমারিতে নেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের এসব চরাঞ্চলকে রক্ষার কোনোই উপায় নেই। এসব এলাকার লোকদের বাঁচাতে পূর্বাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা জোরদার এবং এদের উপদ্রুত এলাকা থেকে সরিয়ে নিরাপদ এলাকায় নিয়ে আসা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের পরে বেশ কিছু বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোনো হেরফের হয়নি এতে। কখনো কখনো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানিও সংঘটিত হচ্ছে। এসব চরাঞ্চলে যাদের বাস, সরকারি কোনো কর্মসূচী বা কার্যক্রম দ্বারাই সেখানে বাস করা থেকে তাদের বিরত রাখা যাবে না। একটাই কারণ, এসব এলাকা খুবই উর্বর। একেবারে খাঁটি পলি দ্বারা এখানকার মাটি নির্মিত। জনবহুল বাংলাদেশের মানুষের একখণ্ড জমির মালিকানা লাভের আকাঙ্ক্ষা সহজাত। কে তাদের এই স্বপ্ন থেকে ফেরাবে। কেননা, একখণ্ড জমির জন্যে তারা ঝড় জলোচ্ছ্বাসকে সত্যিই তুচ্ছ মনে করে। সন্দ্বীপ প্রাচীনতম একটি জনপদ। ওখানকার রাজা ছিলেন যথেষ্ট ধনী। এই এলাকায় বহুদিন ধরেই মানুষের বসতি বিদ্যমান।

এই বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের সাথে পায়ে পায়ে আসে অসুখ-বিসুখ, মৃত্যু। এই বৃষ্টি এবং জলোচ্ছ্বাস যেমন এই ভূখণ্ডের মানুষকে অনেক কিছু দিয়ে যায়, নিয়েও যায় অনেক কিছু। বছরের যে কোনো সময়ের চেয়ে এই সময় রোগে-শোকে বেশী

www.pathagar.com

লোক মারা যায়। এ-বাড়িতে জানাজা তো ও-বাড়িতে জানাজা। বর্ষাকালে বন্যার অব্যবহিত পরেই টাইফয়েড ও ডায়রিয়াজনিত রোগে বহু লোক মারা যায়। কলেরায় শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পানি খুব দ্রুত বের করে দেয়। কিছুক্ষণ আগেই যে লোকটি ছিল তরতাজা, সুস্থ– কলেরায় আক্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা যায়। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিক পানির অভাবে যেমন হুট করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কলেরার মৃত্যুও ঠিক তেমনি। শিশু, বয়োবৃদ্ধ, অপুষ্টির শিকার যারা তারাই কলেরায় বেশি মারা যায়। বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে বিছানায় কিংবা খোলা নৌকার পাটাতনে যখন এরা মৃত্যুর প্রহর গোনে তখন এদের আত্মীয়স্বজনদের ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। আশার কথা হলো, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে ডায়রিয়া ও কলেরার প্রতিষেধক বাংলাদেশে খুব সহজ উপায়ে তৈরির উদ্যোগ সফল হয়। একমুঠ গুড়, একচিমটি লবণ, একজগ পানি দিয়ে এই প্রতিষেধক তৈরি করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা কলেরা বা ডায়রিয়ার এই প্রতিষেধক তৈরিতে সফল হলো বর্তমানে সেই সংস্থাটি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ডায়রিয়াল ডিজিজেস অ্যান্ড রিসার্স বাংলাদেশ– সংক্ষেপে আইসিডিডিআর,বি (ICDDR,B) নামে পরিচিত। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সর্বত্র যাতে সংশ্লিষ্ট দরিদ্ররা এই স্যালাইনটি ঘরে বসে বানাতে পারে সেই শিক্ষা দেয়া হয়। প্রতিবছর এই স্যালাইনের লাখ লাখ প্যাকেট বিতরণও করা হয়। ফলত এই স্যালাইন লাখ লাখ প্রাণ বাঁচাচ্ছে। প্রতিষেধক হিসেবে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই স্যালাইন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াবিদরা পান করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে এর নাম গ্যাটোরেড।

এ কথা স্বীকার্য, বন্যা উদ্ভূত ক্ষতির পরিমাণ হালে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৪ সালে বন্যার কারণে যে দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমানে তা অনুপস্থিত। বর্ষাকালে ব্যাপকসংখ্যক লোক এক সময় পুষ্টিহীনতার শিকার হতো। বর্তমানে তার বিস্তৃতি অনেক কমে গেছে। সরকারি মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। বন্যা উদ্ভূত কারণে অনাহারে মৃত্যুর পরিমাণ এর ফলে কমেছে। এ কারণে দেশজুড়ে সরকারের খাদ্য গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ কর্মসূচীর প্রশংসা করতে হয়। উল্লেখ্য, ১৭৮৭ সালের বন্যায় মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের মৃত্যু ঘটেছিল। পক্ষান্তরে ১৯৮৮ সালের বন্যা যা গত দুই শতাব্দীকালের ভয়াবহ বন্যা হিসেবে খ্যাত তাতে মারা গিয়েছিল দুই হাজার লোক। ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ বাংলার তুলনায় ১৯৮৮ সালে এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি পেলেও ক্ষতির পরিমাণ ছিল সত্যিই কম। ১৯৯১ সালের ভয়াবহ বন্যায় খাদ্য ঘাটতি ছিল না মোটেই। আসলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা ছিল হেলিকপ্টারের। ফলশ্রুতিতে সামরিক বাহিনীকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে ডাকতে হয়। উল্লেখ্য, এই ভয়াবহ বন্যায় দেশের শতকরা মাত্র একভাগ শস্য বিনষ্ট হয়েছিল।

www.pathagar.com

বর্ষা ঋতু ধীরে ধীরে শেষ হয়। বৃষ্টিপাত কমে আসে। আর এক সময় ছাই বাদামি রঙের মেঘ কেটে বেরিয়ে আসে; এখানে ওখানে সুনীল চিলতে আকাশ। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সূর্যের কিরণ আনন্দদায়ক উষ্ণতা ছড়ায় মানুষের শরীরে। আর মাঝে-মধ্যে বারিপাত গোটা আবহাওয়াকে আরো নির্মল ও প্রফুল্লকর করে তোলে। নভেম্বরে পা দিতে দিগন্ত ফুঁড়ে উড়ে আসা বক ও সাইবেরীয় হংসবলাকা পাখা মেলে মাথার ওপরের আকাশে। ওই সময় শীত নামে উত্তরে। রাতে বাতাস আরো শীতল, আরো শুকনো হয়ে আসে। ডিসেম্বর নাগাদ বাতাস কাপড়-চোপড়, কাঁথা-বালিশের মতো শুকনো খটখটে হয়ে ওঠে। দিন উষ্ণ। আকাশ নীল। রাতের মুক্ত আকাশে জ্বলে তারার দীপাবলী। সবচেয়ে সুখের দিন আসে– ফসল তোলার এই সময়ে। ফুল ফোটে। পাটের আঁশ সোনালী আভায় উজ্জ্বল হয়। এটাই সোনার বাংলার নিখাদ সোনা– সোনার বাংলা।

শরৎ

সেপ্টেম্বরের আকাশ সুনীল, উধাও ঘন নীল। মাঝে মাঝে শরতের উত্তুরে শীতল বাতাস নেমে আসে সুদূর সাইবেরীয় সমভূমি থেকে। এ মাসের শেষে আকাশ হয়ে ওঠে গাঢ় সবুজ নীল। বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের উজ্জ্বল শ্যামলিমা নিসর্গ জুড়ে থাকে। শুকোতে দেয়া পাটে কাঠের গুঁড়োর মতো এক ধরনের গন্ধে বাতাস ভরে ওঠে। গায়কদের হাতে ওঠে একতারা-দোতারা। গাঁয়ের পাড়ার উঠোন গানের মূর্ছনায় ঝংকৃত-প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ফুল ফোটা শুরু হয়। ধান ও পাটের ফসল ঘরে আসতে থাকে। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হয়। সবচেয়ে মনোহর দৃশ্য; ক্ষেতের পর ক্ষেতে দাঁড়িয়ে থাকা, পুষ্ট হয়ে ওঠা পাটের ফসল; সোনার বাংলার নিরেট সোনা।

এই সময় পুরো অঞ্চলের সেতু, বাঁধ, ঘরের ছাদ, রাস্তার পাশের শুকনো স্থানে পাট শুকানো হয়ে থাকে। পাট কেটে আনতে হয় গভীর পানি থেকে, ৬ ফুট থেকে ১৫ ফুট অব্দি লম্বা হয় পাটগাছ। পানির নিচে গিয়ে প্রতিটি পাটগাছ কেটে আনতে হয়। শুকনো পাতা ঝরার সময় অতিবাহিত হলে সপ্তাহকাল তা পানিতে জাগ দিয়ে রাখতে হয়। অতঃপর পাটকাঠি থেকে পাটকে বিচ্ছিন্ন করে শুরু হয় আঁশের শ্রেণীবিভাগের কাজ। এই পাট রপ্তানি করা হয়, ব্যাগ, কার্পেট ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এই সময় কাঠের গুঁড়ির মতো এক ধরনের গন্ধে নাসারন্ধ্র ভুর ভুর করে।

১৭০০ সাল থেকেই পাট এই অঞ্চলের লোকদের প্রধান অর্থকরী ফসল। কিন্তু ১৯৬০ দশকের শুরুতে পাটের বিকল্প হয়ে উঠতে শুরু করে সিনথেটিক। সিনথেটিকের দাম পাটের চেয়ে কম এ কথা বলা যাবে না। তবে সিনথেটিকের

www.pathagar.com

ব্যবহার পাটের তুলনায় আয়াশসাধ্য, সহজ, মজবুত এবং বহুলভাবে এর ব্যবহার সম্ভব। ফলত, নাটকীয়ভাবে পাটের দর বিশ্ববাজারে পড়ে যায়। এর ফলে দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এদেশের মানুষ। দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর লোক ভূমিহীন বেকার হয়ে পড়ে। কেননা, পাট চাষের পুরো প্রক্রিয়ায় প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। দুঃখজনক ঘটনা হলো, পাটের বাজার পড়ে যাওয়া এবং পাটের সাথে জড়িত মানব-সম্পদের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সরকার, পণ্ডিতসমাজ, সংবাদপত্র এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে যারা মতামত দেন তারা সমস্যা সমাধানে করণীয় নিয়ে তেমন কিছু বললেন না, ভাবলেন না। পাটের বিকল্প হিসেবে কোনো শস্য উৎপাদন সম্ভব হলো না। পাটের বিকল্প আর কি আছে যা শতাধিক ইঞ্চি বৃষ্টিপাতে ফলানো সম্ভব?

শরৎকাল পাট কাটার মৌসুম। এ সময় ঘন নীল আকাশের আয়নার নিচে প্লাবনের পানি নামতে থাকে। জলাবদ্ধ হরিৎ ঢেউ খেলানো ধানক্ষেতে শারদীয় আভা নামে। সূর্যের আলোয় ধানের পাতাগুলো আরো উজ্জ্বল ঝিকিয়ে ওঠে। নীল, সোনালি, হলুদ আর সবুজ এই কয়েক রঙের খেলা শরতে। নীল আকাশ, সোনালি রোদ আর সোনালি পাট, শ্যামল হরিৎ নানা শস্য, সবুজের ছড়াছড়ি– পান্না সবুজ থেকে কচি কিশলয়ের সবুজাভা, মটরশুঁটি থেকে লেবুর সবুজ, শিম, বরবটি সবুজ– তাল, আম, মেহেদি, কলা এমনকি দুর্বাদাম, ঘাস, সরিষা, মরিচ, কচি বাঁশের ঝাড়, কচি আম ও তামাকের চারা, চায়ের ঝোপ, মুগ-মসুরের সবুজ ক্ষেত ও শাপলা-শালুকের সবুজ পাতার মাঝে শ্যামলে সবুজ নানা বিন্যাসে বিভাময় হয়ে ওঠে। করোজ্জ্বল আকাশের নীল সামিয়ানার নিচে যেন কল্পনায় সকল সম্পদ শ্যামল সবুজ হরিৎ, যেন অকস্মাৎ প্রাণবন্যায় ফেটে পড়ে, ভাসতে থাকে। বর্ষার বাদামি ছাইরঙা আকাশের ক্যানভাসে এই প্রাণবন্ত শ্যামলিমা হয়ে ওঠে সত্যিকার অর্থেই শ্যামশোভা, নবঘনের উপমায় কিংবা জলপাইয়ের সবুজ ম্লানিমায়– সোনালি পাটের গরবিনী ঐশ্বর্যে সবুজের প্রশান্তিদায়ক নৈবেদ্য। এভাবেই চলতে থাকে চোখ-মন জোড়ানো শ্যামল ছবির একের পর এক ভুরিভোজ। সবুজের এহেন সমারোহের মধ্যে সাইবেরিয়া থেকে আগত সারস দলবেঁধে ধানক্ষেতে এসে বসতে শুরু করে। দেশী বক ও সারসে ধানক্ষেত একাকার হয়ে যায়। বাদামি ও কালো রঙের হাঁস নদীর বিস্তীর্ণ এলাকা ছেয়ে ফেলে। এরা যখন ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসে তখন তা সূর্যকে ঢেকে ফেলার উপক্রম করে। যে আর্দ্রতা থাকে তা এক সুখকর উপভোগ্য উষ্ণতা ছড়ায়। শেষ রাতের দিকে কিছুটা ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

উত্তরদিকের দেশগুলোতে শরৎকালে শীতল আবহাওয়া থাকে, ফুল মরে যায়। কিন্তু বাংলাদেশে এর ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। শরতে বাংলাদেশে শীতল বাতাস বয় বটে, কিন্তু এখানে এই সময় ফুল ফোটে। বাংলাদেশে শীতকালে ফুল ফোটে এবং

www.pathagar.com

গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিলে পাতা ঝরতে শুরু করে। সব মিলিয়ে এই সময় বাংলাদেশ রীতিমতো স্বর্গে পরিণত হয় । হিমালয় বাংলাদেশে বেশি শীত পড়তে দেয় না। বাংলাদেশের অবস্থান এমন এক জায়গায় যে, সাইবেরিয়ার শীতল বায়ু হিমালয়ের কারণে বাংলাদেশকে আঘাত করতে পারে না। পাশাপাশি ভারত উপমহাদেশের পশ্চিমাঞ্চল এর প্রভাবেই মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি বাংলাদেশের প্রচুর নদী ও প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে এখানে স্যাঁতসেঁতে ও উষ্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। ব্রিটিশরা উষ্ণ আবহাওয়া ও বৃষ্টির কারণে শীতকালে বাংলাদেশে বেড়াতে আসত। কেননা, এখানকার বাতাস, ফুল, আলোকোজ্জ্বল রাতের কোনো তুলনাই হয় না। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ও ঢাকা ছিল ব্রিটিশদের প্রিয় শহর। শুকনো মৌসুমে ঘোড়দৌড়, বিভিন্ন জমকালো পার্টি ও জীবনযাপনের চমৎকার পরিবেশ ব্রিটিশদের খুব টানত।

শরৎ আসে, মেঘেরা পালায়। যেন পাল তুলে চলে যায়। বাংলাদেশের গরিমায় আকাশ আবার আদিগন্ত প্রসারতা লাভ করে। প্রতিটি তারা আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে জ্বলজ্বল করে রাতের নিকষ কালো ক্যানভাসে। এখানে-ওখানে আকাশের সবখানে তারার দীপাবলী। এ আকাশ উজ্জ্বল তারকাখচিত নয় কিংবা ছায়াপথে অস্পষ্ট আভাময় নয়– এ আকাশ গাঢ় বর্ণের নীল জলধির মাঝখানে গাঢ় কৃষ্ণনীলের মতো। এ আকাশের আলোরও একটা গভীরতা আছে, ইথার, বাষ্প ইত্যাদির একটি বিরল বায়ুমণ্ডলীয় পরিবেশ আছে– এই পরিবেশই যেন সূর্যাস্ত, চাঁদ-তারা, ধূমকেতু– সবকিছুকে মাটির ধরণীর আরো কাছে নামিয়ে আনে– যেখানে সূচিভেদ্য আঁধারে ডুবে থাকা নিশুতি গাঁয়ের মানুষ আকাশের ঠিকানায় চোখ মেলে অসীমের মরমী উপস্থিতি উপলব্ধি করে। কক্সবাজারের সাগর বেলায় হোক, কিংবা স্টীমারের ডেকে বসেই হোক, যে কারো এই অনুভূতি আসবে। মনে হবে অভ্রংলিহ কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। তার মস্তক ও স্কন্ধ প্রদেশ গ্রহ-নক্ষত্র জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ছাপিয় উঠেছে। জ্বলজ্বল নক্ষত্র এত উজ্জ্বল মনে হয় যেন প্রিয়ার চোখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে চোখের তারায়।

হেমন্ত

বর্ষাকাল সমাপনান্তে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যভাগে এই দেশের ভূখণ্ড জেগে উঠতে শুরু করে। বর্ষাকালে দেশের ৮০ ভাগ এলাকা নিমজ্জিত হয়। উঁচু এলাকাগুলোই শুধু এ সময় দৃষ্টিগোচর হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ১৯ ফুট বা তদূর্ধ্ব উঁচু বাঁধগুলোই শুধু বন্যার ও বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা পায়। বাদবাকি নিমজ্জিত হয়। তবে উঁচু বাঁধ ও সড়কগুলোও নিমজ্জিত হওয়া বিচিত্র নয়। এবং তা নির্ভর করে

www.pathagar.com

আগের বছরের বসন্তকালে হিমালয়ে কী পরিমাণ বরফ গলেছে তার ওপর। বৃষ্টির আধিক্য ও তুষার গলা পানির প্রাবল্যের ফলে উঁচু বাঁধ, সড়ক নিমজ্জিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উল্লেখিত কারণে ১৯৮৮ সালে ঢাকা মহানগরী ছিল কয়েক ফুট পানির নিচে। যদিও ঢাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। সমুদ্র থেকে ঢাকার দূরত্ব ১৫০ মাইল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড সামান্যই উঁচুতে। তবে দেশের পার্বত্য এলাকা ও উত্তরাঞ্চলীয় এবং পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত এলাকার চিত্র ভিন্নরূপ। আর পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সাথে বাংলাদেশের সাদৃশ্য খুঁজে বের করা কঠিন হবে। আসলে এই ভূখণ্ডের সৃষ্টি যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনার সম্মিলিত পলিমাটি দ্বারা। সাথে আছে সহস্র বছর ধরে পাহাড় থেকে যে মাটি এখানে জমা হয়েছে। এই মাটি বছরের পর বছর ধরে সমুদ্র ও নদীতটে জমা হয়েছে। আর এভাবেই বাংলাদেশের ভূমি তৈরি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। একটি নতুন ও সক্রিয় বদ্বীপ হিসেবে বাংলাদেশের নদীসমূহ নতুন নতুন ভূমি উপহার দিয়ে চলেছে। গ্রীষ্মকালে নদীর মধ্যখানে কিংবা সমুদ্রের মুখগহ্বরে নতুন নতুন চর এলাকার সৃষ্টি হচ্ছে। বিগত বর্ষায় সঞ্চিত মাটি এই চরের সৃষ্টি করেছে। আগামী বর্ষায় এই নতুন চর থাকবে, না মিলিয়ে যাবে, কেউ তা বলতে পারে না এবং আগামী শতাব্দীতে বাংলাদেশের কোন অংশ পুনর্গঠিত হবে কিংবা বিলীন হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। বাংলাদেশ এমন এক ভূখণ্ড যেখানে নদী তার গতিপথ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বর্তমান আদল অপরিবর্তিত থাকবে এমনটি বলা যায় না। পাশাপাশি ভারতের পশ্চিমবঙ্গও এই বদ্বীপের একটি অংশ। পশ্চিমবঙ্গ এই বদ্বীপের প্রাচীন ও স্থায়ী হওয়া অংশে অবস্থিত। এই অংশের পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে নেই। কিন্তু বাংলাদেশ অংশ সম্পর্কে এ কথা বলা যাবে না। একই সাথে বাংলাদেশ অংশে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা বহুলাংশে বেশি। কারণ প্রতিবছর বাংলাদেশ পলিমাটি দ্বারা বিধৌত হচ্ছে। বন্যা শেষে বাংলাদেশের চেহারা হতশ্রী হয়ে ওঠে বটে; কিন্তু মাটি পায় উচ্চমাত্রার উর্বরতা। অবিশ্বাস্য রকম নির্মল বায়ু ও যে সজীবতা বর্ষাশেষে ফিরে আসে তার কোনো তুলনা হয় না। মেঘনা, যমুনা ও পদ্মা এই বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে প্রতিবছর ৪০০ মিলিয়ন অথবা ৫০ মিলিয়ন কিউবিক ফুট মাটি জমা করছে। এই বদ্বীপের আয়তন ৫৬ হাজার বর্গমাইল এবং এর গভীরতা ৫ শত ফুটের অধিক। বর্তমানে বাংলাদেশের যে চেহারা গত ১৩ হাজার বছরে তা গড়ে উঠেছে। প্রতি ৪৫ বছরে এক ফুটের মতো উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই বদ্বীপ অঞ্চলটির। উত্তরে বদ্বীপের যেখান থেকে শুরু সেখান থেকে এদেশের ভেতর দিয়ে বহতা নদীগুলির পানিতল প্রতি মাইলে নামছে পাঁচ ইঞ্চি করে। আর সমুদ্রের কাছাকাছি এসে ওই পানিতল নামার মাত্রা এক ইঞ্চির কম। নদী যতই সাগরের

www.pathagar.com

কাছাকাছি হয়, তার গতিপথ কমে যায়। পলিবহন ক্ষমতা পড়ে যায়। তাই এ পর্যায়ে নদী তার পলিমাটি প্রথমে প্লাবিত জমিতে, পরে তীর বরাবর ও পরিশেষে নদীর বুকে ধারা প্রবাহের ঠিক কেন্দ্রেই ফেলতে থাকে। আর ওভাবে পলিমাটি জমে জেগে ওঠে চর। এ ধরনের একটি চর নদীগুলোর মোহনায় ৪৪১ বর্গমাইল আয়তনের একটি দ্বীপ গড়েছে। আর যেখানে তিন নদীর ত্রিধারা মিলিত হয়েছে সেখানে নেদারল্যান্ড ও বেলজিয়ামের মোট আয়তনের একটি বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে।

বস্তুত বাংলাদেশ নিজে নিজে গড়ে ওঠা একটি দেশ যার ভ্রূণ হিমালয়ের গর্ভে সৃষ্ট। জন্ম একই সাথে তিনটি স্থানে যেখান থেকে তিনটি বড় নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। স্থান তিনটি হলো : পশ্চিমে রাজশাহীতে, উত্তরে গারো পাহাড়ের কাছ দিয়ে এবং সিলেটের খাসিয়া পাহাড়ে। উল্লেখিত তিনটি নদীর মাধ্যমেই বাংলাদেশ নামক এই বদ্বীপের সৃষ্টি। কী পরিমাণ পলিমাটি পড়ে জমি উর্বরা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করা যায় বর্ষার শেষের মাটির ওপর দিয়ে হাঁটার সময়। কোথাও কোথাও জমি এত উর্বর হয়ে ওঠে যে চাষবাস ছাড়াই ধানের ক্ষেত তৈরি করা যায়। উচ্চফলনশীল শস্যাদি যদি এসব জমিতে রোপণ করা হয় তাহলে তা বাম্পার রেকর্ড করবে। এবং এর মূলে যে বর্ষাকালই কৃতিত্বের দাবীদার তা বলাই বাহুল্য। বর্ষায় জমি পায় পলি। দেশের প্রধানতম সারের উৎসও এই পলি। এবং এ কারণেই প্রতিবেশী দেশগুলোর হিংসার উদ্রেক করে আসছে বাংলাদেশ।

হেমন্তে এদেশের মাটি থেকে সুবাস নির্গত হয়। সারা দেশ ধান কাটাকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। বন্যা-বর্ষা শেষ হয়েছে, এসেছে নতুন মাটি। এই তো উৎসবের সময়। উত্তরাঞ্চলের মরুপ্রবণ এলাকায় একই সাথে দক্ষিণাঞ্চলের আর্দ্র এলাকায় মেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ নেয়ার জন্যে ঢাকায় ভিড় পরিলক্ষিত হয়। এই সময়েই হিন্দু সম্প্রদায়ের দুর্গাপূজা ও নবান্নের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে ছাত্র ও গ্রামবাসীরা নাটক, যাত্রাপালা ইত্যাদি মঞ্চস্থ করে। যাত্রাপালা বা নাটকের বিষয়বস্তু থাকে অঞ্চলের কোনো কীর্তিমান পুরুষের জীবন-কাহিনী, প্রচলিত লোককাহিনী কিংবা এই অঞ্চলের নদ-নদী বা মানুষের কাহিনী।

তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশ সমতল এলাকাবিশেষ। যদিও আমার বন্ধু কাজী জালালউদ্দিন আহমদের ভাষায় : বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ বটে যদিও এক স্থানের থেকে অন্য স্থানের দূরত্ব অত্যধিক। আমার বন্ধু কাজী জালালউদ্দিন আহমদ সরকারি চাকরিতে থাকাকালে দেশের সব এলাকা ভ্রমণ করেছেন। তাঁর এই উক্তির পেছনে দুটি কারণ বিদ্যমান। বাংলাদেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। বর্ষাকালে সব ধরনের যান চলাচল কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। মোদ্দা কথা হলো, এক স্থানের সংস্কার, ভাষা, শস্যাদি, বাড়িঘর নির্মাণ-শৈলী একশত

www.pathagar.com

মাইলের ব্যবধানে ভিন্নতর। জাপান, জার্মানী, যুক্তরাষ্ট্রেও এই ভিন্নতা লক্ষ্য করা যাবে। জাপান ও জার্মানীর ৩০০ মাইলের মধ্যে ভাষা, সংস্কারসহ বিভিন্ন বিষয়ে তেমন একটা বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রে এক হাজার মাইলের মধ্যকার লোকজনের ভাব, ভাষা, সংস্কার, আচরণ প্রায় একই রকম হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত এলাকাগুলোতে গারো, খাসিয়া সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বাস। উত্তরাঞ্চলে বাস কোচদের এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাস চাকমা, মারমাদের। গারোরা খ্রিস্টান। চাকমারা হিন্দু অথবা বৌদ্ধ। এবং রোহিঙ্গারা মুসলমান। যারা প্রতি ডিসেম্বরে চাঁদের পূজা করতে গিয়ে গরু হত্যা করে, তাদের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক, আছে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসীরা। এরা সকলেই মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত এবং হোমঙ্গের অনুসারী। হোমঙ্গ একদা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চট্টগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী বার্মায় বাস করতেন। এই আদিবাসীরা সংখ্যাগুরু বাঙালিদের দ্বারা প্রায়শই অত্যাচারিত হয়ে থাকে। বাঙালিরা ওদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ লালন করে আসছে তা হলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা কামরূপের শাসনামলে তারা সমগ্র বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল ওমিনেট করত। এই আদিবাসীদের অবশেষে পার্বত্য এলাকার মধ্যেই কোণঠাসা অবস্থায় থাকতে বাধ্য করা হয়। উল্লেখ্য, সরকার আদিবাসীদের নানাভাবে খুশি রাখতে আগ্রহী। সংখ্যাগুরু বাঙালিরা আদিবাসীদের সাথে যে আচরণ করে চলেছে তার সাথে আর্যদের আচরণের তুলনা করাই সংগত। তিন হাজার বছর আগে আর্যরা স্থানীয় বাঙালিদের সাথে যথেষ্ট খারাপ আচরণ করেছে। বাঙালিরা আদিবাসীদের জমি-জিরেত দখল করে নিয়ে যাচ্ছে। মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের একটি অংশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে গেছে। তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্যের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার সাথে বিক্ষিপ্তভাবে লড়াই করেছে। যদি এই আদিবাসীদের সাথে সত্যিই ভালো ব্যবহার করা হতো তাহলে তারা বাংলাদেশের সবচেয়ে অনুগত নাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করতে পারত। কেননা, স্বভাব ও প্রকৃতিগতভাবে তারা অনুগত।

পার্বত্য এলাকায় বিচিত্র ধরনের প্রাণীর বাস। যেমন হরিণ, শূকর। এটি একটি চমৎকার শিকার ক্ষেত্রও। দেশের উচ্চ, মধ্যবিত্ত ও ধনী ব্যক্তিরা এখানে শিকার করতে আসে। চলতি শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশ বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হাতীসহ প্রচুর বন্য প্রাণীতে ভর্তি ছিল। কিন্তু বর্তমানে এসব দুর্লভ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ত্রিশের দশকেও শহরের কয়েক মাইলের মধ্যে গণ্ডার, বাঘসহ প্রচুর পরিমাণে হরিণ দৃষ্টিগোচর হতো।

www.pathagar.com

চা হলো বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান অর্থকরী ফসল। পাটের পরেই চা। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব চা-বাগানের জন্যে শ্রমিক এনেছিল। এই আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে যা সন্নিহিত এলাকার লোকদের কাছে বোধগম্য নয়। এসব এলাকার ব্যবসায়ীদের একাংশ রীতিমতো চোরাচালানীর সাথে যুক্ত। বহু বহু বছর ধরে এরা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকা থেকে ঔষধ, কাঠ, গবাদিপশু, মশলা প্রভৃতি ধান, চালের বিনিময়ে পাচার করে থাকে। একই চোরাকারবারের সাথে জড়িত চট্টগ্রাম এলাকায় ব্যাপৃত মুসলমান আদিবাসী রোহিঙ্গারা ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মগরা। উভয় সম্প্রদায়ই এক সময় বার্মা থেকে এসেছিল। মগরা এক সময় বঙ্গোপসাগরের দুঃসাহসী জলদস্যু হিসেবে খ্যাত ছিল। তাদের মধ্যে ছিল প্রচুর নাবিকও। মোগল সাম্রাজ্যের শেষার্ধে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মগরা পুরো বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল, উপকূলীয় এলাকাসমূহে বিশেষ করে নৌপথসমূহে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। মগ সম্প্রদায় বেশ ভালো ব্যবসা বুঝত। এখনো ঢাকা শহরে মগদের নামে একটি এলাকা বিদ্যমান। আসলে এক সময় ঢাকা বেশ বড় ধরনের নগরী ছিল। মোগল এবং তাদের সহযোগী শক্তি আফগানরা মগদের অভিযানের বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত লালবাগ কেল্লা এবং ঢাকা থেকে ১৫ মাইল দূরবর্তী নারায়ণগঞ্জ দূর্গের দেয়াল নির্মাণের মূলে ছিল মগদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে ওয়াশিংটন ডিসির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ঢাকার যারা আদিবাসী, হয় বরাবর তাদের এখানেই বাস অথবা নিজ নিজ জেলা যেমন– রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তারা ঢাকাতে বাস করছে। ২১টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা এবং ৬৫ হাজার গ্রাম নিয়ে বাংলাদেশ। দেশটি ছোট হলেও নির্বাচনের সময় এদেশের নির্ভীক রাজনীতিবিদদের একই স্থানে জনসভা উপলক্ষে মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে খুব অল্পই গত দশকে প্রত্যেকটি জেলা সফর করেছেন। প্রতিটি উপজেলা সফর করেছেন এমন কাউকেও পাওয়া যাবে না। যদিও উপজেলাগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম সম্পর্কে এদের ধারণা ভাসা ভাসা জ্ঞানের থেকে সামান্য বেশি। একজনকে চেনার ক্ষেত্রে তার নিজ জেলার নামটা জানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নোয়াখালী এলাকায় মরিচের চাষ বেশ হয়। নোয়খালীর একজন লোকের মধ্যে শুকনো মরিচের ঝালের মতো মেজাজ পরিলক্ষিত হতে পারে। সিলেটের লোক মানেই পাকা ব্যবসায়ী। তাকে জলদস্যুদের উত্তরসূরীও ভাবা যেতে পারে। শ্যাম

www.pathagar.com

উপসাগর এলাকায় জলদস্যুদের এখনো সালেটি বলা হয়ে থাকে। শ্রীমঙ্গলের লোক সাধারণত চা-ব্যবসায়ী হয়ে থাকে। আর ময়মনসিংহবাসী মানেই সে পাট ব্যবসায়ী। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় শহর যেমন– দিনাজপুর, রংপুর, যশোর, বগুড়া, কুষ্টিয়ায় দেশের অপর অংশের তুলনায় বন্যা ও বৃষ্টিপাত কম হয়ে থাকে। এ এলাকার প্রধান শস্য ইক্ষু, রেশম, আম, কলা, তামাক, গম ইত্যাদি। সুন্দরবন দেশের সবচেয়ে বড় বন। বাঘ, চমৎকার কাঠ সুন্দরবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঢাকা মহানগরীর মার্সিডিজ ও ভিডিও ক্লাবের পসরার তুলনায় সুন্দরবনের জীবন একেবারেই ভিন্নতর। উল্লেখ্য, আঞ্চলিকতার প্রতি টান, বিভিন্ন রকম শস্য, ভাষা এই বৈচিত্র্য নিয়ে বহু ধরনের মানুষের বাস এই ভূখণ্ডে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে, কুষ্টিয়া ও যশোরের লোক ভালো বাংলা বলেন বলে রবীন্দ্রনাথ ও লালন শাহের মতো বড় কবির জন্ম এই অঞ্চলে। বাউল সম্প্রদায় যাদের সাক্ষাৎ মিলবে যত্রতত্র তারা এই জাতির গীতিকবি স্বরূপ। গায়ে থাকে নানা রঙের ভিন্ন বস্তু। কণ্ঠে তাদের দেশের গান। সাহায্যের আশায় তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায়। এরাই এই জাতির চারণ কবি। এরা ভাং, গাজা ইত্যাদিও সেবন করে থাকে। কিন্তু এরা সবসময়ই হাসিখুশি, জীবন্ত, সতর্ক এবং কারো সাথে দু'কথা কইতে আগ্রহী। একতারা, দোতারা কাঁধে ঝুলিয়ে এরা গান গেয়ে যে আবহের সৃষ্টি করে তার সাথে এদেশের সবুজ মাঠ, নীলাকাশ এবং মিঠাপানির যোগসূত্র খুঁজে পওয়া যায়।

হেমন্তে যেন পুরো অঞ্চলটি পানির মধ্যে থেকে জেগে ওঠে। জেগে ওঠে মানুষ। ভূখণ্ড জেগে ওঠার সাথে সাথে গোলাপ, জুঁইসহ নানা ধরনের অজস্র ফুল ফুটতে শুরু করে। হেমন্তের শেষ দিকে বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়। শরতের শুকনো পাটের গন্ধ অন্তর্হিত হয়ে গ্রামাঞ্চলে নতুন ধরনের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসে ভেসে বেড়ায় শস্য, ফুলের গন্ধ, পাটখড়ি পোড়ার গন্ধ। কুটিরের চালার সংস্কার হয় এই সময়ই। শুষ্ক বাতাসে উঠোনের কর্দমাক্ত মাটি শক্ত হতে শুরু করে। গরু এই সময় বাচ্চা দেয়, ছাগলছানার সে কি উল্লাস। মাঠে মাঠে সারস এসে জমা হতে থাকে। হাঁস সাঁতার কাটে। সব মিলিয়ে অপূর্ব দৃশ্য।

হেমন্ত শুরু হওয়া মানেই বিয়ের কাবিন শুরু হয়ে যাওয়া। লাল, নীল, সবুজ, সাদা– বিভিন্ন রঙের শামিয়ানা টানিয়ে কনের বাড়িতে বিয়ের প্রথম অনুষ্ঠানটি হয়। বরপক্ষের লোকদের আপ্যায়ন করা হয় এই অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশে বিয়ে মানেই ৭ থেকে ১০ দিনের মামলা। কিছু পরিবারে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয় এভাবে– পরিবারের একজন বয়স্ক পুরুষ লোক বর-কনেকে আশীর্বাদ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান হলো, বর-কনেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে হলুদ-সাবান দিয়ে গোসল করানো হয়। কনের হাতে এবং পায়ে মেহেদি দিয়ে রঞ্জিত করা হয়। এরপর বরের পরিবার

www.pathagar.com

বিভিন্ন প্রকার উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকে। এর মধ্যে থাকে বিছানাপত্র, রান্নার তৈজসপত্র, চাদর ইত্যাদি। মিষ্টিও থাকে। কনের পরিবার অতঃপর বরের পরিবারের লোকদের ভোজে আপ্যায়িত করে। কনের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠানটি হয় সেই অনুষ্ঠানেই বিয়েটি চুক্তিবদ্ধ হয়। অতঃপর কনে বরের বাড়িতে যায়। কনেকে ধুমধামের সঙ্গে বরের বাড়িতে স্বাগত জানানো হয়। আলতায় পা দুটোকে লাল টুকটুকে করে সাজিয়ে কনে যে বাড়িতে ঢুকল এই বাড়িই এখন তার বাড়ি। অবশেষে বরের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছোট ছোট হিন্দু পরিবারের বিয়ের অনুষ্ঠানে ভিন্নতর আচরণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, পদে পদে শাঁখ বাজানো সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যে ধর্মেরই হোক না কেন, এদেশের বিয়ে মানেই আনন্দ, খুশি, হইচই। যদিও জীবনের প্রয়োজনীয় আপস-রফা করে নেয়া, অন্য পরিবারের কন্যাকে নিজ করে নেয়া কিংবা নিজ কন্যাকে পরের ঘরে পাঠানো– কারো ছেলেকে জামাতা হিসেবে আপন করে নেয়ার ব্যাপারটি অনেক সময় বাঙালির একান্নবর্তী পরিবারে খুবই জটিল বিষয়।

পশ্চিমারা বাংলাদেশের বিয়ের ব্যাপারে নানা অপব্যাখ্যা করে থাকে। ধনী এবং বিদেশে লেখাপড়া করছেন। [যাদের সংখ্যা ইদানীং বাড়ছে] তাদের ছাড়া এদেশের সবগুলো বিয়েই পরস্পরের পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখেশুনে এবং সতর্কতার সাথে আয়োজন করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের লোকজন এদেশের বিয়ের ব্যাপারে যতই সংশয় প্রকাশ করুক না কেন, এদেশের অধিকাংশ বিয়েই সফল। এর কারণ এদেশের সমাজ খুব ছোট ছোট বিন্যাসে বিভক্ত। বর-কনে বলতে যা বোঝায় তারা মোটামুটিভাবে একই শ্রেণীভুক্ত, পরস্পর পরস্পরের চেনা এবং দুই পরিবারেরই থাকে কমন আত্মীয়স্বজন। এক পক্ষের প্রস্তাব অপর পক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের ঘটনা এখানে খুব কমই ঘটে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বর বা কনে খুব ভালো করেই জানে যে তারা পরস্পরকে ভালোবাসবে, পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। এবং এমনটিই ঘটেছিল বা ঘটে চলেছে তাদের বাবা-মা, চাচা-চাচীসহ সকল আত্মীয়স্বজনের ক্ষেত্রে। তাদের বাপ চাচা মা খালারাও এভাবে তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করেছিল। বর ও কনের আরো জানা আছে যে, বিয়ে তাদের কি দেবে এবং কতটুকু তাদের প্রত্যাশা করা উচিত। যাই হোক, সন্তানের মঙ্গলের আশায় যেখান থেকে সম্বন্ধ আসুকই মা-বাবা প্রথমেই দেখে নেন। এবং এভাবে যদি আমরা বিবেচনা করি তো দেখব, সন্তানের সুখী হওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সব মা-বাবা যা করে থাকেন বাংলাদেশের মা-বাবাও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। সত্যি বলতে কি, বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশে সফল ও দীর্ঘস্থায়ী দম্পতির সংখ্যা প্রচুর। যদিও মুসলিম আইনে তালাক প্রদানের বিধান পশ্চিমাদের মতোই সহজ ও শিথিল।

www.pathagar.com

পশ্চিমাদের অনুযোগ, বাংলাদেশের মানুষের বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে বাহুল্য খরচ করে থাকে। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু ছেলে হওয়া উপলক্ষে এসব পরিবারের যে খরচ হয়, বিয়ে-শাদীতে খরচ সে তুলনায় নস্যি। এই অনুষ্ঠানাদিতে বিশাল আয়োজন করা হয়। আত্মীয়স্বজন তো আসবেই। যারা দাওয়াত দিয়েছিল তাদের কোনো অনুষ্ঠানে– এবারে তা পুষিয়ে নেয়া হয়। ছেলে হওয়া উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আত্মীয়স্বজনদের নবজাতকের প্রতি যেমন ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে একই সাথে তা এই নতুন বাবা-মার দাম্পত্য জীবনের প্রতি সম্মান জানানোরও সামিল। এবং এ কথা বলতেই হবে, এদেশের মানুষ খুব কমসংখ্যকই দ্বিতীয় বিয়েতে আগ্রহী। যেসব বিদেশী বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আগ্রহ বোধ করেন এবং এ ধরনের বিয়েতে হাজির হন তারা সত্যিই ভাগ্যবান। এসব বিয়ের অনুষ্ঠানে কত রকম বিষয় নিয়ে যে আলোচনা, গল্প-গাছা হয় তার ইয়ত্তা নেই। এসব বিয়েতে হাজির না হওয়া মানে বিচিত্র গালগল্প ও গুজব-গুঞ্জনের রস থেকে বঞ্চিত হওয়া।

এদেশের সমাজের একটা নির্ধারিত স্তরে প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কিত। ঠিক সেভাবেই বিয়ে হলো এবং বংশলতিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য-উপাত্ত বাছাইয়ের উৎস। বাংলাদেশে মানুষের নামের শেষ শব্দটি প্রায়ই পারিবারিক পরিচয়ে হারিয়ে যেতে দেখা যায়। খুঁজে পাওয়া যায় না। বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েদের কেবল তাদের মূল নামের প্রথম শব্দটিই থাকে। আর তার আগে বেগম (মিসেস) শব্দটি জুড়ে ডাকা হয়। নামের শেষের শব্দগুলোর অস্তিত্ব তুলনামূলকভাবে কম। ফলে বাংলাদেশের মানুষের নামকরণের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে পরিচয় নেই এমন কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না, জিয়াউল হক নামের একজন লোক হুমায়ূন কবির নামে কোনো ব্যক্তির আপন চাচাতো ভাই হতে পারে– বেগম তাহমিনা ও বেগম রেখা সহোদর বোন হতে পারে কিংবা কারো সবচেয়ে উত্তম বন্ধুর টেনিসের জুটি শিল্পমন্ত্রীর বউ হতে পারে। এর কারণ বাংলাদেশের মানুষ কেউ না কেউ কারো না কারো সাথে 'তস্যকুলের বকুল ফুলের' সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। সেই কিংবদন্তীর আলকাতরা মাখা বাচ্চার মতো বাংলাদেশের একটি বাচ্চাকে ছুঁয়ে দেখুন– ওর সাথে অগুনতি পরিবারের সম্পর্ক রয়েছে। ওদের কেউ না কেউ ওদের চাচা, একদঙ্গল চাচা, জ্ঞাতি ভাইবোন, চাচাশ্বশুর– কত না সম্পর্কে সম্পর্কিত। এদের সর্বত্র আপনি দেখবেন, ঢাকার প্রতিটি লোকের সাথে কেমন করে যেন সম্পর্কে জড়িত। আর জেলা, থানা সদর কিংবা গাঁয়ে এভাবে সম্পর্কিত পরিবারের কথা না হয় বাদই দেয়া গেল।

www.pathagar.com

শীত

নভেম্বরের মধ্যভাগ থেকে জানুয়ারির প্রথমদিকে আবহাওয়া ক্রমশ শুষ্ক হতে থাকে। মাটি শুকনো হতে থাকে এবং ধুলোর সৃষ্টি হয়। এই সময় যে শিশির পড়ে ধুলোকে সারাদিন ধরে স্যাঁতসেঁতে করে ফেলে। বিকেলের দিকে বয়স্ক লোকজন শীতবস্ত্র পরিধান করে। যারা তরুণ এই সময় তাদের সাক্ষাৎ মিলবে ফুটবল মাঠে, ক্রিকেট পীচে, টেনিস কোর্টে, কিংবা গলফ মাঠে। কেউ কেউ স্কোয়াশ খেলে। শীতে মানুষজনের অনেকেই গ্রামে ফিরে যায়। এই গ্রামই হলো তার নাড়ির বন্ধন।

দুনিয়া জুড়ে বিদেশীরা কোথাও গেলে দেখা যায় একই ধরনের প্রবণতা তাদের মধ্যে কাজ করছে। ওরা সেই দেশের প্রদীপের নিচে বিরাজমান আঁধারি এলাকা পল্লী জনপদকে জানতে চায়, চিনে উঠতে চায়। কেননা, ওখানেই খাঁটি মানুষের বাস। বাংলাদেশের বেলায় এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এর কারণ শতকরা ৮০ জনের বেশি মানুষের বাস পল্লীগ্রামে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশে যারা বাইরে থেকে আসেন মোটামুটি তাদের ধারণায়, এদেশের গাঁয়ের মানুষ নিরীহ, নম্র, ভদ্র, দেহাতী, অসহায়, বেচারা, দেখে মায়া হয়। বকাঝকা করা যায় না। আর এসব দেশজ স্থানীয় মানুষগুলোর বিপরীত চিত্র প্রায়ই দেখা যায় শহুরে আভিজাত্যের মধ্যে। ওরা নব্য ধনী। ধনী দেশগুলোর সাহায্য-সহায়তায় নগদ নারায়ণে আঙুল ফুলে তরতর করে কলাগাছ হয়ে উঠেছে ওরা। বলা বাহুল্য, এদেশে বিদেশীরা যারা আসে তারাও বস্তুত সকলেই বাংলাদেশকে দেয়া বিদেশী সাহায্যের গায়ে লেগে থাকা পোকাই বটে। ফলত, এই যে এখানে অধিক মার্কসীয় পরিস্থিতি বিচারের প্রয়াস চলছে তা খোদ মার্কসের চিন্তা-ভাবনার উল্টো। মার্কস পল্লী বাংলার যে উদ্বেগজনক পশ্চাদপদতার ধারণা রাখতেন ও সে কল্পনায় নিজেও শিউরে উঠতেন তার সাথে এ ছবির মিল নেই। এখন কেউ যদি গ্রাম বাংলাদেশের নেহায়েত নম্র দেহাতীদের না খুঁজে দেশের সংস্কৃতিকে খোঁজে তাহলে তা নগরে নয়, গ্রামেই আছে। আর প্রেক্ষিত এটিই যদি হয়ে থাকে বলতে হয় মার্কসের ধারণাও ছিল ভ্রমাত্মক।

পশ্চিমবাংলার রাজধানী কলকাতা এক আবর্জনা দুর্গন্ধময় নেতিয়ে পড়া, বিষণ্নকর দারিদ্র্যপীড়িত মহানগর (অবশ্য বিগত কয়েক বছর ধরে এ নগর দ্রুত নিজেকে পুনর্বাসিত করছে) ঠিকই; কিন্তু তবু লন্ডন, তাইপে কিংবা প্যারীর মতোই কলকাতা বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সজীব, প্রাণময়। পূর্ববঙ্গের শহর-নগরগুলো তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন, দক্ষতায় সুপরিচিত অথচ গোরস্থানের নৈঃশব্দের মতোই ক্লান্তিকর। যেমন– বাংলাদেশের মানুষ ভদ্র, তবে ঢাকা কোনো চর্চিত, পরিমার্জিত জায়গা নয়। ঢাকা ম্যানচেস্টার-এডিনবরা নয়; ডালাস, বোস্টন নয়, নাগোয়া-কিয়োচো নয়। ঢাকার ওপরতলার অভিজাতবর্গ রাজনীতির নিন্দা-মন্দ, সন্দেহ-

সংশয়ে ডুবে আছে। ওদের চিত্ত জুড়ে আছে অন্যের বিত্ত। ঢাকা তাই সবার আগে রাজনীতিক, ব্যবসায়িক, আমলার নগরী। ওয়াশিংটন ডিসির মতোই কৃত্রিমতায় ভরা। দূর পল্লী জনপদের কথা অবশ্য একেবারেই ভিন্ন। ওখানে আছে বাঙালি সংস্কৃতির বুনিয়াদ।

ছোট দেশ হলেও বাংলাদেশের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াত বেশ তরক্কি ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যে কোনো ভ্রমণ মানেই সে উদ্দেশ্যে বড় ধরনের আয়োজন চাই। জাপানী অনুদানে নির্মিত ব্রীজ (মেঘনার ওপরে) যাত্রাপথ একঘণ্টা কমিয়ে আনলেও ঢাকা হতে ১৫০ মাইল দূরবর্তী চট্টগ্রামে যেতে ৭ ঘণ্টা সময় লাগে। বগুড়া থেকে ঢাকা যেতে লাগে ৬ ঘণ্টা। এর পরে আছে ফেরীর জন্য প্রতীক্ষা। ঢাকা থেকে শত মাইল দূরত্বের সিলেট ও খুলনার পথেও একই অবস্থা। ট্রেনে সময় কিছুটা কম লাগে, কিন্তু ট্রেনে লেট হবেই। যদিও গত ২০ বছরে ট্রেন যাতায়াতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিমান ভ্রমণ তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল। ঢাকার অদূরবর্তী ১৬ মাইলের মধ্যে অবস্থিত এক বন্ধুর বাড়িতে সবচেয়ে দ্রুতগামী ব্যবস্থায় নৌপথে যেতে আমার লেগেছিল ৩ ঘণ্টা সময়। এই পথে কোনো পাকা রাস্তা নেই। কিভাবে আমি নবাবগঞ্জে শামসুদ্দিন আহমদের বাড়িতে পৌঁছেছিলাম এখন তার বিবরণ দেব। শামসুদ্দিনের গ্রাম দেশের অসংখ্য গ্রামেরই অনুরূপ।

অতি প্রত্যুষে আমরা ঘুম থেকে উঠে রওনা দিলাম। তখন মসজিদে আযান হচ্ছিল, পাখি ডাকতে শুরু করেছে। একটি ঘুমন্ত শহরকে পেছনে ফেলে পুরনো ঢাকার সদরঘাট এলাকা থেকে একটি যন্ত্রচালিত ফেরিতে উঠি। ফেরিতে শতাধিক লোক। ফেরিটি দুলছিল, যদিও চলার সময় সে তরতর করে এগিয়েও যাচ্ছিল। যাত্রীদের অনেককে দেখলাম জায়গা করতে ব্যস্ত, নাশতা কিনছে কেউ কেউ।

এই পুরনো শহরের নদীতীরে অসংখ্য বাড়ি। এসব বাড়ির স্থাপত্যে-বৈচিত্র্য বিদ্যমান মিনারগুলোও একটির মতো আরেকটি নয়। অপর তীরে জাহাজ বানানো হচ্ছে। যাদের সকালে স্নানের অভ্যাস তাদের কয়েকজনকে দেখা গেল অগভীর পানিতে তাদের পুণ্যস্নান সারছিল। একজন হালকা স্রোতে সাঁতার কাটছিল। সাবান মাখছিল একজন। ফেরির প্রধান কেবিনে একজন বাউল পরম মমতার সাথে দুঃখের গান গাইছিল দোতারা বাজিয়ে বাজিয়ে। নারায়ণগঞ্জ দূর্গ অতিক্রম করে ফেরি গিয়ে পড়ল ধলেশ্বরী নদীতে। এ পথেই যেতে হবে নবাবগঞ্জ। শিশিরে সিক্ত দুর্গের লাল পাথরগুলো অতি প্রত্যুষের ঝকমকে আলোতে জ্বলজ্বল করছিল। আমাদের ফেরির বিপরীত দিক থেকে আসছিল আরো ফেরি, দেশীয় নৌকা, লম্বা লম্বা অপ্রশস্ত নৌকা যাতে মেশিন লাগানো। গত পাঁচ বছরে মেশিন লাগানো এহেন দেশীয় নৌকা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়েছে।

www.pathagar.com

যাহোক, এভাবে এগিয়ে চলুন পায়ে পায়ে। দেখবেন বাংলাদেশের গ্রাম আপনার মনে ধরে। ধরুন, মোটামুটি উঁচু ঢিবি যা দেখতে ছোট্ট দ্বীপের মতো– ওর ওপরে কোথাও রয়েছে কয়েকটি তালগাছ, আমগাছ আর বাঁশের ঝাড়। আর ওর ফাঁকে ঘাসে ঢাকা একটি পরিবারের মাটির দেয়ালঘেরা চালাঘরের আঙিনা। এগুলো চোখে নিবিড় হয়ে উঠবে। দু'শতক আগে যেসব ইংরেজ প্রথম এই বাংলাদেশে এসেছিলেন তাদের একজন লিখেছেন, "আজকে আমি এমন এক দেশ দেখলাম যে আর কোনো সমতল, এত সূক্ষ্ম শিল্পকলা বিবর্জিত এত সুন্দর, নয়নাভিরাম দেশ আমি আর কখনো দেখিনি। এর দিগন্ত-ছোঁয়া সোনার ফসলের অবারিত মাঠ, মাঝে মাঝে যদি ব্যাঘাত বলতে কিছু থাকে তাহলে সেখানকার দেহাতী লোকজনের ফলের গাছের ঘেরাটোপে লুকিয়ে থাকা কিছু কুঁড়েঘর মাত্র। যেন ঐশ্বর্যে উপচে-পড়া নিখাদ নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতির সুন্দর নয়নশোভন দৃশ্য।"

হরিৎ বর্ণের মাইলের পর মাইল ধানের ক্ষেত চোখ জুড়িয়ে দেবার মতো। মাঝে-মধ্যে আরোহণ করা যায় এমন সাইজের গাছ আপনার চোখ শুধু আটকে দেবে। গ্রামগুলো এতটাই উঁচু যাতে বন্যার পানি থেকে রক্ষা পেতে পারে। গাছ কুটিরগুলোকে শীতল রাখে। গ্রামের আরেক আকর্ষণ পুকুর। এই পুকুরে মাছ চাষ করা হয়, গোসল পর্ব সম্পন্ন হয়। প্রতিটি গ্রামই আরেকটি গ্রাম থেকে এভাবে পৃথক। তবে স্কুল ও গরু-ছাগল চরানোর জন্যে যৌথ বা কমন জমি রয়েছে।

নবাবগঞ্জে প্রবেশমাত্রই আবহাওয়া বিশেষ করে তাপমাত্রার তারতম্য অনুভূত হবে। খোলা মাঠের তুলনায় ১০ ডিগ্রী তাপমাত্রা কম অনুভূত হবে। এবং গ্রামগুলো পুরোটাই এমন ছায়াময় যে, আপনার চোখ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে। পুরো গ্রাম জুড়ে আম, কাঁঠাল, কলাগাছ, বাঁশঝাড়, মেহেদি গাছ। কত গাছ! এই গাছের কারণেই পুরো গ্রামটিকে জীবন্ত মনে হয়। গ্রামের প্রতিটি বাড়িই বেশ পরিচ্ছন্ন। সামনে নিকানো উঠোন। এই উঠোন শক্ত রাখার জন্যে প্রতিদিনই লেপা হয়। উঠোনকে সামনে রেখে রান্নাঘর, শোবার ঘর, মেহমানদের জন্যে ঘর। দেয়াল হয় মাটির অথবা বাঁশের চাটাইয়ের। ছাদ টিন অথবা খড় দিয়ে ছাওয়া। মহিলাদের পর্দা করার জন্যে লম্বা লম্বা কলাপাতা দিয়ে বেড়া দেয়া হয়ে থাকে। লক্ষণীয়– বাংলাদেশের মহিলারা পরিমিত পর্দা করে থাকে। সৌদি আরব ও পাকিস্তানের একাংশের মহিলারা যেভাবে পর্দা করার জন্যে ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে বাংলাদেশে ওরকম প্রচলন নেই।

পল্লী পরিবারের গৃহের আঙিনাটি সাধারণত আয়তাকার। সাজসজ্জা বিবর্জিত। ক'টি কুঁড়েঘর। পিতৃভিত্তিক পরিবারের লোকজন ওগুলোতে থাকে। গৃহের প্রতিটি জিনিসই কাজে লাগে। সেগুলো পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত। পরিবারটির সামান্য যা কিছু সম্বল যথাস্থানে রক্ষিত। কাপড় আছে আড়ায় ঝুলানো। ব্যবহার্য সরঞ্জাম ঠিক

www.pathagar.com

ঘরটিতে। অবশ্য রান্নাঘরের এলাকাটি বেশ মান্ধাতার। একটা মাত্র ইটের সমান উঁচু ভিটির ঘর এটি। ঘুঁটেয় সাধারণত রান্নাঘরে চুলো জ্বলে। তবু আশপাশের উঠোন সুচারু নিকানো যাতে বাসি-পঁচা খাবার থেকে দূষণ না ঘটে।

এক গৃহস্থের বাড়ির অবস্থা এরকম : পেশীবহুল এক বয়োবৃদ্ধ কৃষক তার কুটিরে ৬ ফুট দৈর্ঘের এবং ৪ ফুট প্রস্থের একখানা ড্রইংরুম বানিয়েছে। এখানে আসবাবপত্রের মধ্যে একখানা রঙহীন টেবিল এবং কয়েকখানা চেয়ার। সাজসজ্জার সামগ্রীর মধ্যে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের একখানা পুরনো ছবি। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর পত্নী এখন এই দেশের প্রধানমন্ত্রী। কক্ষটি যদিও ক্ষুদ্র কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন। এই ড্রইংরুমের সামনেই এই কৃষকের ছেলেদের থাকার পৃথক ঘর। এর পাশেই অবিবাহিত মেয়েদের জন্যে ঘর। বিবাহিত যারা– তাদের জন্যে পৃথক ঘর।

নবাবগঞ্জের এহেন কুটিরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পাকা দালানও চোখে পড়বে। এই সকল দালান ধনীব্যক্তিদের। কয়েকটি বাড়ি তো রীতিমতো দেখার মতো– চুনকাম করা, তেমনি মজবুত। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত কয়েকটি বাড়িও দেখা গেল। ওইসব বাড়িকে পরবর্তীতে হাল-ফ্যাশনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবে নবাবগঞ্জের অধিকাংশ লোকেরই বাস কাঁচা বাড়িতে। গ্রামের অনেক তরুণ সৌদি আরবে চাকরি করে। ২/৩ বছরের চুক্তিতে এসব চাকরি মেলে। এদের বাড়িঘর বেশ অত্যাধুনিক এবং টেলিভিশন-ফ্রিজসহ বিলাস-ব্যাসনের জিনিসপত্র যথেষ্টই রয়েছে এসব বাড়িতে।

বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামের মতো নবাবগঞ্জ সম্পূর্ণত একটি পরিচ্ছন্ন গ্রাম। একটি বিষয় আমার মনে হচ্ছে, প্রাণিজগতের সঙ্গে আমরা শহুরে লোকেরা কিভাবে সম্পর্ক চুকিয়ে-বুকিয়ে ফেলেছি। অপরাপর গ্রামের মতোই নবাবগঞ্জের লোকজনের কাপড়-চোপড় আনুষ্ঠানিক বা ফিটফাট নয়। শিশুরা পরে হাফপ্যান্ট। মহিলারা লাল, নীল অথবা সবুজ রঙের সুতি শাড়ি পরে। গ্রামের সকলেই খালিপায়ে হাঁটে, কারো কারো পায়ে থাকে রাবারের চপ্পল। গ্রামের লোকদের পোশাক-আশাকের বাহুল্যহীনতায় যে বিষয়টি স্পষ্ট– তা হলো গ্রামেই যে প্রকৃতি তার সাথে তারা নিজেদের একীভূত করে ফেলেছে।

প্রতিটি গ্রামের ক্ষুদ্র মসজিদ ও কবরস্থান রয়েছে। বাজারঘাট নেই বললেই চলে। বাজারের জন্যে কিছুটা দূরে যেতে হয়। দেশের এক-পঞ্চমাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ আছে। বাকিরা মোম, কেরোসিনের বাতি অথবা ব্যাটারীচালিত লাইট ব্যবহার করে। এদেশে গ্রাম মানেই ধানক্ষেত। এই ধানক্ষেত দেখলে মনে হবে জোড়াতালি দেয়া এক বিশাল ভূখণ্ড। তালিটা পড়ে জমিতে আল দেয়ার কারণে। মাটি সামান্য উঁচু করে এই আল তৈরি করা হয়। এতে একের জমির সাথে অন্যের জমি মিলে

www.pathagar.com

যায় না। এই সীমানা কিংবা আলকে মেনে নিয়েই জমির বেচা-কেনা হয়, বর্গা দেয়া হয়।

কৃষিকাজ এদেশে পারিবারিক পেশা। চাষের কাজটা হয় সকালের দিকে। বীজ রোপা, আগাছা সাফ, শস্য কাটা হয় বিকেলের দিকে। কৃষক খালি গায়ে ফোস্কাপড়া রোদে সকাল-সন্ধ্যা মাঠে কাজ করে। কৃষক সম্প্রদায়ই জাতির মেরুদণ্ড। বৃটিশ ভাইসরয় ওয়ারেন হেস্টিংস যাদের আখ্যায়িত করেছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কৃষক হিসেবে। উল্লেখ্য, সারা দেশের এক ইঞ্চি জমিও বছরে অকর্ষিত থাকে না। যে সময়টুকুতে জমিকে বিশ্রাম দিতে হয় সেই সময়টুকু ছাড়া।

জমির সাথে কৃষকের সম্পর্ক কি রকম নিবিড় তা লিখে প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন। অতি ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে কৃষক মাঠে যায়। রোপা মৌসুমে বলদের গোসলের সময় না হওয়া পর্যন্ত কৃষক মাঠে কাজ করে। আগাছা পরিষ্কারের সময় কৃষক উবু হয়ে জমিতে কাজ করে। ছোট কাস্তে দিয়ে মাটির খুব কাছাকাছি গিয়ে ধান-পাট শস্যাদি কাটতে হয় কৃষককে। সেই শস্য মাথায় নিয়ে কৃষক বাড়ি ফেরে। গ্রীষ্মে কৃষক আগুন দিয়ে মাঠ পোড়ায়। কৃষক মাঠে শাকসবজি বোনে, লাউয়ের মাচান বানায়। বলদের পেছনে পেছনে চাষের জমিতে চাষ করতে যায় কৃষক। কতভাবেই না একজন কৃষক এই মাটির সাথে যুক্ত। এই মাটিই কিষাণ-কিষাণীর ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু, তাদের জীবনের সবটাই তাদের সম্পদ। মাটির রঙ কিষাণের চেনা। ঋতু নির্বিশেষে মাটির রঙ কেমন হয়ে উঠবে কিষাণের তা নখদর্পণে। কিষাণ জানে মাটির মর্জি, গন্ধ, মাটির চাহিদা, প্রয়োজন। এই একখণ্ড জমি যেন তার সন্তান, তার মা। এহেন মাটিতে কিষাণ নিঃশব্দে কাজ করে বছরের পর বছর– আমৃত্যু। নিশ্চয়ই এই মাটির কান্না, খেদ শুনতে পায় সে। কিষাণ শুনতে পায় মাটির অনন্তকালের খেদ।

বিদেশীদের মধ্যে খুব কমসংখ্যকই গ্রাম পরিদর্শন করে থাকে। অনেক বিদেশী গ্রাম ভ্রমণকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে। গ্রামে পথ চলতে বিদেশীদের পিছু নেয় লোকজন, বিশেষ করে কৌতূহলী শিশুরা। এই বাংলাদেশী গ্রামগুলোতেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও সদয় মেজবানরা রয়েছে। যদিও তারা খুব সামর্থ্যবান এ কথা বলা যাবে না। তবে যে কোনো মেহমানের জন্যেই তারা সাধ্যমতো খানাপিনার আয়োজন করে। যেমন খাসি, মুরগি, সুবাসী চালের ভাত, মিষ্টান্ন এবং যে কোনো বিদেশী স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, তাদের জন্যে যথেষ্ট আয়োজনই করা হয়েছিল– যদি তিনি বিবেচক হন।

নবাবগঞ্জে আমার প্রথম বেলার আহারে আমাকে দেয়া হয়েছিল পাঁচ পাউন্ড ওজনের আস্ত একটা রুই মাছ, খাসির মাংস, মুরগি, জাফরান দিয়ে রান্না পোলাও, সালাদ, গামলাভর্তি মিষ্টান্ন, খাঁটি দুধের মালাই দিয়ে চা। আমার মেজবানের মধ্যে

www.pathagar.com

আমি লক্ষ করেছি ঔদার্য, সারল্য, অকপট ভাব, ওদের নিজস্ব জীবনযাপন সম্পর্কে বোঝানোর আগ্রহ, ওদের নিজেদের জীবনের বিশ্বাস, অভ্যাস। এ সময় দেখানেপনা ছিল না মোটেই। হীনভাবে তোষামোদের ভঙ্গিও ছিল তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। সত্যি বলতে কি, এদেশের মানুষের জীবনযাপন, এদেশের ফল, ফুল, পাখি পশ্চিমের একজন শ্রান্ত মানুষকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে প্রলুব্ধ করতে পারে। প্রকৃতির খুব নিকটে, প্রকৃতির মধ্যে, প্রকৃতির খুব কাছাকাছি এখানকার মানুষের বাস। গাছগাছালি, মাটি, পানি, গৃহপালিত পশু সবসহ এদের বাস। এ কথা অনস্বীকার্য, গ্রামে-গঞ্জে আজ পরিবর্তনের ব্যাপক হাওয়া বইছে। শিক্ষার হার বাড়ছে। বিদ্যুতের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন-ভিডিও মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে গেছে। গ্রামের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে যেমন আগ্রহ বাড়ছে– তেমনি তারা সুযোগও পাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। এ-কারণেও শহরগামী মানুষ গ্রাম ছাড়ছে।

যে গ্রামাঞ্চলে বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের বাস, শুকনো মৌসুমে সেই পল্লী অঞ্চল ভ্রমণ আরেক মজাদার অভিজ্ঞতা। ধানক্ষেতের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, সূর্য বা তারাদের যে ছায়া পড়ে বিল ও জলাশয়ে তা অবলোকন, তারার সাথে মনে মনে অনেক কথা বলা– সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশ যে যত বেশি ভ্রমণ করবে তত বেশি সে এদেশের প্রেমে পড়বে। এদেশের মানুষজন সুন্দর, সুদর্শন, আরো সুন্দর মাটি, আকাশ অনেক বেশি জীবন্ত। এদেশের মানুষ চাঁদ, ফুল, নিয়ে গান রচে, গায়। লণ্ঠনের নিচে শাড়ি পরিহিতা মেয়েরা যে নাচ নাচে তাতে যৌনতা অনুপস্থিত। হাজার বছরের ঐতিহ্য এই নাচে যেন ঝরে পড়ে। এই নাচ এতই মুগ্ধকর, মনে হয় মুহূর্তকালের মধ্যে হলুদ বর্ণের ফুল ফুটেই চলেছে।

বসন্ত

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি শীত পড়ে মধ্য ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই সময় দিনগুলো আলোকময় ও পুষ্পশোভিত হয়ে ওঠে। রাতে এবং সকালে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয় বলে কম্বল, সোয়েটার ইত্যাদি পরতে হয়। এবং ঠিক এই সময়টাই পশ্চিমারা পছন্দ করে বাংলাদেশে বেড়াতে আসতে। বাংলাদেশে এই প্রচণ্ড শীতের সময়টাতে চৌকিদার, দারোয়ান, আনসার, মিলিটারি-পুলিশ, রাতের প্রহরী গায়ে শাল-কম্বল জড়ায়। মাফলার, চাদর, টুপি ইত্যাদি দিয়ে কান ঢেকে এরা রাতে পাহারা দেয়, ডিউটি করে। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্যে এটি প্রকৃষ্ট সময়।

www.pathagar.com

যেসব এলাকা যক্ষ্মাপ্রধান, গরীব মানুষদের সেই বসতি এলাকায় যক্ষ্মার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

নিরোদ সি. চৌধুরীর জন্ম এই মাটিতেই। অক্সফোর্ডে বসবাসরত বয়োবৃদ্ধ এই লেখক তার দেশের আকাশ সম্পর্কে লিখেছেন:

> আমাদের দেশের আকাশ এক পেলব অসীমতা। এ আকাশ উঠে এসেছে মাটি থেকে, চলে গেছে উর্ধ্বলোকের উধাও অজানায়। আমাদের এই মাটির ধরার সবচেয়ে কাছে ঘোরাফেরা করা যে মেঘ– সে কোথাও স্থির নয়– রঙ বদলায় নিরন্তর। সূর্য যখন ওঠে, যখন নামে পাটে– আমাদের মন হলুদ, সোনালি, কমলা, লাল, গোলাপী ও ধূসর রঙের একের পর এক স্তূপ, একের পর এক স্তর– নীলের শূন্যতা পেরিয়ে আমাদের শিশুমন উর্ধ্বগামী হয়। আকাশের নীলও কুসুম পেলব তাও তার তুল্য নয়। মনে হয় যেন গাঢ়, মিহি কুয়াশায় তৈরি হয়েছে আকাশের রঙ। রাতে এই নীলাকাশের গভীরে, উর্ধ্বলোকে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় গ্রহ-তারা, ছায়াপথের নক্ষত্রলোক, নক্ষত্র মেঘ, অশেষ তারকাপুঞ্জ থেকে তারকাপুঞ্জ। আর এমনি করে গ্রহ, রবি শশী তারার জ্যোতির্মণ্ডলীয় মহাবিশ্বে উর্ধ্বারোহণের মন্ত্রে মন হয়ে ওঠে বিদিশার নিশাচর। হেন আকাশের নিচে যে মহাবিস্ময় নিয়ে আমাদের সকলেরই জন্ম, তার মৃত্যু নেই।

বসন্তকালে দেশব্যাপী নানা মেলা বসে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সারা দেশ মেতে ওঠে এই সময়। দেশীয় মেলা, আড়ং ইত্যাদির পাশাপাশি সাধু-সন্ত, পীর-ফকিরদের দরগায় কিংবা তাদের সমাধি ক্ষেত্রে ওরশ, বার্ষিক ইসালে সওয়াব, মিলাদ-মাহফিল ইত্যাদি হয়ে থাকে। ঢাকার বই মেলা, বর্ষবরণ, শিল্পমেলা ইত্যাদির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবীদার। শহীদ দিবস ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে খুব বড় করে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর হাতে নিহতদের স্মরণে ঢাকা হতে ২০ মাইল দূরে সাভার স্মৃতিসৌধে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

লোকশিল্পকলা উৎসব কিংবা গ্রামের মেলা সম্ভবত সবচেয়ে সাড়াজাগানো উৎসব। এসব মেলায় হাতে তৈরি নানা শিল্পসামগ্রী, রঙের কাজের পসরা বসে। গ্রাম্য গীতি– যাত্রা, নাচের আসর জমে ওঠে। মেলা এমন এক জায়গা সেখানে যুবা-বৃদ্ধ, শহুরে-গেঁয়ো, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে জাতীয় সংস্কৃতির তথা মেলায় অংশ নিতে পারে। শিল্পী জাহাঙ্গীর, সামাদ, প্রাণবন্ত সুলতান, রেখা কবিরের শিল্পকর্ম রীতিমতো মুগ্ধকর। এদের শিল্পকর্মে মৌলিকত্ব ও শক্তির যে স্ফুরণ ঘটেছে তা দু'হাজার বছরের ঐতিহ্যের অনুগামী। একইভাবে কবিতাও শক্তিশালী। কবিতা একদিকে যেমন জাতীয় শিল্প, তেমনি বহুমুখী ঐতিহ্যে তা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। আর এই কবিতা অমরত্ব লাভ করেছে নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্‌দীনের হাতে। এছাড়া আছে নাটক, নাচ, কনসার্ট– যা বিশ্বজনীন আবেদন রাখে এবং এই দেশ, দেশের মাটি মানুষের গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলে। এছাড়া প্রতি হপ্তাশেষে অভিজাত ও একান্ত নির্জন কুর্মিটোলা গলফ কোর্সে গলফ খেলা হয়ে থাকে। সেখানে বিজয়ীদের হাতে ইস্পাহানী কাপ, প্রেসিডেন্ট কাপ, কিংবা নানা দেশের রাষ্ট্রদূতদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবর্তিত কাপ উপহার দেয়া হয়। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানগুলোতে যে সুতীব্র উত্তেজনা জমে ওঠে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি এসবের মাঝে কপট আন্তরিকতা ও বাসনার নাটুকেপনাও রীতিমতো চোখে পড়ার মতো। সতর্ক চোখে ধরা পড়ে যায় খেলোয়াড়দের মাঝে কে এরশাদ গলফার। এ নামটি বলাই বাহুল্য, সাবেক সামরিক শাসকের নাম। অনেকে বলেন, প্রাণবান আর খুব নাকি ভাল গলফ খেলোয়াড় ছিলেন এই ভদ্রলোক। ক্ষমতায় থাকাকালে (১৯৮২-৯০) তিনি তাদেরকেই কৃপা বিতরণ করতেন যাদের এই ক্লাবে হাজিরার ব্যাপারটি ছিল নিয়মিতভাবেই নিশ্চিত। অনেকের বর্ণনা অনুযায়ী এই ক্লাবের টাকার যোগান আসত মার্কিন কাজের বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম থেকে ও জাপানের দেয়া সাহায্য থেকে। অথচ এ নিয়ে শরমের বালাই দূরে থাক– এদের ভড়ং আর চালিয়াতি বরং দেখার মতো। (গলফ কোর্সের সুইমিং পুলের ধার বরাবর জাপানি সাহায্য সম্পর্কিত এক ফলকও লাগানো রয়েছে। এটি এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সাহায্য খাতে পাওয়া টাকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধনী দেশের গরীব লোকদের গাঁটের টাকা গরীব দেশের বড় লোকদের পকেট ভরায়– আয়ের স্থানান্তরের চেয়ে এটা বেশি কিছু নয়)। এই ক্লাবের কোনো কোনো সদস্য ক্লাবের কাজ বাগিয়ে নেবার জন্যে খোলা হাতে নিজের পকেটের টাকায় চাঁদা দেন। এই ক্লাব সরকারি ব্যয় এবং পৃষ্ঠপোষকতারই ফল আর এ অর্থের যোগান মূলত আসে বিদেশী সাহায্য-সহায়তা থেকে।

ঢাকা ক্লাবে গলফ হয় না বটে তবে স্কোয়াশ, টেনিস ইত্যাদি খেলা হয়। কিছুটা জীর্ণ ঢাকা ক্লাব-ভবনের সকল সদস্যেরই সমানাধিকার। তারা পেশাগত কারণে যতটা না ক্লাবকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছেন তারচেয়ে বেশি কাজ করেছে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বিকাশ ইত্যাদি। ঢাকা ক্লাবের বর্তমান অবস্থা হেয়ারের জন্যে শোকাবহই হবে। পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্নর হেয়ার সাহেব শাসকবর্গের বিশ্রামস্থল হিসেবে ১৯১১ সালে এই ভবনটি দান করেছিলেন। তার স্বপ্ন ছিল এদেশে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘায়িত হবে এবং বিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা এবং ঢাকা হবে বলে যে জনমত ছিল তিনিও ছিলেন সেই ধারণার একজন অনুগামী।

আজ ঢাকা ক্লাব রাজধানীর গুজব তৈরির সবচেয়ে বড় কারখানায় পরিণত হয়েছে। এজন্যে উপযুক্ত সময় হলো বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে। গুজবের বীজ রোপণ করে সরকারের গোপন পুলিশ অথবা বরাবরের বিরোধী দল। এই গুজব

www.pathagar.com

পানাসক্ত বক্তা কিংবা শ্রোতার অবস্থার উপর নির্ভর করে ডালপালা ছড়ায়। সাংবাদিক, অস্ত্র ব্যবসায়ী, আমলা, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, স্নুকার খেলোয়াড়, কূটনীতিক, গুপ্তচর– এরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সর্বশেষ পরিস্থিতি শোনার জন্যে ঢাকা ক্লাবে আসেন। বিবাহ সংক্রান্ত, ব্যবসা, স্কুলের বন্ধু কিংবা পারিবারিক যোগাযোগ বা আত্মীয়তার পরিচয়ে এরা এখানে জমায়েত হওয়ার সুযোগ পান। ঢাকা ক্লাবের খাবারের বিশেষ সুনাম আছে। বিশেষ করে পোলাও, স্মোক ইলিশ ইত্যাদি। ব্ল্যাক ডগে গলা ভিজিয়ে, সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে দেশের এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়, কখন এই চেষ্টা হয়েছিল বা কি ঘটেছিল এ নিয়ে এন্তার আলোচনা চলে।

বসন্তকালে ফুটবল লীগ শুরু হয়। মতিঝিল থানা এলাকায় অবস্থিত জাতীয় স্টেডিয়ামে ফুটবল লীগ শুরু হয়। মাঠে-ময়দানে বার্ষিক ক্রিকেট শুরু হয়। ক্রিকেট শুরু হয় ধানমণ্ডির পীচে। এটা শিকারেরও কাল। মেঘনায় হাঁস শিকার, হরিণ ও শূকর শিকার চলে সিলেটের হবিগঞ্জ অঞ্চলে। যদিও ১৯৮৯ সাল থেকে এ ধরনের শিকার নিষিদ্ধ। বসন্তের শীতল আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে একটা বিপথগামী দিকও লক্ষ্যগোচর হয়। এ সময় এই জাতির মধ্যে এক ধরনের পাগলামি শুরু হয়ে যায়। রাজনীতি সম্বন্ধে বলতে গিয়েই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। খেলাধুলা এবং মদ্যপান পৃথিবীবাসীর দুটি প্রিয় বিষয় বটে। বাংলাদেশীদের প্রিয় হলো রাজনীতি। একজন মার্কিন নাগরিক যেভাবে প্রত্যক্ষ করে একজন বাংলাদেশী; কিন্তু সেভাবে রাজনীতি প্রত্যক্ষ করে না। রাজনীতিকে বাংলাদেশীরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। এদেশের রাজনীতি হলো ক্ষমতায় আসীন হওয়ার লড়াই। এ এমন এক প্রতিযোগিতা যা সত্যি সত্যি রক্ত ঝরায়। ছাত্র, সমর্থক, প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী রাজনৈতিক কারণে কিংবা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে প্রাণ হারায়। ঢাকা মহানগরীসহ দেশের সর্বত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এই ধরনের সহিংস ঘটনা ঘটে থাকে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগুলোর দ্বন্দ্ব সংঘাত স্কট প্রতিপক্ষদের মতো প্রচণ্ড। আর স্বাভাবিকভাবেই এ কারণে যেসব সহিংসতা ঘটে সেগুলো মাফিয়া মাত্রা ও ব্যাপ্তিতেই ঘটে। আর এতে যে গভীরতা ও তীব্রতার আবেশ, তাড়না তার সাথে কেবল ধর্মযুদ্ধের উন্মাদনারই তুলনা হতে পারে। আর দেখা যায় এ ধরনের সংঘাত সহিংসতা ঘটছে বছরের সবচেয়ে চমৎকার মৌসুমে। এর কারণ রহস্যাবৃত ও ব্যাখ্যাতীত। এভাবেই ১৯৭১-এর বসন্তে রাজনৈতিক বচন বিনিময়ের তাপ এত বেড়ে যায় যে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় অর্ধাংশ বসন্তকালেই স্বাধীনতার ডাক দেয় আর পশ্চিম পাকিস্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যাঙ্ক পাঠায়। তার ফলে শুরু হয় ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের। ভূমিষ্ঠ হয় বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত এখনো থামেনি। বাংলাদেশীদের মধ্যে মতভেদ হয় না। ওরা একে অন্য পক্ষকে ঘৃণা করে। ওরা বিতর্ক করে না কেননা তাতে পটভূমি অভিন্ন হয়ে যাবে। ওরা গণমানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেননা, একটি অতিক্ষুদ্র অভিজাত গোষ্ঠীর বিশ্বাস, বুলি, মেধা– সে তো কেবল তাদেরই একচেটিয়া। অন্যত্র যা হয় এখানেও টাকা ও ক্ষমতাওয়ালার হাতেই ক্ষমতা সুতোর নাটাই। ওরাই পুতুল নাচের দক্ষ কারিগরের মতো ওই নাটাইয়ের সুতো টেনে কিংবা ছিড়ে বিক্ষুব্ধ মহলকে পুতুল নাচ নাচায়। বিক্ষুব্ধদের দলে যেমন থাকতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কিংবা এ দলে থাকতে পারে গ্রামের তরতাজা যুবকের দল, যারা কাওয়াসাকি মোটর সাইকেল চড়ে ভোট কেন্দ্রগুলোতে টহল দিয়ে বেড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও থাকে অস্ত্রসজ্জিত– ওদের সাথে থাকে বন্দুক। মলোটভ ককটেলসজ্জিত সশস্ত্র মাস্তান দল তারা। গ্রামের মাস্তানরা সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে ভোটারদের ওপর পেছন থেকে নজর রাখে আর ভোট কেন্দ্রে হামলার জন্যে তৈরি হয় ব্যালট বাক্স ভর্তি করে দেবার জন্যে।

রাজনৈতিক দুর্নীতি বাংলাদেশে জীবনযাপনেরই অংশ। অনেকেই এ হেন দুর্নীতিতে অংশ নেয়। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো সমস্যা নিরসনে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে তিনদিন ধরে নির্বাচন কমিশনে বসে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করেছিল।

এই বসন্তে রাজনৈতিক ডামাডোলের সময়ে সহিংস ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার মতো ঘটনাও বেশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে মলোটভ ককটেল নিক্ষেপের ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই ঘটনায় ছাত্র গবেষকরা প্রাণের ভয়ে টেবিলের নিচে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে দুই দলের সংঘাতে একজনের নিহত হওয়ার পর অনির্দিষ্টকালের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ১৯৭০, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ সালে অবস্থার এতই অবনতি হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল। বহু পরিবার বাধ্য হয়ে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে পড়াশোনার জন্যে বিদেশ পাঠায়। বাংলাদেশে যেমন হয়, এশিয়ার কোনো দেশে এমনকি ভারতে ছাত্রদের তেমনভাবে রাজনীতির চরম মতবাদে দীক্ষিত করা হয় না। এ কথা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১৯৯১ সালের বসন্তকালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন বেশ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কারণ ছিল, ১৯৯০ সালের এক ছাত্রের নিহত হওয়ার ঘটনায় ছাত্ররা রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। ছাত্ররা তাদেরকে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে হয়েছিল মুখর। ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তনের দাবীতেও ছাত্ররা সোচ্চার হয়েছিল। ছাত্রদের এই দাবী বেশ সাড়া জাগিয়েছিল এবং অক্টোবরে হাজার হাজার লোক এ লক্ষ্যে ঢাকার রাজপথে অবস্থান নিয়েছিল। তারা সেনাবাহিনীকে অগ্রাহ্য করে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে সোচ্চার হয়েছিল। এ কারণে জাতির ২০ বছরের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে প্রথমবারের মতো সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯১ সালে। একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের হাতে নির্বাচনের ফলাফল এই দফায় নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি এরপর আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হাঙ্গামা, গুলিবর্ষণের ঘটনা বহুতর বৃদ্ধি পায়। বিশিষ্ট আইনজীবী সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়েছিলেন বেশ সাহসিকতার সাথে।

বসন্তকাল, এই সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ [যা ঘুরপাক খাচ্ছিল] তা একটি চূড়ান্ত উন্মত্ততায় গিয়ে উপনীত হয়। এ সময়কার দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, গাছে নতুন কুঁড়ি ফুটতে দেখা যায় এবং উত্তর থেকে আগত শকুন বরাবরের ন্যায় শ্যেনদৃষ্টিতে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে।

গ্রীষ্ম

বসন্তকালের শীতল আবহাওয়াতেও প্রতিদিন উষ্ণতা কিছুটা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পহেলা মার্চ থেকে খুব দ্রুততার সাথে গ্রীষ্মের উষ্ণতা শুরু হয়ে যায়। এদেশে বর্ষা ঋতুর বৈশিষ্ট্য হলো পানি, শরতের বৈশিষ্ট্য মাটি, বায়ু এবং গ্রীষ্মকাল মানেই যেন আগুনের হলকা। যদিও বর্ষাকাল শুরু হয় মধ্য জুন থেকে। কিন্তু কিছু কিছু বৃষ্টিপাত এই সময় হয়ে থাকে। বজ্রবৃষ্টি। আসলে এপ্রিল-মে মাসে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়। এই সময় শিলাপাত ঘটে। মুঠি সাইজের এসব শিলা গাড়ির ছাদ বাঁকা করে দেয়। সমুদ্রের জাহাজ এই ঝড়ে যেন আঁকুপাঁকু করে। বিমান চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। মার্চ নাগাদ মাটি ধূসর হয়ে ওঠে এবং এরপর আস্তে আস্তে সাদা বর্ণ ধারণ শুরু হয়ে যায়। নদীতে যান চলাচলের পথ অগভীর হয়ে পড়ে। প্রবাল প্রাচীর ও চড়া থেকে নৌযান বাঁচিয়ে নদীর মূল খাত দিয়ে তা চালিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নাবিকদের বেশ সতর্কতার সাথে কাজ করতে হয়। নদীর তলদেশ থেকে বালু সংগ্রহ করতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে পড়ে শ্রমিকরা। এদেশে পাথরের বালাই নেই। তাই বাংলাদেশে বালুও বেশ দুর্লভ। বালু সংগ্রহকল্পে নদীর মধ্যে নৌকায় নোঙ্গর

www.pathagar.com

করে সেই নৌকার দুইদিকে বাঁশ বা খুঁটি বেঁধে তা নদীর তলদেশ পর্যন্ত স্থাপন করা হয়। বাঁশ ধরে ধরে শ্রমিককে নদীর তলদেশ থেকে বালুভর্তি মাটি তুলতে হয়। নৌকা ভরে না যাওয়া পর্যন্ত নৌকায় বালু ভর্তি করা হয়। ডুব দিয়ে দিয়ে নদীর তলদেশ থেকে এই বালু সংগ্রহ করতে হয়। এই বালু নির্মাণকাজসহ নানা কাজে খুবই প্রয়োজনীয়।

খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনের আগে থেকেই এতদঞ্চলের ইট শিল্পের বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। প্রাচীনকালে নির্মিত রাজধানী গৌড়, মহাস্থানগড়, ময়নামতিতে নির্মিত ইটের ভবনগুলো সহস্র বছর টিকে থাকার গৌরব অর্জন করেছে। ওইসব ভবনের চুন, বালি, সুরকি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাংলাদেশের মোট ইটের পাঁজার বেশিরভাগই ঢাকার আশেপাশেই অবস্থিত। লাল মাটি ইট তৈরিতে প্রধান অবলম্বন। ইট পাথর ও নুড়িপাথরের বিকল্পও। ইটশিল্পে ব্যাপকভাবে মহিলারা নিয়োজিত। বর্ষাকালে জোরেশোরে বৃষ্টি নামার আগে ঠিকার কাজ শেষ করার জন্যে পীচ গলানোর চুল্লির পাশে (সড়ক) নির্মাণ কর্মীরা যখন কাজ করে ওদের গা দিয়ে ঘামের ধারা ছোট ছোট স্রোতস্বিনীর আকারে যেন দরদর করে বেয়ে পড়তে থাকে। গ্রীষ্মের নিদারুণ তাপে গাঁয়ের মাটির ঘরের দেয়ালগুলোতে বড় বড় ফাটল দেখা দেয়। আর ক্ষেতের চাষীমজুররা মাথা ঢাকে টোপ দিয়ে। এদিকে আরো অতিরিক্ত ফসল আদায় করে নেয়ার জন্যে টিউবওয়েল দিয়ে পানি উঠানো হয়। মাত্র কয়েক বছর আগেও গ্রীষ্মে এ ধরনের জমি পতিত থাকত। আর এসব শুকনো উষর ক্ষেতে জমা ধুলো ঘূর্ণি বাতাসের টানে নিজেরাই হয়ে ওঠে ঘূর্ণিঝড়। শহরে কাঁচের আলোর বিচ্ছুরণ, পাকা দালানকোঠা থেকে প্রতিবর্তিত সূর্যের তাপ, ফুটপাতের দাহ দারুণ শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে ওঠে। অবশেষে তখন শেষ বিকেলে যখন মনে হয় এ ধরণী আর সইতে পারবে না, তখন আকাশ কালো হয়ে আসে। ভয়ংকর বজ্রপাতের সাথে বৃষ্টি নামে। সন্ধ্যা ধরেই চলতে পারে কিংবা ঘটনা খারাপ হলে আপনাকে শীতল প্রশান্ত করবে কি, ঝড়, বজ্র, বৃষ্টির পাল্লায়ও পড়তে হতে পারে। এই বজ্রবৃষ্টি এমন প্রচণ্ড হতে পারে যে, মনে হতে পারে ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলসে ওঠা অগ্নি প্রচণ্ড শব্দে আকাশের এপার ওপার লাল সাদা দ্যুতির রেখায় ফেড়ে ফেলছে। আর বিদ্যুৎ প্রভায় গোটা আকাশের নিচে বাংলাদেশ উজ্জ্বল ও স্পষ্ট যা এদেশের আবহাওয়ার একান্ত বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যুৎ বজ্র চমকে ওঠে ধরণীর খুব কাছেই। বাজ গুরু গুরু আওয়াজে বদ্বীপের নদী, সমতল প্রকম্পিত করে, কান কালা করে দেয়ার মতো করে। তার পরের সকালের বাতাস আবার হয়ে ওঠে আরো নির্মল, আবার উত্তপ্ত এবং আর্দ্রও।

এতেও কিন্তু গরম কমে না। গরমে সব মিলিয়ে এক অসহনীয় অবস্থা। উপরে ঘাস, নিচের মাটি ফেটে তা চৌচির, থকথকে পলির চেহারা আজ প্রায় পাথরের

www.pathagar.com

ন্যায়। ফুলের দিকে তাকানো যায় না, গরমে কেমন নিস্তেজ ভঙ্গি, পাখির স্বরে ক্লান্তি। সাইবেরিয়া থেকে আগত সারস, হাঁস, শকুন আবার উত্তরে ফিরে গেছে। মহিষ চোখ দুটো বাইরে রেখে পানিতে ডুবে আছে। গরুর জাবর শুকিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এক অসহনীয় অবস্থা। গ্রামাঞ্চলের মতো শহরের অবস্থাও অসহনীয়।

ঋতু পরিক্রমা

একটি বিশেষ মাসের উল্লেখ ছাড়া বাংলাদেশের ঋতুগুলোর বর্ণনা সম্পূর্ণ হবে না। বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট মাসের সাথে এটি চিহ্নিত নয়, কেননা এই মাসটি ইসলামের চান্দ্র বছরের অন্যতম মাস। এই মাসের নাম রমজান। মুসলমানদের পবিত্রতম মাস। এই রোজার মাসে ১০ বছরের ওপরে বয়সের কেউই ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি কোনো কিছু খেতে বা পান করতে পারে না। এ সময় মানুষের জীবনযাত্রা শ্লথ হয়ে আসে, চিরন্তনের তাগিদ রক্ষায়। রমজানের ভীতি উদ্রেককারী একটি দিক আছে এ কারণে যে, এই মাসে অনুশোচনা, ত্যাগ ও কঠোর বিধির অনুশাসন ও পালনীয়গুলো ইহুদী, কিংবা খ্রিস্টানদের গুড ফ্রাইডের পাপক্ষয়ের তথা অনুশোচনার অনুশাসনের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর। এ মাস যতই গড়িয়ে চলে রোজা-করা মানুষের চেহারা ততই ক্লান্ত হয়। এর আংশিক কারণ উপবাস, আংশিক কারণ ঘুমের মেয়াদ হ্রাস। এ সময় মহানবীর (দঃ) জীবনের আলোচনা-পুনরালোচনা চলে। রোজাদাররা ভোরে কিছু ভাত খায়। পানি পান করে পরের ১২ ঘণ্টা কাটিয়ে দেবার জন্যে।

সূর্যাস্তের সময় সাইরেনে ইফতারের সময়-সংকেত দেয়া হয়। শহর বন্দর গ্রাম সর্বত্রই ইফতারীর একই চিত্র। ইফতারীর কিছু পরে রাতের খাবারের জন্যে বড় ধরনের আয়োজন করা হয়। রমজানে রোজাদারের শরীর-স্বাস্থ্য কিছুটা কৃশ হয়। যাহোক, রোজাশেষে আসে ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতরের ২ মাস ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত হয় ঈদুল আজহা। ঈদুল আজহা উপলক্ষে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি কোরবানীর পশু নানাভাবে সজ্জিত করা হয়। কোনো কোনো পরিবার এককভাবে কোরবানী দেয়, অন্যরা ভাগে কোরবানী দেয়। রোজা শেষে একদিন সন্ধ্যায় লাখো মানুষের চাতক চোখ আকাশপানে তাকিয়ে থাকে নতুন শিশু-চাঁদ দেখা যাবে, রমজানের পরবর্তী মাস সওয়ালের বার্তা নিয়ে আসে সেই আশায়। এ দৃশ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট বা তওরাতের দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু এক্ষেত্রে যা হয় না, তা হলো ঈশ্বর ইব্রাহীমের পরীক্ষা নেন, তার ছেলেকে তার জন্যে কোরবানী করার আহ্বান জানিয়ে। গোটা বিশ্বের মুসলমান গরু, ছাগল, ভেড়া কোরবানী দিয়ে ইসলামী বিধান অনুসারে পশুর গোশত আহার করে। ঈদের এই ভোজ উৎসব

www.pathagar.com

বছরের একটি বড় ঘটনা। কোন ঋতুতে তা উদযাপিত হচ্ছে সেটি কখনো বিবেচ্য বিষয় নয়।

মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে বছরের প্রতিটি দিনই– সে বৃষ্টির দিন হোক কিংবা রৌদ্রকরোজ্জ্বল– মোয়াজ্জিন মসজিদের মিনার থেকে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত আযান দেবেনই। দিনের পাঁচ বেলায়ই ধর্মনিষ্ঠ মানুষ নামাজ পড়ে। পাঁচ ওয়াক্ত প্রার্থনা করে মানুষ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। উদাত্ত আযান এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির যেই হোক না কেন, আযানের সুমধুর ধ্বনি শোনার পর শক্তিশালী, হৃদয় নিংড়ানো আহবানের মূল উৎস কোথায়, কোনখানে সে কথা, সে প্রশ্ন তার মনে একবার উদয় না হয়েই পারে না।

www.pathagar.com

গর্ব ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীনকে ছেড়ে দেয়া জায়গার পরিমাণ দেখে অবাক হতে হয়। এই শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে বাংলাদেশের ইতিহাসের করুণতম বছরটাকে জীবন্ত করে রেখেছেন। সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বছর ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ লোক অনাহারে মারা গিয়েছিল। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, ১৯৪৩ সালের ঘটনা, সেই মন্বন্তরের কথা এখনো অনেকের স্পষ্ট মনে আছে। সেই ঘটনার মানসিক প্রভাব, যারা সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন শুধু তাদের মধ্যেই পড়েনি, পরবর্তী প্রজন্মের উপরও পড়েছে। শিল্পী জয়নুল আবেদীনকে জাতীয় জাদুঘরে এত বেশি [যা তাঁর শিল্পের শিল্পমূলের চেয়ে অনেক বেশি] জায়গা ছেড়ে দেয়ার কারণ, অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশের আজকের যে রূপ সেটার সূত্রপাত ১৯৪২-৪৩-এর ঘটনা থেকে। সেই আকালের পরই ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে ধনী প্রদেশ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রদূত, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, তাকে দুই শতাব্দী ধরে একের পর এক আঘাত হজম করতে হয়েছে এবং এর পরও তার নিজের হিস্যার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছে– অত্যন্ত উঁচুহারে সাম্রাজ্যের খাঁই মিটিয়ে, মুখ থুবড়ে পড়ে এবং আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে।

আজকের বাংলাদেশের, যে দেশ সাহায্য এবং দারিদ্র্যের প্রতীক, এর প্রকৃত সূচনা ১৯৪৩ সালে, লজ্জা ও অপমানে কুঁকড়ে যাওয়া সেই আকালের বছর থেকে, ভারতীয় উপমহাদেশের শীর্ষ অবস্থান থেকে ছিটকে পড়ার বছর থেকে। হোঁচট খেয়ে পড়া এক কথা, আর পড়ে গিয়ে চিড়েচ্যাপ্টা হওয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আবার আছাড় খেয়েছে সে এবং দলিত-মথিত হয়েছে, এমনকি উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও শেষ হয়ে গেছে। এত বেশি মার খেয়ে দেশটা তার বাসিন্দাদের, ভিক্ষার জন্যে হাত পাততে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এই ভিক্ষাবৃত্তি মানহানিকর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর এটা নিয়ে ঢিঁঢিঁ পড়ার মূল কারণ হচ্ছে, হাঁ করে থাকা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সামনে ভিক্ষার জন্যে হাত বাড়াতে হয় বাংলাদেশকে।

www.pathagar.com

এমন এক পৃথিবীর জীবন্ত প্রতিকৃতি এঁকেছেন জয়নুল আবেদীন, যেখানে কাকগুলো হৃষ্টপুষ্ট, তেলতেলে, শকুনগুলোও সুস্থ-সবল। কিন্তু খরা এবং যুদ্ধ চলাকালে, যখন মরতে বসেছিল বাংলাদেশ, প্রচণ্ড খরা এবং ক্ষুধা তাড়া করছিল বাংলাদেশকে, চোখ ঝলসানো রোদে উদভ্রান্তের মতো ছুটছিল হতাশ, বিবস্ত্র, অনাহারী মানুষগুলো– তাদের অনুসরণ করছিল বিভিন্ন শবলোভী পাখির দল।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক জনাব আনোয়ারুল হক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাচ্ছিলেন লেখককে। জয়নুল আবেদীনের প্রতিকৃতিগুলোর পাশেই আনোয়ারুল হকের একটা পেইন্টিং ঝুলানো। ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপকে পারমাণবিক বিস্ফোরণের আদলে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী আনোয়ারুল হক। এই ছবিতে যুদ্ধের ভয়াল রূপ এবং তাঁর দেশবাসীর অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়া কাঠফাটা রোদকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছেন তিনি।

১৯৪৩-এর আগেও দুর্ভিক্ষ হয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু এটাই হচ্ছে দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত ছোবল। গত দুই শতাব্দীতে এই অঞ্চল, যার বেশিরভাগ অংশ নিয়ে আজকের বাংলাদেশ, দুটো ভয়াবহ আঘাত সহ্য করেছে। একটা ১৭৫৭ সালে এবং আরেকটা ১৯১২ সালে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এদেশের শিল্পকারখানা ধ্বংস করে দেয় ব্রিটিশরা। ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয়, সুয়েজ খাল উদ্বোধনের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া এবং ব্রিটিশ স্বার্থ উত্তরে সরে যাওয়ার কারণে, ব্রিটিশ ভারতের ১৫৫ বছরের পুরনো রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী নিয়ে যায়। বাংলার এই রাজধানী হারানো এবং সুদূর নতুন রাজধানীমুখী অর্থপ্রবাহ চালু রাখতে গিয়ে কলকাতা দীর্ঘদিনের জন্যে হীনবল হয়ে পড়ে।

এসব আঘাতের চিহ্ন যখন শুকিয়ে আসছিল ঠিক তখনই, ১৯৪৩ সালে, আসে চূড়ান্ত আঘাত। সেই সময়টাকে যুগসন্ধিক্ষণ বলা যায়। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে ব্রিটিশ ভারত। বার্মা দখল করে বাংলার সীমান্তে হানা দিচ্ছে জাপানীরা। যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে এদেশের অপ্রতুল খাদ্যসামগ্রী, এদিকে 'ভরপেট' ব্রিটিশ সৈন্যে ছেয়ে গেছে সারা দেশ। জাপানীদের হস্তগত হওয়ার ভয়ে দেশের সমস্ত নৌকা হয় ভেঙে ফেলেছে নয়তো ডুবিয়ে দিচ্ছে ব্রিটিশ সৈন্যরা। এর ফলে পুরোপুরি ভেঙে পড়ল এদেশের পরিবহন ব্যবস্থা। এরপর এল খরা আর লাঞ্ছনা– পুরোটাই ঘটল আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের নাকের ডগায়। কাহাতক সহ্য করতে পারে মানুষ!

ভিটেমাটি ছেড়ে শহরের দিকে ছুটল হাজার হাজার মানুষ। কলকাতা পরিণত হলো ঘিঞ্জি শহরে। এককালের সমৃদ্ধ, পরাক্রমশালী বাংলা পৃথিবীর কাছে ক্ষুধার্ত, কঙ্কালসার, হতোদ্যম এক মানব বসতি হিসেবে চিহ্নিত হলো। ১৯০৫ থেকে ১৯১১

www.pathagar.com

সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়েছিল বাঙালিরা। কিন্তু ১৯৪৩-এ কাউকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। নিজেদেরকে নর্দমায় আটকে পড়া এক হতাশ জাতি হিসেবে আবিষ্কার করে। ১৯৪৩ সালেই প্রথম 'বাস্কেট কেস'-এর ছায়া পড়ে বাংলাদেশের উপর। এই কলঙ্কিত বছরেই বাংলার প্রাচীন 'সোনার বাংলা' ভাবমূর্তি, লন্ডনের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলকাতার পরিচিতি চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যায়।

জয়নুল আবেদীনের পেইন্টিংগুলো নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে যে কেউ বুঝতে পারবে কেন ১৯৪৩-এর গ্রীষ্ম শুধু জাদুঘরের স্থায়ী প্রদর্শনীতেই নয় বরং সারা বাংলাদেশেই প্রদর্শিত হয়। খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ সারাক্ষণ দিগন্তে ওত পেতে থাকে এবং ১৯৪৩-এর প্রেতাত্মা ঘুরঘুর করে।

এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচতে ১৯৪৫ সালের শেষদিকে দেশের খাদ্য পরিবহন ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করতে ৫৭,০০০ লোককে চাকরি দেয়া হয়। এই খাদ্য পরিবহন ব্যবস্থাই ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে বড় ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালেও এই খাদ্য পরিবহণ ব্যবস্থাই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। এই স্থায়ী খাদ্য পরিবহন ব্যবস্থা ১৯৭৪-এর স্মৃতির এবং ১৯৪৩-এর গভীর ক্ষতের বাহ্যিক চিহ্ন। এখন যেটাকে বাংলাদেশের 'এইড মেন্টালিটি' বলা হয় তার বেশিরভাগই এই দুর্ভিক্ষভীতির ফলশ্রুতি। এই ভীতি ১৯৩০-এর আমেরিকার 'গ্রেট ডিপ্রেশন'-এর মতো। কারণ, ১৯৪৩ সালেই অত্যন্ত গর্বিত বাংলাদেশ মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। সেই অবস্থা এখনো পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। সেই ঘটনার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আর এক সময় সমৃদ্ধির যে চরম শিখরে ছিল তার কাছে ঘেঁষা তো দূরের কথা, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের আগ পর্যন্ত গোটা ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলা– অহিংস এবং সহিংস দুই ক্ষেত্রেই।

আজকের বাংলাদেশ তার হারানো গৌরব এবং হারানো জীবন দুটোর কথা ভেবেই কষ্ট পায়। সেই সময়টা এতই পুরনো– ওরা একদিন এক গর্বিত জাতি ছিল, সেটা মনে করতে স্মৃতির উপর চাপ দিতে হয়। তারপর ওদের মনে পড়ে, সবসময়ই ওরা এমন ছিল না। একদিন, স্মরণকালেই, তাদের দেশের ঈর্ষা জাগানো জৌলুস ছিল। সমগ্র পূর্ব এবং উত্তর ভারতের শস্যভাণ্ডার ছিল তাদের দেশ। তাদের সম্পদ ছিল মোগল সাম্রাজ্যের চালিকাশক্তি। ব্রিটিশদের ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অর্থের যোগান দিয়েছে এই বাংলাদেশ। বাঙালিরা যদি তাদের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করতে চায়, তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত পুরো ইউরোপের সুতিবস্ত্রের এক-তৃতীয়াংশ তুলা বাংলাদেশ একাই উৎপাদন করেছে এবং

www.pathagar.com

আজ পর্যন্ত মানুষের জানা প্রায় সব ধরনের সুতিকাপড়ের বয়ন প্রণালী এবং রেশম শিল্প তাদের আয়ত্বে ছিল। ষোলশ' শতকে বাংলাকে তার কৃষিজাত পণ্যের উদ্বৃত্ত এবং শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের কারণে 'স্বর্গরাজ্য' বলা হতো, বলা হতো সম্পদের দেশ। ঢাকাই, ম্যানচেস্টার নয়, ছিল সুতি ও রেশম শিল্পের আবাসস্থল। ঢাকায় ব্যবসা করতে আসা ডাচ, পর্তুগীজ, ব্রিটিশ এবং ফ্রেঞ্চদেরকে বাণিজ্যিক শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিত। যেহেতু বাঙালিদের ইউরোপীয় পণ্যের প্রয়োজন ছিল না এবং ইউরোপীয়দের কাছে বাংলার পণ্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল তাই ইউরোপীয়দের নগদে মূল্য পরিশোধ করতে হতো। উনিশ শতকের ব্রিটেনের মতো, এক প্রজন্ম আগের আমেরিকার মতো, আজকের জাপান এবং জার্মানির মতো পৃথিবীর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্য তখন অনুকূল ছিল।

১৯৪৩ সালে হারিয়ে যায় সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীত। তারই আলামত মূর্ত হয়ে উঠেছে জয়নুল আবেদীনের শিল্পকর্মে। নিষ্ঠুর আকাশের নিচে কালচে, ধূলি-ধূসর, খাকি-রঙা বিরান প্রান্তরের গলি-ঘুঁজি দিয়ে এগিয়ে চলা পরিবারগুলোর দিকে তাকিয়ে একই দলকে ইউরোপে বিভিন্ন বন্দী শিবির থেকে ছাড়া পাওয়া কঙ্কালসার মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় বসে পড়েছে অনেকে। তাদের পাশেই অপেক্ষা করছে মরা খেকো, হৃষ্টপুষ্ট কাকগুলো– অপেক্ষা করছে অনাহারী শিশুদের মৃত্যুর। রঙের মনোরম ব্যবহার সত্ত্বেও জয়নুল আবেদীনের পেইন্টিংগুলো বিষণ্ন, ভাবাদর্শ বর্জিত, যার মধ্যে বাংলার ঐতিহ্যের ছিটে-ফোঁটাও নেই। এই মাধ্যমটা কোনো বার্তা সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে না, কিন্তু মানুষের নিরলঙ্কার দৈন্যের জীবন্ত বর্ণনা তুলে ধরে।

বুড়োদের সেই অতীতের স্মৃতিচারণ, তাঁদের চোখেমুখে ফুটে ওঠা আতঙ্ক এবং ১৯৭৪-এর আকালে হাজার হাজার মানুষের করুণ মৃত্যু, ঢাকার রাস্তায় বাপ-মা-মরা ভবঘুরে শিশুদের দুর্দশা দেখা মানুষের মনে জয়নুল আবেদীনের আঁকা নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার নিরাবেগ, অকপট ছবিগুলো ভেসে ওঠে।

জয়নুল আবেদীনের এসব পেইন্টিং পর্যালোচনার পর কল্পনা করা কঠিন হয়ে ওঠে যে, ১৯৪৩ সালের আগের ২৩০০ বছরের লিখিত ইতিহাসে আজকের বাংলাদেশ কখনো এত গরীব ছিল না। এবং ১৯৪৩ থেকেই বাংলাদেশ দীর্ঘদিনের জন্যে ভিক্ষুকে পরিণত হতে থাকে।

প্রাচীন বাংলা

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের, মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের ইটে বসে, যে মহাস্থানগড়ে গৌতম বুদ্ধের পদধূলি পড়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়, যে নগরীর ইতিহাস আদি

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণদের চেয়েও পুরনো, বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধি সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। মহাস্থানগড় মানুষের জানামতে বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো নগরী, প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ। এই নগরীর জাঁকজমকের আন্দাজ করা যায়, মূল নগরীকে ঘিরে রাখা পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত বেষ্টনী দেখে। এই বেষ্টনীর ভেতরে রয়েছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধদের মন্দির, মুসলমানদের মসজিদগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে প্রাচীন বৌদ্ধ মঠ এবং স্টুপা (Stupa)। এগুলোর মধ্যে উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের বিশাল মঠগুলো উল্লেখযোগ্য। নগরীর পূর্বদিকের প্রতিরক্ষা বাঁধের নিচ দিয়ে বয়ে গেছে পবিত্র (হিন্দুদের) নদী করতোয়া। এখনো এখানে স্নানে আসে হিন্দুরা। বিশেষ করে পূর্ণিমার সময়, বাংলা নববর্ষে। একযুগ পর পর, গ্রহসমূহের বিশেষ এবং সমাপতনকালে– নারায়ণী যুগে এখানে স্নান করা হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এখান থেকে সামান্য উত্তরে হিন্দু দেবতা গোবিন্দের মন্দির। এই মন্দিরের সিঁড়ি নেমে গেছে করতোয়ায়।

করতোয়া পবিত্র গঙ্গার একটা শাখা। এক কিংবদন্তী। চাঁদের আলোয় সোনালি হয়ে যায় করতোয়ার কুচকুচে কালো পানি আর সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল নীল। এদেশের সচেতন ইতিহাসের একটা অন্তরঙ্গ অংশ করতোয়া। করতোয়ার জন্ম কম করে হলেও খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। খ্রিস্টের জন্মের ২৫০০ বছর আগে, গৌতম বুদ্ধের ১৯০০ বছর আগে এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর ৩১০০ বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশে তখন মঙ্গোলীয়, অস্ট্রীক কিংবা দ্রাবিড় বংশোদ্ভূতদের বাস। সিন্ধু নদের (Indus River) কাছে, পশ্চিমে, পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো এবং হরোপ্পা সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে পাওয়া নিদর্শন থেকে এই সভ্যতার শিল্প, কৃষি, সম্পদ এবং বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। সেই সভ্যতা তৎকালীন পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য সভ্যতার সমপর্যায়ের ছিল। এই প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে বড় রকমের প্রথম বহিরাক্রমণের পূর্বে তখনকার ভারতের অবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক সূত্র (Clue) পাওয়া গেছে। প্রাথমিক এই কারণে যে, বিজ্ঞানীরা সবেমাত্র সেই জনগোষ্ঠীর রেখে যাওয়া সূত্রগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে শুরু করেছেন। তুলনামূলকভাবে তাদের সম্পর্কে সামান্যই জানা গেছে। তারা তাদের উপলব্ধির সাহায্যে আর্যদের আগমন পূর্ব ভারতের খ্রি: পূ: ১৫০০ থেকে ২০০০ পর্যন্ত জনগোষ্ঠীর স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করছেন। আর এটাই হচ্ছে পৃথিবীর এই অংশের পরবর্তী ইতিহাসের ভিত্তি। এখানকার দালানকোঠার ধ্বংসাবশেষ এবং সেই যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার দেখে বোঝা যায় সভ্যতা, পিরামিড এবং অন্যান্য স্মৃতিসৌধ বাদে তৎকালীন মিশরীয় সভ্যতার সমপর্যায়ের ছিল। আর্যদের আক্রমণের ফলে সেই সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে। সেটাই হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতার যুগসন্ধিক্ষণ।

www.pathagar.com

আর্যরা সঙ্গে করে নিয়ে আসে নতুন ভাষা (সংস্কৃতি), নতুন ধর্ম (বৈদিক হিন্দুবাদ), নতুন সমাজ ব্যবস্থা (শ্রেণী প্রথা) যা আজও ভারতে দোর্দণ্ড প্রতাপে ক্রিয়াশীল। আগন্তুক আর্যদের সংস্কৃতির সঙ্গে মহেঞ্জোদারো ও হরোপ্পার স্থানীয় সংস্কৃতির মিলনের ফলে যে বিস্তৃত সাংস্কৃতিক রূপরেখা (Out Line) তৈরি হয় সেটাই পরবর্তীকালে জন্ম দেয় বৌদ্ধ ধর্মের, বুকে তুলে নেয় ইসলাম ধর্মকে যার ফলশ্রুতি আজকের আধুনিক বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা এবং বার্মা (মায়ানমার)-এর জটিল সমাজ ব্যবস্থার।

আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতির এই মিশ্রণ কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছিল। আর্যদের আদি ধর্মগ্রন্থে (আনুমানিক ১৩০০ থেকে ১৪০০ সালের) দশায়ুস (Dasayus)-এর অথবা নমশূদ্রের (Namasudras) উল্লেখ আছে, সেই কালো অনার্যরা সমাজের বাইরে বাস করত। কিন্তু এরাই ভারতীয় উপমহাদেশের আদি অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী। সম্ভবত আজকের ভারতীয় উপমহাদেশের ৮০ ভাগ অধিবাসীই অভিবাসী এবং 'অস্পৃশ্য'; অর্থাৎ স্থানীয় অধিবাসীদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা অংশ আর্য হানাদার। কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে, আজকের বাংলাদেশীরা সেই নমশূদ্রদেরই উত্তরপুরুষ। এমনকি অধিকাংশ প্রামাণিক গ্রন্থও এই অনার্য জনগোষ্ঠীকে উপমহাদেশের আদি অধিবাসী বলে দাবী করে। এই অনার্য জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ সামাজিক প্রথা প্রাক-আর্য যুগ থেকেই প্রচলিত। ঐতিহাসিক মজুমদারের মতে, "কাজে কাজেই, আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নিতে পারি যে, বাংলার আদি জনগোষ্ঠী বর্ণে ও গড়নে অথবা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল এবং সম্ভবত উভয় ক্ষেত্রেই বৈদিক মতাবলম্বীদের থেকে ভিন্ন ছিল।" এই নৃতাত্ত্বিক পার্থক্যই জন্ম দিয়েছে বাংলাদেশী সংস্কৃতির যেটা আজ দক্ষিণ এশীয় জাতিসমূহের মধ্যে যুক্তি, ব্যর্থতা বা বিরোধিতা সত্ত্বেও অনড় অবস্থান গ্রহণ করেছে। এটা ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথা, ভাষা, লিখিত ব্যবস্থা (Script), ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং মেজাজ– সবগুলোই উপমহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোনায় এসে একীভূত হয়েছে।

যাহোক, ধীরে ধীরে, আর্য সমাজের সঙ্গে আত্মীভূত হয়ে গেছে গঙ্গার নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীরা। আর্য সমাজের উঁচু জাত ব্রাহ্মণ এবং নীচু জাত শূদ্র। যেহেতু আর্যদের জাত প্রথা বর্ণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তাই এই অঞ্চলের আদি অধিবাসী, অপেক্ষাকৃত কালোরা নীচু জাতে ঠাঁই পেল। আজকাল এ ধরনের পার্থক্য দেখা যায় আশরাফ (উঁচু স্তর) এবং আতরাফ (নীচু স্তর)-এর মধ্যে। আশরাফ এবং আতরাফ হচ্ছে পার্সি শব্দ যা রক্তগত পার্থক্য নির্দেশ করে। এর বাংলা প্রতিশব্দ উঁচু শ্রেণী এবং নীচু শ্রেণী; তবে অন্যান্য বিভেদকারী শব্দগুলো রক্তভিত্তিক নয়। যেমন, ভদ্রলোক, ছোটলোক, ইতরজন– যেগুলো শহরের

www.pathagar.com

পেশাজীবী নিম্নমধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এভাবেই বাংলাদেশে অধিকাংশ সাদা চামড়ার লোক পুরনো সেই উঁচু শ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, পেশাজীবী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। নিম্ন-মধ্য শ্রেণী এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে কালো চামড়ার লোকদের প্রাধান্য রয়েছে। অবশ্য ১৯৮০-র দশকে এসে শ্রেণী ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলেই মনে হয়, যদিও বর্ণপ্রথা রয়ে গেছে।

খ্রি: পূ: ৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ আর্য সংস্কৃতির অংশ ছিল। যদিও অনেকে এখনো পূর্বাঞ্চলের বদ্বীপগুলোয় বসবাস করে। উর্ধ্বতন ইংরেজ সরকারি কর্মচারী ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের মতে, "আজকের ব্রাহ্মণরা সম্ভবত ৩০০০ বছরের বংশানুক্রমিক শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ফসল। এরা এমন এক ধরনের মানুষ হিসেবে বিকশিত হয়েছে যা তাদের পারিপার্শ্বিক জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লম্বা, পাতলা, চমৎকার নাক ও ঠোঁটের গড়ন, সুশ্রী চেহারা, বিস্তৃত কপাল এবং অনেকটা নারকেল আকৃতির খুলিবিশিষ্ট আত্মসর্বস্ব পরিশীলিত এক মানুষ– একজন ব্রাহ্মণ।" হান্টারের এই বর্ণনা আজকের বাংলাদেশের উপর তলার হিন্দু এবং মুসলমানদের সঙ্গে মিলে যায়। সম্ভবত অন্তর্জ্ঞান বলে এটা ধরতে পেরেছিলেন হান্টার।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম এ ধরনের 'সন্তান উৎপাদনের' ফলে নির্দিষ্ট একটা পরিশীলিত উৎকর্ষ, ভদ্রতা, পরিমার্জিত আচরণ বাংলাদেশের উঁচু শ্রেণীকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। নীতিগতভাবে এটা প্রাচীন হিন্দু শিক্ষাদীক্ষার ফল। গ্রীক রাষ্ট্রদূত খ্রি: পূ: তৃতীয় শতকে বাংলা ভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, একজন ব্রাহ্মণের জীবনে চারটি স্তর রয়েছে: শিক্ষাজীবন, যুবা বয়সে যখন সে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে; কর্তা জীবন, দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষে যখন সে বিয়ে করে; প্রাক-সংসার ত্যাগকালীন জীবন, যখন সে সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্তে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে এবং জীবনাভিজ্ঞতা এবং জীবনের অর্থ চিন্তায় ধ্যানে বসে; শেষ স্তর সন্ন্যাস গ্রহণ, যখন সে পবিত্র 'ভিক্ষার পাত্র' হাতে গৃহ ত্যাগ করে এবং ভিক্ষা করে পবিত্র জীবনযাপন করে। যখন কেউ বিশ্বাস করে না যে, সব মানুষের জীবনই এরকম এবং যতক্ষণ না সেই কেউ একজন সেরকম জীবনযাপন করে ততক্ষণ এটা পরিষ্কার হয় না যে, শিক্ষার ভাবগত দিক, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব, ভগবত চিন্তা এবং এর প্রতিফলন ও ঐশ্বরিক জগতে প্রবেশ, সবই জীবনের এক একটা প্রয়োজনীয় অংশ এবং এই চেতনাটা এখনো বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষের কাছে সমভাবে শ্রদ্ধেয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বনিয়াদী পরিবারগুলোর এখনো স্থূল বস্তুবাদ এমনকি সম্পদের মোহের প্রতিও বিরূপ মনোভাব রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর যার বেশিরভাগই গরীব এবং গ্রামে বাস করে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বাংলায় ব্রিটেনের প্রথম গভর্ণর (১৭৭১-৮৪) ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাষায়, '... এরা অমায়িক, উদারচেতা এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর।' ১৭৮৭ সালে নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, ঘুষ গ্রহণ এবং প্রতারণার অভিযোগে তাঁর বিচার চলাকালীন পার্লামেন্টের উদ্দেশে এই কথাগুলো বলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, অন্যদের দেয়া বিবরণ অনুযায়ী বাংলাদেশীরা 'নৈতিকভাবে কলুষিত' এটা ঠিক কিনা, এর জবাবে তিনি বলেন, "ঈশ্বরের নামে যে শপথ করেছি সেই শপথ অনুযায়ী আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, এই অভিযোগটা পুরোপুরি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন ... ওদের প্রতি প্রদর্শিত মহানুভবতার প্রতি ওদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম, ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া জুলুমের বদলা নিতে ওরা ততটা তৎপর নয় এবং মানুষের নিকৃষ্টতম সম্পদ কাম, ক্রোধ এবং ঘৃণার ক্ষেত্রে ওরা পৃথিবীর অন্য যে কোনো অংশের মানুষের চেয়ে বেশি দায়মুক্ত।" হেস্টিংসের এই বর্ণনাকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাংলাদেশী গ্রামীণ দুঃখ যত না তাদের দারিদ্র্যের জন্যে তারচেয়ে বেশি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্যে– এর ধারণা রোমাঞ্চকর কল্পনাবিলাসীদের।

আজকের বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশেরও বেশি মুসলমান। এরা প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য থেকে আগত। এই ঐতিহ্য ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব, মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী পাহাড় থেকে ইরান (Iran Ayran, আর্য) পর্যন্ত এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যতদিন না এটা পশ্চিমের সিন্ধু (Idus) ছাড়িয়ে গাঙ্গেয়, যা কাশ্মীরের উত্তর থেকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণে প্রবেশ করে, ততদিন এটা বাংলাদেশের মানুষের জীবন পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয়নি।

হিন্দুরা আর্য ধর্মকে স্থানীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দিলেও তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাসের কিছু কিছু অংশ আর্য ধর্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে কতগুলো হিন্দুধর্মে বিশ্বাস, যেমন– মহামাতার প্রতি ভালোবাসা, নদীর পানির উপর চাঁদের প্রভাবজনিত কারণে– অমায়িক ভক্তির একটা চেতনা, এসেছে নমশূদ্রের কাছ থেকে। এর থেকে বুঝা যায় আজকের যে হিন্দু ধর্ম, যা এই উপমহাদেশে এখনো অস্তিমান, তা প্রাক-আর্য যুগের ধর্মবিশ্বাসের খুব কাছাকাছি। যেমন, ছোট্ট ভেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে তা দেবতার উদ্দেশে ভাসিয়ে দেয়া।

বৈদিক হিন্দুবাদ যখন পূর্ণ বিকশিত এবং সমৃদ্ধির শিখরে তখনই ভারতে প্রথম ইউরোপীয় আক্রমণের সূচনা হয়। মেসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার দি গ্রেট পার্শিয়া

www.pathagar.com

এবং আফগানিস্তান জয় করে, সিন্ধু (Indus) এবং ঝিলাম (Jhelum) পেরিয়ে ভারতের হৃৎপিণ্ডের দিকে এগিয়ে আসেন। বিপদ বুঝতে পেরে পূর্ব ভারতের, গঙ্গার নিম্নাঞ্চলের, স্বাধীন রাজা নন্দ (Nanda) সৈন্য সমাবেশ ঘটায়। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ শতাব্দীর ঘোড়া ও হস্তীবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট এই বিশাল পদাতিক বাহিনী বিপাশা নদীর (Beas River) তীরে আলেকজান্ডারের অগ্রাভিযান থামিয়ে দেয়। প্রখর রোদ এবং পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে কাহিল হয়ে পড়া আলেকজান্ডারের সৈন্যরা গঙ্গাহৃদ্যির (Gangaridae) এই উন্নত সেনাবহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে না জড়াতে অনুরোধ করে। আলেকজান্ডার এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে না জড়িয়ে পিছু হটে যান। এবং আর কখনো ভারত আক্রমণ করতে আসেননি। টলেমির (Ptolemy) মতে এই গঙ্গাহৃদ্যিই গঙ্গার নিম্নাঞ্চলের গাঙ্গেয় বদ্বীপ, আজকের বাংলাদেশ।

এভাবেই বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে। এখন থেকেই পাথরে খোদিত বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস পাওয়া যায়। মহাস্থানের পোড়ামাটির নকশায় এর প্রমাণ রয়েছে। যেহেতু এখনো বাংলাদেশে সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন শুরু হয়নি, আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আরো পুরনো দিনের নিদর্শন পাওয়া যাবে। তবে এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে ইউরোপের ইতিহাসে বাংলাদেশের বিজেতা হিসেবে প্রবেশ।

বৌদ্ধ যুগ

আলেকজান্ডারের ভারত থেকে চলে যাওয়ার কিছুদিন পরই বিহারে এক শক্তিশালী সরকারের আবির্ভাব ঘটে। বাংলার ঠিক পশ্চিমের এই প্রদেশের তখনকার নাম ছিল মগধ। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন আর্যযোদ্ধা চন্দ্র গুপ্ত। চন্দ্র গুপ্ত আলেকজান্ডারের সহযোগী ছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায় এবং চন্দ্র গুপ্ত নন্দ রাজত্বের অবসান ঘটান। কয়েক বছর পর চন্দ্র গুপ্তের পৌত্র অশোক, বহু যুদ্ধের বিজয়ী বীর, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং উত্তর ভারতের মগধ রাজ্যে সেই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। সদাশয় শাসক অশোক মানুষ এবং জীবজন্তুর জন্যে হাসপাতাল নির্মাণের উদ্দেশ্যে তহবিল আলাদা করে দেন। এসব প্রতিষ্ঠানের কয়েকটা বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত টিকেছিল। সমস্ত মগধ রাজ্যে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন রাজা অশোক। এখনো ভারতীয় উপমহাদেশের সম্মানিত রাজাদের একজন রাজা অশোক। আদি বাংলা পাণ্ডুলিপির যে অংশটুকু পাওয়া গেছে সেটাকে স্থানীয় দুর্ভিক্ষ এড়াতে মহাস্থানগড়ের গুদামজাত খাদ্য ব্যবহার করতে দেয়া রাজা অশোকের নির্দেশের একটা অংশ বলে মনে করা হয়।

পরবর্তী কয়েকশ' বছরে, খ্রিস্টীয় যুগের আগ পর্যন্ত, মগধ সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। চতুর্থ শতকে আরেকটা রাজ্য (হিন্দু রাজ্য) প্রাধান্য বিস্তার করে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিস্তারলাভকারী এই সাম্রাজ্যের নাম গুপ্ত সাম্রাজ্য এবং এই সাম্রাজ্য গৌড় ও পুণ্ড্রনগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে এই সাম্রাজ্য কখনো বাংলাদেশের সম্পূর্ণ উত্তরাঞ্চল শাসন করতে পারেনি। এক সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যও দুর্বল হয়ে পড়ে। তারপর বিশৃঙ্খল একটা যুগ পেরিয়ে আরেক স্বাধীন রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে।

ভূখণ্ডের, যেটা পরে বাংলাদেশ হিসেবে নির্ধারিত হয়, বৌদ্ধ যুগে একটা অত্যন্ত সফল ইতিহাস রয়েছে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই ব্রাহ্মণদের চাপিয়ে দেয়া শ্রেণীপ্রথা পছন্দ করেনি। বুদ্ধের শান্তিপূর্ণ দর্শন তাদের জীবন পদ্ধতির সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এরা সহজ-সরল-নিরীহ কৃষক যারা গাঙ্গেয় বদ্বীপের বিপজ্জনক জলরাশিকে জীবনসঙ্গী করে বেঁচে থাকত। খরা ও বন্যায় মর্জিমাফিক চলতে হতো এদের।

এই জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষেরা অনেক আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও রাজা অশোক এবং খ্রিস্টীয় যুগে যারা বাংলায় বসবাস করত তাদের কাছ থেকে দানসূত্রে একটা উত্তরাধিকার পেয়েছে, যে উত্তরাধিকারের ফলশ্রুতি আজকের শান্তিবাদী নম্র স্বভাবের গ্রামীণ বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী। পণ্ডিতদের মতে আধুনিক বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের মধ্যে বৌদ্ধ উত্তরাধিকারের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই একই ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী। বিধবাদের প্রতি আচরণ, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর বিধবাদের ক্ষেত্রে এবং মানুষের প্রতি তাদের ভদ্রতায় ও বদান্যতায় এমন এক জীবন-ব্যবস্থা যেখানে সংঘটিত রাষ্ট্রীয় সমাজসেবার প্রয়োজন হয় না। ব্রিটিশরাও এটা বুঝতে পেরেছিল। তাই ব্রিটিশরা যখন তাদের বিখ্যাত বেঙ্গল আর্মি গঠন করে, উনিশ শতকে, তখন উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেছিল। বাঙালিদের অসামরিক জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এরা সেই কৃষক সম্প্রদায় যাদের সম্পর্কে হেস্টিং বলেছেন, "ভয়ানক কষ্ট স্বীকার করেও এরা জমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে প্রস্তুত ... তাই এরা কষ্টও পায় বেশি।"

মহাস্থানগড়ের (পুণ্ড্রনগর) ক্ষেত্রে, আধুনিক যুগ পর্যন্ত, এটা অত্যন্ত সম্পদশালী এবং প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল যার স্বীকৃতি পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক স্মৃতিকথা, চীনা পর্যটকদের কাছ থেকে এবং সেখানকার জাদুঘর ভ্রমণ করে কিংবা এর উঁচু পাঁচিল সুন্দর উপাসনাগৃহগুলো দেখে। তাছাড়া, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরেই রয়েছে আরেক প্রাচীন নগরী গৌড়। সেখানেও মহাস্থানের সমপর্যায়ের, সম্ভবত মহাস্থানের চেয়েও প্রাচীন, সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। গঙ্গার একটা শাখা বরাবর দশ মাইল বিস্তৃত ছিল এই সভ্যতা। বহু বছর ধরে আদি বাংলার রেশম চাষের, সুতি বয়নশিল্পের, চিনির, কৃষি এবং অন্যান্য পণ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই গৌড়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের বেশিরভাগই এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পড়েছে। গঙ্গা ও করতোয়ার গতিপথ

www.pathagar.com

পরিবর্তনের ফলে মহাস্থান এবং গৌড় পরিত্যক্ত হয়। কারণ এর ফলে এখানকার জনগণের নিত্যব্যবহার্য পানির উৎস নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিবহণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

তারপরও মহাস্থান ও গৌড় একটা টেকসই উত্তরাধিকার রেখে গেছে। এই দুই নগরীর কাছেই গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে মহাস্থান থেকে অল্প কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে জন্মগ্রহণ করেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁর পিতা ছিলেন যোদ্ধা গোষ্ঠীর এক রাজা। উনত্রিশ বছর বয়সে নির্বাণলাভের উদ্দেশ্যে পিতার ঐশ্বর্য এবং সুন্দরী স্ত্রীর সান্নিধ্য ছেড়ে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন গৌতম বুদ্ধ। পার্থিব সুখের গণ্ডি ছেড়ে ভিক্ষার পাত্র হাতে বেরিয়ে পড়েন। তৎকালীন জ্ঞানীগুণীদের সংস্পর্শে আসেন বুদ্ধ এবং সংসার ত্যাগের ছয় বছর পর, হতাশার শেষ প্রান্তে এসে, নির্বাণলাভ করেন। শ্রেণীহীন এক পৃথিবীর অস্তিত্ব ঘোষণা করেন বুদ্ধ। সৎ চিন্তা এবং সৎ কর্মের গুণে পৃথিবীতে সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটবে। নিজেকে চিরন্তন সত্যের মাঝে বিলীন করে দিয়ে, যেখানে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটে, বুদ্ধ বলেন, দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান ঘটানো সম্ভব। তারপর, এক ফোঁটা সুগন্ধির মতো, আত্মার অন্তর্ধান ঘটবে, পিছনে ফেলে যাবে শুধু একটা সুখকর সুবাস। শিষ্যদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন বুদ্ধ। ভিক্ষুকের মতো দ্বারে দ্বারে ঘুরে এরা বৌদ্ধ মতবাদ প্রচার করতে থাকে এবং সুদূর মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক পৌঁছে যায়। এখনো বিশ্বাস করা হয়, সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খ্রিস্টধর্মের চেহারা পাল্টে দিতে পারত কিংবা অন্তত কিছুটা হলেও পরবর্তীকালের আধ্যাত্মিক খারিজত্ব কমিয়ে দিতে পারত।

বাংলাদেশে বুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে বলা যায়– স্বয়ং বুদ্ধ মহাস্থানগড় এবং গৌড়ে এসেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এর কারণ বিহার থেকে গঙ্গা দিয়ে এগুলোর সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা। (বিহারের স্থানীয় উচ্চারণ বিহারা বা Vihara; যার অর্থ, বৌদ্ধ মঠ। রাজা অশোক এবং তার অনুসারীদের দ্বারা ঐ অঞ্চলে প্রচুর মঠ সৃষ্টির ফলে মগধ নামের বদলে বিহার নামের উৎপত্তি।) বুদ্ধ মহাস্থান কিংবা গৌড় ভ্রমণ করুক আর নাই করুক, এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁর কাছাকাছি বসবাসকারী শিক্ষিত, সচেতন, বহু ঈশ্বরবাদী, সাদা চামড়ার বৈদিক হিন্দুদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর, কালো চামড়ার আদিবাসীদেরই বেশি আকৃষ্ট করেছিল তার সাম্যের বাণী। সম্ভবত এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের দ্রুত এবং শক্ত ভিত্তি গড়ে উঠার এটাই মূল কারণ। পরবর্তীকালে অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণও স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

তাছাড়াও, প্রাচীন আর্য দেবতার উপাসনাকারী বৈদিক হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রতি বৌদ্ধ কৃষ্টি সহনশীল ছিল। ধর্মীয় এবং নীতিগত নেতৃত্ব হিন্দুদের হাতেই ছিল।

www.pathagar.com

এমনকি দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং সামরিক নেতৃত্ব ওদের অথবা ক্ষত্রিয়দের হাতে ছিল। বৈশ্য, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, সবচেয়ে নীচু জাত শূদ্রদের (শ্রেণী ব্যবস্থার বাইরে পঞ্চম শ্রেণী হলো নমশূদ্র বা অস্পৃশ্য) উপরও ওদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। নির্দিষ্ট একটা সময় হিন্দু এবং বৌদ্ধ দুটো ধর্মই যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাস্থানগড়ের জাদুঘরে রক্ষিত হিন্দু এবং বৌদ্ধ শিল্পকর্ম দেখে। ৩০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, বৈদিক ব্রাহ্মণরা যখন অটল অবস্থানে ছিল, বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যেটা আফগানিস্তান থেকে শুরু করে পশ্চিমে বার্মা, পূর্বে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া পর্যন্ত; উত্তরে নেপাল, দক্ষিণে শ্রীলংকা পর্যন্ত বিস্তৃত বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটা অংশ। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব যখন তুঙ্গে তখনই এই উপমহাদেশে উক্ত সংস্কৃতি সংহতির ধারণা জন্ম দেয়। মহাস্থানে পাওয়া দুই হাজার মাইল দূরের, পশ্চিম পাকিস্তানের গান্ধরায় (Gandhara) বসবাসকারী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত ২০০ খ্রিস্টাব্দের ধাতব মুদ্রা এবং মূর্তি সেই ব্যাপক সংহতির ইঙ্গিত দেয়। এই সংহতি একাদশ শতকে গজনীর মুসলমান সেনাপতি সুলতান মাহমুদের অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত টিকেছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম শুধু আর্য এবং স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যেই সংহতি স্থাপন করেনি, এই অঞ্চলে অভিযানকারী অন্যদেরও একীভূত করেছিল। এদের মধ্যে রয়েছে বুদ্ধের জন্মের ৮০০ বছরের মধ্যে উত্তর থেকে আসা শ্বেত-হূনদের বংশধর বলে অভিহিত লোকেরা এবং বলা হয় সম্ভবত এই কারণেই তাঁর মতবাদের দ্রুত প্রসার ঘটেছিল। এই হূনদের উত্তরসূরীরা মহাস্থানের ঠিক উত্তরে কুচবিহার (Cooch Bihar) রাজ্যে বসবাস করত। বাংলাদেশের জেলাশহর রংপুরে এখনো এদের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের বলা হয় কুচি (Kochis)।

মনে হয় বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক সাধনা (Tantric Practice), গুপ্ত যৌন আচারানুষ্ঠান (যা কেবল বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্তদের জন্যে প্রযোজ্য ছিল), হূনদের কাছ থেকে অথবা আরো আগের এবং সুদূর গ্রীকদের কাছ থেকে এসেছে। কারণ এ সময় সেলজুকরা (Seleucids), ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক ডাইনেস্টি, পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং গান্ধরার রাজধানী তক্ষশিলায় (Taxila) অ্যাথেন্সের পার্থেনিয়ান ধাঁচে নির্মিত হয়েছিল অ্যাথেনার মন্দির। লোককাহিনী অনুযায়ী যীশুর বারো শিষ্যের একজন, থমাস (Thomas), খ্রিস্টীয় প্রথম শতকেই তক্ষশিলা সফর করেছিলেন।

রাজা কনিষ্কের (Kanishka) বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণও ছিল বৌদ্ধ ধর্মের আরেক মাইলফলক। রাজা কনিষ্ক সম্ভবত প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে গান্ধরা বিজয়ী উত্তরাঞ্চলীয় হূন উপজাতির লোক ছিলেন। বৌদ্ধদের মাঝে অনেক ভিন্ন মত রয়েছে এটা জানতে পেরে রাজা কনিষ্ক সমস্ত পৃথিবীর বৌদ্ধদের (বৌদ্ধ পণ্ডিতদের) এক

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ কাউন্সিল আহবান করেন এবং তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে বলেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে মহাযান বৌদ্ধ মতবাদ (Mahayana Buddhism)। বৌদ্ধ ধর্মের এই মতবাদই চীন এবং তিব্বতে গৃহীত হয়েছে এবং জাপানে জৈন বৌদ্ধবাদ (Zen Buddhism)-এর উদ্ভব ঘটিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের এই মতবাদই বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তবে লাগোয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশগুলোর এবং আরো পূর্ব থেকে আসা তীর্থযাত্রীর কাছে এই মতবাদ শিক্ষার প্রধান বিষয় হিসেবে পরিণত হয়। আনুমানিক সাত শতকে চীনদেশীয় এক বৌদ্ধ ভিক্ষু হুয়েন সাং (Huien Tsang) বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেন। এই দলিল কোনোভাবে প্রাচীনকালেই জাপানে চলে যায় এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই দলিল বাংলায় ফিরিয়ে আনা হয়।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সশরীর উত্তরাধিকার তিন তিনটা প্রধান বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ। প্রথমটা হচ্ছে মহাস্থানের ভাসু বিহার (Vasu Bihar)। বৌদ্ধ ভিক্ষু হুয়েন সাং এটাকে পো-চি-পো (Po-shi-Po) বলে উল্লেখ করেছেন। এই মঠের বিশাল দুটো দালান থেকে সবুজ ফসলের মাঠ আর খড়ের ঘরের গ্রামগুলোকে ছবির মতো মনে হয়। এই দালান দুটোয় ছয়শত ভিক্ষু বাস করত। এছাড়া এখানে রয়েছে মাটি-উঁচু-করা ক্রুশাকৃতির এক বিশাল ঢিবি যার মধ্যে রয়েছে আশ্রম স্থাপত্যে নির্মিত ছোট ছোট কুঠুরী। বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ এবং নলকূপের ইঞ্জিন এই মঠের নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং প্রশান্তি নষ্ট করে ফেললেও এই মঠে ভিক্ষুদের নির্জন আবাসস্থলের আমেজ এখনো টিকে আছে।

এর প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরেই পাহাড়পুর। এখানে রয়েছে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পাল রাজাদের আমলে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতকে গৌড়ে শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে পাল রাজারা। সময়টা পশ্চিমের চার্লিম্যানেগি (Charlemanage)-র দু'শ বছর আগের এবং জাপানে সূর্য দেবতার (Sun God) উত্থানের সমসাময়িক। তিব্বত থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলে পাহাড়পুরের যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। ভাসু বিহারের মতো লাল ইট আর পোড়ামাটির সত্তর ফুট (প্রায় সাততলা দালানের সমান) উঁচু ঢিবির উপর ন'শ' ফুটেরও বেশি লম্বা ক্রুশাকৃতির বাহুসম্বলিত এই বিহার। এই বিহারের দৃষ্টিনন্দন কাঠামো এবং এর জাদুঘরে রক্ষিত বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন পাহাড়পুরকে সুদূর অতীতের এক সুন্দরতম স্মৃতিসৌধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পাহাড়পুর থেকে সোজা ৮০ মাইল দূরে ময়নামতি। ময়নামতিতে রয়েছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ধ্বংসাবশেষ। এই বিহারও পাল যুগেই নির্মিত হয়েছিল। এর

www.pathagar.com

প্রধান আকর্ষণ বৌদ্ধের ত্রিত্বে উৎসর্গীকৃত তিনগম্বুজের স্টুপা (Stupa)। ত্রিত্ব হচ্ছে- বুদ্ধ (নির্বাণপ্রাপ্ত), ধরম (পথ) এবং সংঘ (ভ্রাতৃত্ব)। এই বিহারে আরো বড় বড় ইটের তৈরি মঠ রয়েছে, রয়েছে একটা পুরো শহর, প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং অন্যান্য দালানকোঠা।

তিব্বতীয় ঘটনাপঞ্জী অনুযায়ী চতুর্থ প্রধান বৌদ্ধনিবাস, পণ্ডিত বিহার (Pandit Vihar) ছিল আজকের চট্টগ্রাম। এখন আর সেটার অস্তিত্ব নেই। হয় তার উপর কোনো হিন্দু মন্দির উঠেছে কিংবা মসজিদ তৈরি হয়েছে কিংবা পুরোপুরি সাফ হয়ে গেছে।

এখনো টিকে থাকা তিনটা প্রধান বৌদ্ধ মঠ এবং ঢাকা ও দিনাজপুরের ছোট ছোট মঠগুলো মনে করিয়ে দেয়, অনেক অনেক বছর আগে, গোটা ইউরোপ যখন অন্ধকারে ডুবেছিল, তখন বাংলাদেশে এক উন্নত সভ্যতা বিরাজ করছিল। যে সভ্যতা তার মনোজাগতিক চিন্তা-চেতনায় এবং অপরাপর শিল্পকলায় উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। তখন এ অঞ্চলের পণ্যসামগ্রী বঙ্গোপসাগরের নৌ-বাণিজ্য পথ ধরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সুদূর ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৌঁছত। তাছাড়া ভারতের কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমাঞ্চলের উৎপন্ন কার্পাস তুলা বাংলায় বয়ন হতো, গৌড়ের নিকটবর্তী মালদহের (Malda) এবং মহাস্থানের রেশমি পণ্য সমস্ত উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। তখনো পর্যন্ত এই অঞ্চল ছিল নতুন আর্য-বাঙালি সংস্কৃতির সীমান্ত অঞ্চল। এই অঞ্চলের বেশিরভাগই ছিল জঙ্গল, বাঘ এবং হাতীর আস্তানা। তারপর জঙ্গল পরিষ্কার করে অধিকহারে কৃষিজমি অবমুক্ত করতে থাকে এখানকার কৃষক সম্প্রদায়। উৎপন্ন হতে থাকে চাহিদা থেকে অনেক বেশি পরিমাণে ধান। এক সময় এই বাড়তি চাল সমস্ত উপমহাদেশে রপ্তানি শুরু হয়। এর ফলে উপমহাদেশে এই অঞ্চল ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৩ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ চাল রপ্তানিকারক দেশ ছিল।

হিন্দুত্বে ফিরে যাওয়া

বৌদ্ধ আধিপত্যের যুগে বৈদিক হিন্দুবাদ, প্রাক-বৌদ্ধ শান্তিবাদী উপদল, জৈনবাদ (Jainism) একেবারে ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু এগার শতকের দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষ করে আর্য-বৈদিক মতবাদ তার শারীরিক, মানসিক এবং আবেগের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য সৃষ্টির মাধ্যমে বৌদ্ধ এবং স্থানীয় বিশ্বাসীদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

মূল হিন্দু মতবাদ আর্যরা (মধ্য এশিয়ার উপজাতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে এরা সম্পর্কিত এবং সমসাময়িককালেই তাদের আরেকটা অংশ ইউরোপে বসতি স্থাপন

www.pathagar.com

করেছিল) সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তাদের ভাষা এবং গণনারীতি প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মতো ছিল। ওদের দেবতা ছিল জুপিটার (Jupitar), জিউস (Zeus) এবং অ্যাপোলো (Apollo)-র অনুরূপ। এদের সুশৃঙ্খল পণ্ডিত শ্রেণী গ্রীক অ্যাকাডেমীর জ্ঞানীদের স্মৃতিবাহী ছিল। এদের সৈন্যবাহিনীও ছিল রোমানদের অনুরূপ। গ্রীকদের মতো আর্য বিজেতারাও নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিল না, যদিও এরা শ্রেণীপ্রথা প্রচলন করেছিল। সেই শ্রেণীপ্রথা ছিল বর্ণভিত্তিক। ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়ে ওরা অতিমাত্রায় আন্তর্বিবাহে অভ্যস্ত হয় এবং নিজেদের জীবন পদ্ধতি ধরে রাখে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য– এরা সবাই 'দ্বি-জন্মা'। যাহোক, শ্রেণী যেহেতু বর্ণের ভিত্তিতে নির্ধারিত, স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষাকৃত কালো বর্ণের স্থানীয় 'এক-জন্মা' জনগোষ্ঠী সমাজের নীচু স্তর, সমাজের পা হিসেবে গণ্য হলো। অন্যদিকে নারীর প্রতি আর্যদের আচরণ ছিল যথেষ্ট সংযত। বলির জন্যে শুধু ষাঁড় এবং ঘোড়াকে নির্ধারিত করে দিল আর্যরা। এদের ব্রাহ্মণেরা শিক্ষার চর্চা করত। এর মধ্যে ছিল বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং আইন। আর্যদের শ্রেণীপ্রথা বিভিন্ন পেশা-গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সামাজিক বিন্যাস নিয়ে আসে। আর্যরা নরবলিতে বিশ্বাস করত না। ওরা সতীত্ব এমনকি উদ্ভট গুপ্ত যৌন ক্রীড়ার সঙ্গেও জড়িত ছিল না।

হিন্দুরা চার সারবস্তুতে (Core) বিশ্বাসী ছিল। প্রথম, যেটা অনেক মুসলমান এবং বৌদ্ধ বাংলাদেশীও বিশ্বাস করে, নদীর পবিত্রতা; দ্বিতীয়, গাভীর পবিত্রতা; তৃতীয়, বর্ণের ভিত্তিতে শ্রেণীভেদ এবং চতুর্থ, চতুর্বেদ (Vedas)।

তবে আর্যরাও পুরোপুরি অহিংস ছিল না। এমনকি স্বয়ং বুদ্ধও হিন্দু নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। এভাবেই, তাঁর জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া এবং স্রষ্টার কাছে সকল মানুষই সমান, এই বিশ্বাসের প্রেরণা এসেছে প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস থেকে, যেটা আগে থেকে জৈনরা প্রচার করে আসছিল। এখনো এই জৈনরা শান্তিপূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবে টিকে আছে যাদের দর্শন অহিংস। এই দর্শনই মহাত্মা গান্ধীকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তাঁর মাধ্যমে মার্টিন লুথার কিংকে।

হিন্দুধর্মের এই দিকটা এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মতবাদ গ্রহণ এবং রূপান্তর বাদ দিলে, সুনীতি ভূষণ কানুনগো (Suniti Bhushan Qanungo)-র (বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী) ভাষায়, এসব মঠকে শুধু যুক্তিতর্কের ফোরাম হিসেবে ধরে নিলে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, বৌদ্ধ ধর্মের শক্তিমত্তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসার সাথে সাথে (নবম, দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম যখন ক্ষীণ জ্যোতি হয়ে আসছিল) দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটছে। পুনরুজ্জীবিত এই হিন্দুবাদের ভিত্তি হচ্ছে ভগবানের ত্রিত্ব– ব্রহ্মা (Brahma) স্রষ্টা; শিব (Shiva)

www.pathagar.com

ধ্বংস এবং বিষ্ণু (Vishnu) ত্রাণকর্তা। এই মতবাদে স্রষ্টার ব্যক্তিক রূপ (Personal/ concept) দেয়া হয় যেটা প্রাক-বৌদ্ধ বৈদিক যুগের একটা ধারণা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টার ব্যক্তিক রূপদান নিরুৎসাহিত করা হতো।

ভগবানের ত্রিত্বে বিশ্বাস জোরদার করতে যেয়ে এই মতবাদ দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। শিবের নামে সৃষ্টি হয় শিবায়েত (Shivaite), যার ভিত্তি হচ্ছে শক্তি। গরীব-ধনী সব হিন্দুই এটা মেনে চলে। অপরটা বিষ্ণুবায়েত (Vaishnavite) যেটা বিষ্ণুর নামানুসারে সৃষ্টি। এই মতবাদ বা ধারা অনেক বেশি শান্তিকামী, বৌদ্ধ আদর্শে অনুপ্রাণিত (Inspired)। মধ্য শ্রেণীর এই মতবাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে ভক্তি। নবম শতকের দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত শংকরের (Shankara) শিক্ষা ছিল দুটোর প্রতিই সমান বিশ্বাস স্থাপন। এই পণ্ডিত আধ্যাত্ম চিন্তার বেদান্ত (Vedanta) শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই আধ্যাত্মবাদ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্যের ভিত্তি হিসেবে একমাত্র বিমূর্ত স্রষ্টাকে নিরূপণ করে এবং মানুষকে আত্মায় স্রষ্টার স্ফুলিঙ্গবাহী সৃষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে।

শংকরের শিষ্য ব্রাহ্মণ রামানুজ (Ramanujan) বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বিষ্ণুবায়েতে দীক্ষিত করেন। পরবর্তীকালে এই মতের পঞ্চম গুরু রামানন্দ (Ramananda) এই মতবাদ বেনারস নিয়ে আসেন। এখান থেকে তাঁর শিষ্য কবীর (Kabir) এই মতবাদ বাংলায় নিয়ে আসেন। সাধারণভাবে বিষ্ণুবায়েত এই ধারণার সৃষ্টি করে যে, বুদ্ধ হচ্ছেন বিষ্ণুর নাম অবতার। অবশ্য এই মতবাদ সৃষ্টির ধ্বংস এবং মাত্রাতিরিক্ত শ্রেণীবৈষম্য দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এই আন্দোলনের ফলে অনেক বৌদ্ধ কৃত্যানুষ্ঠান বিষ্ণুবায়েতে ঢুকে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নারীর প্রতি শিবায়েতদের চেয়ে বিষ্ণুবায়েতের অনুসারীদের অধিক সম্মান প্রদর্শন। আর এ কারণেই উপমহাদেশের অন্য যে কোনো অংশের চেয়ে বাংলাদেশের নারীরা স্বাধীনতা ভোগ করছে বেশি।

এই নব্য হিন্দুবাদের একটা ভিতরের দিকও রয়েছে। সেটা হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনা (Tantric Practices)। এই তান্ত্রিকতার সংযোজন বিশেষ করে অপশক্তি কালীর অভ্যুদয় বাংলাদেশে নতুন হিন্দুবাদের এবং নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কালী হচ্ছে শিবের স্ত্রীকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে অংকিত একটা কুৎসিত প্রতিকৃতি। কালী এখনো বাংলাদেশে এক ভীতিকর দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গলায় নরমুণ্ডের মালা পরা মৃত শিবের উপর পা দিয়ে দাঁড়ানো। কালী ভক্তদের, যারা দেবতাকে শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখতে চায়, আহবান জানায়। আজকাল কদাচিৎ কালী মন্দিরে রক্ত উৎসর্গ করা হয়, কিংবা কালীর কতগুলো আচারানুষ্ঠানে রক্তের প্রয়োজন হয়। সেসব আচারানুষ্ঠানে কামোত্তেজনা সৃষ্টি এবং নেশা করা হয়।

www.pathagar.com

অবশ্য শুধু তন্ত্র সাধনাই এই ভালোবাসার মতবাদকে শক্তিশালী করেনি। এই মতবাদের প্রসার ঘটিয়েছে বিষ্ণুবায়েত শিক্ষাকেন্দ্রগুলো। শুধু যৌন আচরণের মাধ্যমেই নয় বরং ভগবানের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা সামগ্রিক বোঝাপড়া সৃষ্টির মাধ্যমে। বিষ্ণুবায়েত শিক্ষার একটা শাখা, যেটা উগ্রপ্রেমের মধ্যে প্রোথিত, যে প্রেম কৃষ্ণের, যা কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জৈবিক প্রেম। কৃষ্ণের এই সরলমতি প্রেমলীলার রূপকথা প্রেমের প্রতি মানুষের কাব্য দৃষ্টি উন্মোচন করে। আগ্রহ জাগিয়ে তোলে সেই অঞ্চলের মানুষের প্রতি, সেই অঞ্চলের প্রতি।

একই সঙ্গে শংকরের দর্শন বেদান্ত (Vedanta) বাংলাদেশে ধর্মমতের একটা বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করে। ততদিনে হিন্দু মতবাদের শিক্ষালয়গুলোতে টোল (চতুষ্পাদী) চালু হয়েছে। এ ধরনের একটা শিক্ষাকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ভাগীরথী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। মহাভারত, রামায়ণ এবং এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভগবান কৃষ্ণের গুণাবলী আলোকপাত করতে থাকে। এটা হিন্দুবাদের দুটো দিক উন্মোচন করে : জনন (Janan) এবং তি (Ti)। প্রথমটা হচ্ছে ধর্মের দার্শনিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দিক যার সাহায্যে বোঝাপড়া সৃষ্টি হয় এবং নির্বাণ লাভ করা যায়। দ্বিতীয়টা হচ্ছে আবেগ সৃষ্টিকারী দিক। শংকর এবং তাঁর প্রথমদিকের শিষ্য কবীর (Kabir) এবং চৈতন্যের (Chaitanya) বাংলার প্রভাব বৌদ্ধ প্রভাবের মতোই স্থায়ী হয়েছে। বাংলাদেশের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের পুরীর বৌদ্ধ কৃত্যানুষ্ঠানগুলোর রূপান্তর ঘটান চৈতন্য। এই পরিবর্তিত রূপটা হচ্ছে জ্ঞান-কর্ম ব্যতিরেকে শুধু ভক্তি সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করার মতবাদ, ভক্তিমার্গ। এর প্রভাবেই পরবর্তীকালে বাঙালি মধ্যম শ্রেণী তাদের আচার-আচরণে নমনীয় এবং মার্জিত ভাব পেয়েছে। এই ভক্তিমার্গ স্থানীয় প্রার্থনা প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যেটা এখানকার বৌদ্ধ প্রভাবের প্রতিফলন। ভক্তিমার্গীয়দের ঈশ্বর পূজার একটা ভিন্নতর দিক ছিল– যেমন, দুর্গাপূজা। এখান থেকেই দুর্গাকে শিবের স্ত্রী হিসেবে, স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে এবং দুর্গা ভক্তি পেতে শুরু করেছে, যা এখনো বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত।

এখানে বলা দরকার যে, নতুন সংকরীয় হিন্দুত্বে, যেখানে স্বর্গের ধারণা অনুপস্থিত, কিংবা যেখানে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি শুধু অফুরন্ত পুনর্জন্মের জন্যে। কিংবা বুদ্ধের মতো আত্মার পুনর্মিলন, সত্যের সমুদ্রে আত্মার বিশ্লেষণ। সুখ-দুঃখের চক্র থেকে বেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা এবং যে মুক্তির অর্থ স্বরূপের অবলুপ্তি।

এগার শতকের দিকে, সেন আমলে, বিষ্ণুবায়েত এবং শিবায়েত বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এই হিন্দু সেনরা বৌদ্ধ পালদেরকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার

www.pathagar.com

করে। পরবর্তী দু'শ' বছর রাজ সমর্থন হারিয়ে এবং নিষ্ঠুর হিন্দু সেনদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ম্লান হয়ে যেতে থাকে। অবশ্য দেশের মধ্যাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত, ১৩০০ সাল পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম টিকেছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে, চিটাগাং-এ এখনো উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ সংখ্যালঘু বাস করছে। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মের সেই প্রায়-বিলুপ্ত কালের একটা অবশেষ যোগী নাথ (Yugis Nath) একটা তান্ত্রিক গোষ্ঠী।

সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটতে থাকে এবং আধুনিক হিন্দুবাদ তেরশ' শতাব্দীর সেই হিন্দু সংস্কারবাদ থেকে উদ্ভূত। সেন আমলে আজকের বাংলাদেশের, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, অস্তিত্ব ছিল না। নৃতাত্ত্বিক, ভাষাগত এবং ধর্মীয় দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত থাকলেও বাংলাদেশ অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গঙ্গা বরাবর উত্তর-পশ্চিমে বরেন্দ্র নামে একটা অঞ্চল ছিল। মালদা (Malda), মহাস্থানগড় ও গৌড়সহ বরেন্দ্র নামে একটা অঞ্চল ছিল। উত্তরে শিলং পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই বরেন্দ্র অঞ্চল। দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর উপত্যকা, তারপর গঙ্গার মূল শাখা বরাবর রাঢ় (Radha)। যেটা বর্ধমান, নদীয়া এবং বর্তমান কলকাতা থেকে পুরী পর্যন্ত বিস্তৃত। বরেন্দ্রর দক্ষিণে এবং রাঢ়'র পূর্বে ছিল বঙ্গ (Vanga), যা ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে উত্তরে রয়েছে হরিকেল (Harikela) এবং দক্ষিণে চিটাগাং এবং ময়নামতিকে ঘিরে ছিল সমতট (Samatata)। সমতট এবং বঙ্গের মাঝে রয়েছে ত্রিপুরা (Tipperah), যেটা এখন নোয়াখালী এবং কুমিল্লাকে বেষ্টন করে আছে। উত্তর এবং পূর্বে কামরূপ (Kamrup) এখন ভারতের আসাম প্রদেশ এবং সমতটের দক্ষিণ সীমান্তে ছিল বার্মার আরাকান।

এমনকি সেনরা যখন গোটা বাংলা, রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র এবং সমতট শাসন করে তখনও এই বিচ্ছিন্নতা ছিল। যাই হোক, সেই সময়ে বাংলায় একটা স্বাতন্ত্র্য বোধ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যারা টিলায় (Mound) বসবাস করত। সেই টিলায় বসবাসকারী সম্প্রদায়কে বঙ্গ বলা হতো আর আইল (Ail) হচ্ছে বিভক্তি রেখা। সাধারণ বার্ষিক বৃষ্টিপাত এবং বন্যা এড়াতে এই বদ্বীপের বাসিন্দাদের উঁচু টিলায় ঘর বাঁধতে হতো। অবশ্য বিহারের অঙ্গজ (Angas), উড়িষ্যার উড়ি (Oryas) এবং বঙ্গজ (Vangas)-দের থেকে এরা নিজেদের আলাদা ভাবত এবং আজকের 'পূর্বদেশ'-এর যে ধারণা সেটা তখন থেকেই অস্তিমান ছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম, মোগল এবং ব্রিটিশ শাসনামলে রাঢ়ের সম্পূর্ণ মধ্যাঞ্চল, বরেন্দ্র, বঙ্গ, হরিকেল উপত্যকা, সমতট, ত্রিপুরা, বিহার এবং উড়িষ্যা নিয়ে বৃহত্তর বাংলাদেশের ধারণা দানা বাঁধে। কিন্তু ১৯১২ সালে খোদ বঙ্গকেই দু'ভাগ করে দেয় ব্রিটিশরা এবং

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা যখন ভারত ত্যাগ করে তাদের তখনকার নীতির কারণে বাংলা পুনরায় বিভক্ত হয়। যার ফলশ্রুতি মালদহ, নদীয়া এবং কলকাতা আজ ভারতের অংশ।

সেন শাসনামলে ভারতের সমগ্র উত্তর-পূর্ব কোনা একত্রিত ছিল। এর নাম ছিল গৌড়। এই অঞ্চল বেনারস থেকে বিহারের পাটনা হয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত এবং পূর্বে চিটাগাং পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিমালয়ের গোড়া দার্জিলিং এবং শিলং থেকে উড়িষ্যার পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত সেই রাজ্য চাউল উৎপাদনে এবং এর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকা নারকেলের জন্যে বিখ্যাত ছিল। তখন মহিষ দিয়ে জমি চাষ করা হতো এবং গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কর্ণফুলী নদীর পানি এসব জমির সেচকার্যে ব্যবহার করা হতো। তখন সেই অঞ্চল বস্ত্রশিল্প, রেশম, সুতি পোশাক, ফল, উদ্বৃত্ত চাল, মসলা, যবক্ষার, সীসা, কয়লা, পাট, নৌকা, নৌবিশারদ, ব্যাংক এবং বাণিজ্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এ অঞ্চলের প্রাচীন শহর ছিল ঢাকা, গৌড়, বেনারস ও পাটনা। চিটাগাং এবং উড়িষ্যা ছিল সমুদ্রবন্দর। নৌপথে আসাম, কুচবিহার ও নেপালের সঙ্গে এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে সমগ্র উত্তর ভারতের সঙ্গে সেই অঞ্চলের নৌ-বাণিজ্য ছিল। বাংলার 'সোনার শহরের' নাম শুনেছিলেন মার্কোপোলো আর বাংলার সম্পদের কথা নিজ ডাইরীতে লিখে গেছেন। গ্রীক ভূগোলবিদ টলেমি (Ptolemy) গৌড়কে বলেছেন 'সোনার বাংলা'।

সেন আমলে গৌড়, যা এক সময় বৌদ্ধ পাল রাজাদের রাজধানী ছিল, সারা বাংলার বুদ্ধিবৃত্তির এবং বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল। গৌড়ের রেশমশিল্প তখন খুবই উন্নত ছিল। এত মিহি রেশম তন্তু তৈরি হতো গৌড়ে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের জনৈক ব্রিটিশ পর্যবেক্ষকের মতে, সেসব কারিগরের মৃত্যুর পর কখনো সেগুলোর অবিকল নকল তন্তু তৈরি করা সম্ভব হয়নি। অনেকের বিশ্বাস এখানে প্রচুর পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হতো বলে এর নাম হয়েছে গৌড়। অবশ্য তখন থেকেই বাঙালি মিষ্টির উদ্ভব এবং এখনো এ মিষ্টিদ্রব্য ভারত-সেরা। তাছাড়া এখনো বাংলাদেশে এমন কোনো হাট-বাজার নেই যেখানে মিষ্টির দোকান নেই।

এভাবে বাংলা যখন বরেন্দ্রযুগে সমৃদ্ধির চরম শিখরে অবস্থান করছে, তখন এর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের স্থানীয় জমিদাররা একটা নতুন কর-পদ্ধতি উদ্ভাবন করে, যে পদ্ধতি বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। রাজশাহীতে রয়েছে বরেন্দ্র মিউজিয়াম। এই মিউজিয়াম সেনযুগের হিন্দু পুনর্জাগরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে রাজশাহীর দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল, যা বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ১২ মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রাচীন নগরীর চারপাশে মাইলকে মাইল আমবাগান। এই আমের রয়েছে রহস্যময় রঙ এবং চমৎকার

www.pathagar.com

সুবাস। রাজশাহী এবং গৌড়ের সৌন্দর্য বাড়িয়ে বলা যায় না। রাজশাহী থেকে নাটোর হয়ে বগুড়া পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে প্রাণজুড়ানো ধান, আখ আর তামাকের ক্ষেত। নাটোর থেকে বগুড়া হয়ে রংপুর পর্যন্ত সবুজে ছাওয়া সমতল ভূমি। ধানের ক্ষেতে সেচের ফলে এখানকার আবহাওয়া সবসময়ই আর্দ্র থাকে। আগে শুষ্ক মৌসুমে এসব জমি শুকিয়ে খটখটে হয়ে থাকত। এখন গভীর নলকূপের সাহায্যে রূপালি পানির ধারা ছড়িয়ে দিয়ে সেসব জমিতে ফলানো হচ্ছে পান্নার মতো সবুজ ধান।

জমিদারদের উথান বাংলাকে কৃষি উত্তরাধিকার থেকে প্রাসাদোপম অট্টালিকার দিকে নিয়ে গেছে। এসব জমিদারী প্রাসাদের মধ্যে রয়েছে গৌড়ের কাছাকাছি নাটোরের রাণী ভবানীর প্রাসাদ। মূল বাড়ী, দর দালান এবং বাগানে ঘেরা এই চমৎকার প্রাসাদ অল্প কয়েকদিন আগে টুরিস্ট হোস্টেলে পরিণত করার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির অবকাশ যাপন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ এবং আরো অনেক জায়গায় জমিদারী প্রাসাদ রয়েছে। এসব জমিদারের বেশিরভাগই হিন্দু ছিল। এসব জমিদারী এস্টেটের জৌলুস সেনযুগে জেগে-ওঠা আদর্শিক সৌন্দর্যের কাছে ঋণী। বাংলাদেশে এমন কোনো গ্রাম নেই, যে গ্রাম থেকে সেই এলাকার জমিদারী এস্টেটে হেঁটে যাওয়া যায় না। এগুলোই বাংলাদেশে সেনযুগের ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার। তেরশ' শতকের শুরুতে সেনদের গৌরব হারিয়ে যেতে থাকে। এই সময়েই বাংলার সম্পদের দিকে এগিয়ে আসে আরেক নতুন শক্তি। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে আসে মুসলিম যোদ্ধাদল।

একটা জনগোষ্ঠীর সন্ধানে এক যোদ্ধাদল

অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসছে ইউরোপ, একতাবদ্ধ হচ্ছে ক্রুসেডের জন্যে। মধ্য এশিয়া থেকে আর্য, আলেকজাণ্ডার আর শ্বেত হূনদের পথ ধরে গজনীর সুলতান মাহমুদের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে মুসলিম সেনাদল। ১০২০ সালের দিকে খাইবার গিরিপথ পার হয়ে উপমহাদেশে প্রবেশ করেন সুলতান মাহমুদ। তারপর সিন্ধু পেরিয়ে ঢুকে পড়েন ভারতের মূল ভূখণ্ডে। আসার পথে বিপুল সম্পদ জড়ো করেন সুলতান মাহমুদ এবং তাঁকে অনুসরণকারীদের জন্যে তোরণ নির্মাণ করেন। কিন্তু ভারতে লুণ্ঠনকারী হিসেবে আসেননি মাহমুদ, এসেছিলেন বসতি স্থাপনকারীদের মতো, এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্যে। যেভাবে স্পেন ও পারস্যে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য মুসলমান সেনাপতিরা। ভারত অভিযানে সুলতান মাহমুদের সঙ্গী হয়েছিলেন তৎকালীন মধ্য এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী-মনীষী আল-বিরুনী। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সেই যুগেই এই বিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন– পৃথিবীর আকৃতি গোল এবং পৃথিবীর পরিধি প্রায় নিখুঁতভাবে হিসেব করেছিলেন। ভারতে

www.pathagar.com

এসে হিন্দুদের ভাষা শিখেন আল-বিরুনী, তাদের ধর্ম, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, কৃষি এবং শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। ভারতে তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত গ্রন্থ, যেটাকে 'আল-বিরুনীর ভারত' শিরোনামে ভাষান্তর করা হয়েছে, সর্বোচ্চ মানের গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে অত্যন্ত জটিল কাঠামোর ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিশদ বর্ণনা তুলে ধরেন তিনি। এই গ্রন্থ পরবর্তী মুসলিম অভিযানসমূহকে সহজতর করেছিল। কারণ গ্রন্থটা ছিল সমন্বিত এবং নির্ভুল তথ্যভিত্তিক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই গ্রন্থ হিন্দু সংস্কৃতিকে সুলতান মাহমুদের চেয়ে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে মুসলমানদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন আল-বিরুনী। আল-বিরুনীর মতে মাহমুদের যুদ্ধকৌশল তৎকালীন ভারতীয়দের এত বেশি দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলেছিল যেটা তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। যদিও আল-বিরুনী হিন্দুদেরকে গ্রীকদের মতো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বলে মনে করতেন না; তবু তিনি তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আগ্রহকে প্রশংসার চোখে দেখেছেন। তাঁর মতে, ভারতের হিন্দুদের দার্শনিক চিন্তা ছিল উঁচুস্তরের, যেটা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে উচ্চমার্গীয় মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ সম্পর্ক আল-বিরুনী নিজেই স্থাপন করেছিলেন।

এই যোগসূত্রটা খুবই জরুরি ছিল। কারণ, আর্য অভিপ্রয়াণকারী এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের প্রসারের মধ্যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। আর্যরা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর যাযাবর হানাদারদের বিরাট পরিসরের একটা পরিবর্তন চাপিয়ে দিয়েছিল এবং এভাবেই স্থানীয়দের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের বেলায় তেমন অভিপ্রয়াণ ঘটেনি। ইসলামী যোদ্ধারা এসেছে সৈনিক হিসেবে, যাযাবর হিসেবে আসেনি। ভারতে উপজাতি হয়ে থাকতে আসেনি মুসলমানেরা। এসেছে দেশ জয় করতে এবং সেই দেশের শাসনকার্য স্থানীয় জনগণের সাহায্যেই পরিচালনা করেছে। মুসলমানেরা স্থানীয় অধিবাসীদের ইসলামে দীক্ষিত করে এবং এভাবেই তারা নিজেদের বদলে ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়ে এদেশে টিকে থাকতে চেয়েছিল। আর সেটা করতে গিয়ে তাদের সৃষ্টি করতে হয়েছে পরিবেশ। যে পরিবেশে ধর্মান্তরকরণ সুবিধাজনক এবং প্রশংসনীয় মনে হবে সেই পরিবেশ। তাদের স্থানীয় জনগণের চরিত্রে ভালো ও মন্দ দুটো দিকই ভালোভাবে বুঝতে হয়েছে। আর এদেশের মানুষের আচার-আচরণের বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণাকর্ম উপহার দিয়েছিলেন আল-বিরুনী। (কয়েক শতক পরে স্পেনের যাজকেরা আমেরিকানদের উপর এ ধরনের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, যার ফলাফলও ছিল এর সঙ্গে তুলনীয়।) সংক্ষেপে বলা যায়, এদেশের বিপুলসংখ্যক জনতাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে বিজেতারা সাড়ম্বর কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। যার

www.pathagar.com

মধ্যে ছিল দয়া, এদেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রশংসা, তাদের অংশীদার হওয়ার চেতনা, দুঃখ-কষ্ট লাঘবের আশ্বাস।

১২০০ শতকের দিকে, বাংলাদেশে প্রবেশের আগে, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ভারতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর, প্রায় বিনাযুদ্ধে সেন রাজ্যের রাজধানী গৌড় অধিকার করেন বখতিয়ার এবং পলায়নরত সেন রাজাদের খাবার ঘরে গরম খাবার আবিষ্কার করেন। শোনা যায়, এই রাজ্যের জ্যোতির্বিদরা লম্বা হাতওয়ালা এক তুর্কী বিজেতার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ব্যাপারটা এত উদ্ভটভাবে মিলে যায় যে, মানুষের মনে সন্দেহ জাগে, যেসব জ্যোতিষী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাদের প্রভাবিত করেননি তো বখতিয়ার! আল-বিরুনীর দেয়া ভারতীয়দের চারিত্রিক ব্যাখ্যা জানা থাকলে সেটা অসম্ভব কিছু ছিল না।

বখতিয়ারের সঙ্গে একদল মুসলমান মনীষী এবং শিক্ষকও উপমহাদেশে এসেছিলেন। এই মনীষীরাই লাখ লাখ লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কেন এই বিপুলসংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল? কিভাবে এরা ধর্মান্তরিত হয়েছিল? স্বধর্ম ত্যাগকারীদের মধ্যে কোন শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য ছিল? এই সম্পর্কে শুধু তত্ত্বগত (Theories) ধারণাই পাওয়া যায়। তবে একটা ব্যাপার সত্য, ইসলামের বিধান মেনে চললে মৃত্যুর পর এক পরম সুখময় জীবনের অঙ্গীকার ইসলাম ধর্মকে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। দক্ষিণের অল্পসংখ্যক খ্রিস্টান বাদে এই উপমহাদেশের মানুষের কাছে এ ধরনের একটা বিশ্বাস পুরোপুরি অজ্ঞাত ছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না, একবার এ ওয়াদা করা হয়ে গেলে, প্যাসক্যালের (Pascal's) বাজির মতো এটাকে প্রমাণ করতে হয় না। প্রমাণের অভাবে এটাকে অস্বীকার করাটাও অর্থহীন। তাছাড়া পারলৌকিক জীবনের সুযোগটাকে হাতছাড়া করাও কঠিন। আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এ ধরনের বিশ্বাস কখনো নিস্ক্রিয়তার (Passivity) দিকে যায় না এবং পার্থিব কর্মকাণ্ড এখানে এবং এই মুহূর্তের বদলে সেই অপার্থিবকে গ্রহণ করলে জীবনের এক নতুন অর্থ পাওয়া যায়। জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ভয় করা উচিত নয়। কারণ, এগুলো শুধুই পরীক্ষা, ফল না। একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, একটা পরিবার পেতে পারে, তৈরি করতে পারে, পারে সৃষ্টি করতে, যদি সে পারলৌকিক জীবনের অঙ্গীকারকে গ্রহণ করে। আর এর সবই একটা সংরক্ষিত মুসলিম সমাজের মধ্যে রয়েছে। অন্যদিকে এদেশের মানুষের রাজকীয় (Kingly) উদাহরণ অনুসরণ করার প্রমাণ একেবারেই নগণ্য যেটা পারস্যের এবং প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়। এছাড়াও সম্ভবত ধর্ম প্রচারকের অপ্রতুলতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অত্যধিক দূরত্বের কারণেই এটা ঘটেছিল।

www.pathagar.com

যেভাবেই হোক কাজটা সম্পন্ন হয়েছিল। ধর্মান্তরিত হয়েছিল বিপুলসংখ্যক লোক। নিরোদ চৌধুরী যাকে একটা, "বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী মানুষের একটা নতুন দল বলে অভিহিত করেছেন (Group), একই জাতি এবং ভাষা থেকে আগত, ভৌগোলিক দিক থেকে সন্নিহিত কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে অন্যরকম। তারা একই পোশাক পরত না, একই জায়গায় জন্মানো অন্যদের বিশ্বাস থেকে এদের বিশ্বাস ছিল ভিন্ন।" এদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি এলাকায় বসবাস করে: সিন্ধু নদের উপত্যকায় (Indus River Vallay) এবং ব্রহ্মপুত্র ও গাঙ্গেয় বদ্বীপ অববাহিকায় (Ganges delta), দুই অঞ্চলের দূরত্ব প্রায় এক হাজার দু'শ' মাইল। এর একটা আজকের পাকিস্তান এবং অপরটা বাংলাদেশ। বাকিরা মধ্য ভারতে, দিল্লীর আশপাশে এবং অন্যান্য প্রধান শহরে। অথচ দিল্লীতে, যা পাঁচশ' বছরের মুসলমান শাসনের কেন্দ্র ছিল, মুসলমানের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৮ জন। এখানে উল্লেখ করা দরকার, মোগল ও ব্রিটিশ যুগের নদীবিধৌত সবচেয়ে ধনী অঞ্চলে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। কেন এবং কিভাবে এমন ঘটল তা রহস্যাবৃত। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, ভিন্ন ভাষাভাষী দুই উল্টো প্রান্তের নদীর অববাহিকার জনগোষ্ঠী ধর্মান্তরিত হয়েছিল অথচ মুসলিম শাসনের কেন্দ্রস্থলে তা হয়নি।

এর একটা তাত্ত্বিক দিক হচ্ছে, শুধু শূদ্ররাই ধর্মান্তরিত হয়েছে। এখানে মার্কসের একটা বিশ্লেষণ, 'শ্রেণী-বিদ্বেষ' যোগ করা যায়। এই তত্ত্বে হয়তো কিছুটা সত্য আছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যে অঞ্চলের জনগোষ্ঠী প্রারম্ভিকভাবেই নমশূদ্র ছিল, ছিল আর্য সংস্কৃতির বাইরে, যেখানে শ্রেণী, বর্ণ এবং আদি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। এই তত্ত্বেও আরো সমর্থন পাওয়া যায়, বিপুল সংখ্যায় কৃষক সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণের মধ্যে। ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীরা হিন্দু থাকাই উত্তম মনে করত। প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে হিন্দু ও মুসলমানদের বাড়ির মধ্যে যে পার্থক্যটা ছিল তা হচ্ছে, মুসলমানেরা সনাতন ধাঁচের খড়ের ঘরে থাকত এবং হিন্দুরা থাকত টিনের ঘরে। কিন্তু এই তত্ত্বের বৈপরীত্য হচ্ছে, অনেক অভিজাত হিন্দু এবং রাজাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এদের কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো বাস্তবিক কারণ ছিল, আবার অনেকে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এছাড়া ব্রাহ্মণদের 'সন্তান লাভ' সম্পর্কিত হান্টারের ধারণা যদি সত্যি বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে এটাও একটা কারণ। কেননা, বাংলাদেশের উচ্চ শ্রেণী দেখায় এবং কাজকর্মে ব্রাহ্মণদের মতোই। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, অবশ্যই অন্যান্য গোষ্ঠীও ধর্মান্তরিত হয়েছিল, যেমন বাংলাদেশের অধিকাংশ অভিজাত পরিবার আফগান মুসলমান, তুর্কী, ইরানী ব্যবসায়ী, স্থানীয় রাজা এবং জমিদারদের বংশোদ্ভূত। এরা আজ তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে যতটা দূরত্ব সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছে ঠিক ততটাই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। নিজেদের পূর্বপুরুষের অবাঙালি যোগসূত্র জাহির করা আজ এদের একটা ফ্যাশন। তাই আফগান বংশোদ্ভূত প্রমাণ করতে নামের শেষে খান জুড়ে দেয়া হয়। পারস্য বংশোদ্ভূত বোঝাতে ব্যবহার করা হয় মজলিস।

ব্রাহ্মণ ও যোদ্ধা সম্প্রদায়ের বিরোধ ছিল দীর্ঘদিনের পুরনো। এই বিরোধ ইদানীংকার আঁতেল-সুলভ ব্যুরোক্রাট এবং সামরিক বাহিনীর বিরোধের অনুরূপ। প্রাসঙ্গিকভাবেই, ১৯৪৭ সালে, ভারত যখন মুসলিম পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশসহ) এবং হিন্দু ভারতে বিভক্ত হয়, তখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি ভূমিকা পালন করেছিল পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী। ভারতের ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয় সামরিক বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। এদের মধ্যে পার্থক্য হলো, ইসলাম ধর্মে, ইসলামের স্বর্ণযুগে, যখন সামরিক শাসন সন্নিবিষ্ট করা হয়, করা হয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং যার ফলে বিজিত দেশে মুসলমান সেনাবাহিনী শাসন পরিচালনা করত এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত স্থানীয় অধিবাসীরা। এই কৌশলটা ব্রিটিশরা পুনঃপ্রবর্তন করেছিল। ক্যান্টনমেন্টের সামরিক শক্তি এবং প্রশাসনের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়।

সবশেষে, ইসলাম ধর্ম নারীদের প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কারণ ইসলাম হিন্দু বিধবাদের সহমরণের ঘোর বিরোধী ছিল এবং হিন্দুধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্ম নারীদের প্রতি অনেক বেশি উদার। আর এই উদারতার বেশিরভাগই সম্ভবত হিন্দুধর্মের বিষ্ণুবায়েত এবং বৌদ্ধ একেশ্বরবাদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মিশ্রণের ফসল। এর প্রভাব আজকের বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে প্রবল। আজকের বাংলাদেশে মুসলমান মহিলারা সমাজে যে উন্মুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারছে তা পাকিস্তান কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের তাদের বোনদের চেয়ে অনেক বেশি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইসলাম কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার প্রদান করে এবং হিন্দু মেয়েদের থেকে সমাজে অনেক উচ্চস্থান দেয়।

বাংলাদেশে ইসলাম এতটা আবেদন সৃষ্টি করল কিভাবে? পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর সম্ভাব্য তিনটা কারণ নির্দেশ করে। প্রথম, ইসলামের বড় আক্রমণগুলো হয়েছিল পূর্ববাংলার বঙ্গ, বরেন্দ্র, সমতট এবং হরিকেল অঞ্চলে, যেটা ছিল হিন্দু সভ্যতার সীমান্ত অঞ্চল। এর খুবই সামান্য প্রভাব পড়েছিল রাঢ় এবং মালদার, যেখানে হিন্দু ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাঢ়, ভাগীরথী নদীর বরাবর আর্য সভ্যতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নদীয়া সেই টোল (চতুষ্পদী)-সহ নয়া (Nyaya) হিন্দু দর্শন শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু পূর্ববাংলা তখনো ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এবং এখানকার জনগোষ্ঠী হয়তো তখনো আর্যবাদ পুরোপুরি গ্রহণ

www.pathagar.com

করেনি কিংবা হয়তো তখনো ওরা সপ্রাণ বৃক্ষের পূজা করত। দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের আগমনের পরের শতকেই গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী থেকে পদ্মায় সরে আসে এবং আস্তে আস্তে আরো পূর্বে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিলিত হয়। যার ফলে বাণিজ্যের পূর্ব সীমান্ত খুলে যায়। ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা দিয়ে গঙ্গায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন পণ্ডিত রিচার্ড ব্যাক্সটার ইটনের তত্ত্ব অনুযায়ী, গঙ্গার এই দিক বদল মুসলমানেরা এই আদিম, সর্ব প্রাণবাদী গ্রামবাসীদেরকে ধান উৎপাদনযোগ্য নতুন জমি বরাদ্দদানের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। পূর্ববাংলার বঙ্গোপসাগরে অনেকগুলো নৌবন্দর ছিল। এসব বন্দরের মাধ্যমে অনেক আরব বণিক এবং বিশিষ্ট মুসলমানদের আগমন ঘটেছিল, এরাই এই অঞ্চল ইসলামের প্রসারে চূড়ান্ত শাণ দিয়েছিলেন। চিটাগাং-এর এক লোককাহিনী মতে নবম শতকে, বৌদ্ধ শাসনামলেই সেখানে ইসলামের সূফী সাধকদের আগমন ঘটেছিল এবং সেই সূফী দরবেশরা ইসলাম প্রচারের জন্যে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

একটা বিষয়ে পণ্ডিতরা একমত, আদি সূফী শিক্ষকরা, যাদের মাজার এখনো তাঁদের ভক্তদের আগমনে, উৎসবে, মেলায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। এঁরা শুধু পুঁথিগত শিক্ষাই দেননি বরং দরদে, আবেগ-অনুভূতিতে এতই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন যে, তা শংকরীয় চূড়ান্ত একাত্মবাদ এবং ভগবানের অস্তিত্বের ধারণাকে একাকার করে ফেলেছিলেন। এই সূফী-দরবেশরা বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে। এই বিশ্বাস স্থানীয় জনগণের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে এঁরা ধর্মান্তকরণের একটা সেতুবন্ধ তৈরি করতেন। এঁরা বলতেন এবং বিশ্বাস করতেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে হলে 'পীরের হাত' ধরতে হবে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে এই 'পীর' হচ্ছে 'গুরু'।

পূর্ববঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রসারের সম্ভাব্য দ্বিতীয় কারণটার দিকে ফিরে যাওয়া যাক: গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের ফলে একটা বিশাল, দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল সৃষ্টি হয়েছিল। এটা দুটো বাঙালি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিল। একটা গোষ্ঠী যেটা পরবর্তীকালে বাঙালি সমাজকে ধর্মীয় এবং ভৌগোলিক দিক থেকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। সৃষ্টি হয় গঙ্গার নতুন প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং মেঘনা বরাবর এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠী গঙ্গার পুরনো প্রবাহপথ ভাগীরথীকেন্দ্রিক হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় মুসলমানেরা বাংলায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। বিশেষ করে পূর্ববাংলায়। ব্রিটিশরা ভারতের সঙ্গে বাংলাকেও দু'ভাগ করে ফেলে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গে পালিয়ে আসে এবং এদের সঙ্গে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মুসলমানেরা মিলে পাকিস্তান সৃষ্টি করে। একইভাবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের

www.pathagar.com

হিন্দুরা নিজেদেরকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেয় এবং বাংলাদেশের মুসলমানেরা পরিচয় দেয় বাঙ্গাল হিসেবে।

যাই হোক, সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলমান শাসনামলে (১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ সালের ২৪শে জুন পর্যন্ত, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ক্লাইভের কাছে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় পর্যন্ত) অবিভক্ত বাংলায় মুসলমান এবং হিন্দুরা একত্রে বসবাস করেছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুসলমানেরা হিন্দু ব্যাংকার, উপদেষ্টা এবং প্রশাসকের উপর নির্ভর করত। অনেক হিন্দু তাদের জমিদারীও বজায় রেখেছিল। সতেরশ' এবং আঠারশ' শতকে অনেক মরমী ভ্রাতৃসংঘ গড়ে ওঠে। এসব সংঘের মাধ্যমে মুসলিম সূফী এবং হিন্দু সন্ন্যাসীরা একেশ্বরবাদের আধ্যাত্মবিদ্যার উপর যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করতেন। ঊনিশশ' শতকে ব্রাহ্মসমাজ নামে আরেকটা গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। এরা ঈশ্বরের একাত্মবাদে বিশ্বাসী ছিল এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় মতবাদেরই সমর্থক ছিল। (এই বিশ্বাস পূর্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গেই এখনো ক্রিয়াশীল। এদের সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের উঁচুস্তরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। অবশ্য অনেকগুলো মুসলমান তরিকা: যেমন, সোহরাওয়ার্দী (Suhrawardy), চিশতিয়া (Chistia), জুনায়েদীয়া (Junayadia), কাদিরীয়া (Qadiria) এবং নকশবন্দীয়া (Naqsbandia) সমমনা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং সেকুলার গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখে। একইভাবে ইসমাইলী মুসলমানেরা আগা খানের অনুসারী, কখনো কখনো বিভিন্ন আধ্যাত্মবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। তবু বাংলাদেশে মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে মনকষাকষি রয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাদের সাধারণ জাতীয়তা বোধের অবমূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। বাহির থেকে উদ্ভূত যে কোনো সঙ্কটে এরা প্রথমে সবাই বাংলাদেশী।)

অর্ধসহস্র বছরের মুসলমান শাসনের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেটা ধারাবাহিক ধর্মীয় সহনশীলতার যুগ না থাকলেও, নিরবচ্ছিন্ন হয়রানির যুগও ছিল না। তাছাড়া অধিকাংশ বাংলাদেশী মুসলমানই বাংলা ভাষাভাষী এবং হিন্দু বৌদ্ধ পটভূমি থেকে আগত। প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাংলার লোকনৃত্য, নদী-উৎসব, ঐতিহ্যবাহী বাঁশি বাজনায় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে অংশগ্রহণ করত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, হিন্দু-মুসলমান উভয় সংস্কৃতিই দিল্লীর সালতানাতের সময় বিকশিত হয়েছিল। সতের শতকে মোগল সাম্রাজ্য যখন ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে তখন বাংলা স্বাধীন হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং হিন্দু ও মুসলমানেরা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বাঙালি সরকার গঠন করে। কাজটা অত্যন্ত জটিল ছিল। কারণ মুসলমান শাসনাধীনে থাকার সময়েই বৃহত্তর বাংলার

www.pathagar.com

ধারণা জন্ম হয় যার সীমান্ত বিহার, উড়িষ্যা ও কুচবিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের ভাষা বাংলা ছিল না। বাঙালির এই সংযুক্ত পূর্ব ভারতের স্বপ্নটা এখনো রয়ে গেছে এবং ধীরে ধীরে এটা ক্ষীণজ্যোতি হয়ে আসছে। তবে পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। মুসলমান আমলে অর্জিত এই একাত্মবোধকে মোবারকবাদ।

শুরুতে মুসলমান বিজেতারা বাংলা সম্পর্কে যা ভেবেছিল তা থেকে সরে আসেনি। কেউ বাংলাকে বলত 'নারকীয় স্বর্গ', কেউ বলত যে 'স্বর্গ থেকে খাদ্যস্রোত প্রবাহিত হয়', আবার কেউ বলত 'সমস্ত পৃথিবীর স্বর্গ'। গৌড়ের আরাম-আয়েশে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন এক মোগল সম্রাট যে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'জান্নাতাবাদ'। আবার কেউ এখানকার বর্ষার বাধ্যতামূলক আলস্যের জন্যে দেশটাকে অপছন্দ করত। বর্ষায় নদীগুলোর দুই তীর প্লাবিত হয় এবং এসব নদী প্রায়ই গতিপথ বদলায়। (এসব ঘটনায় বিরক্ত হয়ে মুসলমানেরা গৌড় ত্যাগ করে এবং হযরত পাণ্ডুয়ায় চলে যায়।)

সেই সময় বাংলার উন্নত কৃষিজমি এবং সুতি ও রেশম বয়নশিল্পে পৃথিবীর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মুসলমান শাসকরা সমগ্র উত্তর ভারতকে একটা একক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসার ফলে এই উৎকর্ষতা অর্জন অনেকটা সহজতর হয়েছিল। এই একক সমাজ ব্যবস্থার ফলে চিটাগাং থেকে দক্ষিণ-পূর্বে সুদূর খাইবার গিরিপথ পর্যন্ত দুই হাজার মাইল এলাকার মধ্যে বাণিজ্যিক সুস্থিতি এসেছিল। মুসলমানেরা সড়ক তৈরির মাধ্যমেও বাণিজ্যিক সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। এরই একটা হচ্ছে আধুনিক বাংলাদেশ থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। তাছাড়া বঙ্গোপসাগর থেকে ভারতীয় উপকূল হয়ে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত নৌপথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল মুসলমানেরা। এর ফলে আরব বিশ্ব, বার্মা (মায়ানমার), থাইল্যান্ড, জাভা, চীন, জাপান, এমনকি আফ্রিকা ও সুদূর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল পর্যন্ত বাণিজ্য প্রসার সম্ভব হয়েছিল। রেশম, তুলা, চাল, সরিষা এবং পাটের বিনিময়ে মালাক্কা থেকে আসত মসলা ও মোটা কাপড়। চীন থেকে আসত চা, পিতল, কাঁচা তুলা, আর উদ্ভিদজাত নীল। দিল্লীর সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক ভারসাম্য এত মজবুত ছিল যে ভারতের মসলা কখনো বাংলা ছাড়েনি, এমনকি ট্যাক্স বসানোর পরও।

সেই যুগের সমৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থাপত্যশিল্পের ধ্বংসাবশেষ। যেমন গৌড়ের (যা পাল এবং সেনদের দ্বারা বিকশিত হয়েছিল এবং মুসলমান আমলে আরো মজবুত হয়েছিল) বিশাল ফটক, প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, বিশেষ করে সোনা মসজিদ। গৌড়ের জৌলুস কমে আসার পর এর কাছেই মুসলমানেরা গড়ে তোলে এক চমৎকার নতুন নগরী হযরত পাণ্ডুয়া। এই নগরীর

www.pathagar.com

ধ্বংসাবশেষ এখনো যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এই হযরত পাণ্ডুয়াও এই অঞ্চলে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে। এমনিভাবে অন্যান্য মসজিদ, যেমন– বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, সিলেট, দিনাজপুর এবং যশোরের স্মৃতিস্তম্ভগুলো বাংলার সেই সোনালি অতীতের সাক্ষী। এছাড়া ঢাকার পাশের সোনারগাঁয়ের (প্রাচীন রাজধানী) ধ্বংসাবশেষ এক সময় যেখানে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের শেষপ্রান্ত ছিল। ঢাকার ঐতিহাসিক লালবাগ কিল্লা। আরো রয়েছে গৌড়ের দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ যা মুসলিম বাংলার শেষ রাজধানী ছিল।

সম্ভবত এই উপমহাদেশে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অবদান সঙ্গীত যা এই উপমহাদেশের স্থানীয় সঙ্গীতের পূর্ণতা দিয়েছে মুসলমানেরা। স্থানীয় সঙ্গীতের একটা অংশ ইসলামের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সেতার, দোতরা (Dotar), হারমোনিয়াম এবং তবলা স্থানীয় সঙ্গীতে মুসলমান সংযোজন। মুসলমানদের যুগে বাংলা এতই সমৃদ্ধ ছিল যে ১৪৯৮ সালে উত্তমাশা-অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসা পর্তুগীজ ভাস্কো দ্য গামা পর্তুগালের রাজার কাছে বাংলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'এই দেশ খাদ্যশস্য এবং মূল্যবান সুতি পণ্য রপ্তানি করে। পর্যাপ্ত রূপা আছে এই দেশে।'

১৫৩৬ সালের দিকে চিটাগাং-এ ব্যবসা শুরু করে পর্তুগীজরা এবং বর্তমান কলকাতার উজানে রাঢ় অঞ্চলে, ভাগীরথী নদীর পাশে বসবাস শুরু করে। ১৬১৫ সালের দিকে আসে ওলন্দাজরা, ব্রিটিশরা আসে ১৬৫১ সালে, ফরাসীরা ১৬৭৪ সালে। সুতি কাপড়, রেশম, খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর জন্যে দলবেঁধে আসতে থাকে ইউরোপীয় বণিকরা। তখন বাংলায় বাণিজ্য এত বেশি লাভজনক ছিল যে, এখানে বাণিজ্যিক প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে চার চারটে ইউরোপীয় শক্তি। ১৭৫৭ সালে বাংলা দখলের পর সম্পূর্ণ ভারত জয়ে মনোনিবেশ করে ব্রিটেন। ব্রিটিশরা ভারত জয় করার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল সম্পদ স্বদেশে পাঠাতে থাকে এবং এই সম্পদই আঠার, উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমদিকে ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে, বাংলা না থাকলে নেপোলিয়নের হাত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষা পাওয়া সম্ভব হতো না।

সোনার সন্ধানে আসা এক সেনাদল

কলকাতায় আদি ব্রিটিশ বসতি স্থাপনকারীদের মৃতদেহ পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে কবর দেয়া হতো। বিচিত্র এক জায়গা এই পার্ক স্ট্রিট। এখানে খ্রিস্টান নিদর্শনের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু মার্বেল পাথরের তৈরি প্রচুর গ্রীক 'কীঅসক' রয়েছে। আছে

www.pathagar.com

কালের গ্রাসে কালচে হয়ে যাওয়া প্রচুর চারকোনা স্তম্ভ। দেখে মনে হয়, হয়তো মিসরীয় কোনো গুপ্ত সম্প্রদায় এগুলোর মালিক। জায়গাটার একটা অতিপ্রাকৃত গন্ধ আছে। কবরগুলোর ধরনটাও কেন যেন অন্যরকম। কোনো ক্রুশ নেই, সেই সমাধিক্ষেত্রের পাথরে খোদাই করা সাধারণ শুভকামনা। অবশ্য কয়েকটা কবর যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। রোজ আলমারের কবর সেগুলোর একটা। এই রোজ আলমারকে উদ্দেশ করেই উঁচুস্তরের একটা কবিতা রচনা করেছিল ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যান্ডার:

উহ্ কী পায় রাজদণ্ডধারী,
আহ্ কী স্বর্গীয় এ অবয়ব!
যত সব পুণ্য, যত সৌন্দর্য!
রোজ আলমার, সবই তোমার
রোজ আলমার, যার জন্যে এ বিনিদ্র চোখ
হয়তো কাঁদবে, কিন্তু কখনো দেখবে না,
স্মৃতিভরা রাতটাকে আর কত আকুলতা
আমার তোমার জন্যে।

সত্যিই তাই। পার্ক স্ট্রিটের সমাধিক্ষেত্রে রেখে যাওয়া রোজ আলমারের স্মৃতিই ব্রিটিশদের একমাত্র মানবীয় রূপ। এটা এমন এক জায়গা, যে তার নিজস্ব আবেগে তাড়া করে ফেরে। হয়তো এরও কোনো উদ্দেশ্য আছে, হয়তো আমাদের মনে করিয়ে দিত– মুসলিম, বৌদ্ধ কিংবা আর্য হিন্দুদের মতো স্বধর্মে দীক্ষিত করতে এখানে আসেনি ব্রিটিশরা। এসেছিল অর্থ লুটতে। ভারতে শিখতে আসেনি ওরা, এসেছিল রোজগার করতে। ওরা বণিক ছিল, বিদ্বজ্জন ছিল না। অন্তর্দৃষ্টি এদের ছিল না। ওরা থাকতে আসেনি, এসেছে অঢেল বিত্তের ফিকিরে। কেবল রোজ আলমারের মতো যাঁরা পালিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাঁরা রয়ে যান। এবং হয়তো পার্ক স্ট্রীটের বিষণ্ণতা এ কারণেই যে, এখানে তাদেরই কবর হয়েছিল যারা তাদের আহরিত অর্থ নিয়ে দেশে চলে যেতে পারেননি।

১৭৫০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা বা সম্পদের বিচারে খুব যে বড় ছিল তা বলা যাবে না। তবু শেষ পর্যন্ত এই কোম্পানি ভারতে শাসন কায়েম করতে পেরেছিল। সুরাট, মুম্বাই এবং মাদ্রাজে বাণিজ্য চৌকি এবং কলকাতায় ক্ষুদ্র একটি দপ্তর নিয়ে কোম্পানি তখন এক মধ্যম মানের প্রতিষ্ঠান। সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা দূরে থাক, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও সে সময় ছিল না এ কোম্পানির। যখন একটি ফরাসি কোম্পানি স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে জোট বেঁধে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করার চেষ্টা শুরু করে, কেবল তখনই ব্রিটিশরা বাধ্য হয় লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে। ব্যবসা হারানোর প্রথম আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠার পর তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে ভারতকে স্থায়ীভাবে ফরাসীদের কবলমুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। এবং ১৭৫৭ সালে তারা এটা করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বস্তুতপক্ষে ১৭৬৫ অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের পর আট বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তারা চূড়ান্তভাবে ফরাসীদের এবং বাংলার স্বাধীন নবাবকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। ১৭৬৫ সালে বাংলার তৎকালীন নবাবকে এবং ফরাসীদের পরাজিত করার পর ব্রিটিশরা বুঝতে পারে তাদের পক্ষে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করা সম্ভব। বাংলার রাজকোষের প্রশাসনিক ক্ষমতা বা দেওয়ানী যখন ব্রিটিশদের হাতে আসে তখনই কার্যত এই ঐতিহাসিক বোধের উন্মেষ ঘটে। অতএব বলা যায়, ব্রিটেন এক অসতর্ক মুহূর্তের আবেশে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্রতী হয়েছিল, এই বক্তব্য একেবারে সত্যের অপলাপ নয়। শুরুতে ব্রিটিশদের লক্ষ্য ছিল সম্পদ আহরণ এবং পাচার করা, সাম্রাজ্য বিস্তার নয়। যখন কোম্পানির লন্ডনস্থ অংশীদারদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মাল যে সাম্রাজ্যই অধিক মুনাফা দেবে কেবল তখনই তাঁরা এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

আমার এক বন্ধু, কলকাতার একজন ঐতিহাসিক, একবার ব্রিটিশদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা ব্যক্তি হিসেবে চমৎকার মানুষ, ক্ষুদ্র সকল বিষয়ে তারা ভালো; তবে সকল বড় বিষয়ে তারা মন্দ, বদমাশতুল্য। তিনি ব্রিটিশ আমলে পুলিশের সততা, আদালতের সত্যশীলতা, জেলা কালেক্টর এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের শিষ্টতা এবং ভারতকে বুঝবার জন্যে সামগ্রিকভাবে যে কষ্ট ব্রিটিশরা স্বীকার করেছে তার প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের সাহিত্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারে ব্রিটিশদের ভূমিকা, ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে তাদের গভীরতা, এবং রেলপথ নির্মাণ, জাহাজ চলাচল ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের উদ্যমের কথাও আমার এই বন্ধুটি উল্লেখ করেন। তবে একই সঙ্গে তিনি এটা উল্লেখ করতেও ভোলেননি যে, ব্রিটিশরা সেই জাতি, যারা ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে-শুনে বাংলার বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করেছে ভারতে ইংল্যান্ডে তৈরি বস্ত্রের বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। তিনি এও বলতে ভোলেননি যে, ব্রিটিশরা চীনের সঙ্গে ভারতের আফিম ব্যবসার সূচনা করেছিল, খাজনা হিসেবে পাওয়া ফসল আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে পাওয়া অর্থ তারা দেশ থেকে পাচার করেছিল– এমনকি দুর্ভিক্ষের বছরেও এটা বন্ধ থাকেনি; বাংলার তরল সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ তারা ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছে, চা-বাগানে ক্রীতদাস খাটিয়েছে, নীল চাষীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, স্থানীয়দের সাথে বর্ণবাদী আচরণ করেছে; এবং বর্বর শক্তির প্রয়োগে নীল-চাষীদের বিদ্রোহ দমন করেছে। অধিকন্তু তারা অতীব প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থা গড়ে না তুলে রেল লাইন বসিয়েছে। কারণ, ইংল্যান্ডের ইস্পাত এবং রেলের সাজসরঞ্জাম বিক্রি করা দরকার ছিল। এমনকি তারা ভারত সরকারকে বাধ্য

www.pathagar.com

করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিনে নিতে, যদিও ভাইসরয়ের মাধ্যমে ব্রিটেনই তখন ভারত সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করত। এভাবে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা যখন ভারত ছাড়তে বাধ্য হলো তখন তারা রেখে গেল ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সম্পর্কিত এক মহান বোধ, গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ– আর একটি বি-শিল্পায়িত, ভিখিরিতে পর্যবসিত বাংলা।

বাংলার প্রতি আগাগোড়া একই আচরণ করে গেছে ব্রিটিশরা। ১৭৮৩ সালে ব্রিটিশ দখলদারীর মাত্র এক প্রজন্ম পর, সেই সত্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন প্রখ্যাত টেরির নেতা এডমন্ড ব্রুক:

'এশীয়রা বঙ্গ বিজয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিষ্ঠুরতা কমিয়ে ফেলে। এর কারণ, ওরা চেয়েছিল বিজিত দেশটাকে নিজের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে। সেই এলাকার উত্থান-পতনের সঙ্গে তাদেরও উত্থান-পতন ঘটত। বিজয়ী পিতা সেখানে তাদের বংশধরদের আশা-আকাঙ্ক্ষা জমা রেখেছিল। সন্তানরা যেখানে তাদের পিতার তৈরি স্মৃতিসৌধ দেখত; সেখানেই তাদের ভাগ্যকে সঁপে দিত। কেউ কি চায় তার ভাগ্যকে একটা ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের সঙ্গে জুড়ে রাখতে? দারিদ্র্য, বন্ধ্যাত্ব, হতশ্রী দশা মানুষের কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। কমসংখ্যক লোকই জাতির দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাতে পারে। যদি তাদের ক্রোধ ও ধনলিপ্সা তাতার নৃপতিদের লোলুপতা এবং জুলুম রুখে দিতে পারে, তাহলে মানুষের জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এক শক্তির উপর আরেক শক্তির এই বীভৎস অপপ্রয়োগ কাটিয়ে ওঠার যথেষ্ট সময় এরা পেয়েছিল। এই সম্পদ যদি সহিংস পথে কিংবা জুলুম করে অর্জিত হয়ে থাকে তো, তবু সেগুলো ছিল ঘরোয়া সম্পদ, ঘরোয়া প্রাচুর্য, হয়তো অধিক শক্তিশালী এবং অপব্যয়ীদের হাতের এই লুটপাট সেগুলোকে পুনরায় জনতার কাছে ফিরিয়ে নেবে। বিশৃঙ্খলা এবং ক্ষমতার উপর রাজনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ সামান্য হলেও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ এখনো পুরোপুরি রয়ে গেছে। সম্পদ অর্জনের উৎস এখনো শুকিয়ে যায়নি। কাজেই, সে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য এবং উৎপাদন আবার বাড়ছে। অর্থলিপ্সা এবং সুদের চড়া হার সত্ত্বেও জাতীয় সম্পদের সংরক্ষণ এবং বিনিয়োগ বাড়ছে। কৃষক সম্প্রদায় এবং উৎপাদক চড়া সুদ গুণছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা ওদের ঋণ গ্রহণের ভবিষ্যৎ উৎসকে বাড়িয়ে চলেছে। তাদের সম্পদ অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ওরা নিঃসন্দেহ এবং কোনো অঞ্চলের সাধারণ মজুদ সাধারণ প্রভাবেই বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ইংরেজ সরকারের আমলে ব্রিটিশরা সবকিছুই উল্টে দিয়েছিল। তাতার আক্রমণ ছিল দুর্ভাগ্যজনক। ব্রিটিশরাই উপমহাদেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ওদের ঘৃণা থাকতে পারে, তবে আমাদের বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া উচিত। আমাদের বিজয়ের বিশ বছর পরও আমরা প্রথমদিনের মতো আচরণ করছি। স্থানীয় জনসাধারণ এখনো জানে না ধূসর চুলের একজন ইংরেজের সঙ্গে, একজন ইংরেজ যুবকের সঙ্গে

কিংবা কোনো ইংরেজ বালকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কি ঘটতে পারে। স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া নেই সেখানকার ইংরেজদের। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় ওরা ইংল্যান্ডেই আছে। এদের কাছে যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে কিভাবে হুট করে ভাগ্য ফেরানো যায়। যৌবনের হঠকারিতার সঙ্গে যুগের ধনলিপ্সা যুক্ত হয়ে এসব যুবককে গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দিচ্ছে। একের পর এক পার হয়ে যাওয়া এসব শিকারী পাখির অনন্ত উড্ডয়নের দিকে তাকিয়ে জনতার চোখে সীমাহীন এক হতাশা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। ইংরেজদের রোজগারের প্রত্যেকটা রুপি চিরদিনের জন্যে ভারত থেকে হারিয়ে যায়।

ব্রিটিশ ভারতের সরকারি কর্মচারি, যারা ইংল্যান্ডকে ভালোবেসেছিলেন, রমেশ দত্তের ভাষায়, তাদের কিছুই বদলায়নি। একশ' আঠার বছর পরও সব ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে। ব্রিটিশরা ভারতে যতগুলো পাপ করেছে তার মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে সুপরিকল্পিত 'নীলনকশা'র মাধ্যমে তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুতি শিল্প ধ্বংস করে দেয়া। ব্রিটেনের ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসনের ভাষায়:

যে দেশটা ভারতের প্রতি সবচেয়ে বেশি অন্যায় করেছে সে দেশের উপরই ভারত সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল ছিল। দুঃখজনক দৃষ্টান্ত এটাই, ১৮১৩ সালে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে তখনো পর্যন্ত ভারতের সুতি ও রেশম পণ্য ইংল্যান্ডে উৎপন্ন এবং পণ্য অপেক্ষা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কম দামে বিক্রি করেও লাভ হতো। সেসব পণ্যের মূল্যের উপর ৭০ থেকে ৮০ ভাগ শুল্ক বসিয়ে কিংবা সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করে ব্রিটশি পণ্যকে রক্ষা করা হয়েছে। যদি সেই শুল্করূপী নিষেধাজ্ঞা কিংবা অধ্যাদেশ জারি না করা হতো তাহলে পেইসলি এবং ম্যানচেস্টারের কারখানাগুলো শুরুতে বন্ধ হয়ে যেত এবং পরে আর কোনোদিনই সেগুলো চালু করা সম্ভব হতো কিনা বলা যায় না। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এসব শিল্প গড়ে তুলেছিল ভারতীয়রা। (প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল ঢাকার বাংলাদেশী কারখানা।) ভারত যদি স্বাধীন থাকত, সে যদি এর পাল্টা ব্যবস্থা নিতে পারত, পারত ব্রিটিশ পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে; তাহলে সে তার এসব শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু এই আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারও তার ছিল না। তাকে পুরোপুরি আগন্তুকদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হতো। বিনা শুল্কে তাকে ব্রিটিশ পণ্য গছানো হতো। বিদেশী উৎপাদকেরা রাজনৈতিক অবিচারের হাত দিয়ে তাকে দাবিয়ে রাখে, প্রতিযোগীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে, যে প্রতিযোগীর সঙ্গে সমশর্তে টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অ্যাডাম স্মিথও তাঁর 'ওয়েলথ অব নেশনস' গ্রন্থে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করেছেন। ভারত এবং ইংল্যান্ডের সেই বাণিজ্যকে তিনি 'মনোপলি' হিসেবে দেখেছেন। যার এক পক্ষে ছিল বৃহত্তর ক্রেতা এবং অপর পক্ষে বৃহত্তর বিক্রেতা।

www.pathagar.com

এডমন্ড ব্রুকের মতে, ব্রিটেন ভারতে তার কার্যাবলীর প্রকাশ্য নিন্দা করার পরপরই ব্রিটিশ সরকার বাংলায় সাবেক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল এবং প্রথম প্রজন্মের লুটপাটের ধকল কাটিয়ে উঠতে বাংলাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। লর্ড কর্নওয়ালিসকে (আমেরিকার যুদ্ধে ইয়র্কটাউনের যুদ্ধক্ষেত্রে জর্জ ওয়াশিংটনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন যে জেনারেল) গভর্নর জেনারেল করে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ভূমিকর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করেন। ট্যাক্স নির্দিষ্ট করে দেন, অপ্রত্যাশিত দাবী থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করেন। আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন সদস্যদের স্থানীয় ভাষা শেখানো হয়। ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করার জন্যে আইন প্রণয়ন করা হয়। নতুন বেতন স্কেল প্রবর্তন করা হয়। শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠার ভয়ে ভারতে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার বন্ধ রাখা হয়। ভারতের পার্থিব সম্পদ কুক্ষিগতকারীদের পক্ষে সেখানকার মানুষকে পরকালের সুখস্বপ্ন দেখানোর সুযোগ ছিল না। আর অধিকাংশ ব্রিটিশই সম্ভবত পরকালে বিশ্বাস করে না।

কর্নওয়ালিসের কর কাঠামো দেশের কৃষির পুনরুদ্ধারের ভিত্তি রচনা করে। পাট, চা, নীল প্রভৃতি চাষের ফলে এদেশের কৃষকরা নতুন অর্থকরী ফসলের সন্ধান পায়। কিন্তু তখনো বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের উপর কঠোর রপ্তানি শুল্ক বজায় রাখা হয়েছিল। স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্যের মূল্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড় সাহেবরা নির্দিষ্ট করে দিত। অথচ আমেরিকার ক্রীতদাসদের তৈরি সুতা দিয়ে বানানো ব্রিটিশ কাপড়ের ওপর নামমাত্র শুল্ক ছিল।

১৮১০ সালের মধ্যেই ভারতের সাধারণ রপ্তানি নাটকীয়ভাবে হ্রাস পায়। সেই সময় চীনে কাপড় রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারতীয়দেরকে আফিমের চাষ শুরু করতে হয়েছিল। (এই ঘটনাটা বাঙালিরা ভোলেনি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশের তৈরি কাপড় 'বয়কট'র মধ্য দিয়ে।) ব্রিটিশ কর্তৃক ঢাকার কাপড়ের ব্যবসা দমনের ফলে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে ৩০,০০০-এ নেমে যায়। এর পরিণতি আন্দাজ করতে পেরে ব্রিটেন আইন-কানুন শিথিল করে। ফলে বাংলা এক ভয়াবহ দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠে। অবশ্য সেই দুর্যোগে এক-তৃতীয়াংশ বাঙালি মৃত্যুবরণ করেছিল। এই ঘটনা থেকে বাঙালির হৃতশক্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওরা শুধু সেই প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ কাটিয়েই ওঠেনি, অধিকন্তু, ব্রুকের ভাষায়, 'ভারতে ব্রিটিশ প্রসারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।'

এখানে ব্রিটিশ অভিযান পূর্বেরগুলোর চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। আগে পশ্চিম দিক থেকে, আফগানিস্তানের পাহাড় হয়ে উপমহাদেশে ঢুকত বিজেতারা। কিন্তু

www.pathagar.com

ব্রিটিশরা আসে পূর্ব থেকে। এটা ভারতীয় শাসকদের বিস্মিত করেছে। তাছাড়া নৌশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল ব্রিটিশরা। অথচ তখনো সেটা উপমহাদেশের যুদ্ধকৌশলে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল না। যেহেতু এখানে ব্রিটেন তার নৌঘাঁটি স্থাপন করেছিল; তাই বলে শুধু এই ঘাঁটির সুরক্ষার জন্যেই তাদের বাংলার প্রয়োজন ছিল না বরং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান চালানোর অর্থ যোগান দেয়ার জন্যেও বাংলার প্রয়োজন ছিল। যদিও নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে বাংলাকে বলাৎকার করেছিল ইংরেজরা এবং চরমভাবে লুণ্ঠিত হয়েছিল বাংলা। তার পরও আঠারশ' শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত এত সুন্দরভাবে সেই ধকল কাটিয়ে আসছিল বাংলা যে, এর কাঁধে ভর দিয়েই সমস্ত ভারত এবং বার্মার প্রভু হয়ে বসেছিল ব্রিটেন।

বাংলার ওপর চাপিয়ে দেয়া দুর্ভোগগুলো সত্ত্বেও সে সময় বাংলা তার আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল এবং এর কোনো কোনো অংশে সুন্দর সংস্কৃতি সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। উঁচু শ্রেণীর কাছে ইংরেজি শিক্ষা জরুরি হয়ে ওঠে এবং বাংলা সাহিত্যের পুনরুত্থান ঘটে। অসংখ্য লেখক, শিক্ষাবিদ এবং ধর্ম সংস্কারক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। যার ফলশ্রুতিতে শতাব্দীর শেষদিকে সমগ্র ভারতে বাঙালিরা দীপ্যমান হয়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যেই বাঙালি ডাক্তার, আইনবিদ, কবি, দার্শনিক এবং সৈনিকেরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলায় একটা রেনেসাঁ ঘটে যায়। অবশ্য সত্যি বলতে গেলে এর উৎস ছিল কলকাতা হয়ে যাওয়া 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের' তহবিল। একটা কথা তখন প্রচলিত ছিল– 'আজ বাংলায় যা ঘটছে সমগ্র ভারতে আগামীকাল সেটাই ঘটবে।'

১৮৯০ সাল নাগাদ ব্রিটিশ স্বার্থের ভারতীয় সম্পদের নিরবচ্ছিন্ন শোষণের ফলে সারা বাংলায় ব্রিটিশদের প্রতি একটা বৈরী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। রমেশ দত্ত তাঁর 'ইকনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে এর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। আর এই বিদ্রোহী ভাব উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোনের উদার নীতির কারণে আরো ফুলেফেঁপে ওঠে। গ্রেট ব্রিটেনের চার চারবারের প্রধানমন্ত্রী তখন আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। বাঙালিরা ভেবেছিল হয়তো তাদের ক্ষেত্রেও ওই ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়া হবে।

কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার এই আন্দোলন নস্যাৎ করার পথ খুঁজতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বেছে নেয় ব্রিটিশরা। ১৯০৫ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করেন। এই আঘাতটা এত জোরালো ছিল যে, এর ফলে কলকাতার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় একটা জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

এই শ্রেণীর বেশিরভাগই ছিল হিন্দু। পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ মুসলমানদেরকেও এই ঘটনা অস্থির করে তোলে। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে থাকে। বাঙালিদের প্রচণ্ড ক্রোধ, ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কট এবং অন্যান্য অসহযোগ আন্দোলন লর্ড কার্জনকে নমনীয় হতে বাধ্য করে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। বাংলার এই বিজয়ও প্রমাণ করে, তখন পর্যন্ত বাংলা ব্রিটিশ ভারতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ১৯১২ সালে এই বিদ্রোহের প্রতিশোধ হিসেবে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী নিয়ে যায় ইংরেজরা। তাদের এই অহঙ্কারী রাজধানী গড়ে তুলতে বাংলাভিত্তিক রাজস্ব আদায় করা হয়। এভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে লন্ডনের পর দ্বিতীয় রাজধানীর মর্যাদা হারায় কলকাতা।

ব্রিটিশদের প্রতিহিংসা আরো জঘন্য রূপ নিতে থাকে। কারণ তাদের মনে তখন সন্দেহ ঢুকে গিয়েছিল– ভারতে তাদের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভীতিকে কাজে লাগায় ওরা। ১৯০৫ সালের সীমান্ত বরাবর পুনরায় ১৯৪৭ সালে বাংলাকে ভাগ করে দেয়।

বাংলার দুঃখ-যন্ত্রণার অনেকগুলো কারণের একটা হচ্ছে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লী সরিয়ে নেয়া। ১৮৭০ সালে সুয়েজখাল উদ্বোধনের ফলে এবং সুয়েজখালে রেলব্যবস্থা সংযোগের ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক ব্যবসাবাণিজ্যের মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে। কারণ কলকাতা থেকে বোম্বে সুয়েজখালের অনেক কাছে। শিল্প এবং অর্থনৈতিক শক্তি তখন পশ্চিমে সরে যাচ্ছিল, যেখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতের কাপড় শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল। এভাবেই বাংলা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে উল্টো স্রোতে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে বাংলা এতই গুরুত্বহীন হয়ে যায় যে, ১৯৪৩ সালে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সেটা বড় ধরনের সরকারি 'ইস্যু' হতে কয়েক মাস সময় লেগে গিয়েছিল। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভিখারিতে পরিণত হয়েছে বাংলা।

এই উপমহাদেশে বাংলায়, যখন মুসলমান শাসনের অবসান ঘটে তখনকার অবস্থা ছিল পুরো উল্টো। তখন সম্পদে সারাবিশ্বের নেতৃত্ব দিত বাংলাদেশ। আর ১৯৪৭ সালে যখন ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে বাংলা তখন ভিখারি এবং দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদের অপর নাম। বাংলায় প্রথম দিকের ইউরোপীয় পর্যটক জীন ল' যখন বাংলাদেশে আসেন সে সময় থেকে কতদিন যে বাংলা ডুবেছিল কে জানে। বাংলা সম্পর্কে জীন ল'র বক্তব্য হচ্ছে, "মোগলদের সমস্ত দাপ্তরিক কাগজপত্র, ফরমান, পরোয়ানা 'দি প্যারাডাইস অব নেশনস' দিয়ে শেষ হতো।" অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার, এখনো ব্রিটিশ আইনই বাংলাদেশের আইনী ঐতিহ্যের ভিত্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গের বিতর্ক চলাকালে স্থাপিত) ব্রিটিশ শিক্ষা

www.pathagar.com

ব্যবস্থার আদলে গড়া। ইংরেজি ভাষা জাতীয় উত্তরাধিকারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সাংবিধানিক সরকারের ধারণা সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান ও শিল্পকলা যা বর্তমানে জাতির প্রাণস্পন্দন। রেলপথ ও ফেরী ব্যবস্থা ব্রিটিশ রূপরেখার তৈরি। ব্রিটিশ নির্মাণ কৌশল এদেশের শহর ও গ্রামের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, চিটাগাং-এর ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ভবন, চা-বাগানে পাহাড়ের উপর আবহাওয়া উপযোগী করে তৈরি মনোরম বাংলোগুলো, সুপ্রিম কোর্ট ভবন, রমনা এলাকার পুরনো বাড়ি-ঘর, কেন্দ্রীয় ময়দান– এসবের সৌন্দর্য ব্রিটিশ যুগের।

কলকাতার স্থপতিও ব্রিটিশরাই। ১৬৯০ সালে বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর এবং চার্লসটনের মতো করে তৎকালীন এশিয়ার প্রধান বাণিজ্য শহর হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল কলকাতাকে। কলকাতা এখন ভারতের পশ্চিবঙ্গের রাজধানী। আর ঢাকা, একসময় সমগ্র পূর্বভারতের বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্র ছিল। বাঁকা দৃষ্টিতে দেখলে কলকাতাকে ব্রিটিশ ভারতের বৃহত্তর স্মৃতিসৌধ ভাবা যায়। এর নির্মাণশৈলী, জাদুঘর, স্মৃতিস্তম্ভ, গ্রন্থাগার, বিদ্বজ্জনসমৃদ্ধ সমাজ– সবই সুন্দর ছিল এবং প্রশাসনিক নৈরাজ্যে সবই হতশ্রী। সার্বিকভাবে, নৈরাজ্য ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও কলকাতা বুদ্ধিবৃত্তি এবং বাণিজ্যিক দিক থেকে এক প্রাণচঞ্চল সতন্ত্র সত্তা– দুর্নামের 'অন্ধকূপ' নয়। এই মানহানিকর বিশেষণটা কলকাতার দারিদ্র্যের জন্যে হয়নি, হয়েছে এক জেলখানায় তথাকথিত বহু ইংরেজের মৃত্যুর জন্যে। অবশ্য ব্রিটিশদের কাছে বাংলাদেশও ধন্যবাদের বিপরীত শব্দ। এক সময় লন্ডনের অনুন্নত এলাকাগুলোকে এই নামে ডাকা হতো। এটাও ব্রিটিশ উত্তরাধিকারের একটা অংশ।

এটা ইতিহাসের একটা বিড়ম্বনা যে, ১৯১২ সাল থেকে (যখন ব্রিটিশরা কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লী নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়) ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত (ব্রিটিশরা যখন ভারত ছেড়ে যায়) সময়টা বাংলার দুর্ভোগের সময়। প্রকৃতপক্ষে সেই দুর্ভোগই চরম রূপ নেয় ১৯৪৩ সালে। দুর্ভিক্ষ-কবলিত বাংলার খাদ্য যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। এটাকে এক ভিক্ষুকের কাছ থেকে আরেক ভিক্ষুকের চুরি বলা যায়। বাংলা এবং ব্রিটেন যেমন একসঙ্গে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল, তেমনি একই সঙ্গে বিপর্যয়ে পড়ে। এই পিছলে পড়া সময়টাতে ব্রিটিশদের রাজধানী স্থানান্তর একেবারে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিয়েছিল।

অনেকের মতে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে 'সাম্রাজ্যের গোরস্থান'-এ সরিয়ে নেয়ার ফলে ইংরেজদের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। রাজধানী স্থানান্তরের ১২ বছরের মাথায় ভারত থেকে বিতাড়িত হয় ব্রিটিশরা। ব্রিটিশরা দিল্লী ছেড়ে যাওয়ার কয়েক বছর পর বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখতে এসেছিল

www.pathagar.com

ফরাসী স্থপতি লা কর্বুসিয়ার (Le Corbusier)। মোগল, লোদী, আফগান, ব্রিটিশ– সব সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখার পর লা কর্বুসিয়ারের মন্তব্য হচ্ছে, এই উপমহাদেশে ব্রিটিশদের ধ্বংসই সবচেয়ে করুণ।

করুণ অধ্যায়

ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিদ্বেষকে কাজে লাগালেও এবং এই বিরোধকে নজিরবিহীন পর্যায়ে নিয়ে গেলেও সমস্যাটার জন্ম ওরা দেয়নি। ১০৪৫ সালে আল-বিরুনী যখন মাহমুদের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন এই বিরোধ তখনো ছিল। এই বিরোধ বাড়তে বাড়তে ১৯৪৭-এ এমন এক পর্যায়ে উঠেছিল যে, তখন ওরা একসঙ্গে বসবাস করতে রাজী হলো না। সেই হিংসাত্মক দিনগুলোতে মুসলিম বাংলা (মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলা) এগারশ' মাইল দূরের তাদের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে মিলে পাকিস্তান সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে বাঙালি হিন্দুরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের তাদের জ্ঞাতি ভাইদেরই তাদের স্বজাতি মনে করে এবং একই ভাষাভাষী মুসলমান ভাইদের চেয়ে আপন ভাবে। তাই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবাংলা রাঢ় এবং মালদা নিয়ে আলাদা থাকার পক্ষে ভোট দেয় এবং ভারতের একটা প্রদেশ হয়ে ভারতের সঙ্গে থেকে যায়।

আজ, ৪৬ বছর পর, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ভাবতে অবাক লাগে, এগারশ' মাইল দূরের একটা জাতির অংশ হয়ে টিকে থাকার কথা কিভাবে ভেবেছিল বাংলাদেশ। ওদের ধর্ম এক হলেও ভাষা, জাতি, খাদ্যাভ্যাস, সঙ্গীত, শিল্পকলা কিংবা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সবই ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। আজ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের গাঁটছড়া বাঁধা যেমন অসম্ভব, তাদের হিন্দু ভাইয়েরা তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খদ্দের এবং নিকটতম প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও দেশ বিভাগের সেই উত্তাল দিনগুলোয় পাকিস্তানের একটা প্রদেশকে বাংলাদেশের কাছে কি মনে হতো সেটা এখন বোঝার উপায় নেই। এখন এদের ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; কিন্তু স্মৃতি বেদনার– খুন, ধর্ষণ, নিপীড়ন এবং ৩,৫০,০০০ বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিক এবং সাধারণ মানুষের করুণ মৃত্যু। এর সাক্ষ্য বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে জয়নুল আবেদীনের চেয়ে অনেক বেশি জায়গা দখল করে আছে।

তারপর, স্বাধীনতার পর কয়েক বছর যুদ্ধ, বন্যা, খরার ফলে আবারও হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে বাংলাদেশ। অতিসম্প্রতি তাদের স্বাধীনতার স্বপ্নের বাস্তবরূপ নেয়ার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এখন ওরা হিসেব করতে পারে এতগুলো বছর পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি থেকে ওরা কি পেয়েছিল। অবশ্য একটা ব্যাপার নিশ্চিত– কেউ বিশ্বাস করে না পাকিস্তানের অংশ হয়ে থেকে বাংলাদেশ এর চেয়ে ভালো করতে পারত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ অত্যন্ত গরীব। উচ্চ মর্যাদা নিয়ে অনেক লম্বা একটা সময় কাটিয়েছে সে। গড়ে রেখেছে এক সফল ইতিহাস। এদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রাচীন গ্রীক এবং পার্সীদের জানা ছিল। জানত জাপান ও চীন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবগুলো দ্বীপও। সুতাসহ সুতি পোশাকের প্রায় সকল পরিভাষা এখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার বয়ন প্রণালী অনুসরণ করে ব্রিটিশরা গড়ে তুলেছে তাদের সুতি শিল্প। পরবর্তীকালে যে শিল্প বাংলাদেশের (পৃথিবীর বৃহত্তর কাপড় রপ্তানিকারী দেশের) বাজার দখল করে নেয়। এখানকার ইটের প্রস্তুত প্রণালী ব্রিটিশ স্থপতিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। আর এদেশের প্রভাবেই যে ব্রিটিশ শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কাজেই আপনি যখন বাংলাদেশ ভ্রমণ করবেন, সম্ভাব্য সব রকমে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন। তবে তাদের এবং আপনার উভয়েরই উপকার হবে। যদি মনে রাখেন, যাদের সম্পর্কে আপনি জানতে চেষ্টা করছেন তারা বোঝে উন্নয়ন কাকে বলে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একজন তরুণ বিচক্ষণ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ভারতবর্ষের যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যে একটা অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করেন। ঘটনাটা হলো, কলকাতা থেকে দু'হাজার মাইল দূরে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তানের কাছাকাছি ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রতিপক্ষের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের গরীব মুসলমানেরা চাঁদা তুলে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়; উপরন্তু সেই যুদ্ধে বাংলার মুসলমানেরা অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশী মুক্তি সংগ্রামীদের এক-চতুর্থাংশ ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমান। এই চক্রান্ত কেন হলো, উইলিয়াম হান্টার তদন্ত করার চেষ্টা করেন। তদন্ত করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন বাংলার বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ মুসলমান; কিন্তু এই ব্যাপক মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের মনোযোগ নেই। হান্টার আরো লক্ষ্য করেন যে, বাংলার বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভালোরকম সচেতন থাকলেও, ভারতের পরবর্তী ব্রিটিশ শাসকেরা তা ভুলে যায়; এবং তার ফলে ব্রিটিশ শাসকেরা বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে একজোট হয় এবং বাংলার মুসলমানদের উপেক্ষা করে। উইলিয়াম হান্টারের এই আবিষ্কারের পর মুসলিম লীগ স্থাপিত হয় এবং পৃথিবীতে বাংলার মুসলমানদের অবস্থান নতুন করে নির্ণীত হয়, এবং ব্রিটিশ সরকারও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বাঙালি মুসলমানদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক হয়।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বাঙালি মুসলমানেরা উপরোক্ত চক্রান্ত কিভাবে সফল ও সংগঠিত করল, হান্টার ভালোভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন। অনুসন্ধান করতে গিয়ে হান্টার দেখেন, ব্রিটিশরা এদেশে আসার আগে প্রায় ১১৪ বছর মুসলমানেরা বাংলার শাসনকর্তা ছিল; মুসলিম-শাসিত বাংলায় ছিল সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্য; কিন্তু ব্রিটিশ দখলের পর থেকে বাংলায় দারিদ্র্য নেমে আসে। ব্রিটিশরা অভিজাত বাঙালি মুসলমানের জমিজমা হিন্দুদের দিয়ে দেয়; এর ফলে এমন কিছু হিন্দু ধনী হয়ে উঠল, যারা ছিল মুসলিম জমিদারদের চাকরবাকর। মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা– যে শিক্ষার মধ্যে ইতিহাস,

www.pathagar.com

বিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র, শিল্পকথা সবই ছিল– ব্রিটিশরা নির্মমভাবে এসব ধ্বংস করে ফেলে। আদালতে মুসলমানদের যে আধিপত্য ছিল, সেটাও চলে গেল ব্রিটিশ কিংবা হিন্দুর হাতে; কাজেই সিভিল সার্ভিসে বলতে গেলে মুসলমানদের কোনো অংশগ্রহণই থাকল না। অন্যদিকে সেনাবিহিনীতেও নেয়া হয় না মুসলমানদের, যদিও একদা এই সামরিক শক্তি মুসলমানদের কব্জায় ছিল। এসব কারণে মুসলমানেরা কি আর বাছাই করতে পারে, বিদ্রোহ ছাড়া?

এই পটভূমিতে উইলিয়াম হান্টারের 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' বইটি আধুনিক বাংলাদেশের সূচনা করে দেয়। হান্টার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, বাঙালি মুসলমানদের ঐতিহাসিক অতীত পর্যটন, মরুচারিতা ও আত্মপরিচয় অন্বেষণের আসল বাস্তবতা। মুসলমানেরা নতুন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আকুল হয়ে ভাবছে। উইলিয়াম হান্টার ধন্যবাদভাজন, কেননা, ব্রিটিশদের চোখে মুসলমানদের অস্তিত্ব তিনি টের পাইয়ে দেন। হান্টারের আলোচনার ফলে এটা বোঝা সম্ভবপর হয় যে, হিন্দুরা নয়, মুসলমানেরাই বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানদের বিষয়ে ব্রিটিশরা ভাবতে শুরু করে নতুন করে; ব্রিটিশরা মুসলমানদের প্রয়োজন ও বাস্তবতা অনুধাবন করার চেষ্টা করে। মুসলমানদের শিক্ষাগত প্রয়োজনের দিকে মুসলমানেরা তাকায়; এর ফলে স্কুলের সিলেবাসে আরবি, ফার্সি ও উর্দু ঢোকানো হয়, গরীব মুসলমান ছাত্রদের জন্যে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের চাকরিবাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।

তবে মুসলমানদের প্রতি নতুন অভিনিবেশের ভেতর কোনো মঙ্গল অন্বেষা ছিল না। ব্রিটিশরা দেখেছে, হিন্দুদের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে বাংলায় তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অতিরিক্ত বেড়ে গেছে এবং যে অঞ্চল ঘিরে বাঙালি হিন্দুর এই প্রতাপ সে অঞ্চলটা আবার বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। নিজের হাতে গড়ে তোলা এই দৈত্যের প্রভাব কমানোর জন্যে ব্রিটিশরা মুসলমানদের প্রতি মনোযোগী হয় এবং হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে দেয়। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ঘোষণা করে যে, শাসনতান্ত্রিক কারণে বাংলা প্রদেশ ভাগ করা হবে। কিন্তু এই ভাগ যতটা সাম্প্রদায়িক ছিল, ততটা প্রশাসনিক ছিল না। বঙ্গভঙ্গের একটা অংশে (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ) হিন্দুরা থাকবে, অন্য অংশে (বর্তমান বাংলাদেশ) মুসলমানেরা থাকবে। লর্ড কার্জনের এই ঘোষণা বাংলার রাজনীতিতে নিয়তির মতো; বিশ শতকী বাংলার সকল ইতিহাস ঠিক ওই মুহূর্ত থেকে শুরু হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বড় পরিবর্তন আনে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেক রকম বিভেদ ছিল বটে; কিন্তু

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু বা মুসলমান কেউই নিজেদেরকে আলাদা আলাদা জাতি বলে ভাবেনি। যদিও মুসলমনেরা এই অঞ্চল দখল করেছিল, তবু নয়। সমগ্র মুসলিম শাসনামলে, ১২০০ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত, হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্প্রীতির ভেতর বসবাস করেছে; দেখা যায় মুসলমানেরা শাসক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা দরবারে বড় বড় পদ অর্জন করে। আর যারা ছিল নিম্নবর্গীয় সাধারণ ব্রাত্যজন, হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান, তারাও সুসম্পর্কের ভেতর বসবাস করেছে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে প্রথমবারের মতো সেই সম্প্রীতিতে ভাঙন ধরল, হিন্দু-মুসলমান দুই আলাদা জাতিতে পরিণত হলো।

হিন্দু নেতারা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন প্রথম। ওই নেতারা মূলত পূর্ববাংলার জমিদার কিংবা কর সংগ্রাহক এবং এরাই পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সমাজের হর্তাকর্তা-বিধাতা। হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার যুক্তি হিসেবে ভাষা, জাতি, সংস্কৃতি এবং বাংলার মাটির ঐক্যের কথা বললেন। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে হিন্দুরা প্রায় বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলে যেন। হিন্দুদের কথায় মুসলমানদের সাড়াও মেলে, বিশেষত তাদের যারা ভাষার প্রতি মমত্বশীল, দেশের প্রতি দরদী। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম, মিছিল-মিটিং, শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন আসলে ব্রিটিশ বিরোধিতার প্রথম সংগঠিত সূচনা; এসব আন্দোলনই উত্তরকালে ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বরাজ, উপনিবেশ প্রত্যাখ্যানের রূপ নেয়।

অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান বঙ্গভঙ্গের সমর্থন জানায় এবং ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে। এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালি মুসলমানের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের, ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করেন (১৯০৬); কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হলেও ক্ষমতা ও রাজনীতিতে তার প্রভাব তখন তখনই বিরাট ব্যাপক হতে পারেনি। হিন্দুদের প্রভাব তখনো বেশি। মুসলমানেরা ছিল গরীব, তদুপরি ক্ষমতা থেকে দূরবর্তী; হিন্দুরা ছিল ক্ষমতাবান এবং তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল সুসংগঠিত।

হিন্দুদের আন্দোলন ছিল অত্যন্ত তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং সন্ত্রাসবহুল। হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতা ইংরেজদের ভাবিত করে; ১৯১১ সালে ব্রিটিশ পদস্থ কর্মকর্তারা সমস্ত খবরাখবর জানবার পর বঙ্গভঙ্গ রদে সিদ্ধান্ত নেয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও ব্রিটিশরা দুটো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে: (১) পূর্ববাংলার 'ঢাকা'য় একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, (২) কলকাতার বাঙালি হিন্দুদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর। ব্রিটিশদের কলকাতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ হিসেবে

www.pathagar.com

'বাংলার' গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়, আর অন্যদিকে এই পদক্ষেপ ব্রিটিশ উপনিবেশের সমাপ্তি ও দ্যোতক।

অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশের মুসলমানদের একটা জাগরণ জাগায়, এর ফলেই জন্ম হয় জাতীয়তাবাদের চেতনা; এই জাতীয়তাবাদ ভাষা, জাতি এবং সংস্কৃতিনির্ভর। এই জাতীয়তাবাদই ধীরে ধীরে অগ্নিশিখার রূপ নেয় এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের সহায়ক হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালির ভেতর জাতীয়তাবাদের প্রেরণা তৈরি করেন অসামান্য অনেকগুলো ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে। বঙ্কিম যে দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, সেটার একটা নির্বিশেষ রূপ থাকলেও, তিনি মূলত প্রচণ্ডভাবে মুসলিম বিরোধী ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর উপন্যাসে মুসলিম চরিত্র অর্থাৎ মোগলদের না এনে, বিরোধিতার জন্যে ইংরেজদের চরিত্রাঙ্কন করতেন, তাহলে সম্ভবত হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতিই সাম্রাজ্যবাদীদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হতো। তবে বঙ্কিমের উপন্যাসের গুরুত্ব অন্যত্র; তিনি উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালির হৃদয়ে ভাষার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করেছেন, দেশের প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে দিয়েছেন। এই চৈতন্যের একটা সদর্থক বিকাশ ১৯৬০ সালে ঘটে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অন্য একটি চেতনাও মানুষের ভেতর জন্ম নেয়, যার নাম 'সেক্যুলারিজম' বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এই সেক্যুলারিজম কেবল যে সাম্প্রদায়িক গণ্ডিমুক্ত একটা চেতনা, তা নয়; এর ফলে সাম্যবাদী রাজনীতির প্রসার ঘটে বাংলায়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় অনেকগুলো গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। এই গুপ্ত সংগঠনসমূহ সন্ত্রাসবাদী এবং ব্রিটিশ বিরোধী : এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন ক্যাডার এবং মতাদর্শ তৈরি করে– এদের মাধ্যমে সেক্যুলার রাজনীতিও উদ্দীপিত হয়েছে। গুপ্ত সংগঠনগুলো ১৯০৫, ১৯১৭ এবং ১৯৩১-৩৩ সালে অনেক সন্ত্রাসবাদী আচরণে ব্রিটিশ প্রশাসনকে বিপন্ন করে তোলে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক; হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কাবনতিতে ব্রিটিশদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। ধর্মীয় ভিন্নতার রাজনীতিকরণ ইতিহাসে দারুণ প্রভাব ফেলে। হিন্দু ও মুসলমান ভুলে গেল যে তাদের ধর্ম আলাদা হলেও তাদের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক। বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা উন্মীলিত হয়; মুসলমানেরা বুঝতে পারে, হিন্দু যত উদারমন্ত্রই প্রচার করুক না কেন, হিন্দুরা মূলত মুসলিম বিদ্বেষী। হিন্দু নেতৃত্বে মুসলমানদের আস্থা থাকল না আর। এগার শতকের আল-বিরুনী যে হিন্দু-মুসলিম অসদ্ভাব ও কলহের কথা বলেছিলেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে সেই পুরনো বিবাদ নতুন ফ্রেমে ফিরে এল আবার। মুসলমানদের মধ্যে একটি কথা প্রবলভাবে অনুভূত হলো যে,

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশভাগ অবধারিত। কিন্তু এটা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক সম্প্রদায়চেতন রাজনীতি; এই চেতনা দেশভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ও ঘনীভূত হয় এবং উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার পর স্তিমিত হয়। কিন্তু এই রাজনীতির পাশাপাশি আরেকটি ধারাও দেখা দেয়, সেটা ছিল সেক্যুলার ধারা; এই সেক্যুলার রাজনৈতিক ধারার পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং 'মুসলিম পাকিস্তান' প্রত্যাখ্যান। ১৯৭১ সালে মুসলিম পাকিস্তান ভেঙে তৈরি হলো সেক্যুলার বাংলাদেশ।

মুসলমান ও সেক্যুলার মানস

বাংলাদেশ একটি মুসলিম জাতি; ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়ার পর পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। এদেশের একশ' দশ মিলিয়ন মানুষের মধ্যে শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলমান। এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস, এই বিপুল পরিমাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনের চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি মুসলমান না হতো, বাংলাদেশ ভাগ হতো না; বাংলাদেশ আজও হয়তো ভারতের অংশ হয়ে থাকত।

দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশীরা 'ইসলাম'কে খানিকটা আতংকের চোখে দেখে; মনে করে 'ইসলাম' মানে সন্ত্রাস, সামরিকবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও মৌলবাদগ্রস্ততা– বিগত কয়েক বছরের বিভিন্ন ঘটনা 'ইসলাম' বিষয়ে এই 'ইমেজ' তৈরি করে দেয়। কিন্তু ইসলামের এই আতংকজনক ইমেজের পেছনে সারা পৃথিবীর 'এক বিলিয়ন' মুসলমান দায়ী নয়, কিছুসংখ্যক মুসলমানই ওইসব সন্ত্রাস প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় দিয়েছে। অধিকাংশ মুসলমান তো এমনকি মধ্যপ্রাচ্য কিংবা উত্তর আফ্রিকায় বাস করে না; তাদের বাস এশিয়ায় এবং এরা ওইসব ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন।

বাংলাদেশের ইসলাম একমাত্র রাজনৈতিক মনোভঙ্গি নয়। একটা সম্পূর্ণ মতাদর্শিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে যখন ব্রিটিশ অধীনে বাংলার সামান্য স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়, তখন এ. কে. ফজলুল হকের মতো একজন নেতা জমির কর ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং আরো ভালো কর্মক্ষেত্রের কথা বলে মুসলমানদের ভোট পেয়ে যান। ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মের কোনো কথা ছিল না, এ ছিল সম্পূর্ণ সেক্যুলার প্রচারণা; তবু ফজলুল হক নির্বাচনে মুসলমানদের ভোটে জয়লাভ করেছেন। এই সেক্যুলার রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি। কেবল ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিচালিত হয় মুসলিম লীগ দ্বারা; কিন্তু এই মুসলিম লীগ ইরানের মুসলিম রাজনৈতিক দলের তুলনায় অনেক সেক্যুলার, অনেক আধুনিক ছিল। সেই মুসলিম লীগই হিন্দু ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, বামপন্থীদের

www.pathagar.com

সঙ্গে মিলিত হয়ে। ১৯৫৩ সালের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি সেক্যুলার এবং আধুনিক।

এই পটভূমিতে বাংলাদেশের 'ইসলাম'কে কিভাবে ব্যাখ্যা করব আমরা? ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পূর্বে, বাংলাদেশের রাজনীতি মোটামুটি দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল। এই ভাগ হলো মুসলিম লীগের, এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি খুব বড় ছিল না এবং এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সালে। কিন্তু সেই সময়ের মুসলিম লীগ, বাংলাদেশের মুসলমানদের নিজস্ব সমস্যা উপেক্ষা করে। এর কারণ মুসলিম লীগের জাঁদরেল নেতারা বাংলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেননি; বাংলা মায়ের সন্তান না হওয়ায় এবং তাদের অধিকাংশের সাংস্কৃতিক শেকড় উত্তর ভারতে চিহ্নিত থাকায়, কিংবা কেউ কেউ শিয়া মতাবলম্বী (সুন্নী নয়) হওয়ায় (যেমন আগাখানের অনুবর্তী ইসমাইলীরা) বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের সমস্যা ওইসব অভিজাত নেতারা বুঝতে পারেননি।

পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকা সফরে আসেন; বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না ভালো করে। তিনি ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন 'উর্দুই হবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা' (যে উর্দু ইন্দো-আর্য ভাষাবংশের সদস্য, যা ফার্সির সঙ্গে সম্পৃক্ত); আর তখনই ঢাকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্বিৎ ফেরে, আর তখন থেকেই বাংলাদেশের সেক্যুলার রাজনীতির ঐতিহাসিক সূচনা।

পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় একটা রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী লীগে'র জন্ম হয়, ভস্মের ভেতর থেকে ফিনিক্স পাখির মতো; এর পেছনে দুজন নেতার ভূমিকা—হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে ফজলুল হক যে সেক্যুলার রাজনীতির সূচনা করে গিয়েছিলেন, সেই রাজনীতির অন্তঃসার আত্মস্থ হয়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে। ক্রমে ক্রমে আওয়ামী লীগ একটা বড় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়; প্রথমে শুধু বাংলাদেশে, পরে পুরো পাকিস্তানে। দলে যারা এসে কাজ করছিল তারা মূলত এমন সব পরিবার থেকে এসেছিল যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ছিল। আওয়ামী লীগের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা; আওয়ামী লীগের লক্ষ্য সম্পূর্ণ হলেও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সোহরাওয়ার্দীকে অফিস থেকে বহিষ্কার করে, এবং তার কিছু পরেই সামরিক শাসন জারি হয়। সোহরাওয়ার্দীকে বহিষ্কারের ফলে যে সংকট সৃষ্টি হলো, তা আওয়ামী লীগ কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়; এবং ১৯৬০ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান বিরোধী বাঙালির বিকাশে স্মরণীয় নেতৃত্ব দেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের আরেকটা সেক্যুলার রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা হলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, তাঁর দলের নাম ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক নেতা, সত্যিকার দেশজ নেতা (ইনডিজেনাস লিডার)। চীনাপন্থী ও রুশপন্থী– এই দুই ভাগে বিভক্ত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ১৯৬৩ সালের পর থেকে বাংলাদেশের মানুষকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় আন্দোলিত করে এবং এই রাজনৈতিক দলের ভাবাদর্শ দুটো পত্রিকাকে কেন্দ্র করে অভিব্যক্ত হয় : 'সংবাদ' ও 'ইত্তেফাক'। 'সংবাদ' প্রকাশ করেন আহমেদুল কবির; আর 'ইত্তেফাক'-এর জনক হলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। মানিক মিয়ার পুত্র আনোয়ার হোসেন (মঞ্জু) বর্তমানে এই পত্রিকার সম্পাদক। ইত্তেফাক বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী দৈনিক।

এই সময়ে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পলিসি অনুসারে ধর্মকে ব্যবহার করতে থাকে। পাকিস্তান সরকার বহু পূর্ব থেকেই ধর্মকে সমাজ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যহার করে আসছিল। ব্যবহারের একটি নমুনা হলো, ১৯৬৪ সালে, এখান থেকে দু'হাজার মাইল দূরে শ্রীনগরে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর একটা সংরক্ষিত চুল চুরি হয়; পাকিস্তান সরকার এই ঘটনাকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। পাকিস্তান সরকারের উস্কানিতে অমুসলিম নিধন ও লুণ্ঠনযজ্ঞ শুরু হয় বাংলাদেশে এবং এই ঘটনায় বর্তমানে গ্রন্থকারের ভাই (ক্যাথলিক সাধু পুরুষ এবং ইসলামী বিষয়ে সুপণ্ডিত) প্রাণ হারায়। যাই হোক, এসব ঘটনা দিয়ে ভোটারদের কাছে কোনো আবেদন তৈরি করা যায়নি। সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে মানুষের সামনে তুলে ধরে এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ঐক্যের বোধ সঞ্চারিত হয়।

এই সময়-পর্বে অর্থাৎ ষাটের দশকে, বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়; এবং সেই গুরুত্বের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান, এম. এন. রায়ের (মানবেন্দ্রনাথ রায়) মানবতন্ত্রী চিন্তাধারা, পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের ঘটনাপ্রবাহ এদেশের মানুষকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে। রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গীতশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের নিত্যচর্চার অংশ হয়। বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান সুপ্ত বাঙালিদের জাগিয়ে তোলে; এ জাগরণ অনেকটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দুর জাগরণের সঙ্গে তুলনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দেন, সেই জাতীয়তাবাদের

www.pathagar.com

বিপ্লবাত্মক প্রেরণায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা ও সাফল্য। অভিন্ন জাতীয়তাবোধের জনয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম; কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান বাঙালি মুসলিম সমাজের ভেতর অসামান্য রেনেসাঁস তৈরি করে দেয়। এছাড়া আরো একজন আছেন, যাঁর কাছে নবোদ্ভূত ও নবজাগ্রত বাঙালির ঋণ অফুরন্ত, তিনি হলেন বাউল সম্রাট লালন শাহ। লালন শাহের গানের ভেতর দিয়ে অসাম্প্রদায়িক মুক্ত মানববোধ সঞ্চারিত হয় বাঙালির মনে এবং লালন শাহের গান যে মতাদর্শ রচনা করে, তা একদিকে মানবিকবাদী, অন্যদিকে পিউরিটান ইসলামতন্ত্রের বিরোধী। ষাটের দশকের শেষে এসে বাঙালি মুসলিম এলিট বুঝতে পারে, বাঙালিরা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যেরকম আন্দোলন এবং নানা প্রকার গুপ্ত সংগঠন গড়ে উঠেছিল, ষাট দশকের তরুণেরাও ওরকম ভিন্ন গুপ্ত সংগঠনে যুক্ত হয়: এই গুপ্ত সংগঠনগুলো হলো জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী, মাওবাদী কিংবা সশস্ত্র সেক্যুলার; এরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়। বর্তমান গ্রন্থকারের সঙ্গে ভারতের ভগবত সিংহের আলাপ হয়; ভগবত সিংহ ইন্ডিয়ান আর্মি জেনারেল, স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশে সক্রিয় ছিলেন, এবং তাঁর কথা থেকে বুঝেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের গেরিলা সংগঠনগুলো ভারত থেকে এবং অন্যান্য দেশ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছিল। অনেক পেশাদার বিক্ষোভকারীও বাংলাদেশের আন্দোলন উজ্জীবিত করে; এদের মধ্যে কেউ কেউ ভারত থেকে আসা, এরা ছাত্রদের মধ্যে কাজ করে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এরা যাত্রার মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করত। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাডারদের ট্রেনিং দেয়া হতো এবং এই ঐহিত্য এখনো অব্যাহত।

ষাট দশকের শেষের দিকে ছোট ছোট ইসলামী দলগুলো পাকিস্তান সরকারের বিশ্বস্ত অনুচর হয়ে থাকল; আর ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের বিক্ষোভের অনুবর্তী হয়ে বসলো, 'তাদের ভাষা ব্যবহার হবে এবং তাদের কথা শুনতে হবে। যুদ্ধ যখন শুরু হলো, ইসলামী দলগুলো সমর্থন করল পাকিস্তানীদের; তাদের নেতাদের মধ্যে গোলাম আযমের কথা বলা যায়, গোলাম আযম গণবিক্ষোভের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবীদের সমর্থন দেয়। গোলাম আযম ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্রনেতা হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং স্বাধীনাতাবিরোধী গোলাম আযম এখন জামায়াতে ইসলামীর আমীর। ইসলামী দলগুলোর ভাবমূর্তি বহুকাল যাবৎ ঘৃণাব্যঞ্জক ছিল, অতিসম্প্রতি তারা আবার সক্রিয় হয়েছে এবং প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। (কিন্তু বাংলাদেশে

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী এখনো বিতর্কিত ও নিন্দিত মৌলবাদী রাজনৈতিক দল; এ বই যখন লেখা হচ্ছিল তখনো স্বাধীনতাপন্থীদের সঙ্গে জামায়াতের মৌলবাদীদের ভীষণ ঝগড়া চলছিল সংসদে। ঝগড়ার বিষয়: গোলাম আযমের নাগরিকত্ব এবং তার যুদ্ধাপরাধের শাস্তি। ১৯৯৩ সালের প্রথমদিকে গোলাম আযমকে জেলেও নেয়া হয়।)

বাংলাদেশের রাজনৈতিকতায় 'ইসলাম'-এর প্রত্যক্ষ প্রচণ্ড প্রভাব নেই, এই কারণে। কাজেই ১৯৯১ সালের জাতীয় নির্বাচনে বাংলাদেশের বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ যখন তিন ভাগের দুই ভাগ ভোট পেয়ে যায় এবং ইসলামী দলগুলো পায় মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট, তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। তবে রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ 'ইসলামী' না হতে পারে; কিন্তু সামাজিকভাবে বাংলাদেশ ইসলামী দেশ; যেরকম উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্র সামাজিকভাবে একটা খ্রিস্টান দেশ, রাজনৈতিকভাবে নয়। সামাজিক ধর্ম এবং রাজনৈতিক ধর্মের এই পার্থক্য গুরুতর। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আরামেই আছে, সংখ্যালঘুদের নাগরিক অধিকার সমান। যে কারণে মোট জনসংখ্যার দশভাগ হিন্দু হলেও, দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাবাণিজ্য, চাকরিবাকরি সকল ক্ষেত্রে তাদের ভালো একটা অবস্থান আছে। ব্যবসায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুরা আছে। হিন্দুদের তুলনায় যারা সংখ্যায় কম যেমন– বৌদ্ধ, আদিবাসী কিংবা খ্রিস্টান, তাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পলিসি সমান। বাংলাদেশে সকল সংখ্যালঘু সন্তোষজনক জীবনযাপন করে এবং পারিবারিক বিষয়ে তাদের ধর্মমত গুরুত্বের সঙ্গে অনুসরণ করা হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠী মনেপ্রাণে মুসলমান এবং তারা নিজেদেরকে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রাদায়ের অংশ মনে করে এবং তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অনুশাসন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। ইসলামের অতীন্দ্রীয় আল্লাহ, হজ্ব, নামাজরোজা সর্বক্ষেত্রে মুসলমানেরা নিষ্ঠাবান কর্মী। এই সরল ধর্মবোধ এবং জীবনযাপন সর্ব মুহূর্তের সত্য।

ধর্মবোধের এই রূপকরণ সামাজিক সংহতিকে অটুট রেখেছে। ইসলামী মূল্যবোধের সূত্রে মানুষের ভেতর ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, দয়া, করুণা, মমতা, নিগৃহীত বিধবা মেয়েমানুষের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছে। এই মূল্যবোধের ভিত্তিতেই সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সরকারের বিরূপ আচরণের সমালোচনা করে। ইসলামের কারণে বাংলাদেশের সমাজ আন্তঃনির্ভরশীল ও মমত্বময়।

ইসলাম কখনোই তাকবন্দী উচ্চমার্গীয় চার্চ নয়; ইসলামে মার্গীয় পদ্ধতিবাদ নেই, ইসলাম এপিসকপালিয়ানসের মতো নয়। ইসলামে কোনো বিশপ বা

www.pathagar.com

আর্চবিশপ নেই, যারা মুসলমানদের জন্যে বছর বছর নতুন নতুন অনুশাসন তৈরি করবে। ইসলামের ঐক্যবোধ তৈরি হয়েছে ধর্মের অন্তর্নিহিত অনুভূতি থেকে, নামাজের মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে, আজান, মসজিদ এবং কাতারবন্দী নামাজ পড়ার পদ্ধতি থেকে। বিশ্বাসের এই ঐক্য ও সরলতা এবং মানুষের সহজ স্বতঃস্ফূর্ততা কোনোরকম জোর প্রয়োগ ছাড়াই মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। মুসলমানদের বিশ্বাসের একাত্মতা কোনো রেজিমেন্টেশন থেকে তৈরি হয়নি। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে মুসলমানদের আশ্চর্য ধৈর্য অবাক করে; যত কিছুই হোক, তারা নামাজ পড়ে, মসজিদে যায়, রোজা রাখতে বা জুমায় অংশগ্রহণে ভুল হয় না। বাংলাদেশের সমাজে যারা সুদে টাকা ধার দেয়, গরীবদের ভালোবাসে না, বৃদ্ধ মানুষের যত্ন নেয় না, পতিত কিংবা বিধবা নারীকে সাহায্য করে না, তাদের কেউ পছন্দ করে না, যেসব সন্তান বৃদ্ধ মা-বাবাকে যত্ন করে না, বাংলাদেশের মানুষ তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ভোগ, সম্পদশালীতা যাদের কাছে বড় ব্যাপার, তাদেরকে কেউ পছন্দ করে না।

ইসলাম ছাড়া বাংলাদেশকে ভাবা যায় না। ইসলামের মূল্যবোধ থেকে সামাজিক নির্ভরশীলতার চেতনা এসেছে মানুষের মধ্যে; ফলে কোনো সংগঠন ইত্যাদির বালাই ব্যতিরেকে 'বিধবা'দের জন্যে দরদ ও সমাজ পরিসরে তাদের কাজের সুযোগ সাধারণ ঘটনা। প্রতিবেশী কোনো বিধবা থাকলে, তার যত্ন নেয়া কর্তব্য বলে মনে করে গৃহস্থ লোকেরা; হয়তো এক কাপ চাল দিয়ে সহযোগিতা করে, কিন্তু করে এটাই সত্য। দেখা যায়, ব্যবসায়ী দোকানদারেরা কয়েন রাখে ফকিরদের দেয়ার জন্যে; ফকির এসে দাঁড়ালে একটা করে কয়েন ধরিয়ে দেয় তারা। তবে ঢাকা বা চট্টগ্রামে ফকির নেই, এমন নয়। কিন্তু ঢাকা-চট্টগ্রামের ফকির দেখে বোঝা যায় যে রাষ্ট্র তাদের জন্যে এখনো কোনো কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। কিন্তু গ্রামেগঞ্জে এদের জন্যে সামাজিক অনুভূতি রয়ে গেছে। কাজ না পাওয়া ভূমিহীনদের কাজ জুটিয়ে দেয়া, গরীব পরিবারকে খাবার বা কাপড় দিয়ে সাহায্য করার রেওয়াজ ঘরে ঘরে আছে। পঙ্গু, অক্ষম, দুস্থদের ত্রাণ ব্যবস্থা সমাজে রয়েছে। যেসব মেয়ে তালাকপ্রাপ্তা হয়, তার মা-বাবা এবং ভাই তাদের চালায়। তাছাড়া হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বিপরীত ইসলামী উত্তরাধিকার আইন; ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীরাও সম্পত্তি পায়– পুরুষদের সমান হয়তো পায় না, কিন্তু পায়। তাছাড়া গ্রামে গ্রামে সালিশ-বিচারের ব্যবস্থা আছে; স্থানীয় বিবাদ মীমাংসা করে থাকে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং এসব বিবাদের জন্যে সিভিল কোর্টে না গিয়ে মানুষ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেয়, এটাও গ্রামীণ বাংলাদেশে সংহত সমাজের একটা বড় বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

এটা সত্য যে, ইসলাম নারীকে সর্বতোভাবে পুরুষদের সমকক্ষ মনে করে না। কিন্তু বাংলাদেশের ইসলামকে যদি অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে প্রতিবেশী অনেক ধর্মমতের চেয়ে ইসলাম অনেক বেশি মানবিক। ইসলাম কখনো দাবী করে না, স্বামী মরলে তার সঙ্গে তার স্ত্রীকেও সহমরণে যেতে হবে; অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীতেও হিন্দুরা মেয়েদের জন্যে এই বিধান রেখেছিল। ইসলাম বিধবার বিবাহকে কেবল অনুমোদনই করেনি, উৎসাহিতও করেছে; অথচ হিন্দুধর্মে বিধবা বিবাহ এখনো নিষিদ্ধ। এসব কারণে বাংলাদেশে ইসলাম অনেকটা আলোকপর্বের মতো, ইংরেজিতে যাকে বলে 'এনসাইটেনমেন্ট'। একজন মুসলিম নারী ইচ্ছে করলে তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে এবং একজন বিধবা চাইলে পুনরায় বিবাহ করতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের কমসংখ্যক মহিলাই বোরখায় শরীর ঢাকে; অনেকে তো চাদর বা উত্তরীয়ও ব্যবহার করে না; অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা পাকিস্তানের মুসলিম মেয়েরা যেরকম পোশাক-আশাকে আবৃত থাকে, বাংলাদেশের মেয়েদের তা দরকার করে না। (তবে কখনো কখনো বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে মেয়েরা কাপড়চোপড়ে সংযত হয়ে ওঠে : যেমন– ১৯৮২ সালে যখন সামরিক আইন জারি হলো, কিংবা ১৯৯২ সালে যখন গোলাম আযম গ্রেফতার হলো।) সবচেয়ে বড় কথা, শহরের মেয়েরা তো পশ্চিমের দেশগুলোর মেয়েদের মতোই স্বাধীন, কেবল পাশ্চাত্যের মতো শারীরিক সম্পর্ক বা ওই ধরনের বন্ধুত্ব ছাড়া। তবে বাংলাদেশের মুক্ত ও বন্ধুত্বভাবাপন্ন মেয়েরা পাশ্চাত্যের মেয়েদের তুলনায় অনেক ভদ্র ও মার্জিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাতৃপ্রেম ও মাতৃতন্ত্র বাংলাদেশের সমাজের আরেক বৈশিষ্ট্য; পশ্চিমের সমাজে মায়ের প্রতি সন্তানদের এরকম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখা যায় না। মাতৃপ্রেম হলো বাংলাদেশে ভালোবাসার উচ্চতম স্তর। মাতৃপ্রেমের এই প্রবণতার একটা প্রাক-আর্য ঐতিহাসিকতাও আছে অবশ্য; প্রাক-আর্য সময় থেকে মহাজননীর পূজা, প্রকৃতিকে মাতৃরূপে কল্পনা এবং দেশকে জননীরূপে ভালোবাসা ঐতিহাসিক-পৌরাণিক ঘটনা। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে এই মাতৃ-আবেগ ফল্গুধারায় বহমান। ইসলামেও মাতার 'ইমেজ'কে বড় করা হয়েছে; বিশেষত নারীদের জন্যে পর্দার বিধান এবং নারী-পুরুষের অবস্থান ও ভূমিকাগত পার্থক্যে সেই ধর্মীয় মাতৃতান্ত্রিক প্রতিমা স্পষ্ট। এসব কারণে ইসলামে মায়ের ভূমিকা বড় হয়ে উঠেছে অনেক। বাংলাদেশের সমাজ যে বিদেশীই বুঝতে চাইবেন, তাকে এই দিকটার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থনৈতিক জীবনেও নারীর ভূমিকা এখানে গৌণ নয় (মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে দুজন বিত্তশালী ব্যক্তিত্বই মহিলা); সকল প্রকার পেশায় মহিলারা রয়েছে। পাশ্চাত্য লোকেরা প্রায়ই ভুল ব্যাখ্যা করে বলে যে, বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সামাজিক ক্ষমতায় মেয়েদের অংশগ্রহণ নেই। আসলে তো এদেশের মেয়েরা ক্ষমতায় সারাৎসার অঙ্গীকার করে নিয়েছে; যে ক্ষমতা পশ্চিমের মেয়েদের নেই।

স্বাধীনতার পর থেকে এখানকার মেয়েদেরকে উচ্চশিক্ষায় ভীষণ অনুপ্রাণিত করা হয়েছে– যে অনুপ্রেরণা আর কোনো মুসলিম দেশে দেখা যায় না (বাংলাদেশের একজন উল্লেখযোগ্য ইসলামী ঐতিহাসিক ও নারী : তাঁর নাম সুফিয়া আহমেদ)। স্বামী ও স্ত্রীদেরকে জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেয়, এবং কর্মজীবী মহিলাদের মধ্যে তাদের সম্মানও যথেষ্ট আছে; রাজনীতিতেও অনেক মহিলা সক্রিয় রয়েছে। তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে দুটো দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলা, খালেদা জিয়া জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী, শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের; আর এর মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, খালেদা জিয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনাও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন একদিন।

বিপরীত, পুরুষদের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি মেয়েদের তুলনায়। বাংলাদেশের মায়েরা ছেলে-সন্তানের যে পরিমাণ যত্ন করে, কন্যা-সন্তানের অতটা যত্ন নেয় না; ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে ভালো এবং প্রয়োজনীয়, এই ধারণা বেশ বদ্ধমূল এখানে। যে জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের সংখ্যা বেশি এবং গ্রামের স্কুলগুলোতেও দেখা যায় মেয়েদের তুলনায় ছেলে ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। ছেলেদের তালাক দেয়ার অধিকার স্বীকৃত এবং একসঙ্গে চারজন স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ ছেলেদের রয়েছে (অবশ্য দুজন স্ত্রী থাকাও এখন দুর্লভ দৃষ্টান্ত, বিশেষত শহরাঞ্চলে)। একটা রসিকতা তো এখনো চালু আছে : যদি কোনো অ্যামেরিকানের হাতে পয়সা আসে, সে কেনে গাড়ি; যদি কোনো হিন্দুর হাতে টাকা আসে, সে কেনে জমি; যদি কোনো মুসলমানের হাতে একটু বেশি টাকা আসে, সে আরেকটা বিয়ে করে।

বাংলাদেশের ধর্ম যে ইসলাম, এটা বাংলাদেশের জন্যে একটা বড় প্রাপ্তি; কেননা, ইসলাম এমন ধর্ম, স্বভাবের দিক থেকে যা আন্তর্জাতিক এবং চরিত্রগতভাবে বহির্মুখী। ইসলাম বর্ণবাদ বিরোধী এবং ইসলাম যথার্থই আন্তর্জাতিক ধর্ম। তাছাড়া জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে এবং সে ঐতিহ্য– ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, আইন, সমরশাস্ত্র, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ঘরানায় ব্যাপ্ত। ইসলামের নিজস্ব একটা শিক্ষাব্যবস্থাও রয়েছে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে।

মুসলমানেরাই প্লেটো এবং এরিস্টটলকে রক্ষা করেছে, ইউরোপের তখন অন্ধকার যুগ। ইউরোপের রেনেসাঁস মূলত ইবনে রুশদ এবং ইবনে সিনার জ্ঞান-

www.pathagar.com

মনস্বিতার উজ্জ্বল পরিণতি। বিখ্যাত ইহুদী পণ্ডিত মেইমোনিডস এবং শ্রেষ্ঠ ক্যাথলিক মনীষী সেইন্ট টমাস একুইনাস– তাদের চিন্তাধারার জন্যে মুসলিম মনীষী ইবনে রুশদের কাছে ঋণী। তার কারণ এরিস্টটলের টেক্সট ইবনে রুশদ ব্যাপকভাবে নিজ ভাষায় অনুবাদ ও সংরক্ষণ করেন। রাজনীতির চিন্তার ইতিহাসে মধ্যযুগের মুসলিম মনীষী আল-ফারাবীর অবদান অসামান্য এবং আল-ফারাবীর চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রেও একটা ভাবুক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, যারা 'স্ট্রাউসিয়ান স্কুল' নামে পরিচিত। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত স্ট্রাউসিয়ান ঘরানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতি তত্ত্বে গভীর প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে। একইভাবে আরব মুসলমানেরা জ্যামিতি এবং অঙ্কশাস্ত্রও সংরক্ষণ করেছে এবং ইউরোপকে শিখিয়েছে আধুনিক আরবী গণনা পদ্ধতি। আরবরা তাদের সংখ্যাতত্ত্বের প্রণালীকে 'ভারতীয় সিস্টেম' বলে থাকে, কারণ সংখ্যাতত্ত্ব মূলত আল-বিরুনীর ছাত্রদের কাছ থেকে অন্যরা শিখেছিল। মুসলমানেরাই ইউরোপকে কম্পাস, রাডার এবং গান পাউডারের সঙ্গে পরিচিত করায় এবং মুসলমানদের দর্শন ইউরোপের সৌজন্যবোধ এবং নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

বাংলায় ইসলামের প্রভাবের কারণে, ইংরেজদের আগমনের পূর্বে, বাংলার শিক্ষা চলত করমুক্ত জমির আয় থেকে। মিস্টার বেইলি নামক এক ব্রিটিশ ইসলাম বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, 'শিক্ষা'র এই বিশেষ সুবিধের কারণে ভারতবর্ষে এই দেশজ শিক্ষাধারা অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করে এবং ঐশ্বর্যময় হয়। প্রাগ ঔপনিবেশিককালে এটাই ছিল ভারতবর্ষের সর্বোন্নত শিক্ষাব্যবস্থা। ব্রিটিশরা এসে করমুক্ত জমির আয় থেকে প্রাপ্ত সুবিধেগুলো তুলে দেয় মুসলিম বিদ্যাপীঠ থেকে; যখন এই সুযোগ উঠিয়ে দেয়া হলো তখনো প্রায় ১ লাখের মতো বিদ্যার্থী শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ওসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিল। এই শিক্ষাধারা ব্রিটিশ নির্মিত শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় অনেক বড় এবং অনেক ব্যাপক ছিল। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ কর্তৃক আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্বে এই প্রাচীন দেশজ শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা বিকশিত হয়েছে; এখন অবশ্য বাংলাদেশে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত যার মধ্যে একটার নাম 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'।

যেহেতু ইসলামের সঙ্গে যোগ আছে বাকি পৃথিবীর, কাজেই খ্রিস্ট ধর্ম এবং ইহুদী ধর্মের সঙ্গেও তার গভীর সম্পর্ক। ইসলামও মনে করে স্রষ্টা একজন; ইসলাম হযরত মুসা এবং হযরত ঈসাকে নবী বলে স্বীকার করে; ইহুদী ধর্মের মতে ইসলামেরও বিশ্বাস, 'ধর্ম' মূলত কতিপয় বিধি-বিধানের ওপর নির্ভরশীল; খাদ্যদ্রব্য ও আহারবিধিতেও ইহুদী ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের যথেষ্ট মিল। সবচেয়ে বড় কথা, মুসলমানেরা খ্রিস্টানদের প্রতি যথেষ্ট সহিষ্ণু (মনে রাখা দরকার খ্রিস্টান স্পেন

www.pathagar.com

মুসলিম শাসিত ছিল); ইসরাইলের ইহুদীরা ফিলিস্তিনী মুসলমানদের যতটা ঘৃণা করে, মুসলমানেরা তারচেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতিশীল ও দরদী।

বাংলাদেশের লোকেরা ঠিকই বলে যে, ইসলামের সঙ্গে ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মের যে ব্যাপক মিল এবং সম্পর্ক আছে, এটা অনেক বিদেশী উন্নাসিক পর্যটক বুঝতে পারে না। বুঝতে না পেরে ইসলাম ধর্মকে তারা খাটো করে দেখে। ইসলাম ধর্ম তো ইহুদী-খ্রিস্ট ধর্মের ধারানিঃসৃত একটি ধর্ম এবং সেই সূত্রে এই ধর্মগুলোর মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্ক বিদ্যমান। এমনকি ক্রুসেড এবং আধুনিক ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যেও জ্ঞাতি সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ দুই ধর্মের অভিজ্ঞতা নিহিত আছে।

তবে বাংলাদেশের ইসলাম ধর্মের কয়েকটি প্রকরণ আলোচনা করা দরকার। গ্রামীণ বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান 'সুন্নী' অর্থাৎ তারা ইসলামের চার ধর্ম পথের মধ্যে সুন্নী পথের অনুগামী। সুন্নী ইসলামের উত্তরাধিকারের প্রাচীনতম উৎস হযরত মুহম্মদ (সঃ) : মহানবীর (সঃ) বাণী, আইন অনুশাসন ও সুন্নতে এদের স্থির অবিচলিত আস্তা। আরেকটা ক্ষুদ্র উপ-মুসলিম সম্প্রদায় আছে, এরা 'শিয়া'; এবং মূলত উচ্চবর্গীয় এবং সংখ্যায় সামান্য। 'শিয়া'দের ধর্মমতের ঐতিহ্য ও উৎস হাসান-হোসেনের মৃত্যু ও কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই 'শিয়া'রা যদিও চমৎকার বাংলা বলে, তবু তাদের প্রথম ভাষা 'ফার্সি', কেননা, তাদের পূর্বপুরুষেরা পারস্য থেকে আগত। আরেকটা সম্প্রদায় আছে 'ইসমাইলী' যার নাম, এদের আগাখানীও বলা হয়; এদের শেকড় মধ্যপ্রাচ্যে। আরেকটা সম্প্রদায় আছে, যার নাম 'কাদিয়ানী' বা 'আহমদিয়া সম্প্রদায়'; এদের উৎসমূল পাকিস্তানে।

এসব সম্প্রদায়ের ভেতর আবার উপ-সম্প্রদায় আছে। উদাহরণস্বরূপ, সুন্নী সম্প্রদায়ের একটা উপাঙ্গ বা উপ-শাখা হলো ওহাবী মতাবলম্বী; ওহাবীরা সৌদি আরবের জঙ্গী, পিউরিটান, তওহীদবাদের অনুগামী। আরেকটা ধর্মীয় মতাদর্শ বা সম্প্রদায় হলো পীরবাদী; যেমন বর্তমানে আটরশির পীর। সব পীরই যে বাংলাদেশের তা নয়, কেউ কেউ ভারত-পাকিস্তান থেকেও এসেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশে আছে তবলীগী সম্প্রদায়; তবলীগ আসলে কোনো সম্প্রদায় নয়, এদের কাম্য হলো ইসলামেরই ভেতর বক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করা। কোনো কোনো উপলক্ষে অর্ধ-মিলিয়ন তবলীগপন্থী একত্রিত হয়ে যায়, শোভাযাত্রা বের করে। এছাড়া ধর্মভিত্তিক কিছু রাজনৈতিক দলও আছে; এরা সেক্যুলার মুভমেন্টে জড়িত– যেমন লিবীয় সাম্যবাদপন্থী। এরা মূলত 'শিয়া', যারা ইরান বিপ্লবের অনুরাগী, আবার কেউ কেউ আছে সাদ্দামভক্ত। এছাড়া বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মৌলানা-মৌলবী রয়েছেন, যারা তরুণদের ইসলামের পথে আহবান করেন এবং এদের তরুণ শিষ্যরা মৌলানাদের বিশ্বস্ত অনুগামী।

www.pathagar.com

তবে আবার প্রবলভাবে মৌলবাদপন্থীও বাংলাদেশে রয়েছে; এরা অনেকটা ইরান এবং সৌদি আরবের মৌলবাদীদের মতো। এই ধরনের মৌলবাদীরা অনেকটা ঊনিশ শতকী সংস্কারবাদীদের মতো; এই ধরনের মৌলবাদীদের মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক ধর্মীয় ভাবাদর্শের মিশ্রণ। মৌলবাদীরা তখনই সক্রিয় হয় যখন সমাজের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন, স্বভাবগত পরিবর্তন, পারিবারিক জীবনে অমিতাচার এবং দরিদ্রের প্রতি অযত্ন বেড়ে যায়। সেদিক থেকে ইসলাম এমন একটা ধর্ম, যার মধ্যে মানব জীবনের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের মতাদর্শ ও কর্মবিধি রয়ে গেছে।

বর্তমানে, গোঁড়া কিন্তু বড়, মৌলবাদী রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর কথা বলা যায়। গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামীর প্রধান, যাঁর নেতৃত্ব বিতর্কিত। জামায়াতে ইসলামীর তিনটি স্তর আছে : প্রথম স্তরে আছেন নেতৃবৃন্দ; আরেকটা হলো সংগঠনের স্তর; তৃতীয় স্তর হচ্ছে কর্মীবাহিনী। জামায়াতে ইসলামীর আড়াই লাখ নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বস্ত কর্মীবাহিনী আছে। জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সভা, শোভাযাত্রা এবং কাজকর্ম সবই খুব সুশৃঙ্খল। জামায়াতে ইসলামীর শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মসংগঠন ও তার অগ্রযাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে নিয়ত। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পর্যন্ত আমাকে বলেছেন যে, গোলাম আযমের নেতৃত্ব গ্রহণ করে অনেক উজ্জ্বল ছাত্র শিবিরে ঢুকে যাচ্ছে। বরফ-শাদা চুল, পরিচ্ছন্ন তীক্ষ্ণ চোখ, চমৎকার হাত ও সুন্দর গড়নের গোলাম আযম অন্য অনেক নেতার তুলনায় বলীয়ান, সপ্রতিভ।

জেলে যাওয়ার পূর্বে গোলাম আযমের সঙ্গে দেখা করা অত্যন্ত সহজ ছিল। তাঁর বাড়ি খুব পরিচ্ছন্ন, যদিও তাঁর আবাস ঢাকার মগবাজারের নিকটে একটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পাড়ায়; মগবাজার থেকে একটু এগোলেই তাঁর বাড়ি। বাংলাদেশের বিচক্ষণ নেতাদের অন্যতম গোলাম আযম কথা বলেন মৃদুস্বরে, উপলব্ধির দিক থেকে তিনি যুক্তিশীল, ভরসাপূর্ণ এবং তিনি প্রায় অরক্ষিত জীবনযাপন করেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রচার দপ্তর তাঁর যেসব বক্তব্য-ভাষণ প্রকাশ করে, তা পড়লে গোলাম আযমের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ভালোভাবে বোঝা যায়। একটা 'ইসলামী রাষ্ট্র' কি হতে পারে, সে বিষয়ে গোলাম আযমের সুস্পষ্ট ধারণা আছে।

জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির তত্ত্বের পুরোধা মওলানা মওদুদী; মওদুদী তিরিশের দশকে ভারতে লেখালেখি শুরু করেন এবং তাঁর অনুগামীরা ভারত এবং পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল গঠন করে। মওদুদীর রাজনৈতিক ভাবাদর্শ-উদ্ভূত বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী বর্তমানে তবলীগের অনেক অনুরাসীকেও দলভুক্ত করছে এবং গ্রামের সেইসব লোকও জামায়াতে চলে আসছে যারা সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডে ভীষণ ক্ষুব্ধ। জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচিগত

www.pathagar.com

সমর্থন এসেছে আফগান মুজাহিদীনদের তরফ থেকে, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জামায়াতে ইসলামী তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের তরফ থেকে সাহায্য পায়; ধর্মীয় এবং সেক্যুলার দুই ধরনের রাষ্ট্রই জামায়াতকে সহযোগিতা করে। এক্ষেত্রে গাদ্দাফী এবং সাদ্দাম হোসেনের কথা বলা যায়। জমায়াতে ইসলামী এখনো বড় দল হয়ে ওঠেনি, কিন্তু পরিস্থিতির আনুকূল্য পেলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ক্ষমতায় চলেও যেতে পারে কখনো। তবে এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জনগণের আস্থা অর্জন; যে আস্থা অন্য ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের গড়ে উঠেছে।

প্রাচীন কিন্তু প্রাণবন্ত ঐতিহ্যধারা

বাংলাদেশের উচ্চবর্গীয় মানুষের চিন্তায় ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভাবশালী দুটো উপাদান। কিন্তু আরেকটা প্রাচীন মন এই বাংলাকে এবং তার মানুষকে অধিকার করে রেখেছে; চাই সে মুসলমান হোক বা হিন্দু, খ্রিস্টান হোক বা নাস্তিক। এটা চিন্তার কোনো পদ্ধতি নয়, বরং একটা অভিজ্ঞতা কিংবা অবসেশন; যার ভেতর ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার এবং যার সঙ্গে সকল মানুষের আত্মীয়তা। মনের গহীনে, নিরালোক অবচেতনে এই প্রাচীন মন কাজ করে; কারণ এর উৎস সকল ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অতীত।

ইসলাম যদিও হযরত মুহম্মদের (সঃ) পূর্বেকার ইতিহাস অনাবশ্যক মনে করে এবং এই ইসলামই বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের একমাত্র অবলম্বন; তবু বাংলাদেশের মানুষের মনোলোকে বাঙালি জাতির প্রাচীন সংস্কার, জীবনধারা ও অতীত অদ্ভুতভাবে মিশে আছে। বাংলাদেশের লোকের কেবল নিজ জাতির ইতিহাস নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-বৌদ্ধ উত্তরাধিকারকেও সমান মূল্য দেয়। এই মূল্য ধর্মীয় চিন্তা থেকে নয়, এর শেকড় বাঙালির গভীরতর নির্জ্ঞানে, তার অবচেতন প্রশ্নমানসে।

মুসলমানদের মধ্যযুগের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম নেই। যেমন বহিরাগত মুসলমানেরা যখন এদেশে এল তারা সেন বংশের সংস্কৃতি-প্রীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং তারা বাংলা ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে তারা কেবল মুসলমানদের ফার্সি সাহিত্যেরই অনুবাদ করেনি, 'রামায়ণ'-এর মতো হিন্দু মহাকাব্যও তারা অনুবাদ করেছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের লেখা থেকে এও জানা যায় যে, প্রথম দিককার অনেক মুসলিম অলি-দরবেশ যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তাঁরা এদেশের পরিবেশ ও স্থানীয় সংস্কৃতি এবং লোকবাদকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজেই ব্রিটিশদের সূত্রে যখন বাংলাদেশ পুনরুত্থিত হলো, তখন ব্রিটিশরা পুরো বাঙালি সংস্কৃতিকে সার্বিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করে।

www.pathagar.com

সেই দিক থেকে বোঝা যায়, মুসলমানেরা বাঙালি সংস্কৃতির সার্বিকতা ও ব্যাপকতা আগে থেকেই উপলব্ধি করেছে। সে জন্যেই মুসলমানেরা আইনকে প্রয়োজনীয় মনে করেছে এবং বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ধর্মকে সম্মান করেছে, নিজের আইন অন্যের ওপর জোর করে চাপাতে চায়নি।

মুসলমানদের গাজী অথবা সূফী, অর্থাৎ সকল ধরনের নেতাই এই উদার দৃষ্টির পরিচয় দেয়; এই উদারতার ফলে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারাও তাদের আপন করে নেয়; এর কারণে মাদ্রাসার মতো ধর্মীয় মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলেমিশে যায় বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে। মুসলমানেরা যে আইন প্রতিষ্ঠা করে, তার মধ্যে হিন্দুদের প্রতি সহিষ্ণুতা ছিল যথেষ্ট; তাছাড়া মুসলমানেরা ছিল সঙ্গীতপিপাসু, শিল্পরসিক, কবিতাপ্রিয় এবং লোকাচার-অভ্যস্ত। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগে 'মুসলিম বাংলা' প্রধানত হিন্দু অধ্যুষিত ছিল এবং তার অন্তর্ভুক্ত ছিল উড়িষ্যা ও বিহার; এবং উত্তরকালে ব্রিটিশরাও মুসলমানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং উড়িষ্যা ও বিহারকে বাংলার প্রাদেশিক বিভাগ নির্ধারণ করে।

হিন্দুদের পুরাণ কাহিনী, কিংবদন্তী জানে না এরকম লোক বাংলাদেশে কমই আছে। লোকেরা অনেকগুলো সূত্রে হিন্দু পুরাণ জেনে যায়; বাল্যকালে ঘরে ঘরেই এসবের গল্প বলা হয়, স্কুল থেকে শেখে কেউ কেউ, কেউ কেউ শেখে 'যাত্রাপালা' থেকে। দু'হাজার বছর আগে থেকে বাংলাদেশে 'যাত্রাপালা' অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে এখন 'যাত্রাপালা' অনুষ্ঠিত হয় 'মেলা' উপলক্ষে, ফসল কাটার মৌসুমে, নবান্নে; অনেক যাত্রাদল আবার এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ঘুরে ঘুরে 'যাত্রাপালা' প্রদর্শন করে। এছাড়া আছে হিন্দু সন্ন্যাসীরা, যারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান; এদেরকে হিন্দু মুসলমান সকলেই সম্মান করে এবং এই সন্ন্যাসীদের মারফতেও হিন্দু পুরাণ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো বৌদ্ধ বনযী (বৌদ্ধ সাধু)-রাও বাংলাদেশের সকল প্রান্তে যাতায়াত করে এবং তার ফলে ভগবান বুদ্ধের কাহিনীও বাংলাদেশের লোকদের জানা।

সংস্কৃতির মতো সঙ্গীতেও বাংলাদেশের দীর্ঘ প্রাচীন ঐতিহ্য রয়ে গেছে। বিশেষত ভাবাবেশ ও সুরের দিক থেকে বাংলাদেশের সঙ্গীতের সঙ্গে প্রাক-বৌদ্ধ প্রাচীনতম ঐতিহ্যের সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতির অভিন্নতা এসব যোগাযোগের মূল : এরা সেজন্যেই মুসলিম দার্শনিক-কবিদের সঙ্গে মিলে যান হিন্দু সংস্কারক শংকর; ভক্তি-আন্দোলনের চৈতন্য দেবের সঙ্গে মিলে যায় আঠার শতকে মদন বাউল এবং তাঁর উত্তর সাধক লালন শাহের। এরা সকলেই বাংলায় গান করেছেন, সেসব গানের বিষয়বস্তু স্রষ্টার এককত্ব; আর বাউলদের সঙ্গীত প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নজরুল ইসলামকে।

www.pathagar.com

বলে নেয়া ভালো, গান ও কথকতা, পুঁথি ও কাব্য এখনো বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ; কেননা, বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে রেডিও-টেলিভিশনের দৌরাত্ম্য অতটা প্রবল হয়নি। গ্রামের মানুষ এখনো তাই যূথবদ্ধভাবে কবিতা-গান শোনে; কবিতা বা গান শোনাতে যারা আসে, তাদের কাছে চলে যায়। বাংলাদেশ এমন একটা দেশ, যেখানে কবিদেরকে মানুষ খুব ভালোবাসে, গ্রামীণ বাংলার প্রাণস্পন্দনও এই কাব্যপ্রেমের ভেতর কোথাও রয়ে গেছে।

সঙ্গীত বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে তাৎপর্যবহ; এই গানের ভেতর দিয়ে উৎসারিত বাঙালির লোকধর্ম, এর ভেতর মিলেমিশে আছে কবিতা, গান, সরল লোকবিশ্বাস, প্রকৃতিবাদ, একেশ্বরবাদ, সেই সঙ্গে এর ভেতর সঞ্চারিত অম্লান সাম্যবোধ, মানবিকতা, ভক্তি আর আলোর অফুরন্ত সমাবেশ। রাজা রামমোহন রায় এই লোকধর্মের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে একটা ধর্ম প্রবর্তন করেন, তার নাম 'ব্রাহ্মধর্ম' : ব্রাহ্মধর্ম আসলে লোকধর্মের পরিশ্রুত মানবতাবাদী হিন্দু ধর্মের একটা রূপ। যেহেতু রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর অনুসারীদের ব্রাহ্মধর্মে হিন্দু ধর্মের ছোঁয়া ছিল, ফলে মুসলমানেরা তাতে অংশগ্রহণ করেনি। তার পরও উনিশ শতকের মনীষী রামমোহনের মানুষের সামনে মানবতাবাদের একটা দলিল তুলে ধরে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির মর্মমূলে যা আজও বহমান।

এসব গান ও কবিতা, এই মধুর সংস্কৃতি, গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনবেদ ও কৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম। অতএব, বাংলাদেশের সংস্কৃতির মানবতাবাদী ঐক্যবোধের এই স্বরূপ 'সঙ্গীত' ছাড়া আর কোথাও অত সার্থকভাবে অভিব্যক্ত হতে পারত না। এই গান শোনা যাবে চারণদের কণ্ঠে, ঘরের দিকে ফিরতে থাকা মাঝি-মাল্লার মুখে, নদীতীরে কাপড় কাচতে থাকা মেয়েদের কাছে। লোকবিশ্বাস একেবারে ধর্মবিরোধীও নয়, ইসলাম-খ্রিস্ট-হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সংগতিহীনও নয়। এই বিশ্বাস আসলে কঠোর খাটুনিতে বসবাসকারী কর্মী মানুষের চিন্তা-ভাবনার কতগুলো সরল প্রকরণ, যার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার জীবন এবং জীবনের অর্থ বুঝবার চেষ্টা করেছে। লোকবিশ্বাসের অসামান্য প্রতিফলন ঘটেছে লালন শাহের গানে।

লালনের এই কবিতা পড়লে দেখা যায়, লালন কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস-ব্যবস্থার কথা বলছেন না, এর মধ্যে কোনো বিধি-বিধান বা অনুশাসন নেই; এ আসলে ব্যাপক ঈশ্বরবোধের এক অভিপ্রকাশ, যে বোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবধর্মে, যেটা তাঁর আগে রামমোহন রায় করে গেছেন। এই ধর্ম বা বোধের আওতায় যে চাইবে, সে-ই অন্তর্গত হতে পারবে। এটা এক ব্যাপক বিশ্বাসের চেতনা, যে চেতনায় পৃথিবীর সকল ধর্মের অন্তঃসার রয়ে গেছে; যদিও এটি কোনো নির্দিষ্ট বিশ্বাস নয়, কোনো বিধিবদ্ধ চৈতন্য নয়। আর এই বিশ্বাসই

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস। তাই অনেকের কাছে লালন শাহের কোনো না কোনো গান অত্যন্ত প্রিয়; যার মাধ্যমে এই লোকজ বিশ্বাসেরই সহজ প্রতিফলন দেখা যায়–

কোথা আছে রে দীন-দরদী সাঁই।
চেতন-গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই ॥
চক্ষু আঁধার দেলের ধোঁকায়,
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই,
বসে নিগম ঠাঁই ॥

এখানে না দেখলাম যারে
চিনবো তারে কেমন করে?
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই ॥

সুমঝো ভবে সাধন করো,
নিকটে ধন পেতে পারো,
লালন কয়, নিজ মোকাম ঢোঁড়ো
বহু দূরে নাই ॥

লালনের গানে বিধৃত বাংলার এই লোকবাদী বিশ্বাসকে কেউ কেউ 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, কেউ কেউ একে স্রেফ 'মানবিকবাদী' বলেছেন, কেউ কেউ পশ্চিমের সেক্যুলারিজমের সঙ্গে একে মেলাতে চেয়েছেন, কেউ কেউ দার্শনিক হিউম্যানিজমের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন, যে হিউম্যানিজমে ধর্মের ভূমিকা নেই বা থাকলেও গৌণ। একদিক থেকে এই লোকবাদী বিশ্বাসে সেক্যুলারিজম ও হিউম্যানিজম, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মানবধর্ম যুগপৎ অন্তরিত; কিন্তু এর ধমনীতে যে অতিলৌকিক আবহ আছে, তা অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না।

লালনের গানে যে অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তা একটা বস্তুবাদী দর্শন উপস্থিত করে। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক নেতারা এই চৈতন্যকেই তুলে ধরতে চান মানুষের সামনে। সেজন্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় সেক্যুলার, সাম্যবাদী, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক প্লাটফরম থেকে বাংলাদেশে নেতারা যখন মানুষকে আহ্বান করেছেন, অভ্রান্ত সাড়া পেয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর নতুন নেতারা যখন সেক্যুলারিজম-গণতন্ত্র-সাম্যবাদ-জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিকে নিরীশ্বরবাদ বা নাস্তিক্যের খাঁচায় ভরে একাকার করতে চাইলেন, সাধারণ মানুষ অস্বীকার করল আওয়ামী লীগকে; সেই আওয়ামী লীগ পুনরায় একই কারণে প্রত্যাখ্যাত হলো ১৯৯১ সালে। বাংলাদেশের মানুষ লোকধর্মে বিশ্বাসী, বাংলাদেশের মানুষ কঠিন-দুর্বোধ্য মতাদর্শ, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির ধার ধারে না; লোকবিশ্বাসেই তারা

www.pathagar.com

আস্থাবান। এই একই কারণে পাকিস্তানীদের ইসলামও বাংলার মানুষ মেনে নেয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায় সাধারণ মানুষের এই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছিলেন; এই ধর্ম বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, আমার বন্ধু, যিনি এরশাদ সরকারের কোপানলে পড়ে পদচ্যুত হন, সেই সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন বলেছিলেন: "এ হলো শেষ পর্যন্ত 'ধর্ম', এই 'ধর্মে'ই মানুষের আস্থা, এটা কোনো 'মতাদর্শ' নয়, 'আইডিওলজি' নয়।" আমার এই বন্ধু গভীর ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাবিদ ছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ধর্মবোধ তিনি ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

সেদিক থেকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উৎস সুদূর অতীতলোকে; এই ঐহিত্য এত পুরনো যে ভগবান বুদ্ধ যদি পুনর্জন্ম লাভ করতেন, দেখতেন, দেশময় তাঁর বাণী ও শিক্ষার প্রতিধ্বনি। একইভাবে যদি পুনর্জাত হন কবীর, শংকর, চৈতন্যদেব, মদন বাউল, লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম, দেখবেন, যার জন্যে তাঁরা গান গেয়েছিলেন তার মর্মবাণী ম্লান হয়নি একটুও, বরং তা নতুনভাবে দীপ্যমান হয়েছে সুলতানের ছবিতে, জয়নুল আবেদীনের চিত্রশিল্পে, মাঝিমাল্লার বাঁশি, দোতারা আর একতারায়।

এই লোকধর্মের অসাধারণ স্ফুরণ ঘটেছে বাংলার মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত ছন্দে; এই স্ফুরণ দেখা যাবে রোদে-পোড়া কৃষকের কালো উদোম পিঠে এবং সিক্ত জমিতে শস্য বপনের মুহূর্তে; মেঘনার চরে গড়ে ওঠা গ্রামের কুটিরে; নবান্নের উৎসবে বাঙালির গানে; নাড়ার দহন ও তার অদ্ভুত গন্ধে; নবজাত ছাগলছানার অস্ফুট চলাফেরায়; চালের সৌরভ, বাঙালি কন্যার সুখী চোখ, জল মহিষের পা-তোলা পা-ফেলায়– সর্বত্র এই ছন্দ, লোকবিশ্বাসের স্পন্দন; এই ছন্দ বয়ে চলেছে এবং বয়ে চলেছে পদ্মার স্রোতের মতো, অবিরত।

দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ

বাঙালি সংস্কৃতি ও ইসলামের কথা তো গেল, এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি জিনিস বাঙালিদের মনে অবিরাম হানা দেয়, তা হলো অকস্মাৎ গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়, দারিদ্র্যের আতঙ্ক। গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় বাংলাদেশের সকল মানুষের; এমনকি যারা উঁচু স্তরে ভালো অবস্থায় আছে, তারাও এই আতঙ্ক থেকে মুক্ত নয়। দারিদ্র্যের ছোঁয়ার বাইরে কেউ যেন পা ফেলতে পারে না। এমন সম্পদ খুব কম লোকেরই আছে, যারা যে কোনো পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। কেননা, দুর্নীতিবাজ সরকারের কর্মকর্তাদের দাবি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ১৯৪৩ কিংবা ১৯৭৪ সালের মতো মন্বন্তর-দুর্ভিক্ষ এড়িয়ে নিজের অগাধ সঞ্চয়ে নিশ্চিন্ত থাকা এক প্রকার অসম্ভব বাংলাদেশে।

www.pathagar.com

এসবের পরিণতিতে মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে অনেক ধরনের গুজব বাজারে চালু আছে; এবং এরা সবসময়ই একটা ভয় এবং একটা অনিরাপত্তার মধ্যে থাকে, ঠিক এ ধরনের ভয়ের সঙ্গে আধুনিক জাপান বা পাশ্চাত্যের লোকেরা অপরিচিত। এই ভয় থেকে জন্ম নেয় একটা হিস্টিরিয়া; এই হিস্টিরিয়ার ফলে মানুষের সুস্থ চিন্তা বিকল, অকেজো, প্যারালাইজড হয়ে যায়। এই ভয়ের কারণে বাংলাদেশের মানুষ কোনো কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে না; যে কোনো নতুন উদ্যোগ বা কাজ সম্পর্কেই আশ্চর্য এক নাস্তিবাদ ও নৈরাশ্য সবাইকে গ্রাস করে রেখেছে। এই মনোভঙ্গির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এদেশের প্রথাবদ্ধ সংস্কৃতি, যে সংস্কৃতি সম্পদবিমুখতা, ঐশ্বর্যবিমুখতা ধনী লোকদের প্রতি ঘৃণার অভিব্যক্ত। গ্রামেও এটা দেখা যায়। অন্যের সম্পর্কে তাই স্বভাবতই সকলের সন্দেহ ও অবিশ্বাস; এ কারণে রাজনীতির লোকদের কিংবা নেতাদের ওপর কেউ আস্থা রাখতে পারে না।

যারা আপেক্ষিকভাবে সচ্ছল, তারা ঘৃণা-বিদ্বেষ করে না; কিন্তু প্যারানোয়ায় আক্রান্ত হয়। সবকিছুকে না-বাচক অর্থে দেখার কারণে, মিথ্যা উদ্দেশ্য খোঁজার আগ্রহ সর্বত্র বেশি। যেমন যে ঘৃণিত সে সফল; যে সফল সে নিশ্চয়ই ঘুষ খায়, উৎকোচ নেয়, কেউ যদি নতুন কোনো পদ্ধতিতে টাকা উপার্জন করে, সে নিশ্চয়ই কোনো একটা ভয়াবহ দুর্নীতিতে অভ্যস্ত। কারো টাকা হলেই, সেটা নতুন কোনো ব্যবসা খুলেও হতে পারে, তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। সেজন্যে কারো কোনো কল্পনা, নিরীক্ষা বা পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না এখানে, সবকিছুতে অর্থঘটিত কেলেঙ্কারী তালাশ করা মানুষের স্বভাব। এরকম অবস্থায় সদর্থক বাণিজ্যবৃত্তি তৈরি হয় না, সফলতা মাত্রই মিথ্যা সৌজন্যের আড়ালের কোনো অনৈতিকতা। এর ফলে দেখা যায়, বাংলাদেশের একজন সফল শিল্পপতি যখন ১৯৮০ সালে ব্যবসাবাণিজ্যের একটা সৃষ্টিশীল উদ্যোগ নিতে গেলেন জাপানের সঙ্গে, তাঁর আচরণ এবং পরিকল্পনাকে বিরাট স্পর্ধা হিসেবে ধরা হলো, এই উদ্যোগী শিল্পপতিকে কারারুদ্ধ করা হলো।

বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু বিদ্বেষভাব থেকে তৈরি হয়েছে মামলাবাজির আমোদ; গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, ভূ-সম্পত্তির এক মালিক আরেক মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করছে। এসব মামলা অকারণেই হয়ে থাকে সাধারণত, একেবারেই সাধারণ কোনো অজুহাতে মামলা ঠুকে দেয়া হয়। অপরাধের অভিযোগেও জড়িয়ে দেয়া হয় একেকজনকে; বিচারককে ঘুষ দিয়ে বশ করার রেওয়াজও বেড়ে গেছে। দুর্নীতি ও অপরাধ অনেক বিচারকের মধ্যে ছেয়ে গেছে আজকাল; অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ, আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ ভাইরাসের মতো প্রবিষ্ট হয়েছে সমাজের মধ্যে। এই আক্রমণের মাধ্যমে মানুষ তার অহমবোধ পরিতৃপ্ত করে। উচ্চবিত্তের

www.pathagar.com

মধ্যে এই ঘৃণা-অসূয়া-আক্রমণ অত সংক্রমিত নেই; এই ব্যাধি গরীবদের ভেতর বেশি; মানুষ যখন দারিদ্র্যের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, দুর্দশায় যখন বিপন্ন আর দোযখ হয়ে ওঠে কারো কারো জীবন, তখনই আক্রোশ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অহমবোধের বিকার এভাবে তৃপ্তির সন্ধান করে।

এর কার্যকারণ সূত্র খুঁজতে গেলে আমাদের যেতে হবে পেছনে, দূর অতীতে। ব্রিটিশ প্রসাদপুষ্ট ঐতিহাসিক ম্যাকলে আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে একবার বাঙালি চরিত্রের একটা বিবরণ দেন; সেই বিবরণ নিশ্চয়ই সৎ ছিল না, তাতে ছিল বাঙালি বিদ্বেষ, শয়তানী ও ঔদ্ধত্য– তবু তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

মহিষের জন্যে যেমন শিং, মধুকরের জন্যে যেমন হুল, গ্রীক গানের সৌন্দর্যবোধে যেমন রমণী, বাঙালিদের অলংকার তেমনি 'প্রতারণা'। বড় বড় কথা এবং প্রতিশ্রুতি, কপট বিনয়, মিথ্যা ও বঞ্চনার জাল, ঠকবাজি, খামোকা কসম, চালিয়াতি-জালিয়াতি– এই হলো গাঙ্গেয় বাঙালিদের চরিত্র। এই বাঙালিরা একটা সিপাহী পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সরবরাহ করে না। কিন্তু বাঙালি সুদখোর, পোদ্দার সূক্ষ্ম আইনজীবীদের সঙ্গে অন্য কোনো মনুষ্যেই বোধহয় তুলনা অসম্ভব।

বাংলাদেশকে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন 'মিথ্যুকে ভরা দেশ' হিসেবে। এসব মন্তব্য অবশ্য ভাবালুতাপূর্ণ, সেন্টিমেন্টাল; এসব মন্তব্য বলা যেতে পারে ঢাকা-কলকাতার তীক্ষ্ণ-চতুর ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে। ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রথম পর্যায় থেকেই এ ধরনের শঠ-বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ঢাকা এবং কলকাতায় বিদ্যমান; শঠতা, দুর্বুদ্ধি, প্রবঞ্চনায় এরা ভারতবর্ষের আর সব অঞ্চলের ব্যবসায়ীকে ছাড়িয়ে যায়। আজকের দিনে যদি এ ধরনের ধূর্ত ব্যবসায়ীর কথা বলতে হয়, তাহলে ওল্ড ক্লাইভ স্ট্রীটের (বর্তমানে যা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস সড়ক) কতিপয় ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করতে হবে; এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলিম বেনিয়া ব্যবসায়ীদের পূর্বসূরীরা প্রায়ই ব্রিটিশদের কায়দা করে ঠকিয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সড়ক পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র; এখানকার ব্যবসায়ীদের পূর্বপুরুষেরা ঠকিয়েছে ব্রিটিশদের, উত্তরসূরীরা এখন ঠকাচ্ছে জাপানী কিংবা জার্মানদের। ম্যাকলে এই জগৎটাই দেখেছেন এবং এর আলোকে সমগ্র বাঙালি বিষয়ে সরল রায় ঘোষণা করেছেন। একই জগৎ এখন বাংলাদেশের মতিঝিলে, কিংবা কাওরানবাজার এলাকায়, কিংবা অন্য কোনো বাণিজ্য কেন্দ্রে লক্ষ্য করা যাবে।

যদিও বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে ম্যাকলে কথিত প্রতারণা, ধূর্ততা, শঠতা ও দুর্নীতি আগের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত; তবু এসবকে তাদের চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য মনে করা সংগত হবে না। ভয়ের বিভিন্ন বিন্যাসে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ অনুমানত্রস্ত; দরিদ্র্যের ভয়, ক্ষুধার ভয়, আত্মবিনষ্টির ভয়। এই

www.pathagar.com

ভয়ের কারণে যে বাঙালিরা দুর্নীতিবাজ হয়ে যায়, এমন নয়। কিন্তু এই ভয়ের ফলে তৈরি হয় ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, ব্যাপক উন্নাসিকতা; সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রকার গুজব, অপরের বিষয়ে নানা সন্দেহ, অপকথা। অপরের দুর্নীতি বিষয়ে নির্দ্বিধায় যা কিছু বলার স্বেচ্ছাচার এই অবস্থা থেকেই বেড়ে ওঠে।

এই ভয় এবং শঙ্কা থেকেই বাংলাদেশের একজন মা তাঁর প্রিয় সন্তানের জন্যে দুর্নীতি করতে দ্বিধা করেন না। নিজের সন্তানকে নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার জন্যে শিক্ষককে ঘুষ দেয়া এখন মায়েদের একটা রেওয়াজে পরিণত। এই মায়েদের উৎসাহেই তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গামী সন্তানেরা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যোগাড় করে ফেলে অবৈধভাবে; এই প্রক্রিয়াতেই গড়ে উঠেছে কুম্ভিলবৃত্তি ও জালিয়াতি। 'টিউটর' রাখা এবং অধ্যাপক-টিউটরকে পয়সা দিয়ে নাম্বার বাড়ানো এখন সবার লক্ষ্যে পরিণত; যে তা পারে না এবং যার পয়সা নেই, তার ছেলে স্বভাবতই ভালো ফল করতে পারে না। এ ধরনের দুর্নীতি কেবল শহরে সীমাবদ্ধ নেই, গ্রামেও এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। এ ধরনের অবৈধ কাজ হওয়ার পেছনে কার্যকর 'শিক্ষা' বিষয়ে বাংলাদেশে মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি; শিক্ষা পেলে দারিদ্র্য দূর হবে, এই হলো মানসিকতা। শিক্ষাব্যবস্থা কিরকম মারাত্মকভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, তার প্রমাণ এ থেকেও পাওয়া যায় যে, ১৯৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নকল করার দাবিতে মিছিল করেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লাইব্রেরি নেই, থাকলেও বইপত্র নেই, ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি দুর্লভ, চারদিকে দুর্নীতি এবং ভয়– এই হলো অবস্থা, এর ভেতর তো পড়াশোনা হতে পারে না।

এরকম পরিস্থিতিতে রাজনীতি ক্ষেত্রে যা হবার তাই হচ্ছে। বামপন্থীরা হতাশ, সন্দিগ্ধ, ভরসাহীন; অন্যদিকে মৌলবাদীরা ধর্মকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উদগ্র। এই হতাশা ও নৈরাশ্য উচ্চশ্রেণীর মানুষদের ছাড়িয়ে সাধারণত কঠোর পরিশ্রমী মানুষদের মধ্যেও ব্যাপ্ত। সাধারণত মানুষদের মধ্যে হতাশা থেকে জন্ম নিয়েছে ভয় এবং আতংক। ভয়ের উৎস বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে সন্ত্রাসী মাফিয়া সংঘের উপস্থিতি; মাফিয়ারা রাজনীতিবিদ, শ্রমিক সংঘ, রাজনৈতিক দল এমনকি ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যেও বিস্তৃত। নির্বাচন প্রক্রিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়গুচ্ছ, আদালত– সবই মাফিয়ার বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত; মাফিয়ারা সরকার এবং বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই মাফিয়াদের বেশভূষা ও চলাচল– যেমন বোতামহীন শার্ট, ওয়েস্টার্ন প্যান্ট, সানগ্লাস এবং সুজুকির ওপর চড়ে দ্রুতগতিতে চলে যাওয়া– এসব সবার চেনা-জানা ছবি। শহরের চমৎকার বাড়ি এবং ক্লাবগুলোতে এদের দেখা যায় এবং বাজারের ধনী ব্যবসায়ীদের আশপাশে এরা ঘুরঘুর করে। মাফিয়ারা বিভিন্নভাবে উৎপাদন করে ভয় এবং ত্রাস; এই ভয় ঢাকা ও চট্টগ্রামের সকল মধ্যবিত্তকে আজ গ্রাস করেছে প্রবলভাবে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এমন কিছু লোক দেখা দিচ্ছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, যারা সকল রকম কাজ-কারবার থেকে পারসেনটেজ খায়। এরা মহিলা এবং পুরুষ; সরকার, সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী এবং জামায়াত ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলে এই শ্রেণীর লোকেরা প্রবল প্রতাপে বিরাজ করছে। দেখা যাবে, সামরিক অফিসারদের স্ত্রীও শপিং করছে শহরের বড় বড় দোকানে; সরকারি ড্রাইভার ও কর্মচারিদের নিয়ে এক দোকান থেকে আরেক দোকানে তারা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা ২৫ পারসেন্ট ঘুষ বিভিন্ন সরকারি কনট্রাক্ট বাবদ মন্ত্রীদের দেয়; প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্টের স্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের প্রেমিকা, সবাইকে ঘুষ দিতে হয়; জেলে যাতে না যেতে হয়, তার জন্যে কর-কর্মকর্তাকে ঘুষ দেয়া প্রতিদিনের ঘটনা। পেমেন্ট রসিদের জন্যে টেলিফোন কোম্পানিকে একটি আমেরিকান সংস্থার ঘুষ দেয়ার কথা আমি নিজেই জানি।

খারাপ লোকেরা উন্নতি করছে দ্রুত এবং টিকে যাচ্ছে, তার কারণ তারা সংঘবদ্ধ; আর সৎ লোকেরা দিন দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং তারা প্রতিবাদ করে না, কারণ তারা ভীত। ১৯৯০ সালে নব-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তো প্রকাশ্যে বললেন যে, সকল রাজনৈতিক দল, জামায়াতে ইসলামী ছাড়া, সরকার থেকে ঘুষ খায়। জানা দরকার, এ কথায় কোনো রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ করেনি। সরকারের ভেতরের কোনো লোকও এতে গা করেনি; পত্রিকাগুলোও গভীর নীরবতা পালন করেছে। কিন্তু এসবের পরও কেউ অবাক হলো না, বিস্মিত হলো না।

এর সঙ্গে অবশ্য বাংলাদেশের মানুষদের দারিদ্র্যের কোনো সম্পর্ক নেই। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষ গরীব এখানে; এই গরীব মানুষদের প্রয়োজন অতি সামান্য : এক টুকরো কাপড়, মাথা গোঁজার ঠাঁই, খেয়েপরে কোনোরকমে বেঁচে থাকা বা বেঁচে যাওয়া। কিন্তু এই সামান্য প্রয়োজনও তাদের পূরণ হয় না। এই মানুষেরা যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো শর্তে, যে কোনো দুর্যোগে– খাটতে, কাজ করতে রাজী; বেতনটা যখন পাবে, সেই দিনটা সেই মুহূর্তটা তাদের জীবনের পরম আনন্দের মুহূর্ত। কিন্তু দারিদ্র্য তাদের মাথায় সর্বক্ষণ হানা দেয়, গরীব হালতের ত্রাস তারা এড়াতে পারে না। দারিদ্র্যের ভয় সারাদিনের চব্বিশটা ঘণ্টা, প্রত্যেক ঘণ্টার ষাটটা মিনিট, প্রত্যেক মিনিটের ষাটটা সেকেন্ড তাদের তাড়া করে। জ্বালায়। নেতা মানুষদের বড় বড় তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত তাদের নেই। উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা ঘুমোতে যায়, উকণ্ঠার ভেতর জেগে ওঠে।

বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ প্রচণ্ড রকম গরীব, ভূমিহীন। শহরে অথবা গ্রামে মাথা গোঁজার জন্যে একখণ্ড জমি বা একটা ঘর কম লোকেরই আছে। অধিকাংশই স্কুলে যেতে পারে না, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে পারে না, ইচ্ছে হলেই চায়ের

www.pathagar.com

দোকানে বসে খোশগল্প করতে পারে না, দাঁতে ব্যথা করলে ডাক্তারের কাছে দৌড়াতে পারে না, পেট ভরে খেয়ে শুতে পারে না। মেয়ে অল্প বয়সে বুড়িয়ে যায়। ত্রিশের আগে শুকিয়ে যায় স্তন, নিজেদের ক্ষুধার জ্বালা ভুলে থাকার জন্যে পান চিবোয় তারা, আর ছেলেমেয়েরা শিশু বয়সে রোগেশোকে মারা যায়। অধিকাংশের কর্মশক্তি লোপ পায় অল্প বয়সে। বিধবারা, এতিম বালকেরা, সাধারণ স্ত্রী-পুরুষেরা বয়স হবার আগেই বার্ধক্যে পৌঁছায় এবং একা হয়ে পড়ে; মেয়েরা বেঁচে থাকার জন্যে গতর বেচে এবং তারাও অল্প বয়সে যৌবন হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশে হাজার হাজার পতিতা; ১৯৮৫ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে. নারায়ণগঞ্জ পতিতালয়ে পতিতার সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি।

ঢাকার বস্তির মানুষদের মতো সম্ভবত আর কেউ এত গরীব নয়। মহাখালীর রেল সড়কের পাশে, নারায়ণগঞ্জের দিকে রাস্তার ধারে, কুমিল্লার পথে আবর্জনা স্তূপের নিকটে গড়ে ওঠা বস্তিগুলোতে মানুষের জীবন দারিদ্র্যের নির্মমতম পর্যায়ে উপনীত। বস্তির ছাউনি এত নিচু এবং বস্তির পরিসর এত সংকীর্ণ যে, ওখানে ভালোভাবে বসতে পারাও কঠিন। এসব বস্তিতে মানুষদের জীবন অশ্রু, রোদন, আর আহাজারিতে পরিপূর্ণ; এই রুগ্ন-অমানবিক জীবনের কান্না ডিকেন্সের আঁকা লন্ডন শহরের জীবনেও মেলা ভার।

এসব বস্তিতে পাঁচ থেকে দশ ভাগ লোক ক্ষুধায় কাতর; অধিকাংশের দানাপানি জোটে না নিয়মিত। শহরের চারদিকে এই গরীব মানুষেরা থাকে। দুস্থ মানুষ, পুষ্টিহীন শিশু, বুড়িয়ে যাওয়া নারী-পুরুষের সমাবেশ, দুঃখ আর গ্লানিময় জীবন বস্তির মধ্যে সবার চোখে পড়বে। বাংলাদেশের যে কোনো ছোট-বড় শহরে বস্তি আছে, বস্তির অভিশপ্ত মানুষেরা আছে; তবে গ্রামে তেমন নেই, তার কারণ বাংলাদেশের গ্রামের বিশেষ ধরনের সামাজিকতা, সহযোগিতা, মনুষ্যত্ব বিরাজমান। দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া গ্রামের মানুষেরা পরস্পর পরস্পরের সহযোগী থাকার চেষ্টা করে। তবে কেবল গরীব মানুষেরাই যে ভয় ও আতঙ্কে দিন কাটায়, তা নয়; মধ্যবিত্ত, এমনকি উচ্চবিত্তের মনেও দারিদ্র্যের স্মৃতি হানা দেয়, পতনের চিন্তায় তারাও বিভিন্ন ফর্মে ত্রস্ত। দারিদ্র্যের আতঙ্ক বাঙালির মনে স্থায়ীভাবে প্রোথিত।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের আরো একটা কারণ এখানকার জনপদ ও জীবনধারার আদিমতা ও গ্রাম্যতা; শরীরের অবস্থা ও মনোভাবের দিক থেকে এখানকার মানুষ এখনো আদিম এবং গ্রাম্য রয়ে গেছে। বাংলাদেশ এখনো গ্রামীণ বাংলাদেশ, সব অর্থে গ্রামীণ; শতকরা আশি ভাগের বেশি মানুষ ৬৮ হাজার গ্রামে বাস করে। আর আমার বন্ধু ড. রিচার্ড বাক্সটার এটনের কথা ধার করে যদি বলতে হয়, বলবো, বাংলাদেশের মানুষেরা টমাস হবস– উল্লিখিত 'প্রাকৃতিক অবস্থা'য় জীবনযাপন

www.pathagar.com

করছে। এদের জীবনযাপন কদর্য, মানবেতর, সংক্ষিপ্ত। আশি ভাগ লোকের ঘরবাড়ি মাটির দেয়াল দিয়ে তৈরি, কিংবা বাঁশের বেড়া দিয়ে নির্মিত; অধিকাংশের ঘরে ছনের ছাউনি, অধিকাংশ মাদুরের ওপর শোয়, ভাত খায়, গরু ও গোয়ালঘর নিয়ে থাকে। যে পানি তারা ব্যবহার করে, সেই পানিই গরুর খাদ্য; সেই পানিতেই গরু ও মানুষের গোসল। বর্ষাকাল, শীতকাল, গ্রীষ্মকাল– সকল মৌসুমে একই ধরনের জীবনে তারা অভ্যস্ত। আলেকজান্ডার সোলঝেনেৎসিন 'গুলাগ'-এর জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, যে মানুষ গরমের ভেতর বাস করে, সে বুঝবে না ঠাণ্ডার মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকা কি দুঃসহ; তেমনি আমরা যারা আধুনিক নগর ও সভ্যতায় বড় হয়েছি, তাদের পক্ষে আন্দাজ করাও কঠিন বাংলাদেশের মানুষেরা প্রাগাধুনিক গ্রামে কি করে বেঁচে আছে বা বেঁচে থাকে। আমরা জুতো পরি, বাংলাদেশের মানুষ রাবারের সেন্ডেলে কাটিয়ে দেয় জীবন; আবার অসংখ্য গ্রামীণ মানুষ জুতো চোখেও দেখেনি সারাজীবন। এসব ভয়াবহ সত্য, এটা আমাদের পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয়।

তদুপরি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যের একটা আপেক্ষিকতাও আছে। খুব ধনী লোক যারা, বিশেষত চা-বাগানের যারা মালিক, তারা জমিদারীর মনোভাব নিয়ে জমিদারের মতো জীবনযাপন করে। অন্যদিকে, অনেক জমিজমার মালিক যাদের মনে করা হয়, তাদের হয়তো মোটের ওপর ১৫ একর জমিই আছে। অথচ, পেনসিলভেনিয়া কিংবা ওহিয়ো-তে দু'শ' একর জমি নিয়ে গড়া খামার রয়ে গেছে একেক জনের। অধিকাংশ লোকের জমি ৫ একরের নিচে : চল্লিশ ভাগ লোকের আছে দুই একরের চেয়েও কম জমি, আর দুই একরের কম জমি থাকার অর্থ হলো জমি না থাকা; কারণ দুই একরের কম জমি দিয়ে চলা সম্ভব নয়। বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশের মানুষের জায়গা-জমি বলতে কিছু নেই; তারা হয়তো জমিজমার মালিকদের অনুকম্পায় কোনোরকম বেঁচে থাকে। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া সম্পত্তি পুত্র এবং কন্যাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জমিজমা একই প্রক্রিয়ায়, একই বংশের মানুষদের মধ্যে রয়ে যায় এবং কোনো পরিবর্তন হয় না।

তবে দারিদ্র্যের এই অবস্থা সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবন অতটা খারাপ নয়, যতটা মনে হয় প্রথম প্রথম। তবে একটা 'গরীব' (poor) ও 'আদিম' (primitive)-এর মধ্যে একটা পার্থক্য করে নেয়া ভালো। বাংলাদেশের গ্রামের লোকেরা অধিকাংশই কোনো না কোনো দিক থেকে যুগপৎ গরীব ও আদিম। কিছুসংখ্যক আবার কম গরীব হলেও কম 'আদিম' নয়। তবে প্রকৃতির ভেতর এবং প্রকৃতির সঙ্গে গ্রামীণ মানুষদের বসবাস। বৃক্ষ তাদের ছায়া দেয় এবং সেই ছায়ায় তাদের শরীর জুড়ায়। খাল, নদী,

www.pathagar.com

নালা, পুকুর, দীঘির কারণে জলের অভাব হয় না। প্রকৃতির বিরূপতার সঙ্গে লড়াই করে তাদের ঘরদোর টিকেও যায়। আর পশু-প্রাণীর সঙ্গে বসবাসের কারণে তাদের জীবনের উদ্যমও বিপুল। খড় ও পাতা দিয়ে তারা রান্নাবান্না করে এবং এটা পরিবেশের দাবি এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভজনক। তবে গ্রামে এখন সবচেয়ে বেশি করে দরকার বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাস, খামার উৎপাদন, সংরক্ষণের জন্যে রেফ্রিজারেশন সেন্টার– এসবের যদি ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে গ্রামের দারিদ্র্য কমে আসবে, প্রকৃতির ভারসাম্য অবিচলিত রেখে গ্রামে সমৃদ্ধির হাওয়া বইবে।

বাংলাদেশের গ্রাম ওই রকমই আছে, যেরকম বলেছি উপরে। তবে হরেক রকম আধুনিক বীজ, শস্যকণা, সার ইত্যাদি অনেক গ্রামে প্রবেশ করেছে, যেরকম গভীর নলকূপের কথা বলা হয়েছে ইতিপূর্বে; একই রকমভাবে ধানের কলও বিপ্লবাত্মক ভূমিকা রেখেছে। ধানের কলের কারণে মহিলাদের এখন আর ঢেঁকিতে পরিশ্রম করে শরীর ক্ষয় করতে হয় না। কিছু কিছু গ্রামে বিদ্যুৎও চলে গেছে; গ্রামের লোকজন বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করেছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা তাদেরই আত্মীয়স্বজনের টাকায়। মধ্যপ্রাচ্যে গমন এবং অর্থোপার্জন এখন বাংলাদেশের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য। তবে আধুনিকায়নের আওতাভুক্ত হলেও, অনেক গ্রামে এখনো আদিমতা ও আঞ্চলিকতা বিদ্যমান, যেমন– নোয়াখালী ও সিলেট, ত্রিপুরা ও বগুড়া। এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামকে মনে করে ভিন্ন এবং অন্যরকম; এও মনে করে অন্য গ্রামের লোকেরা হয়তো তাদের মতো বন্ধুভাবাপন্ন, সহানুভূতিশীল নয়। কিংবা ধরে নেয়, তারা অসৎ। আঞ্চলিকতা জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে।

আঞ্চলিকতাবাদ গ্রামজীবনের অনিবার্য 'লবণ'-এর মতো। প্রত্যেক গ্রামের আলাদা রূপকথা/উপকথা আছে, আছে ভিন্ন ভিন্ন হ্যামলেট; প্রত্যেকের আছে নিজস্ব 'গ্রাম-দেবতা'। চাষবাস, গৃহনির্মাণ, খাদ্যাভ্যাস– প্রত্যেক গ্রামে একেবারে না হলেও, কিছুটা ভিন্ন। সেজন্যে নদীর পাড়ের গ্রামগুলো স্থলভাগের গ্রামগুলোর চেয়ে আলাদা।

দাদা-দাদীর মুখে মুখে প্রচারিত হয় এসব গল্পকথা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তা প্রবাহিত হয়। মেয়েরাও এভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে আলপনা আঁকা কিংবা মেঝেয় রঙ করা শেখে; চালের গুঁড়া, অঙ্গার, ইটের গুঁড়া দিয়ে তারা মেঝে রাঙায়। মেয়েরা ময়ূরের ছবি আঁকে; সূর্য, চাঁদ, ফুলের ছবি আঁকে। বয়স্কদের মধ্যে অনেকে আবার গ্রামের জায়গা-জমি খুব ভালো বোঝে; কিভাবে বংশানুক্রমে জমির হাতবদল হলো, কার হাত থেকে কার হাতে গেল, এসব তাদের নখদর্পণে।

গ্রামের লোকদের দৃষ্টিতে এই মুরুব্বীরা একেকটা প্রতিষ্ঠানের মতো। মুরুব্বীরা যে কোনো ঝগড়ায় এগিয়ে আসে; মুরুব্বীর কথা অনেক ক্ষেত্রে আইনের মর্যাদা

www.pathagar.com

পায়। তবে 'মুরুব্বী' বা প্রবীণ মানে, বাংলাদেশে যাদের বয়স ষাট কিংবা তার বেশি। আমার এক অবাঙালি বন্ধুর মতে, বাঙালির কাছে প্রবীণ লোক বলতে বোঝায় সেই লোক, যার বয়স ষাট। ষাটের কোটায় যাদের বয়স, বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোতে, তারা খুব শ্রদ্ধাভাজন। দেখা যায়, ষাট বছর বয়স পাওয়া কিংবা ষাট বছর ধরে বেঁচে থাকা দক্ষিণ এশিয়ায় দুর্লভ ঘটনা। অতিসম্প্রতি এক্ষেত্রে, অর্থাৎ দীর্ঘায়ু লাভের ক্ষেত্রে, কিছু উন্নতি হয়েছে। আমার বন্ধুর মন্তব্য অর্ধেক সত্য; কারণ বয়স একটা বড় ব্যাপার। ভালো বুদ্ধিসুদ্ধি এবং যুক্তিশীলতা সত্ত্বেও প্রবীণের অনুমোদন ছাড়া তার উদ্ভাবন গ্রহণযোগ্য হয় না।

তবে প্রবীণ বা মুরুব্বী মাত্রই যে ধনী ব্যক্তি তা কিন্তু নয়। মুরুব্বীরা তাদের অবস্থান এবং শ্রদ্ধা অর্জন করে জীবনব্যাপী সাধনা, সততা, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে। এই মুরুব্বীরা গ্রামীণ এলিট, কিন্তু তাদের কোনো 'লিগ্যাল পাওয়ার' নেই, এবং তারা কোনো নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় না। তবু তাদের কথাই লোকে শোনে, তারাই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেয়, তারাই গ্রামের বিরোধ ভঞ্জনে প্রধান ভূমিকা রাখে, কলহ মেটায়, সালিশ বিচার করে, সরকারি অফিসারদের সঙ্গে আলাপে বসে; এদের কাছ থেকেই লোকেরা চাষাবাদের পরামর্শ নেয়, কৃষিকাজের নিয়ম-কানুন শেখে, বন্যা ও প্লাবন প্রতিরোধের জন্যে এদের কাছেই সবাই ছুটে আসে। এদের কোনো আইনগত ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাদের ক্ষমতা আইনের মতোই; মুরুব্বীরা গ্রামে মোল্লা এবং সরকারি অফিসারদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাবান। গ্রামের ক্ষমতা ও ঐক্যের এই বিশেষ বিন্যাস বাংলাদেশে বহু প্রাচীন।

তবে 'মুরুব্বী'দের কথা শুনে এটা কেউ ভাববেন না যে, মোল্লাদের ক্ষমতা কম কিংবা তারা ক্ষমতাহীন। গ্রামের সর্বক্ষেত্রে মোল্লারা প্রভাব রাখে; যেমন– মক্তব। 'মক্তব' একটা প্রতিষ্ঠান, যেখানে মোল্লাদের কর্তৃত্ব। 'মক্তব' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এত গুরুত্বপূর্ণ যে, ব্রিটিশদেরও তা স্বীকার করতে হয়েছে। মক্তব ছাড়াও, স্বাস্থ্য ও পরিবার, সন্তান, দুস্থদের সহযোগিতা এবং আরো অনেক অনেক ক্ষেত্রে মোল্লাদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মফস্বল পার্সন'র মতো মৌলবীরা গ্রামের শিক্ষিতজন হিসেবে গণ্য।

আত্মীয়তা সম্পর্ক ও জাতিগত চেতনা বাংলাদেশের গ্রামজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; পশ্চিমে অবশ্য আত্মীয়তা সম্পর্ক, এর অর্থ ও তাৎপর্য এবং গভীরতা হারিয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশে আত্মীয়তাবোধ ও আত্মীয়-সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা তাদের জীবনের অংশ : যেরকম ভাত, ডাল, জল, বাতাস। আত্মীয়তা তাদের সামাজিক মর্যাদার স্মারক। গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ তার পূর্বপুরুষের গত

www.pathagar.com

আট প্রজন্ম পর্যন্ত চিহ্নিত করতে পারে। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ আত্মীয়তার, যেখানে রক্তের সম্পর্ক প্রধান, সেই সম্পর্ক গ্রামে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। রক্তের সম্পর্ক থেকে জন্মায় বন্ধুত্ব, সহযোগ এবং প্রেম, রক্ত সম্পর্কীয় নারী-পুরুষের মধ্যেকার প্রেম বাংলাদেশে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাংলাদেশে প্রেম হয় সাধারণত খালাতো ভাই/ফুফাতো ভাই, চাচাতো/মামাতো ভাই-এর সঙ্গে। খালাতো/ফুফাতো, চাচাতো/মামাতো বোনের প্রেম প্রতিদিনকার বাস্তবতা। এই প্রেম প্রায়ই বিয়েতে গড়ায়। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ের সম্পর্ক ঘটার পেছনে একটা তাৎপর্য আছে। মানুষ মনে করে, আত্মীয় মানুষের সঙ্গে বিবাহ হওয়াটা ভালো, কারণ তাতে একদিকে বংশ রক্ষা হয়, অন্যদিকে শত্রুর মধ্যে গিয়ে পড়ার আশংকা থাকে না। আরো সুবিধে হলো, এর মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক অনেক গাঢ় ও গভীর হয়; বৃহত্তর সমাজে প্রবেশের সুযোগ আসে; জীবনের ভবিষ্যৎ পথ চলা নিষ্কণ্টক হয়– যেমন চাকরি পাওয়া, ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করানো, অফিসের অনেক রকম কাজ, ঘরের বন্দোবস্ত ইত্যাদি। মোটকথা সাহায্য-সহযোগিতা অনেক বলিষ্ঠ হওয়ার অবকাশ আছে। বাংলাদেশে জ্ঞাতি সম্পর্ক ও আত্মীয়তাবোধ এদেশের সমাজকে চমৎকার একটা বন্ধনে গেঁথে রেখেছে।

এভাবে নিজের পরিচয়ের চেয়ে অন্যের পরিচয়, আত্মীয়তার পরিচয় বাংলাদেশে বড়। আত্মীয়তার পরিচয় এবং সম্পর্কের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সমাজ চলে। সমাজের স্ত্রীরা নিজের পরিচয়ে নয়, স্বামীর পরিচয়ে চলে– যেমন 'শামসুদ্দীন মিয়ার স্ত্রী'; কিংবা ছেলের পরিচয়ে, যেমন অমুকের মা। বন্ধু-বান্ধবরাও 'ভাই', 'চাচা' ইত্যাদি সম্বোধনে পরিচিত হয়। শাহজাহান কবিরের ভাই (ভাই নয়, আসলে কিন্তু 'বন্ধু') এম. এ. মুহিত যেহেতু বয়সে আমার চেয়ে বড়, কাজেই তিনি আমার 'চাচা'। বয়স্ক কারো সঙ্গে প্রথম দেখা হলে জিজ্ঞেস করে নেয়া ভালো, তাঁকে কি নামে ডাকা সংগত হবে। এভাবে সামাজিক সম্পর্ক নির্মিত হয় বাংলাদেশে।

ঐতিহ্য আরো নানা কারণে শক্তিশালী। প্রথম অনিরাপত্তার আতংক; দুর্যোগ, ঝড়-তুফান, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার ভয়। প্লাবন বা দুর্যোগ এলে, এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে গল্পের পর গল্প তৈরি হয়; একজন থেকে আরেকজন, আরেকজন থেকে আরেকজনে কথামালা গড়াতে থাকে। কোন খবর এসেছে, কোন খবর সত্য এবং কেন সত্য– মহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। ঐতিহ্যের গুরুত্ব ইংল্যাণ্ডেও আছে; একটা উদাহরণ দেয়া যায়। উনিশ শতকে একবার প্রতিভাবান প্রকৌশলীরা বললেন– পুরনো কাঠের লাঙ্গলের স্থানে নতুন ইস্পাতের লাঙ্গল চালু করতে। কৃষকেরা মানলো না প্রথম, তারপর জোর করে চাপানো হলো। কিন্তু দেখা গেল, ইস্পাতের লাঙ্গল অনেক দিক থেকে কাঠের লাঙ্গলের চেয়ে খারাপ; জমির স্বাস্থ্য,

www.pathagar.com

চাষবাস ও উৎপাদনের জন্যে কাঠের লাঙ্গলটাই শ্রেয়। অগত্যা কাঠের লাঙ্গলই বহাল রাখা হলো। এখনো ইংল্যান্ডের ছোট জমিতে কাঠের লাঙ্গলে চাষ হয়। অন্য বংশ বিষয়ে বিভিন্ন ভয়ঙ্কর গল্পকথা ছড়িয়ে দেয়ার রেওয়াজও ঐতিহ্যগত। এসব গল্প মিথ্যা বা বানোয়াট হলেও ঐতিহ্যের শক্তি এতটুকু কমে না। ঐতিহ্যের ভিত্তিতে কলহ মেটানো হয়, ঝগড়া ও দাম্পত্য গোলযোগের নিষ্পত্তি ঘটে, রোজকার ব্যাপার-স্যাপারে ঐতিহ্যই অগ্রগণ্য। ঐতিহ্যের পটভূমিকায় সামাজিক সম্মান ও শ্রদ্ধা নির্ধারিত হয়, ইংল্যান্ডের মতো দেশেও, অন্তত উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে। গ্রামের ঐতিহ্য সাধারণত আইনের মর্যাদা পায়।

নিরক্ষরতার সর্বব্যাপ্তি বাংলাদেশের গ্রামগুলোর আরেকটা বৈশিষ্ট্য। গ্রামের শিক্ষাধারা লিখিত নয়, মৌখিক, শ্রবণনির্ভর। যিনি প্রবীণ তিনি গ্রামের আচার-আচরণ জানেন, কাজেই তাঁকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয়। যাকে খুব ভালো শিক্ষিত মনে করা হয়, সেও অন্তত আধুনিক বোধের দিক থেকে অশিক্ষিত (ইহুদী বাইবেলের কথা মনে পড়ে; খ্রিস্টের জন্মের মাত্র কিছুকাল আগে ইহুদী ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়, তারাই লেখে, যারা শুনে শুনে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে তা মনে রেখেছে)। আধুনিক পৃথিবীতে ধীরে ধীরে লিখিত রেকর্ড ও বই-পুস্তকের ওপর নির্ভরতা বাড়ে। শিক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বি-মুখী : শিক্ষা একদিকে ভয় ও সন্দেহের বস্তু, অন্যদিকে শ্রদ্ধার। সবাই জানে যে ইংরেজি শিক্ষা না থাকলে অফিসে চাকরি-বাকরি হয় না; অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষারও একটা কদর আছে, ধর্মীয় কারণে ওই শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাও আছে।

মৌখিক ঐতিহ্যের ওপর গ্রামীণ বাঙালির নির্ভরতার একটা প্রধান কারণ কাব্যপ্রেম। বাঙালিরা কবিতাকে অসম্ভব ভালোবাসে; কেউ কবিতা পড়লে তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কবিতার ভূমিকা রাজনীতিতেও দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে। পরে, আমি যখন রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো তখন বিষয়টি আলোচনা হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের মতো ঘটনাতেও কবি এবং কবিতার একটা ভূমিকা ছিল।

সংযম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় বাংলাদেশে। এই সংযমের দৃষ্টান্ত তাদের কবিতায়, বিশ্বাস, ধর্মবোধ এবং ভাষায় দেখা যাবে; দেখা যাবে শিল্পকথায়, কৃষি এবং ব্যবসাবাণিজ্যে। গ্রামের লোকেরা উলঙ্গ হিন্দু সাধু, ভ্রাম্যমান অলি-দরবেশকে এখনো ভক্তি করে। যে বুজুর্গ এই নশ্বর জগত থেকে মুক্তির কথা বলছেন এবং দারিদ্র্যকে কঠোর সংযম ও পারলৌকিক প্রাপ্তিযোগের প্রতিশ্রুতিতে সম্মান জানাতে বলছেন; গ্রামের লোকেরা তাদের খুব সম্মান করে। গ্রামে যারা ধনী কৃষক, তারাও বিলাস-ব্যসনের অনুগামী নয়; তাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, জীবনযাপন সবই সাধারণ ও আড়ম্বরহীন, যুক্তরাষ্ট্রের শেইকার

www.pathagar.com

স্টাইলের মতো। পোশাক-আশাকও অত্যন্ত সাধারণ : শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, সাধারণ শাড়ি, সাধারণ লুঙ্গি। রঙচঙে কাপড়, জমকালো জুতা, অলংকৃত জামা– এগুলোকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখা হয়; ভাবা হয় এগুলো হৃদয়হীন, জড়বাদী স্বভাবের লক্ষণ। এই শিক্ষাটা কিন্তু ইসলাম থেকে আসেনি, হিন্দুধর্ম থেকে আসেনি, বৌদ্ধ ধর্ম থেকে আসেনি; এটা এসেছে চিরন্তন বাংলার গ্রাম থেকে; সেই গ্রাম, যেখানে লাভের চেয়ে ত্যাগ, প্রাপ্তির চেয়ে প্রত্যাশা, জীবনের চেয়ে মৃত্যু, জ্ঞানের চেয়ে প্রজ্ঞা মূল্যবান। যেখানে একজনের মূল্যায়নের জন্যে সারা জীবনের দরকার হয় এবং যেখানে সংযমের শিক্ষা প্রধান ব্যাপার। বাংলাদেশে সবসময়েই সম্মান পেয়েছেন গৌতম বুদ্ধ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু-সন্ত, সূফী-দরবেশ, মুসলিম অলি-আউলিয়া। মহাত্মা গান্ধীকে এদেশ আপন করে নিয়েছিল, পীর-ফকিরদের বড় কদর এদেশে। রণাঙ্গণে গাজীকে বাঙালিরা খুব ভালোবাসে। সৎ ব্যবসা ও সৎ বিনিয়োগ, সঞ্চয়– বাংলাদেশে খুব মূল্যবান। সংযম বাংলাদেশের মানুষের গহন মনোলোকে সবসময়ের জন্যে ছেয়ে আছে। বাংলাদেশের মানুষ অসৎ মানুষ এবং ভণ্ড লোক পছন্দ করে না। যিনি সত্যিকার ধনী তিনি যেমন শ্রদ্ধাভাজন, যিনি সত্যিকার প্রজ্ঞাবান তিনিও সম্মানার্হ; কিন্তু বাঙালিরা এই দুই চরিত্রের অভিব্যক্তি খুঁজে পায় সরলতা, আড়ম্বরহীনতা ও অবিলাসের মধ্যে। 'সংযম' তাই সবসময়েই বড় একটা ব্যাপার।

কিন্তু এ ধরনের ধর্ম বা চরিত্র প্রগতির পথেই থাকা সম্ভব, আর সেই প্রগতি অনিবার্যভাবে ভোগ ও ভোক্তার চাহিদার উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী ও লেখক কবীর চৌধুরী একবার একটা অদ্ভুত কথা আমাকে বললেন। কবীর চৌধুরী আমাকে বললেন, "যেসব মহিলা রঙ-বেরঙের শাড়ি কাপড় পরে, আমি তাদের নিন্দা করি। কেননা, মেয়েদের কেবল এক রকমের শাড়ি পরা উচিত, আর পুরুষদের থাকা দরকার কেবল এক ধরনের শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি।" আরো একজন অধ্যাপক বাংলাদেশের লোকদের ঘন ঘন মোটর কারের মডেল বদল এবং বছর বছর ফ্যাশন পরিবর্তনের তীব্র নিন্দা করেন। এঁরা অধ্যাপক হয়েও এ ধরনের কথা কেন বলেন, আমি বুঝি না; এঁরা কি জানেন না, তাঁদের পরামর্শ যদি মানা হয় তাহলে বাংলাদেশ আবার সেই মধ্যযুগ কিংবা আদিম যুগে ফিরে যাবে? বাজারের বিকাশ তো যে কোনো উন্নয়নের শর্ত; তাতে চাকরির সুযোগ বাড়ে, তাতে কর্মসংস্থান বাছাই করা সম্ভব হয়, তাতে দেশের মেধা উপযুক্ত স্থানে উপযুক্তভাবে ব্যবহার হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

অর্থনীতি বিষয়ে বাংলাদেশের সকল বক্তৃতার সিংহভাগ জুড়ে থাকে এই সংযমবিষয়ক বাগাড়ম্বর। সেসব বক্তৃতা দেশের মানুষকেও প্রভাবিত করে। সবাই

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কেবলি সংযমের কথা বলে, এমনকি অর্থনীতিবিদদের মতো প্রাজ্ঞ লোকেরাও; খাদ্যে সংযম, পোশাকে সংযম, জীবনযাপনের সর্বত্র সংযম। এসব ধারণা সেই পুরনো এলিজাবেথীয় মার্কেইনটাইলিজমের মতো, যার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দেশকে একটা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ খামার' বা সাবসিসটেন্স ফার্ম হিসেবে দেখা অর্থাৎ এমন খামার, যার উৎপাদন ওই খামারের জন্যেই; বিক্রির জন্যে নয়, প্রসারের জন্যে নয়, বিনিময়ের জন্যে নয়। এসব বক্তা গলাবাজির সময় একটা কথা ভুলে যান যে, জাপান-জার্মানি বা সুইজারল্যান্ডের মতো ধনী দেশগুলোও খাদ্য বা অন্যান্য বস্তুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বহু ক্ষেত্রে বহুভাবে তারা বিশ্ববাজারের ওপর নির্ভরশীল। এভাবে বিশ্ববাজারের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এই নির্ভরশীলতা এবং প্রতিযোগিতা যে স্বাভাবিক এবং উপকারী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে তাদের সেই শিক্ষাটা হয়েছে। ফলে আত্মনির্ভরশীলতার তত্ত্ব বা সার্বভৌমিকতার ধারণা তারা বাদ দিয়েছে; কেননা তার কোনো দরকার নেই এবং তা নিরর্থক। অথচ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী, সাম্যবাদী, বুদ্ধিজীবী সকলেই প্রায় আত্মনির্ভরশীলতার ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলেন; সেজন্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটা বাংলাদেশে মনোলোকের ভেতরই কোথাও রয়ে গেছে।

সংযমের একটা উদাহরণ মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশের একজন বিরাট ব্যক্তি আছেন– যাঁর নাম এবং সম্পদ ও ক্ষমতা সমার্থক। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তিনি সংযমী; তাঁর বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ আসবাবপত্র এবং তাঁর গাড়ি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়। তাঁর গাড়িটাও খুব সাধারণ। তাঁর পোশাকে কোনো বিলাস নেই এবং খাদ্যাভ্যাসও বিলাসহীন, মামুলি। হ্যাঁ, তিনি এটা অবশ্য বলেন যে, তিনি যেরকম জীবনযাপন করেন, তা অন্যেরও অনুসরণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

গ্রামীণ বাংলাদেশের আরেকটা প্রবণতা হলো এক ধরনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অবশ্য শিক্ষিত মুসলমান, পশ্চিমের মানুষ বা আধুনিক পূর্ব এশীয় তথা জাপানীদের কোনো মিল নেই। বহু গ্রামে বিভিন্ন আধিভৌতিক বিশ্বাস, প্রত্যয় ও প্রথা প্রচলিত : ভূত-প্রেত ও প্রেতাত্মায় অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ভূতের আছর লাগতে পারে, জ্বিন-পরী দ্বারা মানুষ, শিশু আক্রান্ত হতে পারে, ভূতের নজরে মানব ভাগ্যের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে– এসব অনেকের ধারণা। ভূতের ভয়ে নববধূ চুল কাটে না, যদি আবার সে গর্ভবতী না হতে পারে! পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বিধবা পবিত্র নদীতে স্নান করে, বিশেষ ইচ্ছা পূরণের মানসে। গ্রামের মানুষ যে 'প্রেরণা'র মধ্যে বিশ্বাস রাখে, সেই প্রেরণা কোথায় থাকে, কিভাবে থাকে– তা নিয়ে মানুষের কোনো মাথাব্যথা নেই; ওই প্রেরণায় তাদের নির্ভরতা, সেই নির্ভরতা থেকে তাদের মধ্যে জন্ম নেয় অনেক

www.pathagar.com

ধরনের কল্পনা, কল্পনার মাধ্যমে তারা এক প্রকৃতিলোক তৈরি করে নেয়, যার মধ্যে পশু-পাখি, প্রাণিগজৎ এক আশ্চর্য শক্তিমত্তায় অবতীর্ণ; অতঃপর তারা নদীর ভেতর, তার স্রোতোরেখায় ও স্রোতধারায়, জমি-জঙ্গলে ওই শক্তি ও ক্ষমতার আশ্চর্য কাল্পনিক ব্যাপ্তি আবিষ্কার করে নেয়। পশ্চিমের কোনো কোনো পরিবেশ বা নবযুগবাদী এক ধরনের মরমীবাদে আকৃষ্ট হলেও, গ্রামীণ জীবনের ওই অভিজ্ঞতা তাদের নেই।

তবে গ্রামীণ জীবনে ওই ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত থাকা আশ্চর্য কোনো ঘটনা নয়; কিন্তু যখন দেখা যায় খুব উচ্চশিক্ষিত শহুরে পরিবারে ওইসব ধ্যানধারণার প্রভাব রয়ে গেছে, তখন বেশ কৌতূহল হয়। হ্যাঁ, ঢাকা শহরে এমন অনেক শিক্ষিত পরিবার আছে, যাদের কেউ কেউ হার্ভার্ড অক্সফোর্ড থেকে পড়াশোনা করে এসেছে, তারাও ওইসব প্রাণিজাগতিক ভূত-প্রেত-আত্মায় দারুণ বিশ্বাস রাখে। তা থেকে বোঝা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে বাংলাদেশের মানুষ তৈরি হয়নি, তাদের কেন্দ্র-ভিত্তি-মূল গ্রামীণ অভিজ্ঞতা। আলোকিত তত্ত্বের চেয়ে পীর-ফকিরের দোয়া, জোতিষীর ভবিষদ্বাণী, নিয়তি ও হস্তরেখায় বিশ্বাস বাংলাদেশের অনেকখানি দখল করে আছে। দুটো উদাহরণ মনে পড়ছে। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাংলাদেশের এক গভর্নরের (যাঁর জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশেই) দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, সরকারি বাসভবন আক্রান্ত হতে পারে, এবং সেজন্যে তিনি আর সরকারি বাসভবনে থাকলেন না। তিনি চলে গেলেন অন্যত্র এবং খুব সাধারণভাবে জীবনযাপন করলেন। আরেকটি উদাহরণ হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার আগে সামরিক নেতা এক পীরের কাছে গিয়েছিলেন কোনদিন 'হত্যা' করলে সুবিধে হবে এবং অভিযান ব্যর্থ হবে না। ১৯৭৫ সালের সেই পীর-নির্দিষ্ট দিনে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।

এ ধরনের অদ্ভুত ধারণা কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বোঝা যায়, যখন দেখি ইংরেজি শিক্ষিত বাংলাদেশের এক গ্রান্ড লেডী ঘোষণা করলেন, 'বাংলাদেশে শিল্পায়ন মোটেও উচিত নয়, তাতে তাঁর প্রিয় বাংলা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'

কাজেই দেখা গেল, আদিম স্মৃতি, গ্রামীণ মনোলোক ও অভিজ্ঞতা, আবার বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা এখনো বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ড এবং তার জনগোষ্ঠীকে বিপুলভাবে অধিকার করে আছে; এবং তা কেবল গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, শহরবাসী শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মস্তিষ্ক-কোষেও তা সমান সক্রিয়।

www.pathagar.com

ভূখণ্ড ও ভাষা

ভূখণ্ড ও ভাষা, যে কোনো সংস্কৃতির প্রাণ এবং যে কোনো সংস্কৃতিতে এই দুটো উপাদান অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে যুক্ত। যেমন ইংল্যান্ডের কথা বলা যায়। ইংল্যান্ডে 'ভাষা' একটা পরম ঐশ্বর্যের মতো; যারা ইংরেজিতে কথা বলেন ইংল্যান্ডে, তাঁরা তাঁদের ভাষাকে পরম গৌরব ও অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করেন। ওই ভাষায় কথা বলার সময় ইংরেজদের মনে হবে বুঝিবা তাঁরা পবিত্র স্তোত্র পাঠ করছে। তবে 'রাশিয়া' আবার অন্য রকম; রাশিয়ায় বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র ভূখণ্ড, বিচিত্র সংস্কৃতি। তবে জাপান এবং ইসরাইলে দেখা যায়, জাতি, ভাষা ও ধর্মের আশ্চর্য ও অপূর্ব মেলবন্ধ। বাংলাদেশে সংস্কৃতি এবং ভাষার সুন্দর সংমিশ্রণ চোখে পড়ে।

বাংলাদেশের কাব্য এবং লোককথা অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, মাটি, জলবায়ু, জল, লাঙ্গল, নদী, নৌকা, কৃষক সারেঙের প্রতি সকলের একটা গভীর ভালোবাসা। একইভাবে পারাপার নৌকায় কোনো গায়ক, নগর চত্বরে অদ্ভুত পোশাকে কোনো চিত্তবিনোদক বাউলের গান, এমনকি টিভি সিরিয়ালের ছবি– সবই গ্রামের সবুজ নিসর্গ ও মনোজ্ঞ প্রকৃতিকে উপস্থাপন করে মনোহররূপে। এসব দেখে এবং শুনে বাঙালিরা বিগলিত হয়ে যায়। একজন বিদেশী লোক অবাক হয়ে যাবে, যখন সে দেখবে বাঙালিরা কত সামান্য ঘটনায় ভাবালু হয়; কত সামান্য জিনিসে তাদের কান্না পায়; বাঙালিরা বাঁশীর সুরে কাঁদে, অবকাশ মুহূর্তে তাদের চোখ ছলছল করে ওঠে; বৃষ্টি-বাদল তাদের আপ্লুত করে ফেলে, এমনকি নীল আকাশের নিচে কিংবা নিমজ্জমান সূর্য ও অস্তায়মান গোধূলি ও পরবর্তী সন্ধ্যার আঁধার তাদের আকুল করে ফেলে। এমনকি যে বাঙালিরা দুই-তিন প্রজন্ম ধরে লন্ডন শহরে বাস করছে, তারাও ছুটে আসে বাংলাদেশে, তাদের গ্রামের বাড়িতে, তারা শাড়ি পরে এবং লুঙ্গি, সকালবেলা নদীতে স্নান করতে যায়, দীঘিতে গিয়ে দাঁত মাজে, বাজারে যায় এবং সব মিলিয়ে এমন আচরণ করে যেন তারা আর কিছু দেখেনি, এই রকমই জীবনযাপন করছে এবং করবে।

বাংলাদেশের জন্যে বাঙালিদের ভালোবাসা অফুরন্ত, বাংলাদেশ তার স্বপ্ন ও স্বর্গ। ইতিহাস খুললেই চোখে পড়ে বাঙালির দেশপ্রেম; ইতিহাসের সাক্ষ্য একে একে জড়ো করা যায় সেই সুদূর অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। এই ভালোবাসার নজির : গাঙ্গেয় লোকদের হাতে আলেকজান্ডার দি গ্রেটের পরাজয়, ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াকু বাঙালিদের মরণপণ সংগ্রাম ও ট্রাজিক পরাভব, ১৮৩০ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহে, ১৮৫৭ সালে সিপাহী অভ্যুত্থানে, ১৯০৫ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে, ১৯১৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বাঙালি জাতির ব্রিটিশ বিরোধী সক্রিয়তা, দ্রোহ ও

www.pathagar.com

আন্দোলনে, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতায় বাঙালিরা সবসময়েই লড়েছে। এই স্বপ্নেঘেরা ভূখণ্ডটির জন্যে; কখনো জয় হয়েছে, কখনো পরাজয়, কিন্তু দেশটাকে ছেড়ে দেয়নি। সেই ভালোবাসাটাই তাদের গানে, কবিতায়, চিত্র, কথকতায় ব্যক্ত। ওয়ারেন হেস্টিংসের একটি কথা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলা যায় : বাঙালিরা ভালোবাসে তাদের দেশ এবং তার জন্যে তাদের ত্যাগও বিপুল।

বাঙালিরা যেমন ভালোবাসে তাদের দেশকে, তেমনি ভাষাকেও। 'বাংলা' ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগ্রুপের একটি সদস্য; এবং এর ব্যবহারের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এটা ঠিক যে, প্রাচীন বাংলা আধুনিক বাংলা থেকে অনেক ভিন্ন এবং আলাদা। কিন্তু তবু কথ্য বাংলা এবং লেখ্য বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; আকবরের সময়ে একটা প্রস্তর খণ্ড, পাল বংশের পালি লিপি, প্রাথমিক মুসলিম শাসনের বিভিন্ন বাংলা পাণ্ডুলিপি এবং অবশেষে ঊনিশ শতকের বঙ্গীয় জাগরণ সবই বাংলা ভাষার ধারাবাহিক ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বহন করে।

কিন্তু বাঙালি জাতির ইতিহাসে এমনও দেখা যায়, যখন তার ওপর বাংলার বদলে অন্য ভাষা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এগার শতক থেকে তের শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত সেন রাজবংশ চেয়েছে বাংলার স্থানে 'সংস্কৃত' বসাতে; একইভাবে মোগলরা চেয়েছে বাংলার স্থান দখল করুক ফার্সি; পাকিস্তানীরা চেয়েছে 'বাংলা'র বদলে উর্দুই হোক বাঙালির মাতৃভাষা। একদিকে বাঙালিরা তাদের ভাষার ওপর এই ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপকে প্রতিহত করেছে; অন্যদিকে বাংলা ভাষা অপরাপর ভাষার শব্দাবলী থেকে মুক্তভাবে গ্রহণ করেছে। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে আরবী, ফার্সি, উর্দু, পর্তুগীজ, মারাঠী ভাষার বিচিত্র শব্দাবলী; আর অবশেষে ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ অবলীলায় প্রবেশ করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় যেমন– গেইলিক, কেলটিক, ওয়েলস কিংবা হিব্রু-তে যে ঘটনা ঘটেছে, বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তা ঘটতে পারেনি। উপরোক্ত ভাষাগুলো মুক্ত ভাষায় পরিণত হয়েছিল, এই শতাব্দীতে এই ভাষাগুলো আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় সেই পতনদশা কখনো ঘটেনি। বাংলা ভাষা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান এবং এই প্রবহমানতা ঐতিহাসিক। 'বাংলা' হলো মাতৃভাষা এদেশের, এইটুকুই তো একটা বড় প্রেরণা। 'বাংলা' ভাষা পৃথিবীর অন্যতম দশটি ভাষার একটি; ১১০ মিলিয়ন বাংলাদেশের মানুষ, ৬৫ মিলিয়ন পশ্চিমবঙ্গের লোক, ৮৭ মিলিয়ন বিহারী এ ভাষায় কথা বলে। বাদই দিলাম ৩২ মিলিয়ন উড়িষ্যাবাসী কিংবা ২৩ মিলিয়ন আসামদেশীয় লোকদের কথা, যাদের ভাষাও মূলত 'বাংলা'। বহুকাল ধরে এই ভাষায় লেনদেন-কারবার-ব্যবসাবাণিজ্য হয়েছে, প্রচুর সাহিত্য এই ভাষায় রচিত হয়েছে; এই ভাষায় পরিচালিত হয়েছে সরকারি কার্যক্রম, আইন-কানুন; এই

www.pathagar.com

ভাষাতেই বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের চর্চা হয়েছে। বাংলা তাই, বাংলাদেশের মানুষ যা হতে চায়। এর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই, কিন্তু এই ভালোবাসা প্রচণ্ড শক্তিশালী ও গভীর।

ভূখণ্ড এবং ভাষা : একত্রে প্রথম রাজনৈতিক উদ্দীপক হিসেবে দেখা দেয়, ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ ঘোষিত বঙ্গভঙ্গের সময়। দেশ এবং ভাষা সেই সময় রাজনৈতিক/মতাদর্শিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ব্রিটিশরা কয়েকটি কারণে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দিয়েছিল। প্রথমত, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করা এবং তার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে আরো পাকাপোক্ত করা। এমনিতে 'কলকাতা' ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় সাম্রাজ্যের অন্য অংশে ক্ষোভ ছিল; কেননা, কলকাতা থেকে জন্ম হতে শুরু করেছে সিভিল সার্ভেন্ট, আইনজ্ঞ, প্রকৌশলী, সর্বোপরি নামজাদা রাজনৈতিক নেতৃবর্গ। তদুপরি কলকাতা রাজধানী হওয়ার সূত্রে এখানে অনেক অনেক স্কুল-কলেজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুবিধেগুলোও কলকাতাবাসীরা ভোগ করতে থাকে। তাছাড়া কলকাতা ছিল প্রধান বন্দর নগর, তার ফলে লন্ডনের পরেই কলকাতার স্থান তৈরি হয়েছিল। সেজন্যেই পশ্চিম ভারতের এক নেতা গোখলে বলেছিলেন (১৮৯০) : 'বাংলা আজ যা ভাবে, ভারত তা ভাববে আগামীকাল।'

এরকম পটভূমিতে ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়; সেই সিদ্ধান্ত এই জন্যে যে, যাতে বাংলার প্রভাব কমে আসে, তার ইতিমধ্যে গজিয়ে ওঠা শিংগুলো ভোঁতা হয়ে যায়। ভারত সাম্রাজ্যের ভেতর বাংলার এরকম অবস্থান এবং কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার প্রভাবকে ব্রিটিশরা ক্ষতিকর মনে করেছিল। তার কারণ বাংলা এক শতাব্দীর মধ্যে ব্রিটিশ প্রভুর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল : অর্থাগম, রাজস্ব, সরকারি প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে, সর্বোপরি বুদ্ধিবৃত্তিতে। যদি কখনো বাংলার মুসলমান এবং হিন্দুরা এক হতে পারত, ব্রিটিশদের তখনই ভারতবর্ষের সাধ চুকে যেত। এই আশংকার কারণে ব্রিটিশরা বাংলাকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আলাদা দুটো ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়, এই সিদ্ধান্তের কারণে কেবল প্রশাসনিক সংস্কার ছিল না। প্রত্যেক ভাগের দায়িত্বে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্যার হার্বার্ট রাইজলি সরকারি নথিপত্রে লিখেছেন : 'এক বাংলা যেহেতু একটা শক্তি এবং সেই শক্তি ব্রিটিশ শাসনের জন্যে ক্ষতিকর, তাই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।' তাই যখন বাংলার উচ্চবর্গীয় লোকেরা, অর্থাৎ এলিটরা, যখন ভাবলো যে, তাদের যে শক্তি তৈরি হয়েছে তা দিয়ে ব্রিটিশদের চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব, ঠিক তখনই ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গের আঘাত হানল।

www.pathagar.com

তবে পরবর্তীতে যেসব ঘটনা ঘটল, তা ব্রিটিশদের প্রত্যাশিত ছিল না। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী বছর, ১৯০৬ সালে, জাপানীরা এক যুদ্ধে রুশদের পরাজিত করে; কোনো ইউরোপীয় শক্তিকে অ-ইউরোপীয় শক্তি এই শতাব্দীতে এই প্রথম পরাজিত করল। এশীয়দের বিজয় আর দুঃসাহসে ইউরোপীয়রা হতভম্ব হয়; ইংরেজরা বাংলা এবং বাঙালিকে ভয় করতে শুরু করে; লর্ড কার্জন লেখেন : 'জাপানীদের জয় বিরাট অশনি সংকেতের মতো; জাপানীদের বিজয়ে প্রাচ্যে উল্লাসের হাওয়া বইছে।' যাই হোক, পূর্ব এশিয়ার জাপানী শক্তির অভূতপূর্ব জাগরণে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের মান-সম্মান ধূলিসাৎ হয়; 'ভদ্রলোক' বা 'বাবু' শব্দ লজ্জার ও অপমানের প্রতীক হয়ে ওঠে।

যাই হোক, বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় দানা বাঁধতে শুরু করল বাঙালি জাতীয়তাবাদ; দেশ, ভাষা ও জাতির প্রতি একাগ্র একাত্মতাবোধের সমীকরণে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধের উদগম। এই একাত্মতা এবং অঙ্গীকার সেই যে জেগেছিল, আর নিষ্প্রভ হয়নি। বাঙালি নেতারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা এবং বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার করল সর্বত্র। 'বন্দে মাতরম্' ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্দীপক মন্ত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীও এই গান ব্যবহার করেছেন; পাকিস্তান বিরোধী ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামেও এই গান অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে বিপুল।

বন্দে মাতরম্

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্॥
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।

www.pathagar.com

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভুক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।"

[আনন্দমঠ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ভূখণ্ড, ভাষা, আত্মা এবং দেশমাতৃকার প্রেম এক আশ্চর্য রাখীবন্ধনে মিলেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'-এ। দেশমাতৃকার এই ভালোবাসা মিশে গেছে কখনো দুর্গাদেবীর সঙ্গে, কখনো কালীদেবীর। দুর্গা এবং কালী এক দেবীর দুই রূপ; দুই রূপে ভক্তের আরতি বিজ্ঞাপিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের (আনন্দমঠ) মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমিক সন্তানদলের কামনা করেছেন; যারা দারিদ্র্যকে বরণ করে, গুপ্ত সংগঠনের ছায়ায়, বৃহৎ ত্যাগে নিজেদের নিবেদন করবে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় এই গুপ্ত সন্তানসংগঠন সত্যিই গড়ে উঠেছিল। বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ দ্রব্য প্রত্যাখ্যান, নাটক এবং গণ-আন্দোলনের সূত্রে যে সংগ্রামের সূচনা তার রূপ ছিল প্রথম বাঙালি, পরবর্তীতে তা সর্বভারতীয় উপনিবেশ-বিরোধী জাগরণের আকার নেয়। সারা বাংলায় দেখা দেয় বিভিন্ন সংগঠন, যার কোনো কোনোটির অপভ্রংশ অন্য চেহারায় আজো টিকে আছে। ব্রিটিশ আইনে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় 'বন্দে মাতরম্'; তবে এর প্রেরণা ও প্রভাব ছিল বিরাট-ব্যাপক। এই এক গানের মধ্যে বাঙালির আত্মাবিষ্কার সূচিত হলো যেন, ভিত্তি হয়ে উঠল এক রাজনৈতিক আন্দোলনের– ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধেও এই দেশাত্মবোধক গানের আবেদন ছিল বিপুল।

১৯০৫ সালে যে বাঙালি জাগরণ, তা মূলত হিন্দুর, হিন্দুরাই ছিল তাতে ঐক্যবদ্ধ; কেননা, হিন্দুরাই ব্রিটিশরাজের বড় বড় অবস্থান দখল করে রেখেছিল

www.pathagar.com

এবং বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় তা হারানোর একটা আশঙ্কা দেখা দেয়। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের জন্যে একটা আধা-স্বাধীন প্রদেশের অঙ্গীকার এনেছিল, যেখানে হিন্দুদের অবস্থান হবে মূলত ব্যবসায়ী ও জমিদার সম্প্রদায়রূপে। বাঙালি মুসলমানের অতীতেও ব্রিটিশদের এজেন্ট কখনো ছিল না, যে রকম কলকাতার হিন্দুরা ছিল; বঙ্গভঙ্গের দৃষ্টান্তে মুসলমানদেরকে ব্রিটিশ এজেন্ট ভাবা ঠিক হয় না। যদিও হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের মতো কালীদেবীর সামনে অবনত মস্তকে শপথগ্রহণ মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তবু মুসলমানেরা ছিল দেশপ্রেমিক : এই দেশ এবং তার ভাষা, এমনকি বন্দে মাতরম্-এর সঙ্গীত মধুরিমা তাদেরও প্রাণে বেজেছে। জাতীয়তাবাদের সেই যে একটা জাগৃতি ও স্ফুরণ, তার অবশেষ যে মুছে যায়নি তার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ, স্বাধীন বাংলাদেশ ও তার জাতীয়তাবাদী চৈতন্য, যার পূর্বাঙ্কুর রয়ে গেছে এই শতাব্দীর প্রারম্ভের আন্দোলনে।

৬৬ বছর পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরিণামে জন্ম নেয় আধুনিক বাংলাদেশ; এর উৎস জাতীয়তাবাদ, দেশের প্রতি ভালোবাসা, বাঙালি জাতিসত্তার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও আবেগ। এর শেকড় কোনো না কোনোভাবে ওই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে রয়ে গেছে। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের নেপথ্যে প্রধান উদ্দীপক ছিল ভাষা-মাতৃভাষা এবং এমনও মনে হয়েছিল যে, হয়তোবা দুই বাংলা এক হয়ে যেতে পারে।

তবে জাতীয়তাবাদ অনেক সময় জন্ম দেয় আত্মকেন্দ্রিকতার, যাকে বলা যায় কূপমণ্ডূকতা। এক ধরনের অহংবোধ, তৃপ্তি ও বিদেশ-ভীতি তৈরি করে জাতীয়তাবাদ। নীরদ চৌধুরী তাঁর বিভিন্ন রচনায় এই উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী ব্যাধির কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা ভাষার আন্দোলনও তাই বাংলাদেশে আন্তর্জাতিকতা-বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বহির্বিশ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে কূপমণ্ডূক হবার বাসনা এর মধ্যে কার্যকর। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ঊনিশ শতকী রেনেসাঁস বা আলোকপর্বের মতো কোনো ঘটনার জন্ম দিতে পারেনি; ঊনিশ শতকের বুদ্ধিবৃত্তি যেরকম বিশ্বজনীনতার স্তব করেছিল, বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তি ও মনস্বিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলার মনন, যার ভেতর জর্মনমনস্বী ম্যাক্স মুলারকে পাই, চন্দ্রনগর ও পন্ডিচেরির ফরাসী স্কলারদের পাই, সে রকম কোনো পুনর্জন্ম ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি করেনি।

ঊনিশ শতকী আলোকপর্বের ঐতিহ্যে বিচিত্র জ্ঞানের সঙ্গে যে যোগ ও সম্পৃক্তি এবং বিকাশ দেখি, তা লুপ্ত হয়ে গেছে বহুকাল আগে; অন্য ভাষার জ্ঞান এখন বাঙালির অনায়ত্ত। বাংলাদেশের লাইব্রেরিগুলো আমি দেখেছি; দরকারী জ্ঞান ও বইপত্রের অভাব প্রকট। ভাষা আন্দোলনের অর্থ যদি এই হয়, অন্য ভাষাকে জানব

www.pathagar.com

না, বুঝব না, তাহলে তা হবে যুগপৎ মূঢ় ও বিপজ্জনক এক সিদ্ধান্ত। এই রকম যদি হয়ে থাকে, তাকে বলতে হবে 'ল্যাংগুয়েজ ফ্যাসিজম', এই রকম যে হয়নি ইতোমধ্যে, তা বলা মুশকিল। একে বাংলাদেশের এক বড় দুর্ভাগ্য মনে করি আমি। এর অন্য ফলও রয়েছে। যেমন বিদেশী বিনিয়োগ; এই রকম আত্মকেন্দ্রিক দেশে বিদেশীরা বিনিয়োগ ও ব্যবসাবাণিজ্যে উদ্যম হারায়।

উচ্চশ্রেণীর কারো কারো মধ্যে এই আত্মকেন্দ্রিক ভাব দেখা যায়। তবে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা মোটামুটি কম। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কূপমণ্ডূকতাও হ্রাস পায়। তবে আত্মকেন্দ্রিকতার উৎসমূল তদন্ত করা যেতে পারে। একটি কারণ হলো, পাশ্চাত্য উগ্র বর্ণবাদের ভয় ও ঘৃণা তা বাস্তব হোক কিংবা কাল্পনিক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা যে দারিদ্র্যের জন্ম দিয়েছিল, সেই ভয়ও এতে আছে। আত্মকেন্দ্রিকতার আরেকটা কারণ দুর্ভিক্ষের আতংক, বিদেশী খয়রাতে অবিশ্বাস। এসব মিলেমিশে আছে বাঙালির অনুভূতিলোকে, এগুলো ঠিক যুক্তিগ্রাহ্য নয়; কিন্তু এগুলোর মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা ও কূপমণ্ডূক মানসিকতা।

বিদেশীদের মধ্যে যারা বাঙালি বর্তমান আত্মকেন্দ্রিকতাকে যাচাই করতে চান, তারা সত্যবাদী নন। কেননা, বাংলা সংস্কৃতির দীর্ঘ ঐতিহ্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং আরো অনেক নেতা-কর্মী-পুরুষ এই আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। তাঁরা বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, আত্মকেন্দ্রিকতা কতটা সর্বনেশে। তাঁরা ছিলেন বিশ্বজনীনতার পক্ষের এবং যাবতীয় ক্ষুদ্রতা ও আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণ আত্মতুষ্টির বিরোধী। একজন বিখ্যাত মৌলানা সত্যি কথা বলেছিলেন, আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে স্টুপিড বানায়। যে বাংলাদেশ ১৭৫৭ সালের পর থেকে যেখানে ইংরেজি-ভাষী পৃথিবীর অংশ ছিল, সেই বাংলাদেশ একটা বদ্ধ ভাষার খাঁচায় অন্তরীণ আছে সত্যিই দুঃখজনক।

ব্রাহ্ম মন

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশী মানুষের এক বিশেষভাবে অভিজাত, বিদগ্ধ, শহুরে ও নগরমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি আছে– অন্য এলাকা বা দেশের আভিজাত্যের সঙ্গে এর মিল আছে বটে; কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে স্বতন্ত্রও। এই দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক নয়, এই দৃষ্টির ভেতর অনায়াসে অন্তরিত হতে পেরেছে সমগ্র বাংলার উত্তরাধিকার। এই মনোলোক সুশিক্ষিত এবং এতে অতি সহজে বাঙালি, হিন্দু, ইসলাম, পারস্য ও আধুনিক পৃথিবীর সকল ঐহিত্য ও ঐশ্বর্য এসে মিশেছে। অত্যন্ত সুকর্ষিত ও সমার্জিত মননের সঙ্গে এটাকে তুলনা করা যায়।

www.pathagar.com

এই মনোলোকের অধিকারী ব্যক্তিরা বিশেষ ধরনের অনুশাসনের ভেতর দিয়ে এসেছেন এবং ইংরেজ-মুগ্ধতার একটা ব্যাপারও তাতে আছে এবং দেখা যাবে এরা কিংবা তাঁদের পূর্বসূরীরা ভারতের সেইন্ট পোল, মসৌরী, দেরাদুন ও সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করেছেন, এবং বাংলাদেশে তাঁদের সন্তানেরা পড়েছে নটর ডেম কিংবা হলিক্রসে এবং অতঃপর গেছেন বিলেতে উচ্চশিক্ষার পাঠ দিতে : অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ কিংবা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাঁদের বয়স পঞ্চাশের ওপরে এবং সুমার্জিত মনোলোকের অধিকারী, দেখা যাবে তাঁদের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক খুব নিবিড়, আর তাঁদের সন্তানেরা– ভারত-পাকিস্তানের বিরোধের ফলে সম্পর্কিত হয়েছে বিভিন্ন ব্রিটিশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

তবে এটা ঠিক, ইংরেজি এবং ইংল্যান্ডের ভালো জিনিসগুলোকে এঁরা নিজেদের জীবনে চর্চা ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তাই বলে একে 'ইংরেজকাতর' মানসিকতা বলা যায় না। কেননা, এঁদেরও আসল ঐহিত্য বাংলার মাটিতে। এই মানসিকতাকে বরং যথাযথ শব্দের অভাবে, বলতে পারি 'ব্রাহ্ম মানসিকতা' বা 'ব্রাহ্ম মন'। 'ব্রাহ্ম' কথাটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

এই যে মনোলোক, যাকে 'ব্রাহ্ম' বলছি, বলতে পারি অন্য কিছুও, সেই মনের কথা বলতে হলে অনেক কথা মনে পড়ে যায় ইতিহাসের। এই মনোলোকের অধিবাসীরা জীবনকে কল্পনা করেছেন উঁচু মনন, সুশিক্ষা ও আধ্যাত্মিক এষণার মধ্য দিয়ে, এমন জীবন যার একটা সম্পূর্ণতা আছে, একটা অর্থ আছে এবং অর্থপূর্ণ মৃত্যুর জন্যে একটা প্রস্তুতি আছে। আমাদের মনে পড়ে মেগাস্থিনিসের কথা, যিনি তাঁর সময়ের বুদ্ধিবৃত্তির চূড়ায় আরোহণ করেন, যাঁর বিদ্যাসভা বসতো অরণ্যে কুঞ্জবীথিতে এবং যিনি জীবন ও মৃত্যুর তাৎপর্য নিয়ে কথা বলতেন। আল-বেরুনীর কথা মনে পড়ে, যিনি এক সংস্কৃতির সীমানা পেরিয়ে অন্য সংস্কৃতির ভেতর প্রবেশ করেন এবং তার অনন্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন; যিনি হিন্দুকে বুঝবার জন্যে এই উপমহাদেশে আসেন এবং হিন্দুদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেন। যেসব মুসলিম বিজেতারা ভারতবর্ষের মুসলিম-অমুসলিম রচনা ও কাজের অনুবাদ করেছিলেন, তাদের কথাও মনে পড়ে। আল-বেরুনীর প্রবর্তনায় মুসলিম জ্ঞানচর্চার যে উদারতন্ত্র তা বিস্মৃত হবার নয়।

এ ধরনের যে মন ও মনন তার মধ্যে একটা অত্যন্ত মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গি আছে, আছে একটা উদ্দীপক আদর্শ– যে আদর্শের ভিত্তি প্রাচীন আত্মানুশাসন, সত্যনিষ্ঠা, এক ধরনের দার্শনিক ভারসাম্য, একটা প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বা 'উইথডম'-এর ভিত্তিতে এই ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে এই উঁচু আদর্শের অনুবর্তী হয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তোলেন অনেক অনেক ব্যক্তি, যাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের

www.pathagar.com

স্ত্রী-পুরুষ, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, বিচারপতি, আইনজীবী, সিভিল কর্মকর্তা, কূটনীতিজ্ঞ, ব্যবসায়ী রয়েছেন এবং এরা সকলেই নিজ নিজ জীবনে ওইরকম উঁচু আর কঠিন মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। এদের মধ্যে খুব সচেতনভাবে 'এলিট' হয়েছেন এমন ব্যক্তি হাতেগোনা; বেশিরভাগই 'সফিস্টিকেটেড'। ঢাকা বা চট্টগ্রাম বা বাংলাদেশের অন্যান্য শহরেও এই রুচিবান, সংস্কৃতিবান মানুষদের পাওয়া যাবে। এসব পরিবারে অর্থ নয়, সংস্কৃতিই মূল।

কেন আমি এই সুকর্ষিত মনোলোককে 'ব্রাহ্ম' অভিধা দিচ্ছি, সেই প্রসঙ্গে যেতে পারি। 'ব্রাহ্ম' শব্দটি এসেছে উনিশ শতকী বাংলার এক বিশেষ মুহূর্তের ইতিহাস থেকে। রাজা রামমোহন রায় ১৮৩০ সালে কলকাতায় 'ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন; এর উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম সংস্কার এবং এর ভিত্তি ছিল হিন্দু ধর্ম। রামমোহনের ব্রাহ্ম মতবাদ বিভিন্ন ধর্মমত ও পথের অদ্ভুত সমন্বয় এবং এর শেকড় যদিও 'ব্রাহ্ম সমাজে'; কিন্তু এর দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ওতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলাদেশের যে সুকর্ষিত, মুক্ত ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি, তা-ও ওই ব্রাহ্ম উত্তরাধিকারের ঐতিহ্যবাহী। ব্রাহ্ম সমাজের বিশুদ্ধতাবাদ, পিউরিটান, জীবনদর্শন, সত্যনিষ্ঠা ও যত্নার্জিত ভাষা-ভঙ্গি, সবই একটা বিশেষ ধরনের জীবনাচার তৈরি করে এবং জীবনের এই দর্শন ও দৃষ্টিতে বাংলাদেশের যেসব ব্যক্তি নিজেদের অভ্যস্ত করেছেন তা বাঙালি সমাজের অহংকার। বাংলাদেশের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি বলি ব্রাহ্ম মনোলোক এবং যদি এর অনুশাসন এখানকার একটা বিশেষ নাগরিক সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করি, তাহলে একই সঙ্গে আমরা দেখব কিভাবে খ্রিস্টীয় 'বঙ্গসভা'র উত্তরাধিকার অনুসৃত হয় ফিলাডেলফিয়া, বস্টনকে কিভাবে পরিচালিত করে পিউরিটানিজম এবং কিভাবে ও কেন পেলাগিয়ান রসিকতা লন্ডনের বিভিন্ন চার্চ প্রভাবিত, এমনকি আক্রান্ত করে। তবে মনে রাখতে হবে 'ধর্ম' নয়, 'ব্রাহ্ম সমাজ'-এর ধর্মের কথা আজ আর কেউ মনেও রাখে না; কিন্তু ব্রাহ্ম মনোলোক যে সংবেদনশীলতার জন্ম দিয়েছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উচ্চ শ্রেণীর বাঙালি সমাজ ব্রাহ্ম জীবনচর্যায় দীক্ষিত ছিল এবং স্বাভাবিকভাবে কলকাতায় এর প্রভাব ছিল সবচেয়ে প্রবল। এঁদের যে আধুনিকতা বা আধুনিকমনস্কতা সেটা ওই যুগের বিরাট এক বৈশিষ্ট্য বলতে হবে। ব্রাহ্ম উত্তরাধিকারের সমাজের এলিট শ্রেণী দেশ ও বিদেশ, স্বাদেশিক ও আন্তর্জাতিকের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণে ব্রতী হন। দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ইংরেজির ঐতিহ্য এঁরা মেলানোর চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলিম পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হবার প্রেরণাও এ থেকে পায়। অনেক দিক থেকে ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মসমন্বয়পন্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনিটোরিয়ানিজম'-এর সঙ্গে মিলে যায়; এমনকি জার্মানির ইহুদীধর্ম সংস্কারের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য আছে। নিউইয়র্কের 'এথিকাল কালচার সোসাইটি'র নীতি ও অনুশাসনের সঙ্গেও এর মিল বিদ্যমান।

www.pathagar.com

আদর্শ, সততা, সংবেদনশীলতা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে সুগভীর আস্থা, পরোপকার-ব্রত ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ– ব্রাহ্ম নৈতিকতার মূল কথা। এই জীবনবোধের বিচিত্র সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্রুপদী রচনায়, রামমোহন রায় ও রমেশচন্দ্র দত্তের সৃষ্টিসম্ভারে এবং সাম্প্রতিক সময়ের নীরদ চৌধুরীর লেখায়ও এর প্রভাব দেখা যায়। ঢাকার বিভিন্ন সৃষ্টিশীল ব্যক্তির ভেতরেও এরই অভিব্যক্তি আমি দেখেছি, যেমন বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান, লেখিকা হামিদা হোসেনসহ বাংলাদেশের অনেকানেক লেখক, ভাবুক, বুদ্ধিবীবী, কবি, সংস্কৃতিকর্মী, শিল্পী। এদের অনেকেই কলকাতায় তাঁদের প্রাক্তন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করেন।

এরা সকলেই নিজদেশ বাংলাদেশের প্রেমিক, এই দেশ তাঁদের গর্ব, গৌরব ও ভরসা; কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা আন্তর্জাতিক; এঁরা কূপমণ্ডূক নন, বরং বিশ্বজনীন মানসিকতায় ঋদ্ধ। স্বজাতিকে এরা মনে করেন বৃহত্তর বিশ্বের অংশ এবং অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিজড়িত। এশিয়া তো বটেই, ইউরোপের সঙ্গে এঁরা বোধ করেন গভীর আত্মীয়তা, বিশেষত ইংল্যান্ডের সঙ্গে এঁরা নিবিড় অন্তরঙ্গ। ইংল্যান্ডের প্রতি দুর্বলতার ঐতিহাসিক কারণ আছে; তা হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মনস্বিতায় ইংল্যান্ড প্রবল একটা সত্য এবং তার সূচনা রামমোহনের হাতে এবং ইউরোপীয়রাও ভারতবর্ষের অতীতকে আবিষ্কার করতে মগ্ন হন এ সময়েই এবং এই দেশে। এই ঐতিহ্যের ভেতর থেকে বাংলাদেশের মানুষের আধুনিকতার বোধ তৈরি হয়েছে। শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষেরও।

এই আধুনিকেরা প্রচণ্ডভাবে সংবেদনশীল যা কিছু মহৎ ও উন্নত তা আবিষ্কার ও অন্তর্গত করে নেয়ার জন্যে এঁরা উন্মুখ; যে কোনো নতুন চিন্তাকে গ্রহণ করতে এঁদের দ্বিধা হয় না এবং কোনো আবদ্ধ ভাবনায় এঁদের আস্থা নেই, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা ভাবনার বদলে উৎসাহী : জীর্ণ বিশ্বাসের বদ্ধ কুঠুরীতে এঁদের বসবাস নয়, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টিতে এঁদের স্বপ্ন কেবলি বিকাশের দিকে ধাবিত। সবচেয়ে বড় কথা, নিজেদের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধিবৃত্তিতে এঁরা বাংলাদেশের উন্নততর চিন্তালোকের প্রতিনিধি।

তবে ব্রাহ্ম মনোলোকের এই মননশীল মানুষেরা একদিক থেকে শক্তিশালী; কিন্তু অন্যদিক থেকে দুর্বল। এঁরা দেশ চালান না, দেশে রাজনীতি এঁদের নিয়ন্ত্রণে নেই এবং এঁরা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিও নন। সমাজের সংস্কার বা পরিবর্তন করে কোনো বাঞ্ছিত ব্যবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষমতা এঁদের নেই, রাজনীতির মতো ব্যাপারে জড়িয়ে নিজেদের হাত এঁরা নোংরা করতে চান না। সিভিলিয়ান নিয়ন্ত্রণে দেশ চলুক, সামরিক বাহিনীর হাতে জিম্মি না হয়ে পড়ুক এই মাতৃভূমি,

www.pathagar.com

এটা তাঁদের বাসনা। কিন্তু সেটা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা তো এঁদের নেই। তবে এঁরা খানিকটা বামপন্থীও, মার্কসবাদ-ঘেঁষা এবং সেটা একটা সমস্যা। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন– জাপান, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া বিষয়ে এঁরা বেশ অজ্ঞ। আর দুই বঙ্গের এসব বামপন্থী তত্ত্বকেন্দ্রিক লোক দেশের জন্যে ভালো কিছু করতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গের ওরা তো বরং দেশকে পতনের দিকেই নিয়ে গেছে।

বাংলাদেশে এই মার্কসবাদ-ঘেঁষা ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবীরা দেশের জন্যে এমন কিছু করতে পারেননি, যা থেকে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধিকার সর্বসমক্ষে প্রতিপন্ন হতে পারে; এমন কোনো ভবিষ্যৎ দর্শন তাঁদের নেই যা আকর্ষণ করবে মানুষকে, এমন কোনো কাজ বা উদ্যোগ তাদের নেই যে সাধারণ মানুষ সরকারের বাইরে তাদেরকে শক্তিশালী মনে করবে, তাদের ওপর ভরসা রাখবে, তাদের থেকে নির্দেশনা পাবে। এদের কোনো ম্যাগাজিন নেই, টেলিভিশনে তাদের কোনো আলোচনা নেই, এমনকি কোনো সংগঠনও নেই যা তাদের ভাবনা ও মতাদর্শ তুলে ধরবে। উল্টা বরং বিদেশী সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন বুদ্ধিজীবীরা এদের আচ্ছন্ন করে রেখেছেন এবং যেহেতু টাকাটা বিদেশের, কাজেই এদেশের লোকেদের নির্বাক করে রাখা কঠিন ব্যাপার নয়।

এসব ব্রাহ্ম মননশীলের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করতে হলে তাদের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটি তুলতে হয়; কেননা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক সৃষ্টিশীল মানুষটি তাঁর গান-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস-নাটক সংবেদনশীলতা, ধর্মবোধ ও ঔপনিষদিক মনোদৃষ্টি দিয়ে বাংলার সর্বস্তরে যে প্রভাব রেখেছেন তার দ্বারা ব্রাহ্ম, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই আক্রান্ত।

১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার এক ধনী হিন্দু (হিন্দু থেকে পরবর্তীতে ব্রাহ্ম) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন। ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশদের প্রথম মৌলিক বিজয়ের সময় থেকেই এ সম্পর্কের সূচনা। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য ছিলেন এবং নানা ধর্মের মানুষকে ব্রাহ্ম বিশ্বাসে আহ্বান জানিয়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনকে একই সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন খুবই প্রতিভাবান, ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের বাইরে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটা প্রভাব ছিল কলকাতায় এবং সেই প্রভাব প্রচণ্ড। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল এক মূল্যবান আধ্যাত্মিক প্রত্যয়, মুসলিম ঐতিহ্যের সূফী মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল। চৈতন্য ও কবীরের ভক্তি আন্দোলনের উপযুক্ত পরিগ্রহণ ও সংমিশ্রণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে ভাবমূর্তি

www.pathagar.com

নির্মাণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে যেভাবে বাস্তব বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান মেশান, তার ফলে তিনিই হয়ে ওঠেন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব।

সরাসরিভাবে নয়, কিন্তু ভারতের রাজনীতিতেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধারণা খানিকটা সাম্যবাদী, যদিও তাকে মার্কসিস্ট বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক স্বাধীনতার পূর্বে সামাজিক সংস্কার কাম্য ভেবেছেন এবং সেদিক থেকে তাঁর ভেতর জাতীয়তাবাদমনস্কতা জন্ম নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছেন সক্রিয়ভাবে এবং অখণ্ড বাংলার পক্ষে কথা বলেছেন।

বিচিত্র ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বলোকের সৌন্দর্য, শিশুর প্রতি ভালোবাসা, ঔপনিষদিক পরম অরূপ ও ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশ করেছে এবং পশ্চিমের কাছে এদেশ ও তার মানুষকে উপস্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মরমী কাব্য 'গীতাঞ্জলী'র জন্যে বিখ্যাত, যার আংশিক অনুবাদ ইংরেজিতে বের হবার পর ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারের টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যার নাম 'শান্তি নিকেতন'– কলকাতা থেকে নব্বই মাইল দূরে। শান্তি নিকেতনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবিকতা, পবিত্রতাবোধ, কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করার প্রয়াস পান, যার সঙ্গে ইংল্যান্ডের সাম্যবাদী আন্দোলনের মিল লক্ষ্য করা যায়। এই শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সমাজের স্থলে একটা অপরূপ প্রাকৃতিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। অনেক মানুষ আকৃষ্ট হয় শান্তিনিকেতনের প্রতি এবং কবিতার প্রতি আবেগপোষণকারী তরুণ নিঃস্বার্থ স্ত্রী-পুরুষ সেদিকে ছুটে যায়। রবীন্দ্রনাথ এমন একজন মানুষ তৈরি করেছেন যার অর্থ, ক্ষমতা ও সফলতার দিনানুদৈনিক লোভের ঊর্ধ্বে উঠে এক মহৎ আদর্শের অনুবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

পশ্চিমবাংলার হিন্দু সমাজে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এখনো বিপুল এবং এখনো তাদের মধ্যে রাবীন্দ্রিক মৃদু সাম্যবাদের আদর্শ সক্রিয় এবং এ ধরনের ভাবাবেগ ব্রাহ্মদের মধ্যেও কার্যকর। তবে সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পূর্ববাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজেও প্রচণ্ডভাবে দ্রষ্টব্য হয়, বিশেষত পাকিস্তানীরা যখন বাংলা ভাষা লুপ্ত করার চক্রান্ত করে। পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান নিষিদ্ধ করে দেয়; কিন্তু বাঙালিরা রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান প্রচার করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন বাংলার এক অভ্রান্ত প্রতীক, রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে অভিব্যক্তি পায় বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য– পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আধিপত্য এভাবে আকারিত হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে কাব্যের প্রভাবের কথা বলেছিলাম আগে, রবীন্দ্রনাথও এ প্রভাব সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথের অবদান ও ভূমিকা এই জায়গায় এসে খানিকটা দুর্বোধ্য ও রহস্যময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতা লিখেছেন এবং গান লিখেছেন এবং সেই গান ও কবিতা মাতিয়ে দিয়েছে এপার ও ওপার বাংলা, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দুই বাংলায় তাঁর জীবদ্দশাতেই বিপুল ছিল; তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'গুরুদেব' মনে করেননি। কিন্তু বাঙালির মন রবীন্দ্রনাথকে সন্তপুরুষ ও গুরুদেব বানিয়ে তোলে। ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথ জন্মালে তিনি কখনোই 'গুরুদেব' হতেন না, হতেন মহৎ 'চারণ' কবি।

কেন রবীন্দ্রনাথ কেবলি একজন মহৎ চারণ কবি না হয়ে গুরুদেব ও সন্তপুরুষে পরিণত হলেন; তার কারণ, ব্রাদার জেমসের বিশ্লেষণে, এই রকম : রবীন্দ্রনাথের মরমী চেতনা ও মিস্টিসিজম কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, এর কারণ তাঁর যৌবনকালের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার একটা বড় অংশ মিস্টিক। ব্রাদার জেমস রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট অনুবাদকদের অন্যতম, খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের দীক্ষিত পুরুষ এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গীতাঞ্জলির ইংরেজি সংস্করণের জনয়িতা। মিস্টিক অভিজ্ঞতা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ছিল প্রবল রোমান্টিক ভাবলোক, যার ভেতর স্বদেশ, ভূ-প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য অন্তরিত। পূর্ববাংলায় পিতার জমিদারী তদারক করার সময় থেকে রবীন্দ্রমনোলোকে এই রোমান্টিসিজমের স্থায়ী স্ফুরণ ঘটেছে। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের লোকালয় ও নিসর্গলোক এবং লালন শাহের বাউল গান রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সত্তাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, কুষ্টিয়ার মৌখিক বাংলা শুদ্ধতম বাংলা। এই কুষ্টিয়াতেই লালনের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বাংলার সম্পর্ক ও এই পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশের মানুষকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ করে রাখে। সেজন্যে সোনার বাংলার বুকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্যে শেখ মুজিবুর রহমান রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেন দু'বার, এবং স্বাধীনতাত্তোর বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেন দেশপ্রেমে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা খুব প্রত্যক্ষ, সেই রকম প্রভাব আর কোনো প্রভাবের সঙ্গেই তুলনীয় নয়। কলকাতার এক কবি ইরা দে তাই বলেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যা কিছু আছে তা মুসলিম বাংলাদেশে, হিন্দু পশ্চিমবাংলায় নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিরাট অংশ যাপিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে; তবু রবীন্দ্রনাথের ভাষাপ্রেম বাংলাদেশের মানুষকে বাংলা ভাষা সংরক্ষণের সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। পশ্চিমবাংলায় ভাষার প্রতি ভালোবাসা আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি।"

অত্যন্ত মলিন একটা পর্ব পশ্চিমবঙ্গে অতিক্রান্ত হবার পর রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য সক্রিয় হয় বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গের দুরবস্থার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নন, ওখানকার বামমনস্ক ব্রাহ্মরা দায়ী। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে একটা রোমান্টিক ভাবালুতাপূর্ণ

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ কাজ করে গেছে; যার ফলে কলকাতা একটা অল্পোন্নত নগরী এবং পশ্চিমবঙ্গ একটা দরিদ্রতম প্রদেশে পরিণত হয়েছে। সত্তর দশকের শেষের দিকে যেসব কম্যুনিস্ট ক্ষমতায় আসেন, যারা ছিলেন মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও সংবেদনশীল, পশ্চিমবঙ্গ তখন থেকে পূর্ব ইউরোপের ব্লকে চলে যায়– তার ফলে কলকাতার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকলেও তা দিল্লী, বম্বে, বাঙ্গালোর বা মাদ্রাজের মতো উন্নত হতে পারেনি; কলকাতা এমনকি ঢাকার তুলনায়ও অনাধুনিক। অথচ তিরিশের দশক পর্যন্তও কলকাতা ছিল উন্নত নগরী, 'সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী'; সেই নগরীর কথা যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে আজকের কলকাতা অবিশ্বাস্যরকম পতিত মনে হবে। বিদেশী পর্যবেক্ষকের চোখে কলকাতা এমনকি বর্তমান পৃথিবীর বাংলাভাষী প্রথম নগরীও নয়। ভারতীয় কংগ্রেস দলের দীর্ঘদিনের উপেক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে কিছু কিছু উন্নয়ন ঘটে; কিন্তু রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদতা ঘোচেনি, অথচ গত পনের বছরে ঢাকা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান এখন তৈরি হয় ঢাকায়, আর দেখে কলকাতার লোকেরা।

কলকাতা শহরের টেলিফোন প্রায়ই খারাপ থাকে; কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়, যা এক সময় ছিল ভারত-শ্রেষ্ঠ, এখন এত বেশিরকম পিছিয়ে গেছে যে, ভারতের প্রধান পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তার অবস্থান নেই; অন্তহীন মানুষের ভিড়, সারিসারি দাঁড়িয়ে থাকা অটো আর বাসের জ্যামে কলকাতার প্রাণ ওষ্ঠাগত; কলকাতার রান্নাবান্নায় এখনো কয়লার ব্যবহার হচ্ছে, প্রাকৃতিক গ্যাস নয়; ভালো ভালো বাড়িতেও গ্যাসের উনুন নেই; কলকাতার বিদ্যুৎ, যুদ্ধকালীন ভিয়েতনামের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার চেয়েও অনির্ভরযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই পশ্চাৎমুখিনতার জন্যে দায়ী করা যায় না; বেঁচে থাকলে হয়তো এই পতনের জন্যে প্রতিবাদ করতেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ব্রাহ্ম গোছের আঁতেলরা দেশের এই দুর্দশার জন্মদাতা। তবে, ব্রাহ্মদের বুদ্ধিমত্তা, সংবেদনশীলতা, নাগরিকতা যে নেই তা নয়; অবশ্যই আছে এবং তাও রবীন্দ্র-প্রভাবজাত।

বিপরীতে, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্বাধীনতালাভে অনুপ্রাণিত করেছে এবং তাঁর রোমান্টিকতা ও কাণ্ডজ্ঞান এখনো এদেশের মনোলোকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তবু, কম্যুনিজম কখনো শেকড় পায়নি এই বাংলায়। গ্রামীণ জীবনের ভাবসম্পদ এই বাংলায় অক্ষুণ্ণ। আর আজকের বাংলাদেশ তো বহুগুণে উন্নত; আধুনিকায়ন বিস্তৃত হচ্ছে নানাভাবে, টেলিফোন অত্যাধুনিক, বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা নগর থেকে গ্রামে-গঞ্জে লোকালয়ে সর্বত্র সম্প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে বদলে গেছে কিংবা চাপা পড়ে গেছে কম্যুনিস্ট নায়কদের

www.pathagar.com

ইমেজের তলায়, আর পুঁজিবাদী উন্নয়নের ধারায় অগ্রসরমান এই বাংলায় রবীন্দ্রনাথ অক্ষত আছেন।

কিন্তু উঁচুতলার ব্রাহ্ম ভাবুকেরা তাদের অদ্ভুত সাম্যবাদের খেয়াল, রোমান্টিকতা এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ভাবধারা এখনো জিইয়ে রেখেছেন অব্যাহতভাবে। ফলে দুটো ঘটনা ঘটেছে : একদিকে রোমান্টিক/রাবীন্দ্রিক মরমীয়া চৈতন্য ও ভাবালুতার প্রতি তাদের অনুরাগ অনেকাংশে; অন্যদিকে পৃথিবীর বাস্তব অর্থনৈতিক ও রাজনীতির পরিবর্তনে তাঁদের সংঘাত প্রায় অদম্য। এই সংঘাত, দ্বন্দ ও দ্বিধা থেকে ব্রাহ্ম বামপন্থীদের মুক্তির উপায় কি? উপায় একটাই, তা হলো ফালতু আঁতলামি পরিহার করা এবং কর্মযোগী হওয়া। তাঁদের ভাবনা ও অনুভূতিলোকের সারবত্তা তবু স্বীকার্য। তবে মনে রাখতে হবে, সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে বিভিন্ন ম্যানারের মধ্য দিয়ে; অন্য সবকিছু তার অনুগমন করে।

বাংলা ব্রাহ্ম মনোলোকের বৃত্তান্ত আপাতত শেষ করার পথে; আমাদের মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ভাবুক বুদ্ধিজীবীদেরকে একাত্তর সালে পাকবাহিনী দলেদলে নির্মমভাবে হত্যা করে। এদের মধ্যে হিন্দু বুদ্ধিজীবী আছেন, মুসলিম বুদ্ধিজীবী আছেন। এসব বুদ্ধিজীবী শিল্প-সংস্কৃতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এঁদের সকলেই ছিলেন সেই মনোলোক ও ভাবধারার অনুগামী, যার বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এতগুলো প্রাণ সংহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা এখনো পূরণ হয়নি।

সামরিক মন

পাকিস্তান-পর্বে তো বটেই, বাংলাদেশেও সেনাবাহিনী তথাকথিত জাতির রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের চারপাশ বৃত্তের মতো ঘিরে রেখেছে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক নেতারা বারবারই একটা জিনিস উপেক্ষা করে গেছেন যে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, বৈদেশিক পলিসির পুনর্গঠন এবং ক্ষমতার প্রকৃতি অনুধাবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এসব বুদ্ধিজীবীর সময় কেটেছে কে নেতৃত্ব দেবে, কিভাবে সাম্যবাদী গণতন্ত্র আসবে ইত্যাদির আলোচনায়। বিপরীতে সেনাবাহিনীর চিন্তাধারা ছিল সুশৃংখল, তাদের শাসন অভিজ্ঞতাও রয়েছে; সেনাবাহিনী জানে এবং জানত প্রতিপক্ষের দুর্বলতা কি এবং কোথায়; সিভিল সার্ভিস পার্টনারদের অভিলাষও তাদের অজ্ঞাত নয়। তাছাড়া পরিকল্পনা ও পলিসিতে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি তাদেরকে সবচেয়ে কার্যকর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে; স্বাধীনতাত্তোর দুই দশকের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়।

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদেরা এখনো চিহ্নিত করতে পারেননি হুমকির প্রকৃতি কি এবং কেমন। রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি এত সংকীর্ণ যে, তাঁরা তাঁদের কর্তব্যও ঠিকমতো বোঝেন না; তাঁদের প্রথম কর্তব্য নেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার সর্বসমক্ষে প্রতিপন্ন করে ক্ষমতায় আসা। নেতৃত্বের এই অধিকার অর্জনের জন্যে এসব বুদ্ধিজীবীর চরিত্র ও স্বভাব এবং মনোভঙ্গিগত পরিবর্তন দরকার। প্রথমত, সামরিক বাহিনীকে বুঝতে হবে এবং তাদের ক্ষমতা কিভাবে কমানো যায় তার প্রক্রিয়া বের করতে হবে; প্রয়োজনে, জীবনের ক্যারিয়ারের একটা পর্যায়ে মিলিটারিতে যেতে হবে– অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক জাতিতে দেখা যায় সামরিক বাহিনীতে অনেকেই ঢোকে; তাছাড়া সেনাবাহিনীর ইতিহাস ও কার্যধারা পাঠ করতে হবে। সচেতন রাজনৈতিক কর্মসূচি একটাই হতে পারে, তা হলো, অফিসার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পরস্পর নির্ভর দায়িত্বশীল সেতুবন্ধন সৃষ্টি। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের প্রমাণ করতে হবে সরকার পরিচালনা কি জিনিস তারা বোঝে এবং এটাও দেখাতে হবে যে, ডিফেন্স ও বৈদেশিক পলিসি বিষয়ে তাদের স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। এসব যদি প্রমাণ করা যায়, তাহলে সেনাবাহিনীর ওপর তাদের প্রভাব তৈরি হবে এবং সেনাবাহিনী সিভিলিয়ান কর্তৃত্ব মেনে নেবে।

সিভিলিয়ানদের তুলনায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও আধিপত্য কেন এদেশে বেশি, তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, মুসলিম ও ব্রিটিশ পর্যায়ে বাংলাদেশ যুগপৎ মিলিটারি ও সিভিল কর্তৃত্ব দ্বারা শাসিত হয়েছে। মুসলিম শাসনামলের কথা ভাবতে পারি। মুসলিম ধর্মের একদিকে আছে সুফী-গাজীরা, অন্যপ্রান্তে মৌলানারা।

মুসলিম শাসনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিভক্ত ছিল সিভিল ও সেনাবাহিনীতে। সেজন্যে স্থানীয় রাজা (অর্থাৎ নিযাম) নিয়ন্ত্রণ করতেন নিযামত (বা সেনাবাহিনীর প্রশাসন) এবং আদালত ও গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ; আর দিওয়ান, অর্থাৎ উচ্চপদস্থ সিভিল অফিসিয়াল নিয়ন্ত্রণ করতেন দেওয়ানি– অর্থাৎ সিভিল প্রশাসন, রাজস্ব ইত্যাদি। দেওয়ানি সম্পর্কিত ছিল ব্যাংকসমূহের সঙ্গে, যে ব্যাংক সরকারকে অর্থের যোগান দিত। মুসলমানদের মতো ব্রিটিশরাও সিভিল ও মিলিটারি, এ দুই পথে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছে। যেমন বাংলাদেশে সিভিল লাইনের লোকেশন হলো ঢাকার রমনা, আর মিলিটারি লাইনের লোকেশন কুর্মিটোলা। ব্রিটিশরা সিভিল প্রশাসনের পেছনে লাগিয়ে রাখত সামরিক বাহিনীর প্রহরা, অর্থাৎ ব্রিটিশদের সিভিল প্রশাসন সামরিক বাহিনী সমর্থিত ছিল এবং উপরন্তু, সেনাবাহিনী ও সিভিল এই দুই লাইনের প্রশাসন ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিল। পাউল স্কটের জনপ্রিয় উপন্যাস 'দি রাজ কোয়ার্টেট' এবং বিবিসি'র 'জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন' সিরিজে

www.pathagar.com

এর চমৎকার বিবরণ আছে। ব্রিটিশদের এই যে ব্যবস্থা এটাই বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সরকারের বৈশিষ্ট্য; এই প্রক্রিয়ায় গত বিশ বছরের মধ্যে বার বছর সামরিক সরকার এদেশ শাসন করেছে এবং এর একেবারে বিশুদ্ধ রূপ দেখা যায় এরশাদের আমলে।

সেনাবাহিনী ও সামরিক শক্তি যখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই বাংলাদেশের সামরিক নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে কয়েকটা বিষয় জেনে নেয়া দরকার। সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বোধকরি এই যে, সামরিক বাহিনী প্রায় একটা গোত্রের মতো; তারা দেখতে আলাদা, তাদের শিক্ষা ও স্বভাব এবং আচরণ ভিন্ন, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও স্বতন্ত্র। যদিও বাংলাদেশের শেষ দুই সামরিক নেতা জিয়াউর রহমান (১৯৭৫-৮১) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ (১৯৮২-৯১) দুজনেই পুরোপুরি বাংলার মৃত্তিকার একেবারেই বাঙালি সন্তান; তবু তাদের একটা ক্যাটাগরি আছে : তারা দুজনেই সিনিয়র অফিসার, অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাদের পূর্বপুরুষ তুরস্ক ও আফগানিস্তান থেকে আগত। এই পূর্বপুরুষেরা বিদেশ থেকে এখানে আসেন ও বসবাস করেন ইসলাম প্রচারের জন্যে, এবং এখানেই তারা বিয়ে করে ঘর-সংসার করেন। এঁদেরই বংশোদ্ভূত এসব অফিসার যে মূল্যবোধ ব্যবস্থা তৈরি করেন, তার সারকথা হলো, ক্ষমতা সম্পর্কে নিরঙ্কুশ ও নিষ্ঠুর একটা মনোভঙ্গি। অর্থাৎ ক্ষমতার লক্ষ্য শাসন করা এবং শাসনের এই মনোভাব দেশ চালনার জন্যে অনিবার্য।

যদিও সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক ধরনের মার্জিত আভিজাত্য লালন করেন, তবু তাদের অধিকাংশই বিচক্ষণ, চতুর ও হিসাববাদী। চাতুর্য ও বিচক্ষণতার এই ঐতিহ্য অনেক পুরনো, বাংলার প্রাচীন বড় সেনানায়কদের ইতিহাসে এর নজির পাওয়া যায়। যেমন গজনীর সুলতান মাহমুদ, মুহম্মদ ঘোরি, কুতুবুদ্দিন আইবেক, মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি; সুলতান সিকান্দার (যিনি ঢাকার নিকটবর্তী তাকঢালায় একটা দূর্গ প্রতিষ্ঠা করেন), শেখ ইসলাম খান– যিনি ঢাকাকে বাংলার রাজধানী বানান; ইবরাহিম খান; শামসুদ্দীন আহমেদ; গিয়াসউদ্দিন খান; কাশিম খান; আলীবর্দী খান (বাংলার শেষতম স্বাধীন রাজ্যাধিপতি); এবং শায়েস্তা খান– যিনি মোগল শাসনামলে বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এসব শাসক যুদ্ধ কিভাবে করতে হয়, রাজ্য পরিচালনা কাকে বলে, ন্যায়বিচার এবং প্রশাসন কি রকম– এসবই জানতেন; এবং মুসলিম দার্শনিক আল ফারাবীর রাষ্ট্র-চিন্তার ধরনে তাঁরা প্রজাদের আনুগত্য অর্জন করেন এবং আনুগত্য লাভের জন্যে তাঁরা ব্যবহার করেছেন নিজেদের জ্ঞান ও উদ্যম। আজকের বাংলাদেশে যাঁরা সামরিক অফিসার, তাদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ মিলিটারি ছিলেন। শুধু তাই নয়, সুদূর অতীত থেকে শুরু করে এখনো এঁরা নিজেদের বাহিনীর ভেতরই আত্মীয়তা করেন; এবং এটা দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের রেওয়াজ।

www.pathagar.com

সামরিক অফিসারেরা বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করেন– গ্যারিসন ও ক্যান্টনমেন্ট তাঁদের আবাসস্থল; প্রতিদিনের জীবন ও লোকালয়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই। তাঁদের বাসভবন অত্যন্ত সুরক্ষিত, প্রহরাবেষ্টিত, সুন্দর; ক্যান্টনমেন্ট মানেই হলো যেখানকার প্রাসাদগুলো অপূর্ব, সুসজ্জিত; যেখানে ব্যারাক আছে, মেস হল আছে, জিমনেসিয়ামসহ অফিসার্স মেস আছে, কম মূল্যের দোকান আছে, হাসপাতাল আছে, লাইব্রেরি-স্কুল, অতি চমৎকার যানবাহন এবং সবুজ উদ্যান আছে। জোয়ান, অফিসার ও হাবিলদারেরা নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পূর্ণ করার বদলে সুবিধেগুলো ভোগ করে থাকে।

পাশ্চাত্য জগতের সামরিক বাহিনীর মতো বাংলাদেশের ক্যান্টনমেন্টগুলোতে ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান রয়েছে; এবং এই ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলো সকল স্তরের সামরিক ব্যক্তিবর্গের জন্যে। সর্বস্তরের সামরিক লোকদের এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। সবসময় এই প্রশিক্ষণ চলছে, কোনো কোনো প্রশিক্ষণ দশকের পর দশক ধরে চলে। সকল সৈনিকই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়, প্রশিক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতি ঘটে; তাদের স্কুলে পাঠানো হয়, কাউকে কাউকে বিদেশে যাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। সেজন্যে অন্য পেশার তুলনায় সামরিক পেশা একেবারেই ভিন্ন– কেননা, এখানাকার প্রতিটি সৈনিক একই সঙ্গে ছাত্র এবং শিক্ষক, এখানকার একজন অফিসার মানে একজন বুদ্ধিজীবী। শান্তিপূর্ণ সময়ে সামরিক লোকেরা যে কোনো রকম ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্যে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। সেনাবাহিনীর এই হলো প্রকৃতি এবং এই তাদের অঙ্গীকার। প্রশিক্ষণ যত অগ্রসর হয়, ধীরে ধীরে তাদেরকে বুদ্ধিমত্তা, কৌশল, জাতীয় অগ্রাধিকার ও স্ট্রাটেজি প্রভৃতি শেখান হতে থাকে এবং এভাবে সেনাবাহিনী কূটনৈতিক, সামরিক-অর্থনৈতিক যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। সেনাবাহিনী প্রশাসিত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ'– এরকম কোনো প্রতিষ্ঠান সিভিলিয়ানদের নেই। সেনাবাহিনীর শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের তুলনা চলতে পারে কেবল সিভিল সার্ভিস ও বিচার বিভাগের সাথে।

উপরন্তু সামরিক স্কুল এবং কলেজও রয়ে গেছে; ওসব স্কুল ও কলেজ যেন পরবর্তী পেশাগত ক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। ওসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরিক নিয়ম-কানুন ও অনুশাসন ভীষণভাবে অনুসৃত হয়। অনেকগুলো বিশেষ স্কুল রয়েছে, যেখানে তরুণ কর্মকর্তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে শিক্ষাগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের অনেকেই সামরিক স্কুলে পড়াশোনার জন্যে খুব গর্ববোধ করেন, যদিও তারা সেনাবাহিনীতে যাননি। এসব স্কুলে শিক্ষালাভ ও ফলাফলের জন্যে তাঁরা খুব তৃপ্তিবোধ করেন। সবচেয়ে বড় কথা, অনেকেই স্বীকার করেন যে, সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ স্কুল-কলেজের তুলনায় দুর্নীতিমুক্ত।

www.pathagar.com

এ প্রক্রিয়ায় সামরিক অফিসারেরা নিজেদের একটা স্বতন্ত্র গোত্র ও সম্প্রদায় তৈরি করে এবং যারা বাইরে থেকে ওখানে আসে তারাও সামরিক দক্ষতায় অনুপ্রাণিত হয় এবং সবাই শারীরিক-মানসিক সব দিক থেকে উত্তমভাবে প্রশিক্ষণ লাভ করে। ফলত, সকলে কর্তৃত্বের জ্ঞান অর্জন করে, কেননা তারা শিখেছে কিভাবে চিন্তা করতে হয়। যেহেতু নেতৃত্বের পরীক্ষা হলো তাদের উদ্দেশ্য, ফলে যারা কৃতকার্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে যায়। সামরিক বাহিনী এভাবে তাদের স্বতন্ত্র সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে।

এখন যারা সেনাবাহিনীর কমান্ডার, তারা পাকিস্তানী বাহিনীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে কমিশন্ড অথবা নন-কমিশন্ড অফিসার হিসেবে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ অবশ্য স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেননি, কেননা পাকিস্তান সরকার তাদেরকে ট্রান্সফার করেছিল, অথবা জেলে ভরেছিল। সেজন্যে কিছুসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন জিয়াউর রহমান ও তাঁর অনুগত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারীরা) অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাই সাধারণ মানুষ থেকে এসেছে এবং তারা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ভারতীয় আর্মিতে, জেনারেল ভগবত সিংহের অধীনে। জেনারেল ভগবত সিংহ পরবর্তীতে শিখ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ভারতে মারা যান।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতার পর প্রথম আট বছরে, জিয়া নিহত হবার পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটা প্রকাশ্য সংঘাত বিদ্যমান ছিল। এই কালপর্বে সেনাবাহিনীর ভেতর একটা চরমপন্থী সেল গড়ে ওঠে এবং এ সময় 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি অনিয়মিত সামরিক বাহিনীও জন্ম নেয়, যারা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময়েই পাকিস্তানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকদের দ্বারা বাংলাদেশের প্রথম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন এবং সেই হত্যা ছিল খুবই সুপরিকল্পিত। সেনা-বিদ্রোহের নেতা কর্নেল তাহের ও আওয়ামী লীগ ভাবধারার খালেদ মোশাররফের উত্থান এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পুরো পাঁচটি বছর ধরে সেনাবাহিনীর ভেতর চরমপন্থীদের দমনকার্য অব্যাহত থাকে। শত শত অফিসার ও ব্যক্তি এতে নিহত হয় এবং অবশেষে জিয়াউর রহমানকেও প্রাণ দিতে হয় চেইন-অফ-কমান্ড ফিরিয়ে আনার দীর্ঘসূত্রী প্রক্রিয়ায়। প্রধান মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম জেনারেল মঞ্জুরও নিহত হলেন অতঃপর। এভাবে নতুন অভ্যুত্থান ঘটান জেনারেল এরশাদ, যিনি জিয়াউর রহমানকে চেইন-অফ-কমান্ড ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে একদা সহযোহিতা করেছিলেন।

সেনাবাহিনীর শোণিতাক্ত আখ্যানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, তারা সংঘাত-লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়েছে এবং তারাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে

www.pathagar.com

জাতিবিষয়ে, অথচ মুজিবের সিভিল উপদেষ্টারা রঙ-বেরঙের তত্ত্ব আর বাগাড়ম্বরে সময় ব্যয় করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে। তত্ত্বের ভেতরই তারা ছিল, বাস্তব সমস্যা তারা বুঝতে পারেনি। সামরিক বাহিনী রাজনীতির মোকাবেলা করেছে এবং সকল ধরনের সমস্যায় কাজ করে গেছে।

সেনাবাহিনীর মধ্যে আন্তঃসংঘর্ষ ও লড়াই অনেক হয়েছে; কিন্তু জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীই প্রথমবারের মতো ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে, যে ধরনের ঐক্য একটা নতুন দেশের জন্যে সব থেকে জরুরি। সামরিক বাহিনীর আন্তঃসংঘাতের মধ্যে সিভিলিয়ানদের অভ্যন্তর সংঘাতই প্রতীকায়িত। সিভিলিয়ানদের দ্বন্দ্ব এখনো অব্যাহত, এই দ্বন্দ্বের ফলে সিভিলিয়ানরা আজও কোনো কিছু প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি– যেটা মিলিটারি করেছে। সেজন্যে দেখা যায়, সেনাবাহিনী বাজার অর্থনীতি সমাজকল্যাণমূলক সরকারের সমর্থক এবং ওই পথেই তারা গেছে; আর বিপরীতে উজ্জ্বল সিভিল নেতৃত্ব পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপকেন্দ্রিক সাম্যবাদী সরকার ব্যবস্থার পক্ষপাতী। ১৯৭৪ সালে সিভিলিয়ানরা একটা সাংবিধানিক আইন পাস করে, যার ফলে 'বাকশাল' নামক একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন পাস হবার ফলে শেখ মুজিবুর রহমান অপরিসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হন। মুজিব সরকারের সময় এই আত্মঘাতী ঘটনাটি ঘটেছিল 'ইতিহাস' থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে। যারা বাকশাল সরকার গঠন করেছিল পরমাগ্রহে তারা সামরিক বাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করেনি। যে কারণে এর প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় ঐক্যের ভেতর ফাটল ধরে, স্বাধীনতার সময় যেরকমটা হয়েছিল পাকিস্তানীদের সঙ্গে। সর্বনাশ ঘনীভূত হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে, যেদিন শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর হাতে সপরিবারে নিহত হন। সেই যে মিলিটারি ক্ষমতায় এল, পরবর্তী পনেরটি বছর ধরে তারাই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে গেছে। ১৯৯১ সালে সিভিলিয়ানরা পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে; কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ নয়– বিভক্ত; বিভক্ত এজন্যে যে মিলিটারি শক্তি প্রয়োগ করে যে ঐক্য রচনা করে সিভিলিয়ানরা যুক্তির মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এখনো সিভিলিয়ানরা বুঝতে পারে না যে, ভুল হোক, শুদ্ধ হোক, জাতি সম্পর্কে সেনাবাহিনীর একটা সামগ্রিক দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যেটা সিভিলিয়ানদের নেই।

বাংলাদেশের অনেকেই, যাদের মধ্যে সিভিল কর্মকর্তা, শ্রমিক নেতা, গ্রামীণ ও সামাজিক নেতা থেকে শুরু করে সবাই আছেন, মিলিটারিকে শাসনকার্যে দেখতে আগ্রহী; এরা সামরিক শাসন ও সামরিক উদ্যমের অনুরাগী এবং এই মনোভাব দেখে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিদেশ থেকে যাঁরা এদেশে আসেন, তাঁদের একটা

www.pathagar.com

কথা সবসময় মনে হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রের ধারণা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে সামরিক শাসনের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং লোকেরা সামরিক শাসনের পক্ষপাতী এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। মুসলমানেরা গণতন্ত্র-বিরোধী, ঠিক এই ধরনের সরলীকরণ করতে চাই না; কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসনের প্রতি এ এক দুর্বলতা।

এই যখন পরিস্থিতি, সেক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সিভিলিয়ান গণতান্ত্রিক সরকার সম্ভবপর কিনা ভাববার বিষয়; সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ক্যাডার সিভিলিয়ানের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাংলাদেশে সিভিল সরকার স্থায়ী হতে পারে না। কেননা, ওরকম না হলে বাংলাদেশের কোনো সরকারই যুগপৎ সিভিল সার্ভিস ও সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না। মিলিটারি সমর্থন ও অনুমোদন এবং নেতৃত্বের একটা ভিশন ও সুপরিকল্পিত পলিসি ছাড়া কেবল কয়েকজন ব্যারিস্টার-বুদ্ধিজীবী কি বাংলাদেশ রাষ্ট্র চালাতে পারবে? আরো একটা ভেবে দেখার মতো বিষয় হলো, অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের আত্মগৌরবের বোধ, মিলিটারির ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা– যার ফলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সমঝোতা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যার ফলে মিলিটারি ও সিভিলিয়ানদের মধ্যে টেনশন বিবর্ধমান। অভিজাত বুদ্ধিজীবীরা তো রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ বা ভূমিকা স্বীকারই করতে রাজী নন; এবং তাঁরা এমন কোনো পলিসি স্বীকার করেন না যে পলিসিতে সিভিল নেতৃবৃন্দ, মিলিটারি ও সিভিল প্রশাসন একতাবদ্ধ হতে পারে। ১৯৭১ সালের পর থেকে আমি এসব বিষয় সম্পর্কে বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে গভীরভাবে অনেক আলোচনা করেছি এবং আমার মনের ভেতরে কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্য জাতি-রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও সেনাবাহিনী সবচেয়ে বড় জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যা সিভিল প্রশাসনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৯১ সালে সিভিলিয়ান ক্ষমতায় এসেছে; কিন্তু তাতে সেনাবাহিনীর কোনো কিছু ক্ষুণ্ন হয়নি। সেনাবাহিনী এখনো আগের বৈশিষ্ট্যেই আছে। সেজন্যে সিভিল সরকার টিকতে পারে কিনা, এটা একটা বড় জিজ্ঞাসা সবার মনে। কেননা, সিভিলিয়ান ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা সেনাবাহিনীর প্রতিপক্ষ এবং বিরোধী। তবে এর ফলাফল নির্ভর করবে ক্ষমতায় সিভিলিয়ানরা কি করে তার ওপর। সেনাবাহিনী যতদিন পর্যন্ত সংগঠিত শক্তি হিসেবে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তারা সিভিলিয়ানদের নিয়ন্ত্রণে পিছ-পা হবে না; হ্যাঁ সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব তখনই হ্রাস পাবে, যখন সিভিল সরকার প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে, মিলিটারি শাসন অপ্রয়োজনীয়।

সিভিল ক্ষমতা ও সিভিল সরকার তখনই স্থায়ী ও দীর্ঘায়ু হবে, যখন নেতৃবৃন্দ যুগপৎ নিযামত ও দিওয়ানি অর্থাৎ সিভিল ও মিলিটারি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

www.pathagar.com

নতুন শ্রেণী

স্বাধীনতার পর থেকে একটা নতুন ব্যবসায়ী এলিট শ্রেণী ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। বিদেশী এক্সপার্ট, প্রাচীন অভিজাত শ্রেণী (পাট, চা ও আমদানি বাণিজ্যের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল), ব্রাহ্ম ভাবুক সম্প্রদায়, সিভিল সার্ভিস, বিচার বিভাগ ও সেনাবাহিনী– কারো ওপরেই এদের কোনোরকম বিশ্বাস নেই। এরা কাউকে বিশ্বাস করে না, কেউ কেউ এখনো পান-সুপারি চিবোয় এবং লুঙ্গি-কোর্তা পরে, কেউ কেউ পরে ঢিলে ট্রাউজার ও বোতামখোলা শার্ট। এদের হস্তক্ষেপে পুরনো শ্রেণী সম্পর্কের ভিত্তি টলে যায় এবং বিভিন্ন রকম ঠমক-গমক আর ঝলকানিতে বাংলাদেশে প্রায় বিপ্লব ঘটায়। পশ্চিমের জিনিসপত্রে এদের দারুণ আগ্রহ, পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী এন্টারপ্রাইজগুলো এদের আকাঙ্ক্ষার মূল। এই নতুন শ্রেণীটি ব্রাহ্ম সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীদের মাঝখানে একটা হলিউড কালচার প্রতিষ্ঠা করেছে।

এই নতুন শ্রেণীটির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালটি বাংলাদেশের জন্যে এক সংকটাপন্ন মুহূর্ত; এ বছরটিতেই উপরোক্ত নব্য এলিটদের অস্তিত্ব সম্ভবপর করে তোলে। এরাই বাংলাদেশে স্বাধীনতা এনেছে এবং স্বাধীনতা উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং এরা বাংলাদেশের বহুদিনকার হিন্দু ও মুসলিম পাকিস্তানী বিহারীদের বাণিজ্যিক মনোপলি ভেঙে দেয়। অন্যদিকে, আশরাফ বুদ্ধিজীবীরা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম নিয়ে ব্যস্ত এবং এসব বুদ্ধিজীবীর কল্যাণেই সরকার একগুচ্ছ সরকারি এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেন– যেমন বিআরটি, বিআইডিএস, বিআইএসএস ও বিএআরসি। এঁরা রাজনীতিবিদদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা, মিছিল ও শোভাযাত্রায়ও অংশ নেন। কিন্তু নব্য এলিটরা গেলেন না সেসব দিকে; তারা রাজনীতি সেমিনার সেনাবাহিনীর কোন্দলে না জড়িয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়তে উদ্যোগী হন। এরা নেমে যান ব্যবসায়, নানা রকম ব্যবসায়, যে কোনো রকম ব্যবসায়। সবাই এক ধরনের ব্যবসা করেননি; কিন্তু একটা ব্যাপারে তাদের খুব মিল আছে– তা হলো, তাঁরা 'ব্যবসা'কেই নির্বাচন করেছেন পেশা হিসেবে এবং এমন সব ব্যবসা আরম্ভ করলেন তাঁরা, যা বাংলাদেশে আগে ছিল। এঁরা ছোট ছোট পারিবারিক মালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজ দিয়ে ক্যারিয়ার তৈরি করতে থাকেন– ব্রিটিশদের ভাষায় এ হলো 'কটেজ ইন্ডাস্ট্রি'; কিন্তু মার্কিন ও জাপানীদের দৃষ্টিতে এ ধরনের উদ্যোগ কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রির মেরুদণ্ড।

নতুন এলিটরা কম্পিউটার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়েছিল তখন, যখন পর্যন্ত এই বস্তুটি ঘরের আসবাবপত্রে পরিণত হয়নি; এরা নির্মাণ কোম্পানি ও কনস্ট্রাকশন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে, ছোট ছোট গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করে, ফার্মাসিউটিক্যাল প্লান্টও এরা করেছে, এরা পান-সুপারি বিক্রি করেছে, সিরামিকের টয়লেট ও বেসিন বানিয়েছে, প্রিন্টের কাপড় বাজারে এনেছে, সিভিল-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান গড়েছে এবং প্লাস্টিক ও ইলেকট্রিক ঘড়ি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছে পাওয়ার গ্রিডের জন্যে।

www.pathagar.com

এদের কেউ কেউ বার্মা, ভারত, নেপালের সঙ্গে প্রাক্তন বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করে চোরাকারবারিতে পরিণত হয়। কেউ কেউ খুললো মুভি থিয়েটার, কেউ কেউ অটো ব্যাটারি ও হেভি ট্রাক ডিউটির লাইসেন্স নিল। কেউ কেউ বিদেশ থেকে মেশিন এনে তৈরি করল গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রপাতি-নাটবোল্ট, তারকাঁটা, গিয়ার, ও-রিং, ই-রিং ইত্যাদি। অন্যরা ওয়েল্ডিং-এর দোকান খুললো, ট্রাক ও বাস চালু করল। অধিকাংশই বিভিন্ন রকম পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। আর এ ধরনের ব্যবসায় একদিন ভরে যায় বাংলাদেশের আনাচ-কানাচ।

অন্যদের মতো নব্য এলিট ব্যবসায়ীরাও বাংলাদেশের বিজনেসের ছায়া-আতপ, তথা চেম্বার অফ কমার্সের ছত্রতলে কাজ করে; চেম্বার অফ কমার্স প্রাচীন ইন্ডেন্টর-ইম্পোর্টারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চেম্বার অফ কমার্সের মতাদর্শ সাম্যবাদ গোছের, সরকারের প্রকাণ্ড সব প্রকল্পের এরা সমর্থক ও সহযোগী; সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, আয়রন এন্ড স্টীল কর্পোরেশন, জুট বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন ইত্যাদি। চেম্বারের লোকেরা কেন এসব সরকারি কর্পোরেশনের সঙ্গে জড়িত তার কারণ খুব পরিষ্কার। এরা মূলত বিভিন্ন জিনিস নিজেদের সিংগেল এজেন্সির মাধ্যমে ইমপোর্ট করে এসব কর্পোরেশনে সাপ্লাই দেয়। এসব ষাট দশকের শস্য এবং ব্যবসার ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রবৃত্তি এদের কখনো হয়নি। যার পরিণতিতে নব্য এলিটরা তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দের চারপাশে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করে।

দেশের বুদ্ধিজীবীরা যেখানে এসব ব্যর্থ প্রকল্পগুলোর পেছনে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করেছে, সেখানে ছোট্ট ছোট্ট এলিটরা চুপিসারে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। এদের সংখ্যা অনেক। লুঙ্গি-কোর্তা পরে ব্যবসায় নেমে, মিষ্টির দোকানে বসে বসে ব্যবসাবাণিজ্য অনেক অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ফেলে এরা; যাবতীয় এবং যত ধরনের ব্যবসা সম্ভব, এরা করেছে। চেম্বার অফ কমার্সের চোখে যারা অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও নগণ্য ছিল, তারা অচিরেই বড় বড় ব্যক্তিতে পরিণত হয়। আর ১৯৯০-এর দশকে এসে দেখা গেল, বাংলাদেশে হাজার হাজার ধরনের জিনিসপত্র মিলে যাচ্ছে অনায়াসে।

এর নাম হতে পারে 'মিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলিউশন'। নব্য এলিটদের হাতে গড়ে ওঠে এই বিপ্লব। যারা দেশব্যাপী জিনিসপত্র সরবরাহ করতে পারে, যে কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসতে পারে মালামাল এবং যে কোনো কিছু তৈরি করতে পারে। বেশিদিন আগের কথা নয়, পুরনো ঢাকার একটা লোক বলেছিল, "আমরা যদি জিনিসটা না পাই, তাহলে তা বানিয়ে নেব; যদি বানাতে না পারি

www.pathagar.com

তাহলে চুরি করব, পৃথিবীর যেখানেই থাকুক সেটা; যদি চুরি করতে না পারি, বুঝতে হবে তা পৃথিবীর কোথাও এখনো উদ্ভাবিত হয়নি; আর তুমি যদি চাও তা উদ্ভাবন করে দিই, তাহলে সেটাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।" এই ধরনের বাসনা ও সাহস এবং প্রত্যয় নতুন শ্রেণীটির চারিত্র্য।

নতুন শ্রেণীটি বলাবাহুল্য, নিয়মনীতির বিশেষ তোয়াক্কা করে না, স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম নেয়া অন্য শ্রেণী বা গ্রুপেরও সেই অবস্থা। এদের সঙ্গে নীতিবাগীশ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম-প্রভাবিত অভিজাত গোত্রের তাই একটা পার্থক্য আছে। নব্য এলিটরা কেবল টাকা চেনে এবং টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না এবং টাকার জন্যে ম্যানেজমেন্টকে এরা যে কোনো হীন উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়। নির্বাচনে ভোট ডাকাতি, কন্ট্রাক্টের জন্যে সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়া থেকে শুরু করে সবই এরা করতে পারে। আর এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এই এলিটরা দুর্নীতিকে খুবই প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে পরিণত করেছে। যেসব কাজে পুরনো গৎবাঁধা দীর্ঘসূত্রী নিয়ম থেকে গেছে, তা পরিবর্তন করার কোনো ইচ্ছে এদের নেই, বরং মোটা অংকের ঘুষের টাকা ছেড়ে ঝটপট এরা ওসব কাজ করিয়ে নেয়। তবে একে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের নৈতিক অধঃপতন বলা যাবে না। কারণ, 'তুমি সৌজন্যে ফিরে আসো, আমিও নত হবো'– সেই যে সরকার ও কন্ট্রাক্টরদের মধ্যেকার পুরনো প্রথা, সেই প্রথা 'সরকার'-এর মতোই পুরনো। তাছাড়া যে সরকারকে যারা কর দেয় এবং যারা দেয় না, তাদের মধ্যে কোনো তফাৎ করে না; যে সরকার দেশীয় আয় ও ঋণদাতাদের অর্থে কোনো পার্থক্যে বিশ্বাস করে না, সেই সরকারের যখন কোনো অধঃপতন নেই তখন একা এসব লোকের সেই অধঃপতন হতে যাবে কেন?

অধঃপতন যদি হয়ে থাকে, তাহলে তা রাজনীতিরই হয়েছে। দীর্ঘ অর্থহীন বাগাড়ম্বরে বাংলাদেশের রাজনীতি তার যাবতীয় গ্রহণযোগ্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। রাজনীতি একটা অর্থশূন্য বাক্যের ব্যায়ামে পরিণত। বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর চিন্তার যে চর্চা এদের বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যম, পত্রপত্রিকাগুলোতে হয়েছে, তার সারকথা : সরকারের কেন্দ্রিকতা (বা সরকারকেন্দ্রিকতা) ও রাজনীতি দেশের মানুষের সকল সমস্যার সমাধান। রাজনীতি ও সরকারের বাইরে সমস্যার সমাধান নেই, এটাই সবার বিশ্বাস। ১৯৫২ সালের সেই ভাষা আন্দোলন থেকে ছাত্রদের 'প্রলেতারিয়েত' করে তোলার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। ছাত্ররা হয়ে ওঠে রাজনীতির সৈনিক, অধ্যাপকরা হলেন মতবাদের প্রচারক, আর বিশ্ববিদ্যালয়– প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার সুবিধায় পরিণত হলো রাজনৈতিক আশ্রমে। এ কথা বলতে চাই না যে, সকল ছাত্র-শিক্ষক, এমনকি সকল বিশ্ববিদ্যালয় এই ফাঁদে পড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

রাজনীতি-স্পৃষ্ট হয়েছে সর্বাধিক; এই বিশ্ববিদ্যালয় এক সময় ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ ছিল, এখন রাজনৈতিক হানাহানির জন্যে বিখ্যাত। মিছিল, সভা, শোভাযাত্রা আর যে কোনো রাজনৈতিক বিস্ফোরণ এখানকার নৈমিত্তিক ঘটনা। এক পক্ষের ছাত্রকর্মীর সঙ্গে আরেক দলের কর্মীর কলহ বাঁধে এবং কোনো একটা হত্যাকাণ্ডের পর তা শেষ হয়; যারা রাজনীতিক কর্মী নয়, তারা হয় অপমানের শিকার; ছাত্ররা মাঝে মাঝেই ধর্মঘটের ডাক দেয়, প্রতিবাদ মিছিল বের করে, কিংবা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে অন্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় এত বেশি রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিণত হয়েছে যে, বাংলাদেশের লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজনীতিকে এখন অভিন্ন মনে করে; আর কারো এমনো মনে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই দেশের যাবতীয় পরিবর্তনের অগ্রদূত।

সত্য কথা হলো, স্বাধীনতার পর থেকে ছাত্ররা রাজনীতিবিদদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা রেখেছে; ১৯৯০ সালে এরশাদকে উৎখাত করার আন্দোলনেও ছাত্রদের ভূমিকা সর্বাধিক। কিন্তু কত দাম দিয়ে তাদের এই রাজনীতি? সেটা ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষার মর্মবাণী এবং মানববিদ্যার কোনো কিছু আয়ত্ত না করে তারা হয়েছে বীতস্পৃহ। অধ্যয়ন, পড়াশোনা, আত্মোপলব্ধি ছাড়াই তারা জড়িয়েছে রাজনীতির সঙ্গে; এবং তারা জানে না কেন তাদের লড়াই, কার বিরুদ্ধে এবং কেন? এ ধরনের পরিবেশে পড়াশোনার পাঠ উঠে যাওয়াই স্বাভাবিক, গেছেও এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করা এখন আদৌ কোনো গুরুত্ব বহন করে না। শুধু তাই নয়, একটা চমৎকার বিকেলে টেনিস খেলা, গান-নাটক নিয়ে বিনোদন কিংবা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান এই ছাত্রদের কাছে কোনো বিষয়ই নয় আর। বিশ বছর বয়স হতে না হতেই এসব তরুণ বীর সব বিষয়ে উন্নাসিক ও সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরা কিছু জানে না এবং কিছু পড়ে না, ইসলামের প্রাচীন দর্শন, রুমির কবিতা, কিংবা প্রাক-মুসলিম ভারতবর্ষের আইনগ্রন্থ, কোনো কিছুই তাদের আকৃষ্ট করে না। অন্যদিকে হবস, লক, বেনথাম, মিল বা বার্ক সম্পর্কে পড়ার সময়ই তো তাদের নেই। অংক বা রসায়নের শৃংখলা তাদের অগম্য। বিক্ষোভ, অস্থিরতা আর আন্দোলনের জন্যেই তাদের রিক্রুট করা আছে, অন্তত যতক্ষণ ক্যাম্পাসে আছে ততক্ষণ তাই করে তারা।

এরা দুর্নীতিবাজ হয়ে ওঠে ছাত্রজীবনেই, এরা উন্নাসিক, শূন্যগর্ভ এবং হৃদয়হীন : কারণ এরা নতুন হলিউড শ্রেণীর প্রতিভূ। গ্রাজুয়েট হওয়ার পূর্বেই রাজনৈতিক মতাদর্শে তারা দীক্ষিত হয় এবং এক অপার উন্নাসিকতার পাথেয় নিয়ে তাদের ছাত্রজীবন শেষ হয়। রাজনীতিকে তারা মনে করে বিধ্বংসী খেলা : কোনো সিস্টেম বা অনুশাসন নয়। অতঃপর তারা দেখে রাজনীতি কিছুই নয়, স্রেফ ক্ষমতা আর

www.pathagar.com

টাকা। রাজনীতি হলো লাভজনক এক প্ররোচনা। এসব রাজনীতির সন্তানেরা 'আইন'কে মান্য করার মতো ব্যাপার মনে করে না; আইনকে তারা মনে করে নেহাৎ আউট-ডেটেড কোনো জিনিস, তুচ্ছ বস্তু। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরে যে আইন তৈরি হয়েছে তা সাম্যবাদ মাথায় রেখে রচিত, ব্যক্তির সকল উদ্যমকে রাষ্ট্রের কুঠুরিতে আবদ্ধ করা যার উদ্দেশ্য। আজকের বাংলাদেশে 'আইন' কোনো অনুশীলনের বস্তু নয়, নেহাৎ কেতাবী ব্যাপার : বইপত্র, পাসপোর্ট কিংবা দুর্নীতিতে 'আইন' অর্থহীনভাবে টিকে আছে।

নব্য শ্রেণীর বিশ্বাস, প্রাচীন ব্যুরোক্রাসি যে বিধি-বিধান তৈরি করেছে তা কেবল মুনাফা হাতানোর জন্যে। বর্তমানে ব্যবসায়িক মুনাফালোভীরা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান এবং তাদেরকে প্রদেয় মুনাফার অংক দিন দিন স্ফীত হচ্ছে এবং সিভিল কর্মকর্তারা বিভিন্ন মুনাফার ভাগীদার হচ্ছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে, পুলিশ যদি কাউকে অবৈধভাবে চার্জ করে বসে, সেই নির্দোষ লোকটি আর আদালতের শরণাপন্ন হয় না– বরং কিছু ঘুষ দিয়ে মিটমাট করে নেয়। এই অবস্থায় রাজনীতি বা আইনের কোনো অর্থ অবশিষ্ট না থাকারই কথা এবং নেইও; তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটাই অর্থ এখন 'যত পারো তুমি নিয়ে নাও।' এই শিক্ষাটাই তরুণেরা এখন শিখছে। নৈতিকতা, চরিত্র গড়া, সৎ জীবনযাপনের বদলে তারা অনুসরণ করছে তাদের নেতাদের জীবন-পদ্ধতি।

১৯৮৯ সালে এরশাদকে নিয়ে একটা গসিপ চালু ছিল বাজারে; সেটা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, অনেকেই তা বিশ্বাস করেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ কুর্মিটোলা গলফ কোর্টের পাশে একটা সুইমিং পুলে (যার চারপাশের দেয়ালে একটা ফলক ছিল, সম্ভবত জাপানীদের উপহার দেয়া) সময় কাটাতেন এবং বলা হয় যে, যখন তিনি গলফ খেলতেন না, তখন বান্ধবীদের সঙ্গে আমোদ-ফূর্তি রঙ্গক্রীড়া করতেন ওখানটায়। সে সময় তাঁর বান্ধবী ছিল কেবিনেট সেক্রেটারির স্ত্রী; তাঁর সঙ্গে তিনি রঙ্গরসে মত্ত ছিলেন। এ সময় সেখানে পৌঁছুলেন রওশন, এরশাদের স্ত্রী এবং কেবিনেট সেক্রেটারির স্ত্রীকে পদাঘাত করেন এবং মারধর করে ক্ষতবিক্ষত করেন। ওই মহিলাকে রওশনের কবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে এরশাদ মাথায় আঘাত পান এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। প্লাস্টিক সার্জারির জন্যে ওই রমণী রওনা হন ব্যাংককের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই ঘটনা বা ওই মহিলার প্রতি এরশাদের দুর্বলতার কারণে রওশন ক্রুদ্ধ হলেন না, ক্রুদ্ধ হলেন অন্য কারণে। এরশাদ তাঁর বান্ধবীকে একটা বড় ধরনের ব্যবসায়িক কন্ট্রাক্ট দিয়ে দেন।

এই গল্প হলিউডের নৈতিকতার কথা মনে করিয়ে দেয় এবং স্মরণ করায় ডালাসের লালসা : এ কারণে এই গল্প যুগপৎ বিশ্বাস্য আর তাৎপর্যপূর্ণ ঠেকে। এ

www.pathagar.com

ধরনের এক আবহাওয়ায় রাজনীতি আমেরিকার 'সোপ অপেরা' হয়ে উঠতে বাধ্য, যার অন্তিম লক্ষ্য : অর্থ আর সম্পদ। বাংলাদেশের ইতিহাসে আমেরিকার 'সাবান নাটকে'র অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীনতার পরপরই, যখন একটা গৃহযুদ্ধের পর দেশটির স্থিত হওয়ার কথা। এরশাদের পতনের পর তাঁকে এবং মন্ত্রীবর্গকে ঘিরে নানা রকম স্ক্যান্ডালে মুখর আজকের বাংলাদেশে হলিউড-মার্কা এই সংস্কৃতি প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, বলতে হবে।

দুর্নীতির সূচনা ঘটে ১৯৭২ সালে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই; এবং তার সূত্রপাত ঘটে ঢাকার সে সময়কার একমাত্র ওয়ার্ল্ড ক্লাস হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। হোটেলের নিচতলার সাকী বার-এ তখনকার ধনী, বখাটে তরুণেরা লোলুপ দৃষ্টিতে দেখতে থাকত বিদেশী মেয়েদের। এই বার-এ শেখ মুজিবের অনন্য পুত্র কামালকে দেখা যেত নিত্য, তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে; আর একজন থাকত এখানে, যার নাম মন্টু। এদের দেখা যেত ক্যানের পর ক্যান বিয়ার খেতে, একেকটা বিয়ারের দাম তখন ৬ ডলার : এগুলো আসত তখন ব্যাংকক থেকে। কামালের সঙ্গে তার কাজিন দামী সিগারেট ফুঁকত একের পর এক : এক প্যাকেট সিগারেটের দাম ১৫ ডলার।

হোটেলের উপরতলায় ১১০০ নম্বর কক্ষে সরকারের মদদপুষ্ট স্মাগলারদের আড্ডাখানা। এরা রেডক্রস ডোনেশনের দ্রব্যসামগ্রী টনে টনে পাচার করে দিত সীমান্তপথে, কলকাতায়; ওইসব সামগ্রী রেডক্রসের লেবেলযুক্ত অবস্থায় বিক্রি হতো বাজারে। ১১০০ নম্বর কক্ষটি এসব চোরাকারবারের জন্যে ব্যবহার হতো; আর রাতে এখানে বসত লাগামহীন মদ্যপানের আসর। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীরা বাঙালি মেয়েদের ধর্ষণ করলে যারা শোক প্রকাশ করত, তাদেরই এখানে দেখা গেল বাঙালি মেয়েদের ইজ্জত লুটতে।

এভাবে শুরু হলো বাঙালি তরুণদের বিরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া। এরাই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের তারুণ্যের প্রতিনিধি, যাদের বয়স বিশ বছরের মতো এবং যারা মূলত অশিক্ষিত; যারা বামপন্থী আলাপ-আলোচনায় কলেজ-জীবন অতিবাহিত করে একটা বিশৃঙ্খল জীবনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো, যখন জাতির শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের চূড়ান্ত রাজনীতিকরণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এই তরুণেরা একটা কবিতা লেখার আগে, প্রেম-ভালোবাসা-সততা ও শ্রদ্ধার মতো বিষয়গুলো উপলব্ধি করার আগে, হৃদয়হীন শিক্ষাহীন বিচ্ছিন্ন পরিত্যক্ত জীবন বেছে নিয়েছে। ষাটের দশকে, দেশপ্রেমের নামে রাজনীতির নেতারা এদেরকে মিছিলে নামাতেন, অন্য ছাত্র গ্রুপের সঙ্গে খুনোখুনির জন্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাতেন; এসব তরুণের হাতে ছিল অস্ত্র, ভারতীয় জেনারেল

www.pathagar.com

ভগবত সিংহ যা তুলে দেন এদের হাতে। খুবই কৌতুকাবহ মনে হয়, যখন দেখি এই ভগবত সিংহ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে এক চরমপন্থী শিখ তরুণকে– ভারতের নবোত্থিত তরুণ শ্রেণীর প্রতিনিধি– সাহায্য করতে গিয়ে ১৯৮৩ সালে মারা যান।

যাই হোক, তরুণেরা হয়ে উঠল ভয়ঙ্করভাবে উন্নাসিক। স্বাধীনতা-উত্তর তরুণেরা দেখল চারদিকে কেবলই দুর্নীতি এবং ক্ষমতা ও টাকা ছাড়া আর কিছুর কোনো মূল্য নেই। ১৯৭৫ সালে সৈনিকেরা যখন মুজিবকে হত্যা করে, তার মূলেও ছিল এই দুর্নীতি এবং এই বোধ, 'রাজনীতি' সেই বস্তু যা ব্যবহার করে রাতারাতি ধনী হওয়া সম্ভব। উন্নাসিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণেরা অতঃপর 'সাম্যবাদ' নামক আদর্শের ফাঁপা বুলিতে অট্টহাস্য করল।

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই বিরাজনীতিকরণ চলেছে; এই কালপর্বে সকল রাজনৈতিক দল– আওয়ামী লীগ, জাসদ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি– ছাত্রদেরকে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে মিছিল-সভা-সন্ত্রাসে নামিয়ে দেয়; বদলে তাদের তারা দেয় টাকা, অস্ত্র, নারী ও অন্যান্য অপরাধের উপকরণ। এর পরিণামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকল দিনের পর দিন, ছাত্রদের হাতে উঠে এল রকমারি অস্ত্রশস্ত্র। অস্ত্র সবচেয়ে বেশি সরবরাহ করেছে আওয়ামী লীগ এবং তারপর বিএনপি এবং অতঃপর এক অখ্যাত ছাত্রনেতা লিটুর মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ। আশির দশকের শেষদিকে শিক্ষা পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটে যে, যাদেরই হাতে টাকা ছিল তারা ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিত বিদেশে– এখানে নয়। শিক্ষাঙ্গনের সেই পরিস্থিতি বুঝবার জন্যে একটা উদাহরণ দিতে পারি। ১৯৯০ সালে মলটভ ককটেল নিক্ষিপ্ত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এবং বন্দুকযুদ্ধে নিহত হলো এক তরুণ, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা গবেষণাকক্ষে ভয়ে এক টেবিলের নিচে ঢুকে গিয়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করি।

নীতিহীনতা, বিরাজনীতিকরণ ও ব্যাপক উন্নাসিকতার পরিণতিতে বাংলাদেশের তরুণ নব্য শ্রেণীর জন্ম এবং এসব গুণের সমন্বিত প্রতীক এরশাদ সরকারের কেবিনেট– যার মধ্যে দিয়ে 'ডালাস' ছবির কল্পিত আদর্শসমূহ বাস্তবে ঢাকায় শোভমান হলো। ১৯৯১ সালে এই পরিস্থিতি পুনরায় সংকট তৈরি করল ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে, আবারও রক্ত ঝরল, আবারও বন্ধ হলো বিশ্ববিদ্যালয়। এই সংকট, লেখার এই মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত। এই সংকট চলবে এবং কেবল এরশাদ ঘরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সমাপ্তি ঘটতে পারে না। যেসব রাজনৈতিক দল এই সংকট এবং সন্ত্রাস শুরু করেছিল, অনুতপ্ত হয়ে তারাই যদি তা ফিরিয়ে না নেয়, তাহলে এটা বন্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

www.pathagar.com

তবে যে ব্যক্তি দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো সোচ্চার হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হন, তাঁর কথা না বলে এ আলোচনার ইতি টানতে পারি না। তিনি ছিলেন এক তরুণ কর্নেল, যাঁর নাম তাহের। ১৯৭৫ সালে, মুজিব নিহত হওয়ার পর কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে এক বিদ্রোহী সেনাসম্প্রদায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং চোরাপথে আসা বিপুল পরিমাণ মালামাল– যেমন, টেলিভিশন, এয়ারকন্ডিশনার, ফার্নিচার ইত্যাদি আটক ও বাজেয়াপ্ত করে। এসব মাল ছিল দুর্নীতিবাজ এলিটদের। এসব সামগ্রী তাহের ও তাঁর বাহিনী এক জায়গায় স্তূপ করে আগুন ধরিয়ে দেয় : দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও নব্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে এটাই ছিল সম্ভবত শেষ চিৎকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কর্নেল তাহের এমন এক ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন, যা দমন করা সম্ভব ছিল না। ফায়ারিং স্কোয়াডে জিয়াউর রহমান তাঁকে মেরে ফেলেন। তাহেরের ওই প্রয়াসের পরও দুর্নীতি আপন গতিতে চলতে থাকে।

কর্নেল তাহের হয়তো কিষাণের কৃচ্ছ্রতা ও নৈতিকতার কথা উচ্চারণ করেছিলেন; কিন্তু সেটা নব্য শ্রেণীর অভিপ্রেত নয়। প্রগতির ব্যানারে প্রস্তুত করা নব্য শ্রেণীর সমর্থনে গত বিশ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতি এক প্রকার ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এই ধ্বংস সম্ভবত স্থায়ী ব্যাপার, আর কোনো মূল্যবোধ এখন বাকি নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিসিজমের শেষতম প্রতীক-পুরুষ, সম্ভবত কর্নেল তাহের; যিনি ইন্টারকন্টিনেন্টালের সাকী বার ও ১১০০ নম্বরের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন ছাত্র-পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। এসব তরুণ কখনো রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, কোনো শিক্ষা বা অভিরুচি এদের নেই, আল-বিরুনী কবীর কাজী নজরুল হোমার অথবা মিলের নাম এরা শোনেনি। রবীন্দ্রনাথের মতোই হয়তো তাহের এসব ছাত্রকে তাদের সময় ও প্রকৃতির অপরূপ হার্মনিতে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাহের দেখেছিলেন, এসব ছেলে কোনোরকম মূল্যবোধে আস্থাশীল নয়, চারিত্র্য কাকে বলে এরা জানে না এবং ঘৃণা ছাড়া এরা আর কিছু শেখেনি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আর্তনাদ করতে গিয়ে তাহের বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে দেয়ার কথা ভুলে যান; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারতেন না, ভোলেনওনি এবং রাজনীতিস্পৃষ্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিনিকেতন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এ ছিল এক প্রতীকী সংগ্রাম। কর্নেল তাহেরকে যদি রবীন্দ্র-সরণীর শেষ অভিযাত্রিক বলি, তাহলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। কেননা, অর্ধশিক্ষিত নব্য শ্রেণীর তথাকথিত আধুনিকতার বিরুদ্ধে তাহেরের লড়াইয়ের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এখন আক্ষরিক অর্থেই একটা 'প্রতিমা' ছাড়া আর কিছু নন।

www.pathagar.com

ইংরেজমুগ্ধ মন

এখন অবশ্য এ কথা স্মরণ করাও কঠিন যে, প্রায় ১৯০ বছর ধরে (দুই শতাব্দীর মতো) বাংলা ও বাংলাদেশ পৃথিবীর ইংরেজিভাষী দেশ ছিল : লন্ডন, নিউইয়র্ক, অটোয়া ও ক্যানবেরার মতো। প্রায় দু'শতাব্দী ধরে ইংরেজি আইন, ইংরেজি শিক্ষা ও বিজ্ঞান, ইংরেজি শিল্পকথা ও স্থাপত্য ম্যানচেস্টারের মতো ঢাকারও অংশ ছিল। ঢাকায় সেই ঐতিহ্যের চিহ্ন এখনো রয়ে গেছে; যেমন গ্রীক, রোমান ও গথিক স্থাপত্যকলার সমন্বয়ে তৈরি বিভিন্ন ভবন– যা ঢাকার বুকে এখনো ব্রিটিশ আভিজাত্যের স্মারক হয়ে টিকে আছে। রমনার উদ্যান ও রমনার ভবনগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে, যেখানে সিভিল ও সেক্রেটারিয়েট ও প্রশাসনিক ভবন আছে; মনে করা যেতে পারে পুরনো ঢাকার ধ্রুপদী অ্যাংলিকান চার্চের কথা; কিংবা চোখে পড়বে বিশাল সুপ্রিম কোর্ট বিল্ডিং। আদালতের কোনো একটা বৈঠকে বসে দেখা যেতে পারে; বিচারকের পরিচ্ছদ ও তাঁর পরচুলা ব্যবহার, কিংবা সেনাবাহিনীর পোশাক-আশাক ও আচরণ-বৈশিষ্ট্য, এ সবই ব্রিটিশ উৎসের কথা মনে করিয়ে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনও অবিকল ব্রিটিশ নিয়মে তৈরি, এমনকি আশরাফ শ্রেণীর ইংরেজি উচ্চারণ ব্রিটিশ স্মৃতিবাহী। যতই মনে হোক নতুন বাংলাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটে গেছে; কিন্তু আসলে এদেশের সমাজের অনেক গভীর-ভিতরে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার স্থায়ীভাবে প্রবহমান।

গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষ ছেড়েছে প্রায় অর্ধ শতাব্দী হয়ে এল। অনেক কিছুই আজ পরিবর্তিত। এটা বলা যেতে পারে যে, মার্কিন, সোভিয়েত ও পূর্ব এশীয় প্রভাব ব্রিটিশ প্রভাবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এখানে এবং ব্রিটিশ প্রভাবের স্থলে ওইসব দেশের প্রভাব গুণগত ও পরিমাণগতভাবে পরিবর্তন আনে। তাছাড়া ব্রিটিশ জমানার শহরগুলো এখন সম্প্রসারিত হয়েছে অনেক বেশি এবং এই সম্প্রসারণ ব্রিটিশ প্রভাবকে এক প্রকার লুপ্ত করে দেয়। যে কলকাতার জনসংখ্যা ব্রিটিশ সময়ে ছিল তিরিশ লাখ, সেই জনসংখ্যা বেড়ে এখন হয়েছে ১ কোটি ২০ লাখের মতো; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঢাকার জনসংখ্যা ছিল ৫ লাখ, এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ লাখ। তবে ঢাকা কিংবা কলকাতা শহর এখনো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ব্রিটিশ স্মৃতিখচিত। খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঢাকার খেলাধুলা, আইন, সংসদীয় প্রাকটিস, সামরিক আচার ও বিধিবিধান, সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন, এমনকি সংস্কৃতিও ব্রিটিশ অনুশাসনের সম্পূর্ণ অনুগামী। কেননা, আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছে ব্রিটিশ কালপর্বের বিভিন্ন আন্দোলন থেকে এবং এ সবই প্রচণ্ডভাবে ব্রিটিশ চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। বাঙালি জাতির ঐক্য কিংবা জাতীয় সংহতির ধারণাও ব্রিটিশ প্রভাব থেকে সৃষ্টি হয়েছে, ব্রিটিশ ছাড়া এই সংহতি

www.pathagar.com

সম্ভবপর হতো না। জাতীয় স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং রাষ্ট্র পরিকল্পনাও ব্রিটিশদের কাছে এদেশের মানুষ শিখেছে। এমনকি উপনিবেশ উৎখাত করে স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাও ব্রিটিশ চিন্তাধারার ঐতিহ্য থেকে পাওয়া। ব্রিটিশ উত্তরাধিকার বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশ এখনো ব্রিটিশ ও কমনওয়েলথ হাইকমিশন থেকে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কৌশল নিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করে, তার কারণও ব্রিটিশ শাসনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব। বাংলাদেশের এরকম পরামর্শ গ্রহণ কোনো চক্রান্ত বা অভিসন্ধি নয়, এ হলো জাতির চিন্তালোকের অন্তর্গত যুক্তিকাঠামো, যে কাঠামো দুই শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসন তৈরি করেছে এখানে। যদিও সুরাট, বোম্বে ও মাদ্রাজে ব্রিটিশদের বাণিজ্যকেন্দ্র ও ক্ষুদ্র উপনিবেশ ছিল, তবু ১৭৫৪ সাল থেকে ক্রমাগত সাতটি বছর যুদ্ধ করার পর ভারতে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ হয় ফরাসীদের ওয়েস্ট ইন্ডিজে, উত্তর আমেরিকায় এবং অবশেষে ভারতবর্ষে। ক্লাইভের নেতৃত্বে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইংরেজরা জয়লাভ করে। যদিও চন্দ্রনগর এবং পন্ডিচেরি ফরাসীদের অধীনে ছিল এবং হল্যান্ড বাংলার চিনসুরা দখল করে রাখে, তবু সাগরের ওপর একমাত্র আধিপত্য ছিল ইংরেজদের এবং তাদের সেনাবাহিনীও ছিল খুব শক্তিশালী। লর্ড ক্লাইভ ফরাসীদের পরাজিত করলে ইংরেজরা আরো বৃহত্তর বিজয়ের জন্যে সংকল্প গ্রহণ করে। এই পর্যায়ে ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবের প্রথম বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়; নবাব তাঁর উপদেষ্টা জগৎ শেঠের পরামর্শের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং কলকাতা দখলসহ অনেক ইংরেজ নেতাকে কারাবন্দী করে। কারাগারের সেলে বন্দী ইংরেজদের মৃত্যুও ঘটে, ইতিহাসে একে 'ব্লাক হোল' বা 'কৃষ্ণ গহ্বর' নামে স্মরণ করা হয়। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ নবাবকে আক্রমণ করেন এবং সেটাই পলাশীর যুদ্ধ নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় গঙ্গার সে সময়কার একটা প্রধান শাখা ভাগীরথীর তীরে।

পলাশীর রণাঙ্গন পশ্চিমবাংলায়, বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে অল্প দূরে। এ জায়গাটি এখন আর তেমন কেউ দেখতে যায় না। বৃক্ষশ্রেণী দিয়ে এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে, তার পাশেই একটা রাস্তা– রাস্তার শেষ মাথায় আছে স্মৃতিফলক। একপাশে আছে মুসলিম সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ, যেসব সৈনিক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মারা গিয়েছিল। রণাঙ্গনের উল্টোদিকে অর্থাৎ পেছনে নদী, নদীর দু'ধারে ধানক্ষেত। অল্প দূরেই এক বিশাল বটবৃক্ষ এখনো অতীতের স্মৃতি ধারণ করে দণ্ডায়মান, এখানটাতেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়। তারই নিকটে বন্যানিরোধক বাঁধের সন্নিহিত (যেটাকে নবাব তাঁর ডিফেন্স

www.pathagar.com

লাইন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন) ধানক্ষেতে এক বাঙালি কৃষাণ জমিতে মাড়াই দিচ্ছিল এবং সেটা দেখে আমার চোখে ভেসে উঠল যেন কোনো ইতালীয় কৃষক আঙ্গুর ক্ষেতে মৌসুমের শেষে হাঁটছে। এখনো এখানে বাতাস বয়, এখনো সূর্য অস্ত যায়। ক্লাইভ অত্যন্ত সচেতনভাবে পলাশীর যুদ্ধ করেন এবং এই যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ক্লাইভ মোগল ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল 'বাংলা' অধিকার করলেন।

শেষ মোগল শাসক নবাবের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার ইংরেজিকরণের সূচনা; এভাবে প্রাচ্যের এই ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর ভেতর পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ রোপিত হয়। এশিয়ার আর কোনো জনগোষ্ঠী– কিছুসংখ্যক পুরনো পর্তুগীজ কলোনী ছাড়া যেমন গোয়া, ম্যাকাও এবং ব্যান্টাম– এত দীর্ঘকাল পশ্চিমের শাসনাধীন ছিল না। 'বেঙ্গল' ছিল পৃথিবীর সমৃদ্ধ একটি দেশ, যা ব্রিটিশরা জয় করে এবং শাসন করে। ব্রিটিশ দখলকৃত অঞ্চলে দু'দশক ধরে লুণ্ঠন ও অপহরণ চলতে থাকে এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসাবাণিজ্য লাটে ওঠার যোগাড় হয়, তখন ব্রিটিশ সরকার সাম্রাজ্যের একটা দায়িত্বশীল সরকার এদেশে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন। সেই সরকারের দায়িত্ব নিয়ে প্রথমে এলেন লর্ড হেস্টিংস এবং অতঃপর জেনারেল কর্নওয়ালিস।

হেস্টিংস এবং কর্নওয়ালিস লুণ্ঠনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের কোনো উপকার করতে পারলেন না (কেননা ক্লাইভ নিজেই শতাধিক জাহাজে ভরে বাংলার সোনাদানা লুণ্ঠন করে নিয়ে যান মুর্শিদাবাদ থেকে এবং তাঁর কর্মচারীরাও মানুষদের কাছ থেকে বলপূর্বক কোটি কোটি রুপী ছিনিয়ে নেয়)। কাজেই এই ব্যাপক লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ অসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ এবং সেই দুর্ভিক্ষে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মারা যায় (১৭৭০-৭১); উপরন্তু ব্রিটিশ সরকার বাংলার সুতা বয়ন শিল্প ধ্বংস করার পলিসি বাস্তবায়ন করে, যার সুতার প্রসেসিং বাংলায় না হয়ে ইংল্যান্ডে হতে পারে, কিংবা বিপুল পরিমাণ সম্পদ এখান থেকে তাদের মাতৃভূমিতে চালান করা যায়। যাই হোক, ব্রিটিশরা একটা লিবারেল ও শ্রদ্ধাযোগ্য সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলে; অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা, যা দিয়ে ভালোবাসা না হলেও 'শ্রদ্ধা' জয় করা যাবে।

হেস্টিংস, এমনকি, বর্ণগত সংস্কার অতিক্রম করেছিলেন। বাঙালিদের তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং এমন দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন যা পরবর্তীকালের জন্যে অনুসরণযোগ্য ছিল। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তিনি দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং ওই কলেজে ব্রিটিশ চাকরিজীবীরা সংস্কৃত, ফার্সী, হিন্দী এবং বাংলা ভাষা শিক্ষালাভ করেছেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এশিয়াটিক সোসাইটি', এদেশের সমাজ ও জীবনধারা সুশৃঙ্খলভাবে পাঠ ও

www.pathagar.com

গবেষণার জন্যে প্রতিষ্ঠান গড়া হয়। তাছাড়া হেস্টিংস চেষ্টা করেন এদেশের আইন, আচার, প্রথা প্রভৃতি যথাসম্ভব টিকিয়ে রাখার। যদিও হেস্টিংস অনেক অশান্তি ভোগ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদও রটেছে বেশি এবং শত্রুর রোষও ছিল তাঁর প্রতি সর্বাধিক, তবু হেস্টিংস উত্তরকালে সর্বোৎকৃষ্ট ইংরেজ গভর্নর হিসেবে ইংরেজ ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের কাছে প্রশংসনীয় বলে পরিগণিত হয়েছেন।

বাংলা সরকারের মধ্যে হেস্টিংস একটা নতুন ঐক্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেন, যে ধরনের ভিশন ক্লাইভের ছিল না। ক্লাইভ আত্মহত্যাও করেছিলেন ক্ষমতাচ্যুতির বেদনায়। বাঙালিদের জন্যে বাস্তবসম্মত একটা সরকার ব্যবস্থা তৈরি করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। হেস্টিংস শৃংখলা ফিরিয়ে আনেন, তাঁর মধ্যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ছিল; ফলে কর্নওয়ালিস যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করে এদেশে এলেন একটা ট্যাক্স ব্যবস্থা ছাড়া আর তেমন কিছু তাঁর করতে হয়নি। রাজস্বের নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেন কর্নওয়ালিস এবং তা হলো, জমির জন্যে একটা নির্দিষ্ট ট্যাক্স নির্ধারণ এবং কর্নওয়ালিসের এই ব্যবস্থা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এদেশে চালু থাকে। যাই হোক, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় মোটামুটি সমৃদ্ধি দেখা যায়, যদিও দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগে পড়ে মাঝে মাঝেই এই দেশ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তবু তার পরও এই বাংলাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একমাত্র রাজস্ব আয়ের উৎস। কেবল ব্রিটিশদের জন্যে নয়, মোগলদের রাজস্বও 'বেঙ্গল'-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে ক্রমে ক্রমে পাঁচটি দশকের মধ্যে, এই 'বাংলা'ই পরিণত হলো ভারত এবং পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্রতম অঞ্চলে।

বাংলার শিক্ষাগত ও সংস্কৃতিগত অগ্রসরমানতার জন্যে স্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়– ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হলেও, এর আগে অনেকগুলো সম্পূরক কলেজ-মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল– যার সূত্রপাত ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি কলেজের মাধ্যমে। ব্রিটিশ কর্তৃক মোগল শাসনের অবসান সূচিত হবার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই বাঙালির চেতনালোকে রেনেসাঁসের সূচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে ইউরোপীয় আলোকপর্বের চিন্তাধারা, সেক্যুলারিজম, বিজ্ঞান, অর্থনীতির তত্ত্ব এবং আইন অতিদ্রুত আকৃষ্ট করে বাঙালির মনোলোক এবং এভাবে বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তি ও মনস্বিতার জাগরণ ঘটে। এভাবেই ইংরেজি শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং অনেক অনেক কলেজের প্রতিষ্ঠা ঘটে, সবচেয়ে বড় কথা: ইউরোপের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির সংস্পর্শে বাংলা কবিতা ও গদ্যের জন্মান্তর। কবিতায় শ্রী মধুসূদন, গদ্যে ডিরোজিওর কথা উল্লেখ করতে পারি।

বাঙালির আলোকপ্রাপ্তি ও দীপায়ন পর্বের সূচনা ঘটে কলকাতায়, যে কলকাতা ব্রিটিশের গড়া, ১৯১২ সাল পর্যন্ত যে নগরী আধুনিকতম একটা শহর ছিল

www.pathagar.com

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে; অতঃপর ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হলো দিল্লী। উনিশ শতকের কলকাতা সুন্দরতম একটা শহর, বাগান, উদ্যান আর প্রাসাদে সুন্দরতম। এই কলকাতায় সাম্রাজ্যের বড় বড় সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো তখন। এই কলকাতার শিক্ষা, শিল্প ও পাণ্ডিত্যের আবহাওয়ায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীর বিকাশ ঘটে। তবে প্রথম দিকে বুদ্ধিবৃত্তির মানচিত্রের নিয়ন্ত্রক ছিল হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত, কেননা ব্রিটিশ শাসনের সুবিধে সবচেয়ে বেশি লাভ করে তারাই। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তি সংস্কৃতির বিভিন্ন তর্ক নিয়ে হাজির হয় দৃশপটে। ১৯০০ সাল নাগাদ দেখা গেল, সারা ভারতবর্ষের তুলনায় বাঙালিরাই শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সবচেয়ে অগ্রসর এবং সিভিল সার্ভিসে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বাঙালি ও বাংলাভাষীরাই শোভমান। বাঙালিরা আইন ও চিকিৎসাবিদ্যাতেও এগিয়েছিল, ফলে এসব ক্ষেত্রেও তারা কৃতকাম। ১৮৭৫ সালে একটা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে, যেমনিভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়েছিল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ।

শিক্ষার এই প্রসারের পেছনে ব্রিটিশ বিদ্যাচর্চা ও মনস্বিতার অবদান কম নয়। এশিয়াটিক সোসাইটি, ন্যাশনাল মিউজিয়াম ও ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ পণ্ডিতদের জ্ঞান ও গবেষণা চলতে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো এবং প্রতিষ্ঠানের ভারতবিদ্যা-বিশেষজ্ঞগণ (যাঁদের সবাই ইংরেজ) ভারতবর্ষের ইতিহাসকে যেন নতুনভাবে রচনা করলেন আবার; ভারতের ইতিহাসের নতুন পাঠ সম্পন্ন হলো এঁদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও সৃষ্টিশীল গবেষণায়। ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বাংলারও নতুন নতুন ঐতিহাসিক উপাত্ত সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হলো। বাংলা ও ভারতের নতুন ইতিহাসের আবিষ্কারক এই ইংরেজ বিদ্বানগণ। ভারতের ইতিহাসের অনেক অজানা আখ্যান উদ্ধার করে এই মনীষীরা নতুন ঐতিহ্য চেতনা ও গৌরববোধ উপহার দেন এদেশের মানুষকে। এই গৌরববোধ এবং স্বদেশ সম্পর্কে সচেতনতা উত্তরকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি। তবে এদেশের ইতিহাসের যে জ্ঞান, কৃতিবিদ্য মনীষীরা উদ্ধার করলেন, তার স্ট্রাকচার এবং প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যার পদ্ধতি পুরোটাই ইংরেজদের নিজস্ব। সুতরাং ভারতবাসী যখন তাদের নিজেদের ইতিহাস পাঠ করতে গেছে, পরোক্ষভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত পদ্ধতি ও শৃংখলার মাধ্যমেই তা পাঠ করেছে, কিংবা প্রভাবিত হয়েছে।

কাজেই বাংলার জাগরণ ও দীপায়ন পর্বের সমস্ত অর্জনই অনেকাংশে ইংরেজ ও ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট উদ্ভূত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৫) থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেরণাও সেই এনলাইটেনমেন্ট থেকে সঞ্জীবিত। আজও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাঙালির মন ব্রিটিশ অনুশাসন

www.pathagar.com

দ্বারা কিরকম নিয়ন্ত্রিত। তবে আরো কিছু প্রক্রিয়া আছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ প্রভাব স্থায়ী প্রতিপত্তি লাভ করেছে এখানে। দেখা যাবে বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক ব্রিটেনে শিক্ষালাভ করে এসেছে। কেউ কেউ হয়তো ওখানেই থেকে গেছে; কিন্তু দেশের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। লণ্ডন শহরে বাঙালিদের উপস্থিতি সর্বত্র– তারা বিশ্ববিদ্যালয়, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক, দোকান– সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালিদের এড়ানোর উপায় নেই ওখানে। এ কারণেও ব্রিটিশ প্রভাব বাংলাদেশে অব্যাহত।

ব্রিটেনকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, কেননা এদেশে তাদের প্রভাব গভীর থেকে গভীরতর স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেজন্যে বাঙালিরা 'ল'ইয়ার নয়, 'ব্যারিস্টার', 'ফিজিসিয়ান কিংবা সার্জন'– কিন্তু 'ডক্টর' নয়; 'রিডার', কিন্তু 'অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর' নয়। ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির অনেক আচার-প্রথা এমনভাবে ঢুকে গেছে যে, তা থেকে বাংলাদেশকে আলাদা করা যাবে না। বিচারক পরচুলা পরেন এখানে, সেই ব্রিটিশ অনুশাসনের জন্যেই; জেনারেলরা হতে চান 'ফিল্ড মার্শাল' সেটাই একটা ব্রিটিশ আকাঙ্ক্ষা। সিভিল সার্ভিসের অভিধাগুলোও ব্রিটিশদের অনুরূপ। এক কথায় বাংলাদেশ তার ঔপনিবেশিক প্রভু থেকে সিভিল এবং সামরিক এই দুই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কিছু অনুসরণ/অনুকরণ করেছে এবং এটা তাদের উত্তরাধিকার।

'কলকাতা' ছিল ব্রিটিশ ভারতের ক্ষমতার এক কেন্দ্রস্থল। রাজধানী কলকাতার নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ ব্যবস্থাও ছিল শক্তিশালী। উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে পুলিশী সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গুরুতর বলে বোধ হলো ব্রিটিশ প্রশাসনের। কেননা ততদিনে বাঙালিদের মুখ খুলে গেছে, ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা সরকারি প্রশাসনে তাদের উপস্থিতি বাড়ানো এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজেদের অংশগ্রহণের দাবি তুলতে শুরু করেছে। কিন্তু লর্ড কার্জন হিন্দু মধ্যবিত্তের সেই দাবি অগ্রাহ্য করলেন এবং শাস্তিস্বরূপ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ফলে দেখা দিল অসন্তোষ, সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠল বাঙালিরা, ইংরেজ কর্মকর্তাদের খুন করার কার্যক্রম শুরু হলো। আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলনে অত্যন্ত সতর্ক ও তটস্থ থাকতে হলো ব্রিটিশদের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মতো।

এই হলো সেই ইতিহাস, যার মধ্য দিয়ে 'বাংলা' স্বতন্ত্র হয়, এবং এই সেই প্রক্রিয়া যার কারণে সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের সম্পর্ক থাকে মজবুত এবং পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার ঘনিষ্ঠতা আরো দৃঢ়তর হয়েছে।

মুসলিম জাতির ওপর ব্রিটিশ শাসনের আরো একাধিক প্রান্ত আছে। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের মানুষ পাশ্চাত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে মক্কা ও লন্ডনের মাধ্যমে, আর এখন মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের সূত্রে। সামর্থ্য থাকলে বাংলাদেশের লোকেরা একবার পশ্চিম ঘুরে আসে। প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তি, যদি তার সামর্থ্য থাকে, জীবনে একবার সৌদি আরবে গিয়ে হজ্জ্ব করতে বাধ্য। তাদের ধর্মও এসেছে পশ্চিম থেকে, মুসলিম সেনাবাহিনীর মাধ্যমে। তারপর বাঙালি মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত ও সম্প্রসারিত হয় দিল্লীতে, যে দিল্লী মোগল এবং সুলতানদের রাজধানী ছিল; তারপর সে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় পাকিস্তানের সঙ্গে, বাংলাদেশের আগে যে দেশ মুসলমান হয়েছিল; তারপর তা বিকশিত হয় ইরানে উপসাগরীয় আরব দেশগুলোতে, তারপর তারা সম্পর্কিত হয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাথে। এভাবে বাংলাদেশ হয়ে ওঠে মুসলিম উম্মাহর অংশ। বাংলাদেশের মুসলমানেরা নামাজও পড়ে পশ্চিমের দিকে মুখ করে। পশ্চিম তাদের কেবলা।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লন্ডন ও ইংরেজি-ভাষী দেশের প্রভাব। কেননা, অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালির আত্মীয়স্বজনেরা লন্ডনে বাস করে, কিংবা এক সময় করত। বিবিসি'র খবর ও সংবাদ প্রবাহ তাই বাংলাদেশের সবার কাছে পরম প্রিয়। কেননা, এ এমন এক পুরনো প্রতিষ্ঠান, যার সঙ্গে যার কণ্ঠ ও শব্দ তরঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে আছে।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বাংলাদেশের লোকেরা বিশেষ অবহিত নয়, এটা দুর্ভাগ্যজনক। অবশ্য তারা প্রতিবেশি বার্মা সম্পর্কেও অল্পই জানে; থাইল্যান্ড ও পূর্ব এশিয়া সম্পর্কেও তারা বিশেষ খবর রাখে না। এমনকি দুটো মুসলিম দেশ– ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সম্পর্কেও তাদের জানাশোনা নেই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এ অভিযোগ চলবে না– ওদেশের খবর রাখে তারা যথেষ্ট, কেননা, প্রচুর বাংলাদেশী ছাত্র এখন ওখানে পড়তে যায়।

সেজন্যে কখনো কখনো মনে হয় বাংলাদেশের অবস্থান যেন ঠিক 'এশিয়াতে'ও নয়, ভারত উপমহাদেশেও নয়– মাঝামাঝিতে। যেন ওসব দেশ ও মহাদেশের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি ঘনিষ্ঠতা নেই। তবে একটা জিনিস খুব কৌতুকাবহ মনে হয়, তা হলো, বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে ব্রিটিশ আমলের নিদর্শন খুব বেশি নেই। তার কারণ হয়তো এই যে, ব্রিটিশ পর্ব এখনো অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের মনোলোক বিচিত্র, এর ইসলামমুখিতা, এর সেক্যুলারিজম, সেনাবাহিনী, এর ভূপ্রকৃতি ও ভাষা, গ্রামের নব্য শ্রেণী ও ইংরেজিয়ানা– সব মিলিয়ে যেন মৌসুমের মতো। মনের গড়ন ও অভিব্যক্তির এত অভিপ্রকাশ বাংলার ঋতু বৈচিত্র্যের আভাস দিয়ে যায়। বছরে বছরে তার ভেতর পালাবদল ঘটে চলেছে। যে কোনো শিক্ষিত বাঙালির সঙ্গে একটানা কথা বলে গেলে ঋতুর মতো বিচিত্র ও বিভিন্ন বাংলাদেশের মন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমি সাইক্লোন; আমি ধ্বংস

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে জয়নুল আবেদীনের শিল্পকর্মগুলোর পাশে আরো কিছু প্রদর্শন সামগ্রী আছে। বিস্তৃতি ও প্রভাব বিস্তারক শক্তির বিচারে সেগুলো জয়নুলের আঁকা ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের দৃশ্যাবলীর চেয়ে মোটেই কম শক্তিশালী নয়। এই প্রদর্শন সামগ্রী কয়েকটি ফটোগ্রাফ। এগুলোতে মূর্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। ছবিগুলোতে দেখা যায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত কিছু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য : এক রিকশাচালক তার রিকশার পা-দানির ওপর পড়ে আছে; ঢাকার রায়েরবাজারে বুদিদ্ধজীবীদের গণকবর– যুদ্ধ শেষ হওয়ার সামান্য আগে এই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন এক হিন্দু ডাক্তার, ছবিটি যখন তোলা হয় তখন তার পরনে ছিল ধুতি। একটি ছবি আছে, স্তূপীকৃত মাথার খুলির। ঢাকা থেকে মাইল বিশেক দূরে সাভার এলাকায় এই খুলির মালিকদের হত্যা করা হয়। এই সাভারেই এখন দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টিনন্দন গাম্ভীর্যময় জাতীয় শহীদ স্মৃতিসৌধ। ছবিগুলো সাদা বোর্ডের ওপর লাগানো, কালো কালিতে লেখা হয়েছে ছবি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা। এ শতাব্দীর মধ্যভাগের সংবাদ সাময়িকীগুলোর বিরস সাংবাদিকতা যে ধরনের আবহ সৃষ্টি করত এই প্রদর্শন সামগ্রীগুলোও সেরকম আবহ তৈরি করে রেখেছে। সাংবাদিকের দৃষ্টিতে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং নৃশংসতাকে দেখা অনুভূতি জাগিয়ে তোলে ছবিগুলো।

তা সত্ত্বেও জয়নুল আবেদীনের আঁকা ছবিগুলোর যে ঐশ্বর্য ও কল্পনা বিস্তারের শক্তি তা এই ফটোগ্রাফগুলোতে অনুপস্থিত। যেখানে ইতিহাস সত্য তথ্যের স্তূপ সেখানে শিল্পকর্ম সরল সুরুচির সঙ্গে সত্যকে তুলে ধরার মাধ্যম; এই প্রবচনই যেন সমর্থিত হয়েছে বাংলাদেশ জাদুঘরের এই দুই প্রদর্শন সামগ্রীর মধ্য দিয়ে। বস্তুত, প্রায় সকল স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কিত শিল্পকর্মই জয়নুলের কাজের যে বৈশিষ্ট্য সেই কবিত্বপূর্ণ চিন্তাময়তা, রঙের মিশেল, দৃশ্য, প্রতীক এবং শৈল্পিক বিন্যাস বিবর্জিত। এর অর্থ এই নয় যে, জয়নুলের কাজ মানুষের দুর্দশার ভয়াবহতাকে কম প্রকাশ করছে, বরং বেশি প্রকাশ করছে। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, জয়নুল

www.pathagar.com

ভয়াবহতার মধ্যেও মানবাত্মার ক্ষমতাকে ধরতে পেরেছেন। যে কোনো কারণেই হোক, বিভিন্ন স্বাধীনতা যুদ্ধকালে যা ঘটেছে তার প্রকৃত শক্তিকে কখনোই শিল্পকর্মে আবদ্ধ করা হয়নি। কারণ, চেতনার গভীরে সেই দিনগুলো সম্পর্কিত ধারণায় এক ধরনের অনিশ্চয়তা থেকে গেছে যা দীর্ঘদিন পরেও মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

এই কারণে যে, কোনো গোপন ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রয়েছে তা নয়, শিল্পের পক্ষে আত্মস্থ করা সম্ভব নয় এমন তিনটি সমস্যার মধ্যেই কারণটি নিহিত। প্রথমত, রাজনৈতিক কাহিনী স্বভাবতই সরসময় মানব জাতির সর্বাপেক্ষা কম মহৎ দিকগুলো– যেমন, রাজনীতির দেয়া-নেয়া এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ও তা পাওয়ার কৌশলের কথা তুলে ধরে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের মানবীয় নিষ্ঠুরতার মুখে শিল্পী মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব তার একটা সীমারেখা আছে। অশউৎস থেকে গুলাগ পর্যন্ত এই শতাব্দীর যে কোনো রাজনৈতিক নৃশংসতার কথাই ধরা যাক না কেন, কোনোটির ধারে-কাছেও উঁচুদরের শিল্পের অবস্থান সম্ভব নয়, যদিও আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন নিশ্চিতভাবে চেষ্টা করেছেন শিল্পকে গুলাগের কাছে নিয়ে আসার। অন্তত এই শতাব্দীতে, শুধু বাংলাদেশে নয় ইউরোপেও, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কথা প্রকাশ করার জন্যে যেন অন্যবৃত্ত সাদা-কালো আলোকচিত্র এবং ছাপানো বিবরণীর প্রয়োজন। তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে, প্রায় সকল রাজনৈতিক গণআন্দোলনের পেছনে আকাঙ্ক্ষা থাকে আকাশছোঁয়া এবং তার পরিসমাপ্তিতে থাকে আশাভঙ্গের বেদনা। ফরাসী বিপ্লব এবং সোভিয়েত কম্যুনিজমের গুলাগ অথবা তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য ব্যর্থ আন্দোলনে সন্ত্রাসের দিকটির কথা ভাবুন। এই সন্ত্রাস আর নৃশংসতার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে জঘন্য একনায়কতন্ত্র আর অর্থনৈতিক অবক্ষয়। এই ধরনের পরিবেশে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার করুণ পরিণতি বেদনায় জর্জরিত নিরপরাধ মানুষের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা কঠিন। এ সময় অবসাদ এমন সর্বগ্রাসী হয় যে, ঘৃণা প্রকাশের প্রয়োজনীয় শক্তিটুকুও পাওয়া যায় না। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশকেও এমন অবসাদগ্রস্ত সময় অতিক্রম করতে হয়েছে।

প্রথমে সোনার বাংলা পাওয়ার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা পরিণামে ভয়াবহ যুদ্ধের বন্য নিষ্ঠুরতা, তারপর বাকশাল-এর (বা দ্বিতীয় বিপ্লব, ফ্রান্সের রেইন অফ টেরর এবং রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের মতো, প্রথম বিপ্লবের পরে যা ঘটেছিল) আগমন এবং তারও পরে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পুরাতনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা– এই হচ্ছে বাংলাদেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বাপর অবস্থা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে বোঝায় ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেখ-এর মৃত্যু পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব।

প্রকৃতপক্ষে এখানে কাহিনী দুটো : এক হচ্ছে, বাংলাদেশের কাহিনী, আর হচ্ছে এক প্রজন্মের রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক (ইনটেলেকচুয়্যাল) নেতৃত্বের কাহিনী। এই

www.pathagar.com

প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বাধিকার অর্জনের বিশ্বাস থেকে আন্দোলন শুরু করলেও এক পর্যায়ে তাদের এই বিশ্বাসকে তাঁরা স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসে পরিণত হতে দেখেছেন। একইভাবে তাঁরা বহুদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসকে 'বাকশাল' নামক কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন। বাংলাদেশের কাহিনী আর এই বর্তমান বিলীয়মান প্রজন্মের কাহিনী অভিন্ন নয়, যদিও দুটোর কাহিনী একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। দুটোর মধ্যে বাংলাদেশের কাহিনীটি অত্যন্ত গৌরবমণ্ডিত। তবে এর সঙ্গে সম্পর্কিত সেই প্রজন্মের কাহিনী তত পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশের কাহিনী দিয়ে আমরা শুরু করি।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়

বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ঐতিহ্য গৌতম বুদ্ধেরও পূর্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা বর্ণাশ্রম সচেতন আর্য– তথা হিন্দুদের উপস্থিতি প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। ব্যর্থ হয়ে যখন নিম্নবর্ণের দাস এবং নমশূদ্র হিসেবে গণ্য হয়েছে তখন বাংলাদেশের ভেতর বদ্বীপ এলাকার নিচু জলাভূমিতে সরে যাওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। এভাবে তারা মাটি কামড়ে থেকে অস্তিত্ব বজায় রেখে গেছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রারম্ভিক বিস্তার পর্বে তারা কোমর বেঁধে দাঁড়ায় এবং বুদ্ধের বর্ণভেদহীন সমাজের নিশ্চয়তায় দলে দলে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে। পরবর্তী বারশ' বছর তারা বুদ্ধের প্রদর্শিত পথের প্রতি আস্থাশীল থাকে এবং তাদেরকে বর্ণাশ্রম প্রথায় ফিরিয়ে নেয়ার যে কোনো চেষ্টা প্রতিহত করে। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীকালে সেন রাজারা যখন তাদের পুনরায় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় ফিরে যেতে এবং তাদের ভাষাকে সংস্কৃতায়িত করার জন্যে বল প্রয়োগ করে তখন বাংলাদেশীরা অমানুষিক নিষ্ঠুরতার মুখেও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইসলামের আগমনে নতুন এক বর্ণভেদহীন সমাজ গড়ে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা এই টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। পরবর্তী প্রায় অর্ধ সহস্র বছর (১২০০ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত) তারা ইসলামের ছায়ায় হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথার ভীতি মুক্ত থেকে জীবন কাটায়।

মুসলমানদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার পর ব্রিটিশরা প্রথমদিকে বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুযোগ-সুবিধা দেয় এবং আগে যারা শক্তিশালী ছিল সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করতে থাকে। প্রথম ১২০ বছরে ব্রিটিশরা তৎকালীন মুসলমান সমাজের যা মূল ভিত্তি সেই মাদ্রাসা ব্যবস্থা, ফার্সি ও মুসলিম আইনভিত্তিক বিষয় ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী এবং সরকার ব্যবস্থা সব ধ্বংস করে দেয়। মুসলমানেরা রাজনীতি থেকে বিতর্কিত এবং

www.pathagar.com

সামাজিক প্রভাব বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ১৮৯০-এর দশকে অনুগ্রহভাজন হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা শুরু করে কেবল তখনই, ব্রিটেন মুসলমানদেরকে নূতন অনুগ্রহভাজন হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে যখন। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই, ব্রিটেন ১৯০৫ সালে বাংলাকে বিভক্ত করে এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো নিয়ে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য গঠন করছে। হিন্দুরা ব্রিটিশদের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। কারণ এতে পূর্ববাংলার ওপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। অন্যদিকে মুসলমানেরা থাকে নিশ্চুপ। তারা ব্রিটিশদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে লেগে গিয়েছিল তা যদিও নয়, তবে নতুন ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ যেমন– ব্যামফিল্ড ফুলার এবং ল্যান্সলট হেয়ার-এর প্রতি তারা কৃতজ্ঞ বোধ করছিল। এই দুই ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট গভর্নর মুসলিম বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্যে রীতিমতো সংগ্রাম করেছিলেন বলা যেতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, বাঙালি মুসলমানেরা ব্রিটিশপন্থী হয়ে পড়েছিল। হিন্দুদের মতো তারাও স্বাধীনতা চাইত। তবে তারা ভাবত স্বাধীনতা পেলে হয় সারা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে তা পেতে হবে, নয়তো পৃথক একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পেতে হবে, যে রাষ্ট্র থাকবে হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথা থেকে মুক্ত। সত্যি কথা বলতে কি, মুসলমানেরা সঠিকভাবেই সন্দেহ করেছিল, ব্রিটিশরা যখন ভারত ছেড়ে যাবে তখন সরকার পরিচালনার ভার হিন্দুদের হাতেই দিয়ে যাবে।

তা সত্ত্বেও ১৯০৫ সালে ব্রিটেন বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রথমদিকে মুসলমানেরা বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের আবেদনে সাড়া দিয়েছিল এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রায় নেমে পড়েছিল। কিন্তু বাংলার বাইরের হিন্দুশক্তি যে মুহূর্তে আন্দোলনকে সর্বভারতীয় এবং হিন্দুভিত্তিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করে তখনই মুসলমানেরা পিছিয়ে আসে। কারণ, তারা বুঝতে পারে হিন্দুরা শুধু বাংলায় নয়, ঐক্যবদ্ধ এবং হিন্দু প্রাধান্যপূর্ণ ভারতেও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আন্দোলনের সেই প্রথম লগ্নে প্রতিবাদের ভিত্তি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ভারতীয় বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ নয় এবং সে সময়ই অন্তত বাঙালির মনোজগতে জন্ম নেয় বাংলাদেশ। বাঙালি মুসলমানেরা তাদের ধর্মকে যেমন গভীরভাবে ভালোবাসত তেমনি গভীরভাবে ভালোবাসত তাদের ভূমি, ভাষা এবং বাংলার মাটিকে। তা সত্ত্বেও তখনকার পরিস্থিতিতে মুসলমানেরা নিজস্ব একটি প্রদেশের আকাঙ্ক্ষাকে মাটিচাপা দিয়ে রাখতে বাধ্য হয়। তবে এই আকুল আকাঙ্ক্ষা কখনো মরেনি। ১৯৬০-এর দশকে তা তীব্র আবেগ নিয়ে জাগ্রত হওয়ার আগে বারবার এই আকাঙ্ক্ষা পুনর্জাগরিত হয়েছে। এভাবে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭-এ ব্রিটেনের ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলিম-বাংলা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে

www.pathagar.com

জাগিয়ে রেখেছে। এর পেছনে যে দীর্ঘমেয়াদী আশা ক্রিয়াশীল ছিল তা হচ্ছে, একদিন তারা কোনো না কোনো ধরনের একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা পাবে, যা তাদের বর্ণাশ্রমভিত্তিক হিন্দু শাসন থেকে রক্ষা করবে।

এ ব্যাপারটিকে অবশ্য খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া যায় না। সকল বাংলাদেশীর রয়েছে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট মানস। এক স্তরে তারা নিছকই হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান। অন্য এবং গভীরতর, তুলনামূলকভাবে কম যৌক্তিক ও অবদমিত স্তরে তারা বাংলাদেশী– এক অর্থে এটা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম বা বৌদ্ধ-চিন্তা কাঠামো জন্ম নেয়ারও বহু আগের প্রাক-আর্যযুগের সঙ্গে একাত্মতার বোধ। এই দ্বিতীয় স্তরে তাদের ঐতিহাসিক স্মৃতি তাদেরকে টেনে নিয়ে যায় উপজাতীয় পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যের দিকে, যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিভূমিতে ছিল নদী, চাঁদ, সূর্য এবং গ্রাম– দেবতাভিত্তিক ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি ভাষা ও দেশের মাটির প্রতি ঐতিহ্যগত জাতীয়তাবাদী আনুগত্য। সকল জাতিরই অবচেতন মনের গভীরে এমনি স্মৃতির ঝর্নাধারা বহমান। তবে বর্তমান শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই ঝর্নাধারা যে বিপুল উদ্দামতায় বয়ে গেছে তা আগে কখনো ঘটেনি। এই ব্যাপারটি এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়নি।

১৯০৫-১২ কাল পর্যায়ের পরে কিছুটা সময় বাংলাদেশী মুসলমানেরা এক অসাধারণ রূপান্তরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। এ ব্যাপারে অবদান রাখেন নওয়াব আবদুল লতিফের মতো মুসলমান সমাজ সংস্কারকরা। এর সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের আবেশিক দিক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার ঐতিহাসিক স্মৃতি জাগিয়ে তোলার অসাধারণ নৈপুণ্য মিলে বাঙালি মুসলমানকে তার বাংলাদেশী ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সঙ্গে সহ-অবস্থানের প্রেরণা যোগায়। তারা 'বন্দে মাতরম্' পছন্দ করত না, কারণ এতে হিন্দু দেবীর উল্লেখ আছে। কিন্তু এর ধ্বনি এবং বাংলাকে মানসপটে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারটিকে তারা পছন্দ না করে পারেনি। তারা হিন্দুরাজের প্রতি সম্মতি দিতে পারেনি, তারা চেয়েছে এমন একটি বাঙালি জাতি, যেখানে বর্ণ-বৈষম্যহীন সমাজে তারা তাদের ন্যায্য আসন পাবে। কিছু বাংলাদেশী হিন্দু পরিবার তখন হিন্দুত্ববাদ ও ইসলামের বাইরে ব্রাহ্ম মতের জীবনাচরণের মাধ্যমে এ ধরনের এক বাঙালি বাস্তবতা অর্জনের চেষ্টা করছিলেন। কিছু বাংলাদেশী মুসলিম পরিবারও তাদের এই চেষ্টায় শরিক হয়। এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বীজ রোপিত হয়। কালক্রমে এ দু'য়ের সঙ্গে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে চার মূল স্তম্ভ তৈরি হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলমান এবং হিন্দু উভয়কেই তাদের ধর্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ ছাড়াই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের সুযোগ করে দেয়। এভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই সুগভীর বোধের

www.pathagar.com

উন্মেষের সঙ্গে লালন শাহের অদেখা-অধরার উদ্দেশ্যে নিবেদিত আবেদনময় গানের মতো গান ও কবিতার সহযোগে বাংলাদেশের প্রকৃত ভিত্তি গড়ে ওঠে। এমনকি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতও তৈরি হয়েছে লালন শাহকৃত (প্রকৃতপক্ষে গগন হরকরা– *অনুবাদক*) সুরের উপর স্থাপিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা– সোনার বাংলার দ্বারা। ১৯০৫ সালে বাংলাকে এক রাখার আন্দোলনে গতি সঞ্চারের জন্যে কবিতাটি রচিত হয়েছিল। এই গানের মাধ্যমে ১৯০৫-এর উত্তরাধিকার বর্তমান বাংলাদেশের অন্তরাত্মায় প্রথিত হয়ে আছে এবং প্রতিবার জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বা বাজানোর সময় তা পুনরুক্ত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ নামক এই নতুন বোধ দানা বেঁধে ওঠা এবং বাংলার মুসলমানদের ভেতর এটা রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবার মতো অবস্থা তৈরি হতে অবশ্য বহু বছর লেগেছিল।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্যে এই আকুলতা নতুন করে জাগ্রত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে, যখন যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের নৈরাজ্যবাদী গোপন আন্দোলন বাংলায় শিকড় ছড়ায়। এগুলো বহুলাংশে ছিল বাঙালি হিন্দুর আন্দোলন। তারা ছিল সহিংসতার সমর্থক এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস পথ-পদ্ধতির বিরোধী। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, তাদের সহিংসতার মধ্যে সবসময়ই কোনো না কোনো বাঙালি উপাদান থাকত। এই সহিংস আন্দোলন বাংলাকে বাকি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে পৃথক করে ফেলে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের আকাঙ্ক্ষা আবার জাগ্রত হয় ১৯২০-এর দশকে যখন সি.আর. দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বসু বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে বাংলাদেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। দুজনই ছিলেন বাঙালি হিন্দু। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নির্বাচিত নেতা সি.আর. দাশ বাংলা চুক্তি (বেঙ্গল প্যাক্ট) প্রণয়ন করেন। এই চুক্তি রাজনীতি থেকে ধর্মীয় প্রতিযোগিতার বিলোপ ঘটায়। আর সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন রণমুখী, কট্টরপন্থী জাতীয় সমাজতন্ত্রী। স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংসতার প্রশ্নে মতভেদ হওয়ায় তিনি গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। দাশ এবং বসু ঐক্যবদ্ধ বাংলার কাঠামোর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতার জন্যে এক রফা চুক্তি প্রণয়ন করেন; যা ব্রিটিশ ভারতের আর কোথাও ছিল না। তাঁরা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বাংলা চুক্তিতে টেনে আনতে সমর্থ হন। এই ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দী ১৯৪০ এবং '৫০-এর দশকে পাকিস্তানের প্রথম সারির রাজনীতিবিদ হিসেবে আবির্ভূত হন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো একবার পুনরাবির্ভূত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন সুভাষ বসু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জাপানীদের সঙ্গে যোগ দেন। আবার তা জাগ্রত হয় ১৯৪৫-এ, যখন গান্ধী ও নেহরু বাংলাকে বিভক্ত করার নতুন পরিকল্পনা

www.pathagar.com

অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেন। সোহরাওয়ার্দী এবং শরৎ বসু (সুভাষ বসুর ভাই) এ সময় বাংলাকে একত্রিত রাখার এক দুর্বল চেষ্টা চালান। অবশেষে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনরাবির্ভাব ঘটে ১৯৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বক্ষণে, যখন শেখ মুজিব বাঙালি ঐক্যের ডাক দেয়ার পাশাপাশি বর্ষীয়ান নেতা মওলানা ভাসানীর তাগিদে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামসহ সমগ্র পূর্ব ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে 'পূর্বদেশ' গঠনের ইঙ্গিত দেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ এবং স্মৃতিজাগানিয়া স্তরে বাঙালি ঐক্য চেতনার বয়স দীর্ঘ। রাজনৈতিকভাবে না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে এখনো এই ঐক্য চেতনা বিদ্যমান।

যাহোক, বাস্তবতার স্তরে কিন্তু বাঙালি মুসলমানের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হিন্দু শাসনের অবসান। এর পেছনে আংশিকভাবে ধর্মীয় অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকলেও অধিকতর মৌলিক কারণটি নিহিত রয়েছে অন্যখানে। তা এই ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশে অধিকাংশ ভূমি মালিক বা জমিদার এবং অর্থ ঋণদানকারী মহাজন ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু। এসব জমিদার এবং মহান সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক প্রজাদের প্রায় ভূমিদাস অবস্থায় ঠেলে দিয়ে এমন দুর্দশায় নিপতিত করেছিল যার নজির এই শতাব্দীর কোনো সভ্য সমাজে মেলে না। জমিদার ও মহাজনরা উচ্চহারে খাজনা ও সুদ আদায় করত। তার ওপর ছিল দাদন নেয়ার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়। আরো ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত গোমস্তাদের অত্যাচার এবং খাজনা-সুদ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে লাঠিয়ালদের নির্যাতন। সবমিলিয়ে বাঙালি মুসলমানের ৮০ শতাংশই পরিণত হয়েছিল প্রায় ক্রীতদাসে। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে এ ধরনের ব্যবহার পেতে পেতে মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত হীনতাবোধ দেখা দিতে শুরু করেছিল। এরই ফলে ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের কাছে 'ভাই' হয়ে ওঠার বা করে তোলার কথাবার্তা বিপর্যয়কর আর্থ-সামাজিক ও বর্ণাশ্রম বিরোধী লড়াইয়ের নিচে চাপা পড়ে থাকে। তবে মুসলমানেরা বিপ্লবের ডাক দেয়নি, বরং তারা বাংলা চুক্তির অধীনে মধ্যপন্থী ও পর্যায়ক্রমিক সংস্কারের জন্যে কাজ করে যায়। তথাপি আন্দোলনের শ্রেণী-চরিত্র আন্দোলনকে এক ধরনের 'হিন্দু বনাম মুসলমান' অনুরণন দান করে।

বাংলার মধ্য থেকে মুসলমানের জন্যে স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের যে সংগ্রাম তা বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রথমেই ছিল উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের অর্জিত প্রাধান্য। এর সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ পরিচালিত সিভিল সার্ভিস এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই সবকিছু মুসলমানদের এক অসুবিধাজনক অবস্থায় ঠেলে দিয়েছিল। এসব বাধা ঠেলে তাদের এগোতে হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ : ব্রিটিশরা গোড়াতে স্কুলগুলোয় নিয়োগ করেছিল হিন্দু শিক্ষকদের। তারা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সহায়তা করার সময় সেগুলোতে ব্যাপকভাবে হিন্দুধর্মের

www.pathagar.com

বিভিন্ন দিকের পরোক্ষ উল্লেখের সমাবেশ ঘটায়। এর প্রতিক্রিয়ায় অধিকাংশ মুসলমান বাংলায় কথা বললেও তারা লিখতে শুরু করে প্রধানত 'মুসলমানি বাংলা'য় যাতে আরবী, ফার্সি ও উর্দু শব্দের আধিক্য থাকত। এ ভাষাতেই তারা উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত পুঁথি-সাহিত্য রচনা করেছে। অথচ এ সময়ে স্কুলগুলোতে শেখানো হতো পরিশোধিত সাহিত্যিক বাংলা, যা ব্রিটিশের অধীনে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের হাতে রূপলাভ করে। এভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক ধরনের ভাষার ব্যবধান গড়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি, সাহিত্যিক বাংলায় মুসলমানের লেখা প্রথম বই– একটি গানের বই– প্রকাশিত হয় মাত্র ১৯১০ সালে এবং ১৯২০ সালের আগে যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান এ ভাষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেনি। কারণ, তারা মনে করত লিখিত এবং সাহিত্যিক বাংলা একটি 'হিন্দু' ভাষা। পাঠ্যবই থেকে হিন্দু পক্ষপাত দূর করতে এর পরেও অনেক বছর লেগেছিল।

আজকের বাংলাদেশে এ কথা যদিও প্রতিক্রিয়াশীলতা হিসেবে বিবেচিত হবে, তবু সত্য হচ্ছে বাংলার অনুপম সাহিত্যিক ঐতিহ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রধানত সেসব হিন্দুর সযত্ন প্রয়াসে গড়ে উঠেছে যারা তাদের প্রদেশে ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক জাতিক রাষ্ট্রের পরিচিতির বোধ সঞ্চারের জন্যে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন। হিন্দুদের পুনর্জাগরণের এই সময়ে বাংলার মুসলমানেরা কিছু করার তীব্র আকুতি নিয়ে তাদের মুসলমানিত্বের শিকড় পুনঃপরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল এবং পুঁথি-সাহিত্য রচনা করছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আগে বাঙালি মুসলমান বাংলার সাহিত্যিক রীতি ও ঐতিহ্যের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকায়নি এবং ১৯৬০-এর দশকের আগে তারা সর্বান্তকরণে বাঙালি চেতনা ও আদর্শকে অনুমোদন দেয়নি। অতএব, বলা যেতে পারে ১৯০৫-১২ কাল পর্যায়ব্যাপী বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এমন এক প্রক্রিয়ার সূচনা হয় যা শেষ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানকে ভাষা আন্দোলনের দিকে নিয়ে যায় এবং উনিশ শতকে হিন্দুদের হাতে গড়া বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিতে অনুপ্রাণিত করে। এই ক্রান্তিকাল আসার পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষা বাঙালি (লেখক লিখেছেন *বাংলাদেশী–অনুবাদক*) জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারেনি, আজকের আধুনিক সমৃদ্ধ ভাষাও হয়ে উঠতে পারেনি। মুসলমানি বাংলা থেকে সাহিত্যিক বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াসটি ছিল খুবই দীর্ঘ ও কঠিন। তবে ১৯৫০-এর দশকের আগেও এই ব্যাপারটি অনেক বাঙালি মুসলমানের কাছেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।

মুসলমানদের অসুবিধা ও হিন্দুদের সুবিধাজনক অবস্থান দৃঢ় হতে সাহায্য করেছিল যেসব ব্যাপার তার আরেকটি হলো আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের

www.pathagar.com

বিস্তার। এ ব্যাপারটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সুনিশ্চিতভাবেই সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যায়। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার যে ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট করেছিল তা এবং সেই সঙ্গে সহনশীলতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ– এই দুই মিলে তথাকথিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও প্রাধান্যেরই ইঙ্গিত করত। ইসলাম সহনশীল হতে পারে এবং এ ব্যাপারে ইসলামের নজির অনেক ধর্মের চেয়ে ভালো হলেও হিন্দুরা যখন ধর্মীয় সহনশীলতার প্রশ্নটিকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে রীতিমতো ব্যবহার করতে শুরু করেছে তখন মুসলমানদের ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ পরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে। অবশ্য এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার প্রয়োগের কারণেই বাংলা চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যম রাজনীতিকে ধর্মীয় ইস্যুর বদলে অন্ন-বস্ত্রের প্রসঙ্গের মধ্যে সীমিত করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯২০-এর দশকের অনেক বাঙালি মুসলমানের লেখায়ই এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সূচনা এক সুগভীর বিতর্কমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, যার সমাধান এখনো হয়নি।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আগমনে রাজনীতিতে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা লুপ্ত হলো। ধর্মের স্থান নিল আধুনিক জাতীয়তাবাদী অর্থে মাতৃভূমি, মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার ধ্যানধারণা বা আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী অথবা মেহনতী মানুষের প্রতি ভালোবাসা। এসব আন্দোলনের কোনোটিতেই অন্তর্লীন কোনো নৈতিক পদ্ধতি নেই। বরং এই শতাব্দীতে দেখা গেছে এর বিপরীতটাই যেন রীতি। এই দুই ধরনের আন্দোলনই বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোর বিনাশের মাধ্যমে অধিকতর নিখুঁত ভবিষ্যৎ লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকে জাত। দুটোই রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ব্যক্তিক বা সামাজিক আচরণের বিচারে কোনোটিতেই কোনো দার্শনিক বা নৈতিক পরিমণ্ডল নেই। জাতীয়তাবাদ জাতিগত, বর্ণগত এবং ভাষাগত অহঙ্কারের উৎসারণ ঘটায়, আর সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে আছে ধনিক শ্রেণী ও ধনী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ঈর্ষা।

যাহোক, বামপন্থী দলগুলোর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এবং মানবতাবাদীরা সম্পূর্ণত অনিচ্ছাকৃতভাবে নব্য শিক্ষিত জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ ঘটায়। সমাজের ধর্মীয় ভিত্তিকে অস্বীকার করে এবং ধর্মের বিকল্প হিসেবে সমাজতান্ত্রিক বা অন্য কোনো আদর্শবাদী ধ্যানধারণার আমদানী করে বামপন্থীরা বাঙালির উপজাতীয় মানসের তলকুঠুরির দরজা খুলে দেয় এবং এক ধরনের আদিম রূপে বর্ণ, জাতি, রক্ত এবং দেশের মাটির প্রতি ভালোবাসা, দেশমাতৃকার সন্তানদের প্রতি মমত্ববোধের উদ্বোধন ঘটায়। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে ধর্মহীনতার কথা বলে বামপন্থী, উদারনৈতিক এবং সমাজতন্ত্রীরা সকল ধর্মে যে নৈতিকতার অনুশাসন অন্তর্নিহিত আছে তার প্রতি বাঙালিদের মনে এক ধরনের অপছন্দের ভাব

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে। উপরন্তু ধর্মের আলখাল্লা ছুঁড়ে ফেলে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বাম এবং ডান উভয় ধরনের আদর্শবাদীদের সামনে এমন এক জাতীয়তাবাদের প্রান্তর উন্মুক্ত করে দেয় যেখানে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের কোনো বালাই ছিল না। ফলে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ তা প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে সকল প্রকার নাস্তিকবাদী অর্থে এই নৈতিকতাহীন জাতীয়তাবাদকে সম্মাননা জানানো হতে থাকে, যেমনটি আমরা দেখি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়। এক্ষেত্রে আরো বস্তুনিষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মকাণ্ড। বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে তিনি স্ট্যালিনের কম্যুনিস্টদের সঙ্গে, হিটলারের নাৎসীদের সঙ্গে এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং ১৯২০-'৩০-এর দশকে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনকালে মূঢ়োচিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

এই ধরনের বিদেশী বিদ্বেষ বা বিদেশী ভীতি জাগরণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মোটেই ধর্ম বিরোধী বা নৈতিকতা বিরোধী নয়, বরং তা সকল ধর্মীয় নৈতিক বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে। প্রচলিত ধর্মগুলোতে যেহেতু অত্যন্ত কার্যকর এবং নৈতিকতাপূর্ণ রীতি-পদ্ধতির কথা আছে সেহেতু সেগুলোকে শ্রদ্ধা করা, সহিষ্ণুতার দৃষ্টিতে দেখাই উচিত। সক্রেটিসের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি হেমলক পান করতে রাজি হয়েছিলেন; কিন্তু জনগণের দেব-দেবীদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে সম্মত হননি। দুর্ভাগ্যক্রমে এরকম সহিষ্ণু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শেষ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেনি, যে কারণে আধুনিক আমূল পরিবর্তনকামী তথা চরমপন্থী মতবাদসমূহের আগমন সম্ভব হয়েছে।

রাজনৈতিক ঐতিহ্য

সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশী রাজনৈতিক ঐতিহ্যের উদ্বোধন হয় ১৯২১ সালে, যখন বাংলায় কলকাতা কর্পোরেশন কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসনাধীন সেটাই ছিল একমাত্র নৈর্বাচনিক পরিষদ যাতে স্থানীয়দের অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। ১৯২১ সালের এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটে। একজন এ.কে. ফজলুল হক। পরবর্তীকালে তিনি বাংলার প্রধান মুসলিম রাজনীতিবিদ হিসেবে গণ্য হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তাঁর এ অবস্থান বজায় থাকে। আরেকজন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৩০-এর দশকে তিনি বৈশিষ্ট্যতা অর্জন করেন এবং ১৯৫০-এর দশক নাগাদ পাকিস্তানের প্রধান রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠেন। অপরজন আবুল হাশেম। তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রী।

www.pathagar.com

কৃষক-শ্রমিকদের মাঝে তিনি কাজ করতেন, সেই সূত্রে তিনি পরবর্তীকালে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলোতে তৃণমূল পর্যায়ের সাংগঠনিক ভিত্তির যোগান দিয়েছিলেন।

ফজলুল হক রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ১৯২০-এর দশকে, সি.আর. দাশের চেষ্টায় বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাংলা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর। এই চুক্তিতে কলকাতা কাউন্সিলে মুসলমানদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। (সি. আর. দাশ ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু প্রকৃতির লোক। তাঁর সহিষ্ণুতা এবং সহিষ্ণু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনন্য উদাহরণ হচ্ছে বাংলা চুক্তি। কোনো ধর্মমতকে আঘাত না করে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে এ চুক্তির গুরুত্ব ছিল বিরাট।) কলকাতা কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার পর কাউন্সিলের অপর মুসলমান সদস্য সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ফজলুল হকের পরিচয় হয়। সোহরাওয়ার্দী কলকাতার এক শ্রমিক এলাকার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে ওঠেন মুসলিম-বাংলার প্রধান মুখপাত্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী তাঁর এই অবস্থানে ছিলেন। ১৯৩৭ সালে ব্রিটেন স্থানীয় প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের সম্প্রসারণ ঘটালে ফজলুল হক নতুন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং শিগগিরই পরিষদের প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে গণ্য হন।

এটা স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, সীমিত সময়ের জন্যে হলেও বাংলা চুক্তি হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক কর্মীদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একসাথে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিল। ১৯২০ এবং '৩০-এর দশকে ক্রমশ অধিক সংখ্যায় মুসলমানেরা কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। এর ফলে প্রথমবারের মতো অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্যে এক ঐক্যবদ্ধ বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। আর এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণাতেই হিন্দু-মুসলিম কর্মীরা একত্রে আন্দোলন করতে পেরেছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মতো তরুণ নেতারা আমূল সংস্কারবাদী– তথা চরমপন্থী হিন্দুদের সাথে একই ব্রিটিশ বিরোধী ছাঁচে ঢালাই হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের দুঃসাহসী কাজগুলোর অন্যতম হচ্ছে কলকাতার ব্ল্যাক হোল মনুমেন্ট ভেঙে ফেলা। ব্ল্যাক হোল হত্যাকাণ্ডে বাঙালির নিষ্ঠুর সংশ্লিষ্টতাকে প্রতীকায়িত করার জন্যে ব্রিটিশরা এই মনুমেন্ট তৈরি করেছিল, যদিও ওই হত্যাকাণ্ডে মৃতের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয় তা অতিকল্পিত। একইভাবে মুসলমান এবং হিন্দু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা অসাধারণ উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে অনুসরণ করেছিলেন। সুভাষ বসু সেনাবাহিনীর মতো সুশৃংখল সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া গোপন বিপ্লবী গ্রুপগুলোকেও তিনি সমর্থন দিতেন। এসব বিপ্লবী সংগঠনের কোনো কোনোটির

www.pathagar.com

সদস্য কৌমার্যব্রত অবলম্বন এবং আত্মোৎসর্গের মতো আধ্যাত্মিক শপথগ্রহণ করেছিল, আবার কোনো কোনো সংগঠন হিন্দুদের ধ্বংসের দেবী কালীর নামে শপথ নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিল। যেসব মুসলমান এ ধরনের কোনো শপথ নেয়নি এমনকি তারাও তাদের এসব উগ্রবাদী বাংলার স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ সতীর্থদের মধ্যে চেতনার আগুন আর আদর্শবাদীতা দেখে মুগ্ধ হতো। এই কাল পর্যায়েই এ ধরনের সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়, তরুণীদের হাতে ব্রিটিশ জেলা কর্মকর্তারা গুলীবিদ্ধ হয়, পুলিশ নিহত হয়। স্নায়ুবিক উত্তেজনা ও আবেগ এবং বিজয় ভাগাভাগি করে নিয়ে এসব হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রের কেউ কেউ পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট হয়েছে, কেউ গান্ধীর অনুসারী হয়েছে, কেউ হয়েছে সমাজতন্ত্রী। তবে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, ১৯০৫-এর মতো এ সময়েও হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতীয়– সকল বাঙালির জন্যে এক অভিন্ন নিয়তি প্রায় সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল।

শেষোক্ত এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিশেষ করে ১৯৩০-এর দশকে, যখন বাংলার বাইরে একমাত্র মহারাষ্ট্র ছাড়া ভারতের আর কোথাও আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়নি, তখন বাংলার হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন করেছে তেমনি গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বিরোধিতা করেছে। এর কারণ হয়তো নিজেদের নিয়তি সম্পর্কে একটা ধারণা বাঙালির অবচেতন মনে সবসময় বিরাজ করেছে। যাহোক, এই অন্তর্ভারতীয় লড়াইকে সবসময় ছোট করে দেখানো হয়েছে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইকে যখন শিরোনাম করা হয়েছে তখন ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে সমান্তরাল সংগ্রামকে করা হয়েছে উপশিরোনাম। সে সময়কার ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে মনে হয় এই ব্যাপারটিকে ইতিহাসে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তারচেয়ে বেশি গুরুত্ব এর প্রাপ্য।

সুভাষ বসু কংগ্রেস পার্টির প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই লড়াই প্রকাশ্যে গান্ধী-বসু লড়াইয়ের চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়। গান্ধী ছিলেন ধর্মপ্রাণ হিন্দু, আর বসু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী। বসু পার্টির প্রেসিডেন্ট হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি নিখাদ বাঙালি দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ ঘটান, যা দলের প্রধান নেতৃবৃন্দ ও পশ্চিম ভারতীয়দের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এতে কংগ্রেস পার্টির স্বর্গীয় শান্তি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। বসু ছিলেন বিপ্লবের সমর্থক। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন বা কংগ্রেস পার্টি অনুসৃত কালক্ষেপণের কৌশল অবলম্বনের ধৈর্য তাঁর ছিল না। সরাসরি যুদ্ধের ডাক দিয়ে তিনি আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে যুবকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে

www.pathagar.com

শুরু করেন এবং ছাত্রদের প্রতি চরমপন্থী তৎপরতা আরম্ভ করার আহ্বান জানান। এরপর বেশিদিন যাওয়ার আগেই বসু এবং গান্ধীর মতদ্বৈধতা এমন প্রকাশ্য হয়ে ওঠে যে, তা আড়াল করার আর উপায় থাকেনি। গান্ধী বসুর প্রতি দলীয় প্রধানের পদ ছেড়ে দেয়ার আহবান জানালেন। ১৯৩৭ সালে ক্রুদ্ধ বসু তাঁর হাতের সবগুলো তাস না খেলেই হাল ছেড়ে দিলেন। এর ফল হলো হিন্দু বসুর নেতৃত্বে প্রকৃত এক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। বসু হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাগ্মিতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেক মুসলমান বাঙালিকে আকর্ষণ করেছিল। এর অন্যতম কারণ তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে তাঁর আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কোনোরকম সাম্প্রদায়িক পটভূমির প্রসঙ্গমাত্র না টেনে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের শুধু বাঙালি পরিচিতি তুলে ধরার মূল মন্ত্রের কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তখন ব্যাপক অনুরণন তুলতে শুরু করেছিল। এর বহু বছর পরে অনেকেই, অন্তত জাতীয়তাবাদ ও জাতিক সচেতনতার দিক থেকে সুভাষ বসু ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। শেখ-এর বাকশাল আন্দোলনে যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ ছিল তাও বসুর চিন্তাধারার সঙ্গে শেখ-এর চিন্তাধারার সাযুজ্য প্রকাশ করে, যদিও মুজিব কাজ করেছেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পটভূমিতে। পাশাপাশি পাকিস্তানীদের প্রতি বাংলাদেশী হিন্দুদের ভীতির কারণে তাদের কাছেও মুজিব বীর হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন।

সুভাষ বসু সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। ধূমকেতুর মতো তাঁর আগমন, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তাঁর সরে দাঁড়ানো, ১৯৪০ সালে কলকাতা থেকে পালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যাওয়া এবং সেখান থেকে স্ট্যালিনের তৎকালীন মিত্র নাৎসী জার্মানীতে যাওয়া, সেখান থেকে সাবমেরিনে করে জাপান অভিমুখে দুঃসাহসিক যাত্রা; এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন এবং জাপান অধিকৃত ভারতীয় বার্মায় (১৯ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বার্মা ভারতের অংশ ছিল এবং দিল্লী থেকে শাসিত হতো) এই বাহিনীর সৈনিকদের নিয়ে জাপানীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করা– এসব ব্যাপারে অনেক কিছু জানা যায়। কিন্তু যে সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না, তা হচ্ছে এই সময়কার যুবমানস এবং যুবসমাজের প্রকৃত অনুভূতি কি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য অংশ জাপানী ও জার্মানদের প্রতি যে বিস্ময়কর মাত্রার সহানুভূতি বিরাজমান ছিল সে সম্পর্কে নিরোদ চৌধুরী যদিও কিছু কিছু বর্ণনা দিয়েছেন, তবে তা অপর্যাপ্ত। ফলে সুভাষ বসু ফ্যাসিস্ট ছিলেন, না কম্যুনিস্ট ছিলেন তা আজও স্পষ্ট নয়। কম্যুনিস্টদের সহায়তায় তাঁর সোভিয়েত ইউনিয়নে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ইঙ্গিত করে তিনি কম্যুনিস্ট ছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলে তিনি হয়তো বাংলার হোচিমিন

www.pathagar.com

হিসেবে আবির্ভূত হতেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন তিনি ফ্যাসিস্ট ছিলেন, যেহেতু তিনি জাপান ও জার্মানীতে বসবাস করেছেন। (যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে তা হচ্ছে বসু যখন পালান সে সময়টায় স্ট্যালিন-হিটলার চুক্তিবলে কম্যুনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন আর নাৎসী জার্মানী পরস্পরের মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৯৯০ সালে ভারতীয় পার্লামেন্ট সুভাষ বসু সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী এবং জাপানকে তাদের মহাফেজখানাসমূহ খুলে দেয়ার অনুরোধ করে।) যাহোক, এসব অস্পষ্টতা সত্ত্বেও যেটা স্পষ্ট তা হচ্ছে এই রহস্যময় মানুষটি কোনো ফ্যাসিস্ট পার্টি রেখে যাননি, ফলে যুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা যখন জাপানীদের সাহায্য করার অভিযোগে বসু প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর বিচার শুরু করে তখন বামপন্থীরা তাঁকে বীর হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। সত্য যা-ই হোক, বাংলাদেশের ইতিহাসে সুভাষ বসু একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, কারণ তিনি জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী ধারার আন্দোলনের এমন এক মডেল সৃষ্টি করেছিলেন, প্রায় ত্রিশ বছর পরে যার পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল। কলকাতায়, ঢাকায় নয়, বসু এখনো শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর নামে রাস্তা আছে, তরবারী হাতে তাঁর যোদ্ধাবেশী ভাস্কর্য আছে, দিল্লীর দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। তিনি যা-ই থেকে থাকুন না কেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুরুষ বাঙালি, ভবিষ্যৎ সংগ্রামের প্রতীক।

১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে যখন বাংলায় সুভাষ বসুকে নিয়ে বিতর্ক চলছে সে সময় ফজলুল হক গঠন করলেন কৃষক শ্রমিকের একটি দল। প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সঙ্গে জমিদারী সম্পর্কের সংস্কারের জন্যে এই দল আন্দোলন শুরু করে। ফজলুল হকের নির্বাচনী এলাকা ছিল মুসলমান অধ্যুষিত। হিন্দুদের প্রতি তাদের ছিল অবিশ্বাস। এই অর্থে ফজলুল হককে সাম্প্রদায়িক মনে হতে পারে; কিন্তু কখনোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। ধর্মীয় অনুভূতিকে উষ্কে দেননি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। তিনি আইনের মাধ্যমে জমিদার-প্রজা সম্পর্ক সংস্কারের অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ প্রচারক ও সংগঠক। তাছাড়া তিনি হিন্দুদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন, রাজনৈতিকভাবে যা তাঁর উপকারে এসেছিল। তিনি এমন সব সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন যেগুলো মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে সকল কৃষকের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দাশ এবং বসুর (দুজনই ছিলেন অস্থিমজ্জায় জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী; তাঁরা তাঁদের মুসলমান ভাইদের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতেন, এ যুগের অনেক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীই যা পারে না।) ভাবশিষ্য ফজলুল হক রাজনীতি করেছেন সর্ববঙ্গীয় ভিত্তিতে। ১৯৩৬ সালে তখনো বাংলাকে ভারতীয়

www.pathagar.com

পশ্চিমবঙ্গ এবং পাকিস্তানী পূর্ববঙ্গ হিসেবে বিভক্ত করার প্রসঙ্গ ওঠেনি, ফজলুল হক এবং আবুল হাশেম কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন নামে কৃষক শ্রমিকের এক মৈত্রীজোট গঠন করেন। এ জোট গঠনে সোহরাওয়ার্দীরও কিছু ভূমিকা ছিল। এ জোট বাংলায় আমূল সংস্কারের ডাক দেয়। এই আন্দোলন সারা বাংলায় দ্রুত জনসমর্থন লাভ করে এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়। মুসলমানেরা গরিষ্ঠ সংখ্যক আসন লাভ করে। এভাবে বাংলা ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাসম্পন্ন নির্বাচিত সরকারবিশিষ্ট একমাত্র প্রদেশে পরিণত হয়।

এই সন্ধিক্ষণে উগ্রপন্থী সর্বভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা– বাঙালিরা নয়– বিদ্রোহ করে। যদিও হিন্দুরা কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার হিসেবে ছিল এবং মুসলমান দলটি ছিল বামপন্থী এবং তারা জমিদার কৃষক ও মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংস্কার দাবী করেছিল, তথাপি বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতাসম্পন্ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ভীত হয়ে পড়ে। কারণ ইতিমধ্যে মুসলমানেরা সিভিল সার্ভিস এবং শিক্ষকতার ক্ষেত্রে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্যকে আক্রমণ করতে, সেই সাথে হিন্দু মহাজনদের নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইনপ্রণয়নের দাবি জানাতে শুরু করেছে। মুসলমানদের এই আকস্মিক ক্ষমতারোহণে ক্ষিপ্ত হয়ে হিন্দুরা কদর্যতম সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ফিরে যাওয়ার ডাক দেয়। হিন্দুদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি এবং মুসলমানদের শত্রুভাবাপন্ন করে তুলে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে তারা গো-হত্যা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে যা বাংলার বিভক্তিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তাছাড়া পাকিস্তানী যুগ শুরু হওয়ার আগে সারা ভারতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে তারও মূল কারণ নিহিত ছিল হিন্দুদের এই আন্দোলনের মধ্যে।

শান্তি ফিরিয়ে আনার মতো ব্যক্তিত্ব ও মেধাসম্পন্ন কোনো নেতা তখন ছিল না। যুক্তিবাদী সি. আর. দাশ তখন পরলোকে। আর সুভাষ বসু তখনো শ্রদ্ধেয় হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীর সঙ্গে মত-বিরোধ এবং কংগ্রেস পার্টি থেকে বাধ্যতামূলক পদত্যাগের কারণে তাঁর প্রভাব আগের মতো অপ্রতিরোধ্য ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, হিন্দু-মুসলমান সহযোগিতামূলক বাংলা চুক্তির অবসান হয়েছিল। এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছিল আগের চেয়ে বহুগুণ তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। গান্ধী ও নেহরু একসময় বাংলায় চরম হিন্দু জাতীয়তাবাদ উত্থানের বিরোধিতা করলেও, এ সময় দুজনের কেউই ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সংঘাত থামানোর ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামালেন না। তাঁরা বুঝতে পারেননি এই পরিস্থিতিতে তাঁদের কিছু করতে ব্যর্থ হওয়ার ব্যাপারটি একসময় এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে যা বাংলার বিভক্তিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।

www.pathagar.com

তখন অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস পার্টির মতো একটি অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগও অস্তিত্বশীল। এই দলটিও কংগ্রেসের মতো ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাইছিল, সেই সাথে চাইছিল একটি মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তান। পশ্চিম ভারতের অবাঙালি মুসলমান নেতাদের প্রাধান্যপূর্ণ এই দল সি. আর. দাশের বাংলার চুক্তির ভূমিকার কারণে কখনোই বাংলায় তেমন প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি, যদিও বাংলায় এই দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বাংলার লোক ছিল। তাঁরা প্রতিভাবান হলেও তাঁদের গণভিত্তি ছিল না। যতদিন বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পর মানিয়ে চলতে পেরেছে ততদিন মুসলিম লীগের পক্ষে বাংলায় ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু গো-হত্যা প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হওয়ামাত্র মুসলমান-হিন্দু উত্তেজনা শুরু হলো এবং দৃশ্যপট পাল্টে গেল আমূল।

পশ্চিম ভারতে তখন অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, আর পূর্ববাংলায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন হাসান ইস্পাহানী ও বগুড়ার মোহাম্মদ আলী। হিন্দুদের গো-হত্যা প্রতিরোধ আন্দোলনের বিপরীত ১৯৩৭ সালে বাংলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা ঘটে তা হচ্ছে মুসলিম লীগের উৎসাহে ফজলুল হক, আবুল হাশেম এবং সোহরাওয়ার্দী অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে ইন্ডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টি গঠন করে। এই নতুন বাঙালি দল ঈষৎ চরমপন্থী (কৃষক) প্রজা পার্টি ও আশরাফ বা উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। (কৃষক) প্রজা পার্টির ছিল গণভিত্তি আর আশরাফ শ্রেণীর ছিল সম্পদ এবং অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সঙ্গে বন্ধন। এভাবে হিন্দুদের বৈরিতার মুখে ফজলুল হকের দলের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বদলে গেল, হক এবং তাঁর অনুসারীরা অসম্পূর্ণত সাম্প্রদায়িক এক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। এই নতুন মুসলমান দলের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলাকে এক রাখার প্রায় সকল আশার পরিসমাপ্তি ঘটল। এর পরেও একাধিকবার বাংলা চুক্তি পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সবগুলো চেষ্টাই ছিল দুর্বল, ফলে সাফল্য ধরা দেয়নি।

স্বতন্ত্র মুসলিম পার্টি ছিল ঈষৎ চরমপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষতাভিত্তিক দল; এর লক্ষ্য ছিল আর্থ-সামাজিক এবং দলটি গড়ে উঠেছিল কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ভিত্তিতে। এই ব্যাপারটি বোঝা জরুরি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দল হক এবং হাশেমের চেষ্টায় সংগঠিত এবং বাংলায় মুসলমানদের ক্ষমতায় এনেছিল যে আন্দোলন সেই প্রজা আন্দোলনের (এর আগে এই আন্দোলনকে লেখক 'কৃষক-শ্রমিক' আন্দোলন নামে উল্লেখ করেছেন।– *অনুবাদক*) ধ্যানধারণা অনুসরণ করে গেছে, অতএব এটা বলা যায়, ১৯৩০-এর দশকের সেই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে হক ও হাশেম মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকলেও এবং আন্দোলনের কৌশল বদল করলেও তাঁদের

www.pathagar.com

লক্ষ্য বদল করেননি। যারা এঁদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল সেই জমিদার ও মহাজনদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। ফলে সাম্প্রদায়িক আবেগ তাঁদের সামগ্রিক লক্ষ্য অর্জনে অতিরিক্ত শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

সোহরাওয়ার্দী, হক এবং হাশেম অন্তর থেকে সাম্প্রদায়িক নন এই সত্যটিকে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ– বিশেষত পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেননি। আমরা দেখেছি, এই তিনজনই ছিলেন 'এই মাটির সন্তান', তিনজনই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ বুঝতেন এবং তিনজনই কংগ্রেস পার্টি এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী দলের কলকাতাস্থ হিন্দুদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বাংলার ইন্ডিপেনডেন্ট মুসলিম পার্টির এই নেতৃবৃন্দের বিপরীতে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের উচ্চশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ছিলেন প্রধানত বাংলায় বসতি স্থাপনকারী মোগল, আফগান বা ইরানীদের বংশধর। তাঁদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থানীয় জনগণের আবেগ অনুভূতির অনুগামী ছিল না। তাঁরা 'এ মাটির সন্তান' বা প্রকৃত বাঙালিও ছিলেন না। উপরন্তু তাঁদের শিক্ষা তাঁদেরকে ব্রাহ্মজগতের অংশে পরিণত করেছিল। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ধ্যানধারণা ছিল উদারনৈতিক, তাঁরা মদ্যপান করতেন এবং তাঁদের সামাজিক ওঠা-বসা ছিল কলকাতার উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে। আরো গুরুত্বপূর্ণ যেটা, অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিকাংশ নেতাই ইংল্যান্ডে অথবা ইংরেজপ্রেমী আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে সচেতনভাবেই ঢাকা বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে না গড়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই কারণটি, অন্যসব কারণের চেয়ে অধিক মাত্রায় বাঙালি জনসাধারণের থেকে তাঁদের পৃথক করে ফেলেছিল।

এখানে মনে রাখা দরকার, অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের আশরাফ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ এবং আন্দোলনের গণভিত্তিসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির এই দুই তলে অবস্থান এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই পরে পাকিস্তানের বিভক্তি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্যভাবে বললে, ১৯৪০-এর দশকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ১৯৫০-এর দশকে এসে দুই শ্রেণীকে দুটো পৃথক দলে নিয়ে গেছে।

স্বতন্ত্র মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক পথে যাত্রা শুরু করলেও এই দলের বিপুলসংখ্যক অনুসারীর অধিকাংশই হক এবং তাঁর সতীর্থদের উপস্থাপিত আর্থ-সামাজিক মূলনীতির প্রতি আস্থাশীল ছিল। অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বাংলাস্থ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হক, হাশেম, সোহরাওয়ার্দীর মতো বাঙালি নেতাদের এরকম অসম্ভাবনীয় রাজনৈতিক মিত্রতা সম্ভব হয়েছিল, তাদের দৃষ্টিতে, উগ্রবাদী হিন্দু শক্তিগুলোর দ্বারা মুসলমানদের উপর সেই অপ্রশমনীয় সংঘাত চাপিয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

ফলেই। ১৯৩৯ সাল নাগাদ মুসলিম লীগ তার বাঙালি মিত্রদেরসহ ঘোরতর হিন্দু বিরোধী হয়ে উঠল। ১৯৪০-এ লাহোরে মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় সম্মেলনে ফজলুল হকই পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, যাতে ব্রিটিশ ভারতের দুই অংশে দুটি পৃথক মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়; সেই সাথে এও বলা হয়, রাষ্ট্র দুটি এক থাকবে কেবল অনুপ্রেরণার দিক থেকে; কারণ প্রস্তাবিত দুই রাষ্ট্রেরই অধিবাসীরা হিন্দু প্রাধান্যপূর্ণ শাসনের এবং প্রথার বিরোধী। (শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত কারণে ১৯৪৭ সালে ভারতের দুই প্রান্তে দুটির বদলে দুই প্রান্তের দুটি শাখা নিয়ে একটি মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই ধারণা বাস্তবে রূপলাভ করেছিল। এরকম রাষ্ট্রের পরিণতি স্বাভাবিক কারণেই যা হওয়ার কথা তাই হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পরে কয়েক বছর যেতে না যেতেই দুই অংশের ভেতরকার মৌলিক দ্বন্দ্বগুলো প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে এবং পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। স্বাধীনতা অর্জনের আগে অবশ্য গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে তার শিকড় পুনরাবিষ্কার করতে হয়েছে, যেমনটা করেছিল ১৯০৫ সালে বাংলা বা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপে।)

১৯৪০ সালে ফিরে আসি। আমাদের মনে রাখতে হবে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার সরকার ছিল হকের মুসলিম পার্টির হাতে। পশ্চিম বাংলায় এই সরকারকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সক্রিয় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। সাধারণ মানুষ–অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এবং সংখ্যালঘু হিন্দু উভয়ের কাছেই মূল সংগ্রাম ছিল অস্তিত্ব রক্ষার, কেননা, তখনো তারা জমিদার ও মহাজনদের হাতে নিগৃহীত হয়ে চলেছে। তবে কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে দাঙ্গার ফলে যেভাবে হিন্দুদের সাথে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছিল তাতে ক্রমশ অধিকসংখ্যক মুসলমান চাইছিল ব্রিটিশরা বিদায় নিক। এই মুসলমানেরা মোটেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না, তবে তারা কিছু লেখাপড়া শিখেছিল, এমন সব স্কুলে যেখানে পাঠ্যবইগুলো হিন্দু-ঘেঁষা ছিল না। তারা ইংরেজিও শিখতে শুরু করেছিল। এই প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ শাসনাধীনে বিপুলসংখ্যক মুসলমান রাজনীতির মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল।

১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, জয়নুল আবেদীনের ছবিতে যা অসাধারণ চমৎকারিত্ব নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। শুরুতে হক-সোহরাওয়ার্দী এবং ব্রিটিশ সরকার ব্যাপারটির প্রতি পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেননি। ক্ষুধার বিশাল ব্যাপ্তি তাঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। পরে যখন তাঁরা দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সক্রিয় হলেন তখনো তাঁদের দেখা গেল প্রায় বিস্ময়কর রকম অপর্যাপ্ত। সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন। ব্রিটিশ ভারত তখন এশিয়ায় জাপানের সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে রত। জাপানীরা বাংলা সীমান্তের ওপারেই বার্মা দখল করে নিয়েছে। সেখানে বিপুলসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য

www.pathagar.com

যুদ্ধ করছে। দুষ্প্রাপ্য খাদ্য রপ্তানি করা হচ্ছে ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রয়াসের সহায়তার জন্যে। এই সময় আকস্মিকভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। গ্রামাঞ্চলে যে সামান্য খাদ্য ছিল তাও শহরে আনা গেল না। কারণ হাজার হাজার দেশী নৌকা তখন সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের আশংকায় আটক অথবা ধ্বংস করা হয়েছিল। বাঙালিদের কাছে যুদ্ধটাই হয়ে উঠেছিল এক অস্পষ্ট বিষয়। একমাত্র বেঁচে থাকার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাই ছিল মুখ্য। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ!

এই বিপর্যয়ের মধ্যে একটি মুসলমান পরিবার, ইস্পাহানীরা, যারা অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল, খাদ্য সরবরাহের কাজে কথিত 'আনাড়ীপনা'র কারণে ব্যাপকভাবে সুনাম ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। এরকম অভিযোগ শুধু ইস্পাহানীদের বিরুদ্ধেই ওঠেনি, অনেক হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধেও উঠেছিল। বাংলার তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীও খাদ্য সরবরাহ কেলেঙ্কারির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন বলে শোনা যায়। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ইস্পাহানীদের পক্ষে দাঁড়ান। বস্তুত সোহরাওয়ার্দী ইস্পাহানীদের পাকিস্তানমুখী স্বার্থের প্রতিনিধি ছিলেন। (অনেক বছর পরে এই দুর্ভিক্ষের সময়কার ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝির কারণে ইস্পাহানীদের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সম্পর্কচ্ছেদ হয়।) দুর্ভিক্ষ সোহরাওয়ার্দীর সুনাম ও ভাবমূর্তির ব্যাপক হানি ঘটায়। তিনিও দুর্নীতির মাধ্যমে লাভবান হয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে, যদিও রটনা যেমন ইঙ্গিত করে তিনি বা ইস্পাহানীরা ততটা দোষী ছিলেন কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। যাহোক, পাকিস্তান হওয়ার পর স্বতন্ত্র মুসলিম পার্টি ভেঙে যাওয়ার পেছনে এই দ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুর্ভিক্ষ বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতিরও বিরাট ক্ষতি করে। এটা যে শুধু হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধানকে প্রসারিত করে তা-ই নয়, 'বাংলা মায়ের সন্তান' বাঙালি নেতাদের সঙ্গে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের বীজও উপ্ত করে। অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিপুল সম্পদের এক কানাকড়িও বাংলার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ব্যয় না হওয়ায় তাদের পূর্বপুরুষীয় শিকড় যে অন্যখানে তা বাংলার নেতাদের মনে পড়ে যায়। দুর্ভিক্ষে প্রধানত যে দুটি জিনিসের ধ্বংস সাধিত হয় তা হচ্ছে মানুষের জীবন আর জীবনবোধ। এরকম দিন আনি দিন খাই অবস্থায় নিপতিত দরিদ্র জাতি যখন তার ভবিষ্যৎ পথ র্নিধারণ করে তখন তার সামান্যই হারাবার থাকে।

যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ উদ্যোগে ভারতে নতুন নির্বাচন হলো। আবার হক ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলমান দলগুলো, তখন পর্যন্ত, অবিভক্ত বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। সংখ্যালঘু হিন্দুরা নতুন করে এর প্রতিবাদ করল। অবশেষে

কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীতে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বাংলা অবিভক্তরূপে ভারতের মধ্যে থাকবে, না বিভক্ত হবে এ নিয়ে বাংলার আইনসভায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলো। স্বভাবতই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা স্থিতাবস্থা চাইল। কিন্তু হিন্দুদের সবাই বিভক্তির পক্ষে ভোট দেয়– ১৯০৫ সালে তাদের পিতৃপুরুষ, যার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাকেই তারা আহ্বান করে। এরপর অলঙ্ঘনীয় সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো : ধর্মীয় সীমারেখার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্ত হবে। বাংলায় মুসলমানেরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় দেশ-বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ মুসলিম-বাংলা হিসেবে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ হয়। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল হচ্ছে : বাঙালি জাতীয়তাবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার ভার চলে এল মুসলমানদের কাঁধে, ১৯০৫ সালে যে ভার বহন করেছে হিন্দুরা।

বাংলার বিভক্তির পর থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী এবং হক স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার জন্যে লড়াই অব্যাহত রাখেন। সোহরাওয়ার্দী সুভাষ বসুর ভাই শরৎ বসু এবং অন্য কয়েকজন হিন্দু নেতার সঙ্গে মিলে যে কোনোরকম একটা কাঠামোর মধ্যে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করেন। উপরন্তু সন্ত্রাস সহিংসতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি পরিস্থিতি শান্ত করার জন্যে গান্ধীর সঙ্গেও সহযোগিতা করেন। এর পাশাপাশি চালিয়ে যান আপস-রফার প্রয়াস। কিন্তু বাংলার হিন্দুপ্রধান কংগ্রেস পার্টি বাকি বাংলার চেয়ে দিল্লীর প্রতিই বেশি আনুগত্য অনুভব করল। ফলে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার সব আশা বিলুপ্ত হলো। শেষ পর্যন্ত হক এবং হাশেম নবসৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানে এসে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। সোহরাওয়ার্দীর জন্মস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গে। তিনি সেখানেই থেকে গেলেন। সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে গান্ধীর সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। সেই সাথে ভারতকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার উপায় খুঁজতে লাগলেন। ১৯৪৮ সালে গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সাহায্য করার আশায় পূর্ব পাকিস্তান চলে আসেন।

পাকিস্তানী যুগ: ১৯৪৭-৭১

ব্রিটেন কেন বাংলাকে বিভক্ত করেছিল, এটা বোঝা কষ্টকর না হলেও পূর্ববাংলা কেন মূল লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী দুটি মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে চাপ প্রয়োগের বদলে একটি রাষ্ট্রের অংশ হতে রাজী হলো তা বোঝা দুষ্কর। নিঃসন্দেহে এর একটি কারণ ধর্মীয় উদ্দীপনা। মোগল এবং ব্রিটিশ আমলে সিন্ধু অববাহিকা এবং গঙ্গা নদীর ভাটি এলাকা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী অংশ বলে গণ্য হতো। পাকিস্তান হওয়ার ফলে ১৯০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের

www.pathagar.com

মতো ভারতের মুসলমনেরা এই প্রাচুর্যময় দুই এলাকার উপর কর্তৃত্ব পায়। এই উদ্দীপনার পাশাপাশি সম্ভাব্য আরেকটি কারণ হতে পারে উভয় অংশেরই ভারত-ভীতি। পূর্ববাংলার মুসলমানদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার সংগত কারণ ছিল। ব্রিটিশরা বাঙালিদের সৈনিক হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়নি। কিন্তু তাদের শাসনামলের শেষদিকে তারা উত্তর-পশ্চিম ভারত অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্য থেকে লোক নিয়ে পুরো রেজিমেন্ট গঠন করেছিল। চব্বিশ বছর পরে যা ঘটেছিল তাকে বিবেচনায় নিলে ব্যাপারটাকে পরিহাসই মনে হবে যে, সে সময় পূর্ববঙ্গবাসীরা তাদের নিরাপত্তার জন্যে তাদের পশ্চিমা ভাইদের সাহায্য অপরিহার্য মনে করেছিল। অপর একটি কারণ, দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম মানুষকে এক ধরনের অবসাদগ্রস্ততা দান করেছিল; এর সঙ্গে ব্রিটিশের বিদায় নেয়া এবং ভারতব্যাপী ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার (যদিও দাঙ্গায় পূর্ববাংলার চেয়ে পশ্চিমবাংলাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বেশি) প্রেক্ষাপটে সর্বত্রই বিরাজ করছিল একটু হাঁপ ছাড়বার, নিজেদের অবস্থা ও অবস্থান অনুধাবন করবার আকুতি, বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা। ব্রিটিশ শাসনের শেষ মাসগুলোর সেই বিশৃংখলা-বিভ্রান্তির মধ্যে হকের দুটি মুসলিম রাষ্ট্রের দাবি উপেক্ষিত, অগ্রাহ্য অথবা বিস্মৃত হয়েছিল। তাছাড়া বাংলা তখনো দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। আরো গুরুত্বপূর্ণ যা তা হচ্ছে, বিভক্তির পর বাংলার পূর্ব অংশ, যা পরে পাকিস্তানের সাথে যোগ দিয়েছিল তা স্রেফ এক কৃষিভিত্তিক প্রদেশে পরিণত হয়, আর ভারতের সাথে যোগ দেয়া পশ্চিম অংশ পরিণত হয় শিল্পভিত্তিক প্রদেশে। বাংলা বিভক্তির অনেক ফলের মধ্যে এই ফলটি উভয়বঙ্গের জন্যেই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত পূর্ববঙ্গবাসীদের আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সম্ভবও ছিল না দীর্ঘস্থায়ী হওয়া। মুসলমান হলেও কোনো কোনো অর্থে পশ্চিমাঞ্চলীয় পাঞ্জাবীরা মুসলমান বাঙালিদের চেয়ে আলাদা। হিন্দু বাঙালিদের সঙ্গে মুসলমান বাঙালিদের যে পার্থক্য, এই পার্থক্য তারচেয়ে বেশি। পশ্চিম পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যীয় স্থলভাগের অংশ, যা অংশত মরুভূমি এবং নিশ্চিতভাবেই শুষ্ক অঞ্চল। ফলে সে অঞ্চলের মানুষদের আচার-আচরণও শুষ্ক কঠোর। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ শস্য শ্যামলা, নদীবিধৌত। এখানে ইসলাম লালিত হয়েছে নিরক্ষীয় সংস্কৃতির পরিবেশে। এখানকার মানুষ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্বভাবের, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং হয়তো আধুনিকতার ছোঁয়া-লাগা পশ্চিমাঞ্চলীয়দের চাইতে বেশি সহজ-সরল এবং বিশ্বাসযোগ্য। তাছাড়া পশ্চিমে যেখানে সামরিক বা সমর সম্বন্ধীয় গুণাবলী প্রশংসিত এবং চর্চিত হয় সেখানে পূর্বের মানুষরা নির্বিরোধী প্রকৃতির; এবং তাদের মধ্যে সামরিক গুণাবলীর চর্চা থাকলেও তা ব্রাহ্ম ধাঁচের– ব্লুম্সবারি রীতির, স্যান্ডহার্স্টীয় রীতির নয়।

যেসব ভুলের কারণে দুই শাখার মধ্যেকার সম্পর্কে অবনতির সূচনা হয় তাদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হচ্ছে পাকিস্তানের প্রধান গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা। মোগল সাম্রাজ্যে সৃষ্ট উর্দু ভাষা হিন্দি এবং ফার্সির সংমিশ্রণে গঠিত এবং মূলত ফৌজি ভাষা। জিন্নাহ ভেবেছিলেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করাটা অন্যায্য নয়, যেহেতু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের মানুষেরই ভাষা উর্দু নয় (স্থানীয় ভাষাগুলো হচ্ছে পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচ এবং পশতু)। শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় সাহিত্যিক বাংলাকে 'হিন্দু' ভাষা আখ্যা দিয়ে স্কুলপর্যায়ে উর্দু পড়ানোর দাবিতে গণআন্দোলন হয়েছিল এ কথাটিও হয়তো তাঁর মনে ছিল। তাই তিনি ঢাকায় এসে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আসলে জিন্নাহ বেশ কয়েকটি বিষয় বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রথমত, পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আলীগড় বা লন্ডনে শিক্ষিত, কলকাতার উচ্চ সমাজে মেলামেশাকারী এবং উর্দু, ফার্সী বা ইংরেজিভাষী আশরাফ শ্রেণীয় ছিল না। দ্বিতীয়ত, মধ্যবর্তী বছরগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষিত পূর্ববঙ্গবাসী আধুনিক বাংলা শিখেছিল এবং ১৯ শতকে দানা বেঁধে ওঠা হিন্দু সাহিত্য আন্দোলন এবং ব্রিটিশ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৮ সাল নাগাদ ১৯৩০ এবং '৪০-এর দশকে শিক্ষিত পূর্ববঙ্গবাসীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য, ডিরোজিও, সুভাষ বসু এবং এম.এন. রায়ের রাজনীতি এবং এমনকি কলকাতার ব্রিটিশ প্রভাবপূর্ণ বৌদ্ধিক জীবনের সঙ্গেও নৈকট্য অনুভব করতে শুরু করেছিল। অধিকন্তু হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে অধিকাংশ পূর্ববঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী কলকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়েছিলেন, আলীগড়ে নয়। ফলে তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। তাঁরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যিক আন্দোলনজাত জাতীয়তাবাদের হিন্দুত্বটুকু ছাড়া আর সবই আত্মস্থ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের, ব্রাহ্ম মতের এবং ব্রিটিশ ধাঁচের মানবতাবাদী চেতনা দ্বারাও তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, স্বাধীনতার প্রথম আনন্দোচ্ছাস থিতিয়ে আসতেই পূর্ববঙ্গবাসীরা রাজনৈতিকভাবে ভাত-কাপড়ের ইস্যুতে ফিরে আসে। হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের অধিকাংশই তখন কলকাতায় চলে গেছে অথবা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ বাঙালিদের শত্রু হিসেবে পরিগণিত এই শ্রেণীটির উপর বিজয় সম্পন্ন হয়েছে। এখন পূর্ববঙ্গবাসীদের চাই ভূমি সংস্কার, উন্নততর শর্তে ঋণ, ভালো মজুরি, আরো শিক্ষা, নগরায়ন এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার। এক কথায়, তারা আধুনিকতার জন্যে আকুল হয়ে উঠল। সেই সাথে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ফলে সৃষ্ট অবমাননাকর দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও ছিল।

কিন্তু জিন্নাহ এবং তার মতো মুসলিম লীগের শাসন দণ্ডধারী অন্য নেতারাও– যেমন চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী, বগুড়ার নওয়াব আলী, ঢাকার খাজা

www.pathagar.com

নাজিমুদ্দীন, হাসান ইস্পাহানী এবং আশরাফ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ স্রেফ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে, বাংলার স্বতন্ত্র মুসলিম লীগ আশরাফ শ্রেণীর নয়, কৃষক-শ্রমিকের এবং বাম-ঘেঁষা (মার্কসবাদী অর্থে নয়) রাজনীতিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগারদের মধ্যে একমাত্র ফজলুল কাদের চৌধুরী তাঁর নির্বাচনী এলাকায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিছু কাজ করেছিলেন, যার স্বীকৃতি এখনো মানুষ দেয়। বাকি মুসলিম লীগাররা সমাজের জন্যে বস্তুত কোনো অবদান রাখেননি।

হক-অনুসারীদের অধিকাংশই চাইছিল পরিবর্তন এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান। জিন্নাহ এসবের কিছুই বুঝতে পারেননি। সুতরাং যে মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করলেন উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সে মুহূর্তেই সেই শক্তির উদ্বোধন হলো, যা চব্বিশ বছর পরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে। বাঙালির মর্মমূলে লুকিয়ে থাকা উপজাতিক চেতনায় তার ভাষায় এক অদৃষ্টপূর্ব আবেদন রয়েছে। বাঙালির কাছে বাঙালি অনুভূতি উৎসরণের গভীরতম উৎস তার ভাষা। এই ভাষার উপর যখন আঘাত আসন্ন হয়ে উঠল তখন তা প্রতিরোধ করার মূলেই বাঙালির অন্তর্লালিত সামাজিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল স্রোতের মতো বেরিয়ে এল। এই আকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত আশরাফ শ্রেণী ও তখনো রয়ে যাওয়া হিন্দু জমিদারদের নিয়তি নির্ধারণ করে দেয়। সংক্ষেপে বললে, সুভাষ বসু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে শক্তিকে অর্গলমুক্ত করে দিয়েছিলেন তাই এখন পাকিস্তানের মোকাবিলা করতে সামনে এসে দাঁড়ালো।

১৯৫০ সালে জমিদারী স্বত্ব ও শাসন বিলুপ্ত করে এক আইন পাস করা হয়। যদিও এই আইনের জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং বলা হয়েছিল ১৯৫৬ সালের আগে আইনটি কার্যকর হবে না, তথাপি এই আইন কিছু পরিমাণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জন্ম দেয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে কৃষক বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে; যার কারণে অনেক হিন্দু জমিদার জমিদারী থেকে উৎখাত হয়। ফলে ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ সালে অনেক হিন্দু পূর্ববাংলা ছেড়ে ভারতে চলে যায়। (সেই সব পরিত্যক্ত জমিদারীর অবশেষ এখনো আছে। শত্রু-সম্পত্তি হিসেবে সেগুলো এখন বাংলাদেশ সরকারের কর্তৃত্বে রয়েছে।) এই আইন এবং হিন্দুদের দেশত্যাগ পাকিস্তান সরকারের উপর থেকে সাময়িক একটু চাপ কমালেও এর ফলে আরেকটি সমস্যা দেখা দিল। জমিদার বিরোধী আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং বাঙালি আশরাফ শ্রেণী উভয়কেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুললো। তারা অবশ্য একে বাঙালি জাতীয়তাবাদ হিসেবে অভিহিত করতো না, তারা একে বলতো চরমপন্থী এবং অথবা মার্কসবাদী তৎপরতা।

www.pathagar.com

উদীয়মান বাঙালি জাতীয়তাবাদের হুমকি মোকাবিলায় পশ্চিম পাকিস্তানী এবং তাদের বাঙালি আশরাফ মিত্ররা এবার এক মুসলমান সংখ্যালঘু শ্রেণীকে ব্যবহার করতে শুরু করল। ব্রিটিশরা যেমন হিন্দুদের ব্যবহার করেছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। বিহারী নামের এই শ্রেণীটি বর্ণভেদ সচেতন ভারত ছেড়ে চলে এসেছিল মুসলমানদের দেশ পূর্ব পাকিস্তানে। সংখ্যায় তারা অন্তত পাঁচ লাখ। অধিকাংশই শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং উর্দু, হিন্দী অথবা এ দুটির সাথে সম্পর্কিত কোনো ভাষায় কথা বলত। তারা বাংলাভাষী দেশের মানুষ ছিল না, তবে তাদের ছিল বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা এবং কাজের চাহিদা। জারের আমলে রাশিয়ায় কসাকরা যে ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব পাকিস্তানে এই বিহারীরা একই ভূমিকা পালন করে, হানা আরডেন্ট-এর ভাষায় তারা হয়ে উঠেছিল 'রাষ্ট্রের লোক' (স্টেট পিপল)। তারা ছিল পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুগত, মোটেই চরমপন্থী নয়। এবং স্থিতাবস্থার পক্ষে। সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিহারীরা ছিল এক মূল্যবান সম্পদ। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনসাধারণের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানী এবং বাঙালি আশরাফদের সঙ্গেই তাদের চিন্তা-চেতনার মিল ছিল বেশি। যে কারণে তারা অকথিতভাবে হলেও মর্যাদা পেয়েছিল বেশি। তাদের এই মর্যাদা এবং পাকিস্তানীদের প্রতি বিশ্বস্ততা, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সময়, তাদেরকে বাঙালিদের কাছে খুব প্রিয় করে তোলেনি। ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এমনকি আজও বিহারীরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অবহেলিত রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে বসবাস করছে। বাংলাদেশে তারা অবাঞ্ছিত, পাকিস্তানে মর্যাদাহীন। তাদের দুর্দশা উভয় দেশের জন্যেই সম্মানহানিকর– বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্যে, যেখানে অল্প কিছু বিহারীর অপরাধের দায় সকল বিহারীর কাঁধে চাপানো হয়েছে। সব শেষে যেটা বলতে হয়, এক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের বেশিদিন টিকে থাকা সম্ভব ছিল না, কারণ দেশটি কখনোই প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক ছিল না। এর পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সবসময়ই স্থানীয় স্বার্থ ও প্রয়োজনের ব্যাপারে ছিল উদাসীন।

এই বিষয়গুলো– সমাজ পরিবর্তনের জন্যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, জাতিক পরিচয়ের ক্ষুধা, পাকিস্তানী সরকারের প্রতি ক্ষোভ এবং বিহারীদের বিশেষ মর্যাদা পূর্ব পাকিস্তানের গণমনে অসন্তোষ ধূমায়িত করে তোলে। হাজার অধিক মাইল দূরে, ভারতের ওপাশে কেন্দ্রীয় সরকার এই অসন্তোষের গভীরতা বুঝতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। এর ফলাফল ছিল অবশ্যম্ভাবী– নতুন এক রাজনৈতিক আন্দোলনের অভ্যুদয়।

এই নতুন আন্দোলনের প্রণোদনা যে সোহরাওয়ার্দী এবং হকের কাছ থেকেই আসবে তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে! নতুন একটি রাজনৈতিক দল গড়লেন তাঁরা আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম দিয়ে। শিগগিরই তাঁরা দলের নাম থেকে মুসলিম

www.pathagar.com

শব্দটি বাদ দিলেন। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানে তখন রয়েছে বিরাট এক সংখ্যালঘু শ্রেণী– অস্থির, উদ্বেগাকুল হিন্দু সম্প্রদায়, সে সময়ে যারা ছিল মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও উপরে। সমাজ পরিবর্তন, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের আহ্বানকারী একটি ধর্মনিরপেক্ষ দলকে তারা হয়তো সমর্থন দেবে, এই চিন্তা থেকে এটা করা হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায়, ১৯৪৭-পরবর্তীকালে ভারতে গান্ধীর সাথে কাজ করার সময় সোহরাওয়ার্দী অনেক কিছু শিখেছিলেন। নেহরুর কংগ্রেস পার্টির আদলে গঠিত এই নতুন দল, আওয়ামী লীগ, মুসলমান, হিন্দু, কৃষক-শ্রমিক (তাদের মধ্যে ১৯২০-এর দশকে ভারতে আসা এবং সারা উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়া মার্কসবাদী প্রচারকরাও ছিল) নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয়। এবং এমনকি কিছু বিত্তশালী পুরাতন জমিদার পরিবারকে (যারা একসময় কংগ্রেস পার্টির ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সমর্থক ছিলেন এবং ১৯০৫-'১২ সময়কালে হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছিলেন) তাদেরও আওয়ামী লীগ দলে টানতে পেরেছিল। উপরন্তু দেশ বিভাগের পরে ঢাকায় চলে আসা কলকাতায় শিক্ষিত বেশ কিছু আইনজীবী এবং অধ্যাপকের ওপর সোহরাওয়ার্দী নির্ভর করতে পেরেছিলেন। এঁরা ছিলেন ইংল্যান্ডের শ্রমিকদল অনুসৃত সামাজিক গণতন্ত্র (সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি) এবং পশ্চিমা উদারনৈতিকতাবাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। সর্বোপরি তিনি ব্রাহ্ম মানসের উদ্বোধন ঘটাতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কবিতা যার পরিপোষণ করেছিল, ঢাকা এবং কলকাতার উচ্চশ্রেণীর চিন্তা-ভাবনা যার অনুগামী ছিল। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বৃহত্তর কোয়ালিশনে রূপান্তরিত এই দল পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আর যেহেতু পার্লামেন্টের অধিকাংশ আসন ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সেহেতু সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন।

সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয়। এত কম সময়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব ছিল না। রাজনীতিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে অনিচ্ছুক পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তখন সামরিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা সোহরাওয়ার্দীকে সরে যেতে বাধ্য করে এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে। মোহাম্মদ আলী ছিলেন আশরাফ শ্রেণীর মুসলিম লীগার এবং এমনকি পূর্ব পাকিস্তানেও তাঁর কোনো জনসমর্থন ছিল না। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে। এর অল্পদিন পরেই সোহরাওয়ার্দীকে কারারুদ্ধ এবং পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক তৎপরতার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতা থেকে হটানো এবং কারারুদ্ধ করার ব্যাপারটি পাকিস্তানী ব্যবস্থার প্রতি বাঙালিদের আস্থায় ধস

www.pathagar.com

নামায়। এর ফলে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও পারস্পরিক অপছন্দের জন্ম হয় তা পরে আর কখনোই নিরসন করা সম্ভব হয়নি। সোহরাওয়ার্দীর দল ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী, সমাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক আওয়ামী লীগ, ১৯৩০-এর দশকের কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের উত্তরাধিকারী আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র গ্রহণীয় দল হয়ে উঠল। অবস্থা এমন হয়ে উঠেছিল যে, ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকেই এক ক্যাথলিক ধর্মযাজক যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর ভাইকে লিখেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ১৯৭০ সাল নাগাদ পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে।

১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে সোহরাওয়ার্দী এবং ফজলুল হকের মৃত্যুতে অবসান হলো একটি প্রজন্মের, যে প্রজন্ম দেশকে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হওয়ার পথে পরিচালিত করেছিল। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের ভাঙ্গন ঠেকানোর জন্যে চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়াসেরও সমাপ্তি ঘটে। ইতোমধ্যে কলকাতা এবং ঢাকায় শিক্ষিত, রাজনৈতিকভাবে চরমপন্থী থেকে সমাজতান্ত্রিকে পরিণত হওয়া এবং জঙ্গীভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এক নতুন প্রজন্মের নেতৃবৃন্দের অভ্যুদয় ঘটতে শুরু করেছে। এই নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট ইউনিয়ন বা উর্ধ্বপক্ষে চীনের সাথে অথবা নিম্নপক্ষে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধিকতর জঙ্গীবাদী সমাজতন্ত্রের মধ্যে নিজেদের শনাক্ত করতে শুরু করল। এর পাশাপাশি তারা গভীর যোগাযোগ গড়ে তোলে ভারতের সাথে বিশেষ করে নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক ভারতের সাথে।

পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকালে যে প্রজন্মটি বড় হয়ে উঠেছিল হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের– সারা বাংলায় তাদের ছিল গভীর যোগাযোগ। এই লোকগুলো বেড়ে উঠেছিল সুভাষ বসুর আদর্শে, উজ্জীবীত ছিল এম.এন. রায় এবং অনুশীলন ও যুগান্তরের মতো গোপন সংগঠনের আদর্শবাদিতার দ্বারা এবং প্রভাবিত ছিল ১৯৩০-এর দশকের সন্ত্রাসবাদ এবং ভারত ছাড় আন্দোলন ও যুদ্ধকালীন জাপানপন্থী অনুভূতির দ্বারা। সবচেয়ে বড় যেটা, তারা ভাষার প্রশ্নটিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য করার একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ভাষার প্রশ্নটি পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমান উভয়ের কাছে এমন একটি বিষয় ছিল যা তাদের মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে এক ধরনের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখার বোধ তৈরি করেছিল। বাঙালির মধ্যে এই বোধটি এখনো ক্রিয়াশীল। কোনো ভাষা আন্দোলনই দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে আন্তর্জাতিক নয়, হতে পারে না এবং ছিলও না। দুটো সহ-অবস্থান স্রেফ অসম্ভব। বাঙালির ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য।

www.pathagar.com

এই প্রজন্ম থেকে দুজন বড় নেতা বেরিয়ে আসেন : শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানী। প্রশ্নাতীতভাবেই রাজনীতিক এবং সংগঠক হিসেবে মুজিবের স্থান দুজনের মধ্যে উপরে। তবে ভাসানীর অবদানও অনস্বীকার্য। তিনি আন্দোলনে সঞ্চার করেছিলেন এক সান্দ্র, আমূল সংস্কারকামী জাতীয়তাবাদ, যা না হলে আন্দোলন নিষ্ফলা হতে পারত। ভাসানী তাঁর সহজ-সরল, অনেকটা গান্ধীর আচরিত রীতিতে তৃণমূল পর্যায়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শ্রেণী ও পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের শক্তি যুগিয়ে গেছেন। উপরন্তু ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে সোভিয়েতপন্থী ও চীনপন্থী উপদল থাকলেও তিনি কখনোই বিস্মৃত হননি যে তিনি বাংলা এবং 'পূর্বদেশ'-এর প্রতিনিধিত্ব করেন, কোনো বিদেশী শক্তির নয়। তিনি প্রথম সারির দুটি সংবাদপত্র 'ইত্তেফাক' এবং 'সংবাদ' প্রতিষ্ঠায়ও সহায়তা করেন। সংবাদপত্র দুটি এখনো গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। গান্ধীর মতো ব্যাপক ভ্রমণের দ্বারা ভাসানী সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাকে কোনোভাবেই গৌণ করে দেখা সম্ভব নয়। জনৈক পর্যবেক্ষক, এক ব্রিটিশ কূটনীতিক, ভাসানীকে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের গড়ে-ওঠা একমাত্র প্রকৃত রজনৈতিক নেতা হিসেবে।

তার পরেও, সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু থেকে তাঁর নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গণজাগরণের যুগের প্রধান পুরুষ নিঃসন্দেহে শেখ মুজিব। হক, সোহরাওয়ার্দী ও হাশেমের উত্তরসূরী শেখ মুজিব। হকের কাছ থেকে শেখ মুজিব শুধু যে দলীয় সংগঠক এবং যোগাযোগের সূত্র লাভ করেছিলেন তা নয়, ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাব, যাতে দুটি মুসলমান রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল তার স্মৃতিও পেয়েছিলেন। আর সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে মুজিব পেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বোধ। এগুলোর সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের অনুভূতি, যা তাঁর জাতীয়তাবাদে প্রায় মার্কসবাদী এক ছোপ দিয়েছিল। আর তাঁর নিজের অতীত থেকে তিনি পেয়েছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ডের স্মৃতি, যার মধ্যে ছিল কারাবাসের মতো ঘটনা; আর ছিল কলকাতাস্থ বন্ধুদের সঙ্গে একরাশ যোগাযোগ। মুজিবের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে কখনো কখনো মনে হবে, তিনি যতটা না বাংলাদেশী জাতীয়তাবাধী ছিলেন তারচেয়ে বেশি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী। মুজিব, যাকে বলা যায় প্রচণ্ড রকমের বুদ্ধিজীবী, তা ছিলেন না। তাই মনে হয় তাঁর জাতীয়তাবাদ বিষয়ক বোধ ছিল আবেগাশ্রিত ও অসচেতন। তাই শেষ পর্যন্ত শুধু মুসলিম বাংলাকে বোঝাতে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ কথাটা এসেছে। বস্তুত শেখ মুজিব এমন এক জাতীয়তাবাদী,

www.pathagar.com

সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন যার উৎস সন্ধানে গেলে সুভাষ বসুর কাছে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। তিনি বাংলার মুসলিম লীগের আশরাফ শ্রেণীয়দের অপছন্দ করতেন। এবং একমাত্র সেই আশরাফদেরই আস্থায় নিতেন যারা ব্রাহ্ম দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী এবং যাদের কলকাতার শিল্পবোদ্ধাদের মতো বিদ্যাভিমান ও আত্মাভিমান ছিল। এক কথায়, ইংরেজ ধ্যানধারণার অনুগামী বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে ঘিরেই ছিল।

এসব সত্ত্বেও শুরু থেকেই ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মুজিব স্বাধীনতার সপক্ষে কাজ করে গেছেন। তিনি বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। তিনি কখনোই ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন না, যেমন করতেন সোহরাওয়ার্দী; যদিও প্রথমদিকে মনে হয়েছে তিনি বোধহয় ঐক্যবদ্ধ বাংলার পক্ষে। তাঁর বিশ্বাস যাই হয়ে থাকুক না কেন, তাঁর ব্যক্তিত্বই তাঁকে তাঁর যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। তিনি এক মৌলিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। রাজনীতিতে ছিলেন ধুমকেতুর মতো। তাঁকে খুব যে বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বা ভালো রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে গণ্য করা যাবে তা নয়। সত্য বলে মনে হয় বরং বিপরীতটাই নাগালের মধ্যে যখনই প্রাণবন্ত এবং আবেগনির্ভর রাজনীতির সুযোগ এসেছে তিনি তা গ্রহণ করেছেন, তবে কখনোই বক্তৃতাসর্বস্ব রাজনীতির চৌহদ্দিতে পা রাখেননি। তিনি মুখের কথার মানুষ ছিলেন, লিখিত কথার নন; মানুষের নাম ও চেহারা মনে রাখার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। আর তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য চয়ন ছিল এমন যা পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণী ও মহাজন– যাদের অনেকেই ছিল হিন্দু– তাদের মধ্যে ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করত। বস্তুত তিনি ছিলেন এক স্বজ্ঞাত শক্তি, যাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ মানসের গভীরতম প্রদেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বাধীনতার জন্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা যতটা তার বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে ঠিক ততটাই বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর জনগণের ভেতর থেকে। তিনি ছিলেন এক নৌকা, যাতে চেপে জনগণের আকাঙ্ক্ষা বয়ে যেতে পারত।

মুজিব রাজনীতির ভিতর দিকটা বুঝতেন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের বাছ-বিচার করতেন না; যা দিয়ে কাজ হতো তাই তিনি ব্যবহার করতেন। তিনি পূর্ববাংলার প্রায় দুর্বৃত্ত এবং অপরাধজগতের বাসিন্দাদের তাঁকে সাহায্য করতে বাধ্য করেছেন, প্রয়োজনে তাদের ব্ল্যাকমেল করেছেন। তাছাড়া জমিদারী প্রথা উঠে যাওয়ার পর যত গোমস্তা এবং লাঠিয়াল ছিল তারা সবাই যেন সরকার বিরোধী দল আওয়ামী লীগের কর্মী হয়ে ওঠে। শেখ এবং তাঁর সতীর্থরা এই গোমস্তাদের যখন যে কাজের প্রয়োজন : সাধারণ ধর্মঘট ডাকা, শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করা, সমালোচকদের মুখ বন্ধ করা ইত্যাদিতে ব্যবহার করেছেন। এভাবে স্বাধীনতা

www.pathagar.com

আন্দোলনে শক্তি ও নির্দয়তার এক বোধ সঞ্চারিত করার মাধ্যমে মুজিব সন্দেহজনক সামাজিক মূল্যবোধঅলা রুচিহীন অথচ জাঁকজমকপূর্ণ এক নতুন শ্রেণীকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। এই শ্রেণীটি এখনো বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির অন্ধকার দিকটিতে সক্রিয় রয়েছে। শেখের বিরুদ্ধে এই কথাগুলো বলা গেলেও তাঁর পক্ষে বিরাজ করছে যে সত্যটি তা হচ্ছে, রাজনীতিতে এই মাফিয়া শক্তির ব্যবহারের ব্যাপারটি তাঁর চরিত্রের কোনো শঠতাপূর্ণ দিক থেকে বেরিয়ে আসেনি, বরং উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর সরল এবং একনিষ্ঠ অনুরক্তির কারণেই এটা হয়েছে। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি এই শক্তিটি একদিন তাঁর স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দেবে।

সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে কেবল মুজিবই আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ হাতে পান এবং শুরু থেকেই দলে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। এই মাত্রা হচ্ছে সুতীক্ষ্ণ এক জাতীয়তাবাদী স্বর, যা আবহমানকাল ধরে বাঙালি সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রোথিত। ১৯০৫ সালে হিন্দু নেতৃত্বে যে বাঙালি পুনর্জাগরণের আন্দোলন হয়েছিল তার ভিত্তিভূমিতে ছিল হিন্দু-মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বী চেতনার অবসান এবং বাঙালি সংস্কৃতির প্রাক-আর্য শিকড় অনুসন্ধানের আকুতি। মুজিব যে আন্দোলন শুরু করেন তা ১৯০৫ সালের এই আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন। মুজিবের আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যকার পার্থক্য যেমন স্পষ্ট হয়েছে তেমনি স্পষ্ট হয়েছে মুসলমান এবং হিন্দু বাঙালিদের ভেতরকার সাদৃশ্য। সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি নয়, অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার প্রতি জোর দিয়ে তিনি বাংলার প্রশস্তি গান করেন, একসময় যেমন করা হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি কণ্ঠে তুলে নিয়ে। তবে পার্থক্য এখানেই যে, মুজিবের বাংলা প্রশস্তিতে হিন্দু দেবীদের উল্লেখ আসেনি, এসেছে রবীন্দ্র কল্পনার সোনার বাংলা বা নজরুলীয় কল্পনার উন্নততর বাংলার ধারণা। বাঙালি জাতির ভাষা, ভূমি এবং রক্তের মধ্যেই এই কল্পনা তথা আকাঙ্ক্ষা শিকড় গেড়ে আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বহু আগেই মুজিব পূর্ববাংলাবাসীদের মনে সাফল্যের সঙ্গে এই বোধ সঞ্চারিত করেন যে, তারা পাকিস্তানী আগ্রাসন ও অবিচারের নির্দয় শিকার। এর ফলে আন্দোলনরত বাঙালিরা সবসময় এক ধরনের নৈতিক স্বস্তিতে থেকেছে যে, তারা নির্দোষ এবং যা করেছে তা ন্যায্য।

লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, মুজিব নেতা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার আগেই ভাষাবিষয়ক বিতর্কের অবসান ঘটেছে। কারণ পাকিস্তান বাংলাকে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই অবস্থায় ভাষা ইস্যুতে পূর্ব পাকিস্তানীদের মনে নতুন করে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। অতএব মুজিব নতুন ইস্যু বেছে নিলেন। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সম্পদের পার্থক্য তখন খালি চোখেই দৃষ্টিগোচর হতো। এই বিষয়টিকে মুজিব আন্দোলনের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। হিন্দুদের জমিদারী জাতীয়করণ করা হয়েছিল যে রাজনীতির কারণে সেই

www.pathagar.com

ঈর্ষার রাজনীতির পিছনে যে মূল ইস্যু ছিল তার সঙ্গে মুজিবের বেছে নেয়া এই নতুন ইস্যুর বেশ সাদৃশ্য ছিল।

আরেকটি বিষয় মুজিব উস্কে দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে সামরিক ও যুদ্ধপ্রিয় পাকিস্তানী পাঞ্জাবীদের চেয়ে বাঙালি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের বোধ। এটা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি কবিদের কবিতা দিয়ে পাকিস্তানের মহান কবি ও স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবালের কবিতাকে প্রতিস্থাপিত করছেন। অকৃত্রিম বাঙালি মনের সূক্ষ্ম ও শৈল্পিক গুণাবলী এবং সেই মনের নৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কবিতার ভূমিকা কি তা মুজিব বুঝেছিলেন। বহুদিন আগে সক্রেটিস যেমনটা বুঝেছিলেন : কবিরা বাগাড়ম্বরে জনমন প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন, আর রাজনীতিবিদরা আবেগের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিকেও প্রাধান্য দেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, একদিকে মুজিব একত্ববাদী ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছেন, তাঁর মানবতাবাদী ধর্মকে ইকবালের মুসলিম মানবতাবাদের সমান্তরালে স্থান করছেন; অন্যদিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন, পাকিস্তান বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠন, রক্তের ঐক্য গঠন এবং ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করার জন্যে তিনি ব্যবহার করছেন কাজী নজরুলের উদ্দীপনাময় গান ও কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন (এবং এখনো আছেন) ইকবালের সমকক্ষ একমাত্র বাঙালি কবি। তারচেয়ে বড় যেটা, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার সন্তান, ফলে ইকবালের চাইতে অনেক বেশি প্রিয়। আর নজরুল ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন সাবেক সার্জেন্ট, ধ্যানধারণায় অসাম্প্রদায়িক এবং জাতীয়তাবাদী। মুজিবের এই কবিতা-কৌশল এত ফলপ্রসূ হয়েছিল যে, এক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথের গান ও সাহিত্য গাওয়া ও পাঠ করাকে দেশদ্রোহিতা আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯০৫-১২ সালে ব্রিটিশরা যেমন করেছিল বন্দে মাতরম্ নিষিদ্ধ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এটাই মুজিব চেয়েছিলেন। অন্যদিকে উদ্দীপনাময় গান ও কবিতার কারণে বিদ্রোহের পূর্বক্ষণে নজরুল হয়ে উঠেছিলেন আওয়ামী লীগের কর্মীবাহিনীর কাব্যিক কণ্ঠস্বর।

এই কবিদের লড়াইয়ের ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করতে গেলে যে আশ্চর্যজনক সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে, এই কবিরা সবাই ব্রিটিশ প্রভাবিত হয়েও তাঁদের জনগণের অনুভূতির একেবারে মর্মমূলে অভিঘাত সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন।

সূক্ষ্ম ও শৈল্পিক গুণাবলীসমৃদ্ধ কৃত্রিমতাহীন গ্রামীণ সমাজে কবি এবং কবিতা রাজনৈতিক অসন্তোষ সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। এর কারণ কবিতা সেই মানুষদেরই প্রভাবিত করে যারা শুনতে জানে; গ্রামে চুলার আগুনের পাশে জড় হয়ে বা মেলায় আয়োজিত আসরে দীর্ঘ কবিতার মনোজ্ঞ আবৃত্তি বা

www.pathagar.com

অভিনয় শুনে বা দেখে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা অন্য এক দুনিয়ায় রেডিও-টেলিভিশন শোনা ও দেখার প্রতিক্রিয়ার কাছাকাছি। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ– এই তিনেরই স্বাধীনতা সংগ্রামকালে দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষের নাগালের মধ্যে কোনো সংবাদ মাধ্যম ছিল না। তার বদলে ছিল গ্রাম্য চারণ কবিরা। তাঁরা নিজেদের অথবা/এবং অন্যদের কবিতা আবৃত্তি এবং অভিনয় করে গ্রামের মানুষদের মনে ও হৃদয়ে পরিবর্তনের জন্যে প্রচণ্ড আকুতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কবিতা বাংলাদেশের অধিকতর শিক্ষিত শ্রেণীকেও বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। এবার তাহলে 'কবিদের লড়াই'-এর ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যাক।

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র আরো বেশি রাজনীতিপূর্ণ হয়ে পড়বে এই আশঙ্কা থেকে অনেকে এই লড়াইয়ের ব্যাপারটির ওপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চান না। কিন্তু ঝুঁকিটা নেয়া খুব ক্ষতিকর হবে বলে মনে হয় না; কারণ পাকিস্তান, পশ্চিমবঙ্গ, হিন্দু প্রাধান্যপূর্ণ বাংলা এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক ইতিহাসে তিনজন কবির প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই তিনজন বিপুলসংখ্যক জনগণকে ভাষা, দৃক্‌শক্তি ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তিন কবির রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগেই কিছুটা আলোচনা করেছি, এবার দেখা যাক আল্লামা ইকবাল ও কাজী নজরুল ইসলামকে।

ইকবাল সৃষ্টি করেন পাকিস্তান শব্দটি, যার অর্থ 'পবিত্র ভূমি'। সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু– এই তিন প্রদেশের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে শব্দটি গঠিত। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহর বন্ধু ইকবাল হচ্ছেন প্রথম বুদ্ধিজীবী যিনি ভারত ভেঙে মুসলমানদের জন্যে পৃথক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি যদি নিছক একজন বুদ্ধিজীবী হতেন তাহলে হয়তো এতটা কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন কেমব্রিজে শিক্ষিত কবি। তাঁর রচনা এমন অসাধারণ উজ্জ্বলতাসম্পন্ন যে, যে ভাষায় তিনি লিখেছেন সেই ফার্সি ও উর্দুতে পাঠ করে তা যেমন উপভোগ করা যায়, ঠিক তেমনি উপভোগ করা যায় অনুবাদ পড়েও, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের রচনায় যেমনটা যায় না। ইকবালের কবিতা দৃঢ় প্রত্যয় সঞ্চারক এবং মানবতাবাদী; হিন্দু এবং মুসলমানের আবাসভূমি সমগ্র ভারতের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। ইসলামের প্রেরণাশক্তি সম্পর্কে সচেতন সেই সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরোধী ইকবাল এক ধীমান বিশ্বদর্শনের ছবি আঁকেন, সমমর্মিতা ও সুবুদ্ধি-সুবিবেচনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠে সৃষ্টি করেন এক 'ব্রাহ্ম সংবেদনশীলতা'। উপমহাদেশের সেরা বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেন ইকবাল। এই বিচারে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য প্রতিপক্ষ বলা যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইকবালের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পরিতাপের বিষয়, ইকবাল ১৯৩০-এর

দশকের শেষভাগে মৃত্যুবরণ করেন। এই মৃত্যুতে বিশ্ব শুধু যে একজন মুসলমান বুদ্ধিজীবীকেই হারায় তা নয়, বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো সাম্প্রদায়িক ভেদ অতিক্রম করে হিন্দু-মুসলমানের অবিশ্বাস নিরসনে গান্ধী, নেহরু ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করতে পারতেন।

ইকবাল গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন; কারণ পাকিস্তানী সরকার, পূর্ববাংলার আশরাফ শ্রেণী এবং মোহাজির বিহারীদের পক্ষে কথা বলার অসাধারণ সামর্থ্য ছিল তাঁর কবিতার। ফার্সি এবং উর্দুতে ইকবাল পাঠ করে এই শ্রেণীসমূহের মানুষেরা তাঁর প্রতি ভক্তিতে অবনত হতো। এসব মানুষ, যারা আত্মমর্যাদা ও জ্ঞানের আলোকে চিন্তা করত– তারা ধনী বা দরিদ্র, শহুরে বা গ্রামীণ, যে পটভূমি থেকেই এসে থাকুক না কেন– তাদের মনে ইকবালের কবিতা প্রচণ্ড আবেদন সৃষ্টি করত। ১৯৫০ এবং '৬০-এর দশকে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করা তাদের সকল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অংশ ছিল। দেশ-বিভাগ আন্দোলনের সময় তাঁর কবিতার ছিল অসাধারণ প্রভাব। তবে পূর্ববাংলায় তাঁর রচনার অনুবাদ হলেও এবং তা স্কুলে শিক্ষা দেয়া হলেও তা কখনোই কোনো অনুরণন সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ সেখানে কবিতার আঙিনা গড়ে উঠেছিল অন্যভাবে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ এবং লালন শাহর অধিকতর রোমান্টিক ও নম্র-শান্ত পদ অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

তার পরেও যদি পরিস্থিতি তৈরি হতো তাহলে পাকিস্তান ও ভারতের, মুসলমান ও হিন্দুর প্রধান দুই কবি ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের পরস্পরকে বলার এবং পরস্পরের কাছ থেকে জানার অনেক কিছু ছিল, বহু শতাব্দী আগে যেমন জানার ও বলার ছিল আল-বেরুনী ও তাঁর হিন্দু পণ্ডিত বন্ধুদের। ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল বিরাট পার্থক্য। ইকবালের মানস গঠিত হয়েছিল দেশে এবং ইংল্যান্ডে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের মাধ্যমে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ খুব কমই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেন। তিনি ছিলেন সৃজনী ক্ষমতাসম্পন্ন, স্ববিকাশিত, শিল্পানুরাগী। ইকবাল ছিলেন এম. ট্যাগার্ট এবং কেমব্রিজের সেরা শিক্ষকদের ছাত্র, আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হাইডেলবার্গের জার্মান মনীষীদের দ্বারা প্রভাবিত, যা তাঁর রচনায় নিরেট পাণ্ডিত্যই শুধু আনেনি, গভীরতাও এনেছে। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেখানে পূর্ববাংলা প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সংবেদনশীলতার আবেদন সৃষ্টি করে সেখানে ইকবাল আমূল পরিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র এবং পশ্চিমা বস্তুবাদ উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে অনেক বেশি সনাতন আবেদন সৃষ্টি করেছেন। সবশেষে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে অনেক দিক থেকে শেলীর সঙ্গে তুলনীয় সেখানে ইকবালের সাদৃশ্য পাওয়া যায় দান্তের সঙ্গে।

এসব পার্থক্য সত্ত্বেও ইতিহাসের গতিধারা বদলে দেবার সামর্থ্য দুজনেরই ছিল সমান। কারণ লাখ লাখ না হলেও হাজার হাজার মানুষ অন্তর থেকে তাঁদের

www.pathagar.com

কবিতাকে জানত। জনৈক ব্রিটিশ লেখকের মতে, ১৯৩০-এর দশকে বাংলার পল্লী অঞ্চলে এমন কোনো গ্রাম পাওয়া যেত না যেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান শোনা যেত না। একইভাবে, ১৯৭০-এর দশকের মতো সাম্প্রতিককালেও এই লেখক লাহোরের কাছে এক গ্রামে এসে দেখতে পান গ্রামবাসীরা ইকবালের জাভেদনামার পাঠ বিমোহিত হয়ে শুনছে। এই দেশগুলোর সাংস্কৃতিক গঠন এখনো বহুলাংশে কণ্ঠ ও শ্রুতিনির্ভর, লিপিনির্ভর নয়। তার পরেও কবিরা যে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেন এর প্রধান কারণ তাঁদের শ্রোতাদের মনে সংবেদনশীল কল্পনাশক্তির উপস্থিতি।

নজরুল প্রসঙ্গে বলা যায়, তিনি ছিলেন অন্য দুজনের চেয়ে বয়সে অনেক নবীন। রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের জন্ম যেখানে, যথাক্রমে, ১৮৬১ ও ১৮৭৭ সালে, সেখানে নজরুল জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ সালে এবং মারা যান ১৯৭৬ সালে। এটা বলা অসংগত হবে না যে, নজরুল এমনকি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় সেই সব বাংলাদেশীর মধ্যে, যারা দেশ বিভাগের আগে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, যেমনটা হয়েছে মুজিব এবং সোহরাওয়ার্দীর ক্ষেত্রে। অন্যদিকে নজরুল বাংলাদেশীদের মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন দেশ বিভাগের পর, যখন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন সবে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এ কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তরুণ নেতাদের কাছে তিনি জাতীয় কবির মর্যাদা পেয়ে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠবার আহ্বান সংবলিত কবিতাগুলো বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের রাজনীতির সচেতন হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছে অবশ্যই, তবে তার ক্ষতিকর দিকটিও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক গোলযোগ ছাত্রদের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতাই এর প্রধান কারণ।

এবার আমরা তাকাব সেই রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে যেগুলো এই তিন মহান কবির চলার পথকে প্রভাবিত করেছে। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গ নিয়ে প্রথম লড়াই শুরু হওয়ার বেশ আগেই তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। বাংলা বিভাগের সময়টায় তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতার মধ্যগগনে অবস্থান করছেন। এই অসাধারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বার্থেই তিনি আন্দোলনকে স্থূল রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক বৌদ্ধিক বিষয়ে রূপান্তরিত করেন। এই কারণে তিনি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা সত্ত্বেও আন্দোলন টিকে ছিল। আন্দোলনের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা যুক্ত হলে রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তবে বাংলাকে বিভক্ত করা যে উচিত হবে না, ব্রিটিশ শাসকদের অপেক্ষাকৃত বিবেচক অংশকে এটা বোঝানোর চেষ্টায় তিনি সর্বাত্মক সহায়তা দেন। তাঁর সময়ের অনেকের মতোই

www.pathagar.com

তিনি ব্রিটেন ও পাশ্চাত্যের মানুষের বিপরীতে নিজের দেশের মানুষদের মর্যাদা আত্মনিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন এবং এমন এক ভারত সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখান, যেখানে পাশ্চাত্যের 'আধুনিকায়ন-সংশ্লিষ্ট ভুল-ত্রুটি' থাকবে না। বঙ্গভঙ্গ রদের জন্যে রবীন্দ্রনাথ সনির্বন্ধ আবেদন জানান প্রথমে বাঙালি হিন্দুদের কাছে, তারপর বাঙালি মুসলমানদের কাছে। তিনি নিজেকে দেখতেন সকল বাঙালির প্রতিনিধিরূপে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন তিনি সারা ভারতের হয়ে কথা বলছেন। এর একটা কারণ সম্ভবত বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশের আশা-আকঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখা যেত। এমনকি ব্রিটিশদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল, যদিও মাত্রায় তা অনেক কম। সর্বব্যাপী এই প্রভাবের কারণ তিনি সমকালীন রাজনীতির উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ে পক্ষভুক্তি এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। এভাবে তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনীতির অনুপ্রবেশকে নিন্দা করেছেন, সেই সাথে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নজরুলের সমালোচনার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি কখনোই গুরুতর সাম্প্রদায়িক কিছু লেখেননি, বরং বারবার ফিরে গেছেন প্রাক-আর্য, প্রাক-মুসলমান, ব্রাহ্ম এবং বাঙালি মানসের কাছে। ফলত তিনি কবি হিসেবে হিন্দুও নন মুসলমানও নন; ধর্মীয় অর্থে এবং সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্ম।

এবার দেখা যাক ইকবালকে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও সকল ভারতীয় মানুষের মর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য প্রকাশের চেষ্টা করেন। তবে একই সঙ্গে তিনি তাঁর মুসলিম ভাইদের ভাল-মন্দের ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। ব্রিটিশের উস্কে দেয়া সাম্প্রদায়িক বিভেদপূর্ণ ভারতে জন্ম না নিলে ইকবাল হয়তো 'মুসলমান' কবি হিসেবে পরিগণিত হতেন না। কারণ তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল উচ্চমানের কবিতা রচনার জন্যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে নয়। কিন্তু যখনই তিনি অনুধাবন করলেন তাঁর ব্যবহৃত ভাষার ফার্সি ও উর্দু, দুটোর কোনোটিই সারা ভারতে কথিত নয়– এ কারণে তিনি তুলনামূলকভাবে কম শ্রোতা বা পাঠক পাচ্ছেন, বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে, তখনই তাঁর গতিপথ বদলে গেল। তিনি প্রবন্ধ রচনা এবং রাজনীতির দিকে ঝুঁকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেখলেন, তিনি ক্রমশ পাকিস্তান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সন্নিকটবর্তী হচ্ছেন।

আর নজরুল– তিনি তাঁর সতীর্থ দুই কবির চেয়ে অনেক নবীন এক প্রজন্মের প্রতনিধিত্ব করতেন। বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল এই দুজনের চেয়ে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন শিল্প অনুরাগী তবে ততটা পরিশ্রুতি ও পরিশীলন তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন বহুল মাত্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং নীতিগতভাবে উচ্ছৃঙ্খল। তথাপি নজরুল কবিতার কাছে তাঁর জীবন সঁপে দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

ও সমাজ সংস্কারের মতো বড় কোনো লক্ষ্য তাঁর ছিল না; যা করার তিনি তাঁর কবিতা ও গান দিয়েই তা করতে চেয়েছিলেন। মতের দিক থেকে তিনি চরমপন্থী ছিলেন; কিন্তু এই মত তিনি প্রকাশ করেছেন একমাত্র কবিতা ও গানের মধ্য দিয়ে। গান তিনি এত সৃষ্টি করেছেন যা সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বা ইকবালকে বহুদূর ছাড়িয়ে গেছে।

নতুন শতাব্দীর প্রায় সূচনালগ্নে জন্মগ্রহণকারী নজরুল ঊনপঞ্চাশতম বেঙ্গল রেজিমেন্টে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে করাচীতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি উর্দু, ফার্সি এবং ইংরেজি শিখেছিলেন এবং তিন ভাষাতেই ভালো লিখতে পারতেন। গান্ধীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সময় একটা কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর পরই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এ সময়ের মেজাজ ধারণ করেছিল কবিতাটি। পরে ব্রিটিশ বিরোধী এবং পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের সময় এ কবিতাটি ব্যাপক আবেদন সৃষ্টি করে। যে সময় কলকাতার বুদ্ধিজীবী রায়ের (এম.এন. রায়) নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক সেই সময় নজরুলের 'বিদ্রোহী' যেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক সক্রোধ চিৎকারের মতো আবির্ভূত হয়। বাল্যকালে দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করতে করতে সারা বাংলায় ঘুরে বেড়িয়ে বাংলার মানুষের দুর্ভোগ-দুর্দশা দেখার যে অভিজ্ঞতা নজরুলের হয়েছিল কবিতাটিতে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এতে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহের এক প্রায় নাস্তিবাদী রূপ। কবিতায় যেমন বিধৃত বাস্তব জীবনেও নজরুল সেরকম বিদ্রোহ করার সামর্থ্য রাখতেন। মার্কসবাদী নেতা মুজাফফর আহমদের বন্ধু নজরুল বিশ্বাসী মুসলমান হয়েও মার্কসবাদী আদর্শের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। প্রকাশ হওয়ামাত্র 'বিদ্রোহী' সাড়া জাগায়। বড় প্রচার সংখ্যার কাগজে তা অবিলম্বে পুনর্মুদ্রিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মনের কথার প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায় কবিতাটি। এই ছাত্রদেরই একাংশ চল্লিশ বছর পরে, ১৯৬০-এর দশকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। নজরুলের এই কবিতাটি উদারনৈতিকতাবাদের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তচিন্তাবাদী সহিংসতার এক প্রায় নাস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বার খুলে দেয়। কবিতাটিতে নজরুল বলছেন:

বল বীর–
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারী' আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর–
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'

www.pathagar.com

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভিদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্‌র!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর–
আমি চির-উন্নত শির!
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি না কো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ববিধাত্‌র!

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল ॥
মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙ্গাই
বিষম চলার ঘায়!
যুগে-যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হ'ল পৃথ্বিতল!
আমরা ছাত্রদল ॥....
আমি চির-বিদ্রোহী বীর
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির!

(মূল বইয়ে মিজানুর রহমানকৃত অনুবাদ ব্যবহার হয়েছে)

www.pathagar.com

নজরুলের 'ছাত্রদলের গান' কবিতাটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কুচকাওয়াজের সুরে বাঁধা গানটি। ১৯২০-এর পর থেকে ঢাকার ছাত্রদের কণ্ঠে বারবার গীত হয়েছে। কবিতাটির শুরু এভাবে : বিপ্লবী উত্তাপে পূর্ণ এই রচনাগুলোতে একটি রক্তলোলুপতার দিক রয়েছে, যাকে অপরিপক্কতা বা নিছক সমসাময়িককালের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এই কবিতাগুলোতে নজরুলের ক্রোধ প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হলেও অন্য অনেক কবিতায় দেশ ও পল্লী মায়ের জন্যে ভালোবাসা, কৃষকদের উপর জমিদার মহাজনদের অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়ন সম্পর্কিত বোধ এবং মুসলমান সমাজের উন্নয়নের জন্যে আকুতি ফুটে উঠেছে। নজরুল যে প্রায় দুই দশক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তিনি কয়েক হাজার কবিতা ও তিন হাজারের অধিক গান রচনা করেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানি তাঁর অনেক গানের রেকর্ড বের করে। তাঁর অনেক কবিতা যেমন প্রেমের কথা বলে, তেমনি অনেক কবিতায় আছে বিরহ-ব্যথা, বিষাদ। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে, তিনি মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ হলেও সাম্প্রদায়িক বা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী এবং অনেক বন্ধু ছিলেন হিন্দু। তিনি সবসময় ইসলামকে চিত্রিত করেছেন মানবিকতা ও সহনশীলতার ধর্মরূপে। সহিংসতা বিষয়ে নজরুলের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার কারণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়, তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ একটি নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন।

নজরুলের জীবনটাই ছিল এক চ্যালেঞ্জ। স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি বলে আয়-রোজগারের ভদ্রসম্মত কোনো উপায় করতে পারেননি। জীবন ধারণের কোনো অবলম্বন যখন খুঁজে পাচ্ছেন না তখন যোগ দিলেন সেনাবাহিনীতে। সৈনিকজীবন শেষে বিভিন্ন কাগজে সম্পাদনার কাজ করেন, সেগুলোর মধ্যে নিজের প্রকাশনাও ছিল। এই সময় যে সামান্য অর্থ তিনি উপার্জন করতেন তা-ও দ্রুত খরচ করে ফেলতেন। তাঁর 'দারিদ্র' কবিতায় কপর্দকশূন্য হওয়ার সমস্যার মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পেলেও নজরুল দারিদ্র্য ছাড়া কিছু পাননি। যে সময়টায় কলকাতায় তাঁর একের পর এক গানের রেকর্ড বের হচ্ছিল সে সময় তিনি কিছুটা সচ্ছলতার মুখ দেখেছিলেন। কিন্তু বেহিসেবে খরচ করে ফেলেন সব অর্থ। তিনি যখন চরম অর্থকষ্টের মধ্যে তখন তাঁর প্রিয় পুত্র বুলবুল গুটিবসন্তে মারা যায় এবং নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। ১৯৪৩ সালে নজরুল নিজেও এক অসাড়, চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় নিপতিত হন। ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই অবস্থাতেই ছিলেন।

www.pathagar.com

নজরুল জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তাঁর প্রতিভা, তাঁর সাধারণ মানুষের কাছাকাছি অবস্থান এবং তাঁর চালচলনের বলিষ্ঠতা। এমনকি তাঁর কবিতার অনুবাদেও এমন এক অভিব্যক্তিক শক্তি আছে যা ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করে পাঠক-শ্রোতার হৃদয়ে পৌঁছায়। অনুবাদে এমনকি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পর্যন্ত এতটা আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম নয়। তবে নজরুলের কবিতায় ইকবালের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির স্থিরত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গির গাম্ভীর্য অনুপস্থিত। তার পরও তাঁর কবিতা টিকে আছে। কারণ, এমনভাবে তিনি তা সৃষ্টি করেছেন যে, ব্যাপক মানুষের কাছে তা পৌঁছাতে পেরেছে। ফলত ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ বাঙালি তরুণদের মধ্যে নজরুলের জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। সে সময় তরুণেরা যে গান গাইত তা তাঁরই গান, যে পথ তারা অনুসরণ করত তা তাঁরই পথ; এমনকি যাত্রায়ও তাঁর কবিতা ও গান আবৃত্ত ও গীত হতো। ভ্রাম্যমান চারণ কবি ও গায়েনদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয় নজরুলের কবিতা ও গান। জনতার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছিলেন বলে তাঁর সৃষ্টির আবেদন শিক্ষা ও শিক্ষিতের সীমানা পেরিয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই শেখ মুজিবের রাজনীতিতে তাঁর রচনার প্রতি গুরুত্ব ছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ : দূরবর্তী পাকিস্তানী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমকালীন সংস্কৃতির বিদ্রোহ। এই দ্বন্দ্ব সংগঠনে নজরুল যা যোগান দেন তা হচ্ছে একটি বাংলাদেশী ভাষা, প্রকৃত দেশ-মাতৃকার সন্তান হিসেবে তাঁর পরিচিতি এবং একটি মুসলিম কণ্ঠস্বর। এই মুসলিম কণ্ঠস্বরের আবেদন ছিল সমধিক। কারণ, যত যা-ই হোক রবীন্দ্রনাথ তখন আর নেই, তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের লোক। আর নজরুল কেবল বাংলাদেশের জন্যে কথা বলেছেন। চূড়ান্ত বিচারে নজরুলের ভূমিকা ছিল বাংলায় ইকবালের উত্তরাধিকার ধ্বংস করা। তাঁর উচ্চনাদের বাংলাদেশী কণ্ঠস্বরের নিচে ইকবালের পাকিস্তানী কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নজরুল নিজে ছিলেন হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের সন্তান, এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও বাস করতেন কলকাতায়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কাটিয়েছেন আজকের বাংলাদেশে। নিয়তির পরিহাস হচ্ছে, অসুস্থতার কারণে নজরুল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা জানতেই পারেননি। তাঁকে যে বাংলাদেশের জাতীয় কবি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে তাও তাঁর জানা হয়নি।

এটা বোঝা জরুরি যে, নজরুল ক্ষুদ্র রাজনীতির দিকে ঝোঁকেননি, উগ্র জতীয়তাবাদের কথাও বলেননি। এগুলো কবির কাজ নয়। ইকবাল এবং রবীন্দ্রনাথও এটা বুঝেছিলেন। বরং কবির কাজ জনগণের মূল্যবোধকে মূর্ত করে তোলা; তাদের

www.pathagar.com

উচ্চতর বোধকে আন্দোলিত করা– জনগণ যে অবস্থায় আছে তার অনুগমন করা নয়; তারা যা হতে পারে তার ইঙ্গিত অনুপ্রেরণা দেয়াই কবির কাজ। এক্ষেত্রে একজন কবি যখন সফল হন, তিনি আত্ম-অনুসন্ধানের পথ খুলে দেন, তাঁর শ্রোতাদেরকে অধিকতর জ্ঞানবান, আশাবাদী এবং সদয় করে তোলেন। তিনি তাদের সাহসীও করে তোলেন এবং তাদের সামনে একটি আরব্ধ কর্ম-সম্পাদনের তাগিদ উপস্থিত করেন। রবীন্দ্রনাথ একটি প্রজন্মের মধ্যে এই সকল বোধ সঞ্চারিত করেছিলেন। শেখ মুজিব প্রায়শই তাঁকে উদ্ধৃত করতেন। তবে শেখের অনুসারীদের কাছে নজরুলই হয়ে ওঠেন প্রধান কবি।

কবিদের ভূমিকা তাঁদের নিজস্ব অবস্থান থেকে পরীক্ষা করলে যে কেউ খেয়াল করবেন, রাজনীতিবিদরা তাঁদের ভিন্নভাবে দেখেন, রাজনীতিকরা কবিদের রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। কারণ, সাধারণ মানুষ তাদের ভালোবাসে এবং তাঁদের সাথে একাত্ম বোধ করে, এবং আশা করে তাদের রাজনীতিবিদরাও একই ধ্যানধারণা ও জ্ঞানের অধিকারী হবেন। এভাবেই ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মতো দেশে রাজনীতিতে কবিরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

১৯৬০-এর দশক নাগাদ পূর্ববাংলায় রবীন্দ্র-নজরুল এবং জসীমউদ্‌দীন– যিনি লোককাহিনীকে নবরূপে সৃজন করে পল্লীর জনগণের কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলেন– বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাহিত্যিক ভিত্তিদান করেন। অন্যদিকে ১৯৬০-এর দশকে উদ্‌যাপিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ব্রাহ্ম সংবেদনশীলতাপূর্ণ শিক্ষিত শ্রেণী ও প্রগতিশীলদের অনুপ্রাণিত করেছিল। আর নজরুল আবেদন সৃষ্টি করেছিলেন ছাত্র, তরুণ বিদ্রোহী, শিক্ষক এবং স্বল্পশিক্ষিতদের মনে। জসীমউদ্‌দীন কথা বলেছেন কৃষকদের জন্যে। এছাড়া গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য অপরিচিত স্বল্পপরিচিত চারণ কবি ও স্বভাবকবি প্রেম, প্রকৃতি ও বিদ্রোহবিষয়ক কবিতা-গান রচনা করেছেন, গেয়েছেন। এ সকল কবিতা ও গান মিলে যে আকাঙ্ক্ষা, আকুলতা বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে তা থেকেই উত্থিত হয়েছে একটি নতুন জাতি। বাংলাদেশের একজন ঐতিহাসিক, রফিউদ্দিন আহমেদ যেমন বলেছেন, বাংলাদেশ কখনোই কিছু বিশ্বাস করে না যতক্ষণ না একজন কবির দ্বারা তা উচ্চারিত হয়।

বাঙালি বনাম পাকিস্তানী কবিদের এই সাংস্কৃতিক যুদ্ধই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয় এবং স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতৃত্বদানকালে শেখ মুজিব একে চমৎকার এক হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেন। বললে অত্যুক্তি হবে না, শেখের ছিল কবিদের লড়াই এবং তার তাল ও অর্থ বুঝবার মতো কান ও জোরালো বোধ।

ফিরে আসি শেখের কাছে। তাঁর নিয়তিই ছিল দুর্ভোগের, এ ধরনের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের যেমন হয়। ১৯৬০-এর দশকে বারবার তিনি পাকিস্তানীদের

www.pathagar.com

দ্বারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কারণ স্পষ্টতই তিনি ছিলেন পাকিস্তানীদের দুশ্চিন্তার কারণ। তিনি এমনভাবে জনগণের কথা বলতে শুরু করেন, যেমনভাবে সোহ্‌রাওয়ার্দী বা হক বলেননি। মুজিব জনগণের বঞ্চনার কথা, ক্ষোভের কথা তুলে ধরেন– বিশেষ করে শহর-গঞ্জের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা, যারা ছিল আওয়ামী লীগের মেরুদণ্ড। মুসলমানি বাংলায় নয়, আধুনিক বাংলায় শিক্ষিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে কৃষকের মুসলমানি বাংলাকে অবজ্ঞাকারী এই উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাঙালির পুনর্জাগরণের সামগ্রিকতাকে এমনভাবে আলিঙ্গন করেছিলেন, ১৯০৫-১২ সালে কলকাতার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যেমনটা করেছিল। পূর্ববাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতাটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চুম্বক কথাটি নিহিত রয়েছে এখানে। ছয় দশক আগে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা যে বুনন কাজ শুরু করে গিয়েছিলেন। ১৯৬০-এর দশকে পূর্ববাংলার মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা সেই বুননের সুতা ধরে বুনন কাজ নতুন করে শুরু করেন। এবং নিয়তির এমনই পরিহাস, শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখন পাপড়ি মেললো, তা ঘটলো মুসলমান বাংলায়, হিন্দু বাংলায় নয়। হিন্দু বাংলা তখন ভারতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আর মুসলমান বাংলা প্রস্তুত হচ্ছে স্বাধীন বাঙালি জাতি হিসেবে উত্থান লাভের জন্যে।

শেখ মুজিব রাজনীতিতে আসার মতো বয়স ও পরিপক্কতা প্রাপ্ত হন সুভাষ বসুর সমসাময়িককালে। অনেকটা অসচেতনভাবেই তিনি ঐ মহান বাঙালির জাতীয়তাবাদী মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন। দুজনের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল এক জায়গায়, বসু সবসময় ছিলেন অভিজাত, আর মুজিব কথা বলতেন সাধারণ মানুষের ভাষায়। তা সত্ত্বেও দুজনেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের গভীরতম প্রদেশে নাড়া দেন। এবং সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বর্ণ, গোত্র ও ভাষাভিত্তিক ভ্রাতৃত্ববোধের দিকে এগিয়ে যান। এভাবে হিন্দু এবং মুসলমানেরা একসাথে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে কাজ করে। উপর থেকে যদিও মনে হতো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের বোধ তাদের একত্র করেছে, কিন্তু আরো গভীরে ছিল সহোদরের ঐক্য।

সোহ্‌রাওয়ার্দী আওয়ামী লীগকে গড়ে তুলেছিলেন কংগ্রেস পার্টির আদলে। মুজিবের আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে অন্যরকম। শেখের অধীন দলটি অনেকটা বসুর নেতৃত্বাধীন বাংলা পার্টির মতো হয়ে ওঠে; কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দীর অধীনে তা ছিল নেহরুর পার্টির মতো অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত এবং উদার। এদিক থেকে বললে, নেহরু এবং বসু যেমন ১৯৩০-এর দশকে বাংলার রাজনীতির দুটি ধারার প্রতিনিধিত্ব

www.pathagar.com

করেন, তেমনি সোহরাওয়ার্দী এবং মুজিবও ১৯৫০ এবং '৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে ওই একই রকম দুটি পৃথক ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপুর্ণ যে ব্যাপারটি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তা হচ্ছে, মুসলমান অনুভূতি তীব্রতা হারায় এবং ইসলাম শেষ পর্যন্ত রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে যায়। এই পরিবর্তনের নিয়ামক আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাভূমিতেই লুক্কায়িত ছিল। দলটি কোনো অবস্থাতেই মুসলমান বিরোধী না হলেও কখনোই সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করেনি। ১৯৬৪ সালে নবীর চুল বিষয়ক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান নেতৃত্ব গণসমর্থন সৃষ্টির সামর্থ্য পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। এর প্রধান কারণ উচ্চশ্রেণীর আশরাফেরা জনসম্পর্কহীন হয়ে পড়েছিল। আরো খারাপ যেটা, মসজিদের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক ছিল না। বস্তুত, পাকিস্তানী মুসলিম লীগ কেবল রাজনৈতিক অর্থেই সাম্প্রদায়িক ছিল, ধর্মীয় অর্থে নয়। পাকিস্তানের সব বড় নেতাই– যেমন : জিন্নাহ, হাসান ইস্পাহানী, আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের নিজেদের মতো করে ধর্মমনা হলেও তাঁরা ছিলেন মানববাদী অভিজাত। সোহরাওয়ার্দীর মতো তাঁরাও মদ খাওয়ায়, নামাজ না পড়ায় বা অত্যাধুনিক জীবনযাপন করায় দোষের কিছু দেখতেন না। ফলে মুজিবের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষতার চ্যালেঞ্জ যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রথম প্রজন্মের মুসলিম লীগারদের উত্তরসূরীরা বিরোধী দলের রাজনৈতিক ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্যে গোপনে মওলানা ভাসানী ও অন্য বামপন্থী দলছুট গ্রুপগুলোর পেছনে অর্থ ব্যয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কৃচিৎ তাঁরা বিশ্বাসী কৃষকদের নেতৃত্ব দেয়ার বা ইসলাম রক্ষায় আত্মনিয়োগ করার স্বপ্ন দেখেছে। একমাত্র যে পুরাতন মুসলিম লীগার সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন তিনি ফজলুল কাদের চৌধুরী। পাকিস্তানের প্রতি অনুগত থাকার কারণে আওয়ামী লীগ আমলে তাঁকে কারারুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়। ব্রাহ্ম মানস এই মৃত্যুর পেছনে কোনো অন্যায় দেখতে পেয়েছে এমন মনে হয় না। যাহোক, পুরাতন মুসলিম লীগাররা ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোকে যতটা না ভয় করত তারচেয়ে বেশি ভয় করত জামায়াত-এ-ইসলামীকে। কারণ জামায়াত একটি গোঁড়া মৌলবাদী দল। তবে মুজিব কঠোর পরিশ্রম করে আওয়ামী লীগের জন্যে যে গণভিত্তি অর্জন করেছিলেন, সংকীর্ণ রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করার কারণে জামায়াত তা পারেনি। অন্যদিকে পশ্চিমা ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত মুসলিম লীগাররা ঢাকা অথবা চট্টগ্রামের চেয়ে লন্ডনে থাকতে বা দেশী নৌকার চেয়ে বিমানে ভ্রমণ করতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। একইভাবে তাঁরা ভোট প্রার্থনা বা ভোট অর্জনের চেষ্টা করতেন না, তাঁরা ভোট কিনতেন।

www.pathagar.com

অন্যদিকে শেখের রীতি ছিল কঠোর পরিশ্রম। অক্লান্তভাবে তিনি জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে মাঠের পর মাঠ হেঁটে মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, মানুষদের সংগঠিত করেছেন; তাদের চা, ভাত, ডাল, লবণ ভাগ করে খেয়েছেন; নাম মনে রেখেছেন, তাদের সঙ্গে মসজিদে নামাজ আদায় করেছেন; ফসলের মাঠে প্রখর রোদে ঘর্মাক্ত হয়েছেন, বন্যাদুর্গত এলাকায় গেছেন, কেউ মারা গেলে শেষকৃত্যানুষ্ঠানে কেঁদেছেন এবং কুলখানিতে উপস্থিত থেকেছেন। শেখ মুজিব অন্যের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হতেন আন্তরিকতার সঙ্গে, আচরণ করতেন সহানুভূতির সঙ্গে এবং হাত বাড়িয়ে যা স্পর্শ করতেন তা গলফ ক্লাব বা ক্লাবের চেয়ার নয়, জনগণের ঘর্মাক্ত ধূলিমলিন হাত। নির্বাচনী জনসভায় বারবার উপস্থিত হয়ে তিনি জনগণের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আত্মীকরণ করতেন, যাতে করে কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে তাদের কাছ থেকে দূরে থেকেও তা তিনি আন্দাজ করতে পারতেন। জনগণের প্রতিক্রিয়া নির্ভুলভাবে আন্দাজ করার অতিমানবীয় ক্ষমতা ছিল তাঁর। জনগণ কি বিশ্বাস করে, কি চায় তা তিনি জানতেন; কারণ তিনি শুধু যে তাদের বোধগম্য ভাষায় সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারতেন তা নয়, ব্যাখ্যা করতেন এমনভাবে যাতে তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, জনগণও এটা জানত বলে তারা বিশ্বাস করত তাঁর মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই। তিনি যেমন তাদের সঙ্গে সততার সঙ্গে কথা বলতেন তেমনি তারাও বলত তাঁর সাথে।

মুজিব রাজনৈতিক আবহে এক ধরনের তাৎক্ষণিকতাও নিয়ে আসেন। সূক্ষ্ম কূটচাল অথবা অসম্পূর্ণ বা খাপছাড়া পদক্ষেপ নিয়ে জনগণকে ক্লান্ত করতেন না। সোহরাওয়ার্দীর অধীনে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন বটে; কিন্তু সরকারি পদের প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল না। যদিও কখনো প্রকাশ্যে বলেননি বা লেখেননি তথাপি তাঁর উত্থানের সময় থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরুর দিকে পাকিস্তানীরা তাঁকে গ্রেফতার করা পর্যন্ত সবাই জানত এবং বুঝত তিনি স্বাধীনতার পক্ষেই কথা বলছেন। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখের পার্থক্য এখানেই– সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে থেকে সংস্কার চেয়েছিলেন, আর শেখ মুজিব চেয়েছিলেন স্বাধীনতা। যদিও মুজিব এই আশংকার কথা উচ্চারণ করেননি, তথাপি তা তাঁর আন্দোলনে দান করে বিপদ ও উত্তেজনার আভাসের চাইতে বেশি কিছু, যাকে বলা যেত এক ধরনের মহত্ত্বের আভা। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো ঘোষণা না দিয়ে তিনি পাকিস্তানীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছেন। তারা তাঁকে সরিয়ে দেয়ার বা কারাগারে নিক্ষেপ করার কোনো কারণ যেমন খুঁজে পায়নি, তেমনি কখনো নৈতিক প্রাধান্য অর্জনেরও সুযোগ পায়নি। এবং পুরোটা সময় মুজিব চোখ

www.pathagar.com

পিটপিটিয়েছেন এবং মিটমিটিয়ে হেসেছেন এবং বাংলার ও বাংলাদেশের কথা বলে গেছেন, যেন চাইলেই ছাদের ওপর লাল-সবুজ পতাকার পতপত করে উড়ার দৃশ্য উপভোগ করা যেত।

শেষত, শেখ মুজিবের সংগঠিত করার বা অন্যদের দিয়ে সংগঠিত করানোর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ব্যবস্থাপক বা প্রশাসক না হওয়া সত্ত্বেও তিনি আওয়ামী লীগের বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্যে গ্রামে-গঞ্জে নাটক মঞ্চায়িত করার জন্যে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করেন। অর্থনীতিবিদদের সংগঠিত করেন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিমালা বিশ্লেষণ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে অন্যায় করা হচ্ছে, দ্বিমুখী আচরণ করা হচ্ছে তার প্রমাণ সন্ধানের জন্যে। তিনি আইনজ্ঞদের উদ্বুদ্ধ করেছেন যাতে তাঁরা জনগণের অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো আরো কারণ বা সরকারকে বিব্রত করার উপায় খুঁজে বের করেন। নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছেন আধুনিক অধিকার দাবি করতে, গোঁড়া পশ্চিম পাকিস্তানীরা যেগুলোকে আপত্তিকর মনে করত। নৃত্যশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন প্রাচীন লোকনৃত্য সন্ধান করে বাঁশি ও ঢোল সহযোগে তা পরিবেশনের জন্যে। তাঁর ছিল নিখাদ বাংলায় কবিতা আবৃত্তি করার মতো কবি, ছিল গান করার মতো কৃষক– এমন গান যা আগে কোনোদিন তারা গায়নি। তিনি শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের গৌরবগাথা শুনিয়ে তাঁর আরব্ধের সহযাত্রী করেছেন। ব্রাহ্ম মানসিকতাসম্পন্নদেরকে রাবীন্দ্রিক মানবতাবাদের মন্ত্র শুনিয়ে তাঁর পক্ষে এসে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করেছেন। এরকম বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি যা সংগঠিত করেন, ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে গণ-আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করা যায়। তবে তাঁর এই আন্দোলনের কোথায় যেন একটু উন্মত্ততার সুর শোনা যেত।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এমন একটি আন্দোলনের নিয়তিই বিকাশ লাভ করা এবং তা যখন হয় তখন তাকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যতই আন্দোলন উত্তাল হতে লাগল পাকিস্তান সরকার ততই তা দমন করার চেষ্টা করতে লাগল। এবং সরকারের দমন-নিপীড়ন যত কঠোর হলো আন্দোলনও তত শক্তিশালী হলো। এমনকি ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে যখন মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন প্রত্যেকের মনে তিনি হয়তো সত্যিই এটা করেছেন, এমন সন্দেহ জাগা সত্ত্বেও সারা দেশ যেন রুদ্ধশ্বাসে থমকে যায়। রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলো নিরাপদে পেরিয়ে যাওয়ার পর আন্দোলন আরো গতিশীল হয়। বস্তুত, পাকিস্তানীদের কোনো আপস-রফার প্রস্তাব অথবা সংস্কার কার্যক্রম বা পারস্পরিক ছাড় দেয়ার প্রস্তাবে এমন আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এটা বুঝতে পেরেই সরকার এই দিক থেকে তেমন কিছু করেনি।

www.pathagar.com

কিন্তু আন্দোলনের একটি পরিসমাপ্তি বা উপসংহারের প্রয়োজন ছিল। পাকিস্তানী সরকারই তা যোগান দেয় ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর পর শেখ প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে পথে না গিয়ে অনমনীয় রইলেন : তাঁর দেয়া ছয় দফা মানতে হবে। সামগ্রিকভাবে এই ছয় দফা ছিল স্বায়ত্বশাসনের দাবী– স্বাধীনতার দাবী। এই সময় সরকার এক মহাভুল করে বসল। তারা ছয় দফা মানতে অস্বীকার তো করলই, পার্লামেন্টের অধিবেশনও পিছিয়ে দিল। অন্তত পার্লামেন্টের অধিবেশনটাও যদি নির্ধারিত সময়ে ডাকা হতো তাহলে হয়তো মুজিব আপস করতেন। কেননা, তখন তিনি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন এবং কে বলতে পারে তিনি ওই পদে থেকে কিভাবে কাজ করতেন। এর বদলে ১৯৭১-এর মার্চে এল চরম অবস্থা। ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ভাষণে শেখ আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া স্বাধীনতার জন্যে আর যা যা ঘোষণা করা যায়, সব করলেন। ফল হলো উদ্দীপনার বিপুল উচ্ছ্বাস। ছাত্ররা অস্ত্রসজ্জা ও প্রশিক্ষণের মহড়া শুরু করল, (হলুদ মানচিত্র খচিত) লাল সবুজ পতাকা উড়তে লাগল সারা পূর্ব পাকিস্তানের ভবনশীর্ষে। এরকম উদ্দীপনাময় পরিস্থিতিতে যথেষ্ট শত্রুতা ও সহিংসতা হলো। পাকিস্তানী সৈন্যদের গালাগাল বা প্রহার করা হলো, উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হলো, মেজাজ আগুন হয়ে উঠল। অবশেষে ২৬শে মার্চ (২৫শে মার্চ– *অনুবাদক*) মধ্যরাতে বাঁধ ভেঙে গেল। শেখকে গ্রেফতার করা হলো, এর কিছুক্ষণ আগেই তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন সমঝোতা সমাসন্ন।

প্রায় একই সময় ট্যাঙ্ক উপস্থিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রাবাসগুলোতে শুরু হলো গোলাবর্ষণ। শুরু হলো ছাত্রহত্যা। তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। কারণ বিদ্রোহের জন্যে দায়ী করা হয়েছিল হিন্দুদের। তারপর পাকিস্তানীরা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোর ওপর গোলাবর্ষণ করতে শুরু করল। হাজার হাজার মানুষ নিহত হলো। এই সারা রাত (এবং পরের অনেকগুলো মাস) পাকিস্তানীরা নাশকতামূলক তৎপরতার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশার লোককে খুঁজে বেড়িয়েছে। একজন একজন করে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, দলবেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঢাকার উপকণ্ঠে অবস্থিত সাভারে, তারপর হত্যা করা হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়। (কয়েক বছর পরে জেনারেল টিক্কা খান, যিনি শুরুর দিকে সেনা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, 'মাত্র' পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ হত্যা করার কথা স্বীকার করেন।) পরের রাতে, ২৭শে মার্চ, চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর এক তরুণ বাংলাদেশী মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর সৈন্যদের নিয়ে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র দখল

www.pathagar.com

করেন এবং শেখ মুজিবের নামে ঘোষণা করেন স্বাধীনতা– সেই স্বাধীনতা যা শুরু থেকেই ছিল আন্দোলনের লক্ষ্য।

১৯৭১-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে জীবন কার্যত থমকে ছিল। গ্রামাঞ্চলে একটা জীপ বা অন্য যে কোনো আধুনিক যানবাহনের চেহারা দেখামাত্র মানুষ লুকিয়ে পড়ত। পাকিস্তানীরা নাশকতামূলক তৎপরতার সাথে জড়িতদের খোঁজে প্রতিটা গ্রাম চষে ফেলে এবং হিন্দুদের প্রায় দেখামাত্র গুলি করে হত্যা করে। সৈন্যদের হাতে যে কোনো লোক ধরা পড়লেই তার লুঙ্গি অথবা ধুতি তুলে দেখা হতো তার খৎনা করা আছে কিনা। না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হতো। গ্রামাঞ্চলে আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক বলে কাউকে সন্দেহ হলেই সৈন্যরা তাকে গুলি করে মারত। স্থানীয় যারা পাকিস্তানীদের অনুগত ছিল তারা কাউকে পাকিস্তানের শত্রুদের সহযোগী বা সহায়তাকারী হিসেবে সনাক্ত বা চিহ্নিত করলেও তার মৃত্যু এড়ানোর উপায় থাকত না। এভাবে অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে নিছক স্থানীয় পাকিস্তান অনুগতদের ব্যক্তিগত শত্রু হওয়ার কারণে। পাকিস্তানী বাহিনী যুদ্ধের সময় স্থানীয় পাকিস্তানপন্থীদের নিয়ে এক আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেছিল, যার নাম দেয়া হয়েছিল 'রাজাকার' বাহিনী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই বাহিনীর নাম অনুসারে সকল পাকিস্তানপন্থীকে ডাকা হয় 'রাজাকার' বলে। শব্দটি গালাগালের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্ববাংলার সাত কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু অথবা আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী। দেশত্যাগ করে যাওয়া হিন্দুদের অনেকেই পরে আর দেশে ফিরে আসেনি। এতে মোট জনসংখ্যায় হিন্দু সংখ্যালঘুদের হার স্থায়ীভাবেই কিছুটা কমে যায়।

এদিকে ভারতে মুজিবের প্রধান দলীয় সহকারী তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। আর মুজিব তখন সন্ত্রস্ত কাল কাটাচ্ছেন পাকিস্তানের কারাগারে। তাজউদ্দিন ভারতের সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্যে এবং ভারতের সহায়তা লাভের জন্যে অনেক কিছু করেন। সেই সাথে সংগঠিত করেন মুক্তিযোদ্ধাদের। মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে জেড ফোর্সও ছিল এই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে। প্রথমদিকে দ্বিধার সঙ্গে, দুরুদুরু বুকে; পরে অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এই আক্রমণের মাধ্যমে তারা পূর্ববাংলার উপর শত্রুর দখলের অবসান ঘটাতে না পারলেও মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী শাসনের ভিত দুর্বল করে দিচ্ছিল এবং সতীর্থদের সাহস ও মনোবল যোগাচ্ছিল। এই সতীর্থরা ছিল দেশের ভেতরে। তারা চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে পাকিস্তানীদের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাস্তা এবং সেতু ধ্বংস করছিল।

www.pathagar.com

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্পূর্ণ কাহিনী কখনো কথিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ কোনো একক কমান্ডের অধীনে একক যুদ্ধ ছিল না। বরং অনেক ক্ষেত্রেই এই যুদ্ধ করেছে ছোট ছোট দল। তাদের আক্রমণে খুব যে ধার ছিল তা বলা যাবে না। বরং তাদের হামলায় পাকিস্তানীরা নিছক একটু নাজেহাল হয়েছে। তবে জানা-অজানা যেসব দল সেতু উড়িয়ে দিয়েছে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে যেমনটা করা হয়েছিল ঢাকায়– তাদের কাজ ছিল সাহসিকতাপূর্ণ এবং কার্যকর। এরকম পরিস্থিতিতে সচরাচর যা ঘটে থাকে, একসঙ্গে অল্পসংখ্যক যোদ্ধাই যুদ্ধ করেছে। তবে অনেকেই ছিল সক্রিয়ভাবে তৎপর। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ বাংলাদেশী সে সময় তাদের সমর্থন করেছে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক এবং আওয়ামী লীগে হিন্দুদের ভূমিকা সবসময়ই বিদ্রোহীদের সম্পর্কে একটু বিরূপ মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। তবে যুদ্ধের উত্তাপের মধ্যে গভীর উপজাতীয় বা গোত্রগত অনুভূতি বজায় থেকেছে, অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের আবেদন ছিল তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর।

অবশেষে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে। যশোরে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ হয়। এছাড়া ছোট-খাটো কয়েকটা যুদ্ধের পর ভারতীয়রা দ্রুত পাকিস্তানীদের পরাস্ত করে। এটা সম্ভব হওয়ার অন্যতম কারণ, হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা এবং স্থানীয় নারীদের ধর্ষণ করার পর পাকিস্তানী সৈনিকদের নৈতিক চরিত্র এবং মনোবল কিছুই ছিল না। প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের আচরণ এক কুখ্যাত উদাহরণ হয়ে থাকবে। তারা ছিল এমন সেনাবাহিনী, যা নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড চালানোর পর প্রথম সংগঠিত প্রতিরোধের মুখেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে এবং আত্মসমর্পণ করে। এভাবে শেষ হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান, জন্ম নেয় বাংলাদেশ। কতজন মারা গিয়েছিল তা কেউ বলতে পারে না। অনুমিত সংখ্যা তিন লাখ হতে ত্রিশ লাখের মধ্যে ওঠানামা করলেও এখনো ধারণা করা হয় প্রকৃত সংখ্যা দশ লাখের নিচেই হবে। বিংশ শতাব্দীর আতঙ্ককর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই সংখ্যাকে খুব বড় বলা যায় না। তবে যখন মনে হয় অনেককে হত্যা করা হয়েছে নিছক সন্দেহবশত বা হিন্দু, ছাত্র অথবা বুদ্ধিজীবী হওয়ার কারণে, বা ধর্ষণে বাধা দেয়ার দায়ে তখন এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপ্তি বিভীষিকা না জাগিয়ে পারে না। চিন্তা করুন একবার : যারা নিহত হয়েছে তাদের অধিকাংশই মারা গেছে হত্যাকারীদের সামনাসামনি দেখতে দেখতে। বন্দুকধারী এই লোক, তার চোখে-মুখে লালসা আর ঘৃণা– এমন লোক উর্দি পরিহিত থাকলেও সে তখন আর সৈনিক নেই, সে তখন উন্মাদ। এইদিক থেকে বিচার করলে ওই

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য কদর্যতা আছে, বিশেষত যখন হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়া হয়নি। এখন তারা পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করে- গণ্য হয় বীর হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, পঁয়ত্রিশ হাজার বুদ্ধিজীবীর গ্রেফতার ও হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী জেনারেল টিক্কা খান আরামে দিন কাটাচ্ছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মহিমান্বিত সাবেক কমান্ডার হিসেবে। ১৯৮৯-৯০ সালে তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনীর বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে, যখন শেখ পাকিস্তানের কারাগার থেকে- যেখানে তাঁর প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, সেই কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর দেশবাসীর উত্তাল আনন্দধ্বনির মধ্যে ঢাকায় এসে নামেন। সেই ১০ই জানুয়ারিতে তিনি সোনার বাংলাকে মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। এবং তাঁর নিজের আন্দোলনকে ষাট বছর আগে শুরু হওয়া আরেক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে উদ্ধৃতি দেন রবীন্দ্রনাথের ১৯১১ সালে লেখা একটি কবিতা থেকে। সেটা ছিল মুজিবের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, এমন একটা দিন যেদিন স্বাধীনতার জন্যে নিবেদিত একটি জীবন তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল, যেদিন ১৯০৫-১২ কাল পর্যায়ের ঘটনাবলী বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছিল মুসলিম বাংলার হাতে। শেখ যখন রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা থেকে উদ্ধৃতি দেন জনতা গেয়ে ওঠে:

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

(ভাব: লালন শাহ, কথা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সূত্র: বাংলাদেশ দূতাবাস, ওয়াশিংটন, ডিসি।)

সেই বিজয়োচ্ছল মুহূর্তের পর, মুজিবকে ঘিরে বরাবর যে অদম্য আবেগোচ্ছ্বাস ছিল এবং যা তাঁকে সাফল্যের দিকে নিয়ে এসেছিল তা শিগগিরই বদলে যায় এবং

www.pathagar.com

মাত্র চল্লিশ মাসের মাথায় তাঁর হত্যাকাণ্ড ডেকে আনে। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাঁর বৌদ্ধিক অলসতা– যা তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল– তাঁর ভেতরের শত্রু হয়ে ওঠে। তিনি শাসন করতে সক্ষম ছিলেন না; তিনি দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালক ছিলেন না; তিনি অর্থায়ন, বৈদেশিক সাহায্য, বাণিজ্য, বৈদেশিক সম্পর্ক, আইন, মতাদর্শ, ইতিহাস কিছুই বুঝতেন না। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এবং সুনির্দিষ্টভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ইতিহাস সম্পর্কে তিনি ছিলেন অসচেতন। তিনি জাতিসংঘ, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা গ্যাট বুঝতেন না। যে যুদ্ধ তাঁর দেশকে বদলে দিয়েছিল সেই যুদ্ধের সময় তিনি দেশে ছিলেন না। ফলে যুদ্ধে তাঁর দেশ ও দেশের মানুষ বদলে গেলেও তিনি বদলাননি। তখন তিনি আর তাঁর দেশবাসীকে বুঝতে পারেন না, দেশের মানুষও তাঁকে আর উপলব্ধি করতে পারে না। মিছিল সমাবেশ হরতাল সফল করার জন্যে একসময় যে ভয়ঙ্কর মানুষদের তিনি ব্যবহার করেছেন তাদের আর তখন তাঁকে প্রয়োজন নেই। তখন তারা তাঁর আদেশ পালনেও ইচ্ছুক নয়। তারা নিজেরাই তখন আইন হয়ে উঠেছে এবং প্রয়োজনমতো 'মুক্তিযোদ্ধা' নামের বর্ম ব্যবহার করছে। তারা তখন খুঁজে পেয়েছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সাকি বার এবং সারা দুনিয়া থেকে আসা সাহায্য তসরুফের উপায়। ক্যারিশমা– তথা জনপ্রিয়তা– ভাবমূর্তি কোনো কিছুই মুজিবকে রক্ষা করতে পারল না। তাঁর অহমিকা তখন পাঁকে আটকে গেছে, যদিও শব্দটির অর্থ তিনি বুঝতেন না।

যত ধরনের প্রশাসনিক ভুল করা সম্ভব তার সবই করেছিলেন শেখের প্রশাসন। মতাদর্শগতভাবে অযোগ্য উপদেষ্টাদের পরামর্শে তিনি দেশকে প্রায় দেউলিয়া করে ফেলেন। উপরন্তু তিনি এমন এক দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হতে দেন যা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সমকক্ষ। তাঁর নিজের এক বাহিনী সৃষ্টি করে সেনাবাহিনীকে অসন্তুষ্ট করে তোলেন, আর সিভিল সার্ভিসকে অসন্তুষ্ট করে তোলেন তাদের এড়িয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি আওয়ামী লীগের ভেতরের কিছু লোককে সমগ্র বিশ্ব হতে পাঠানো সাহায্য ভাগাভাগি করে নিতে– এমনকি ভারতে বিক্রি করতে পর্যন্ত দেন। এই লেখক এবং আরো অনেকে কলকাতার পাইকারি বাজারগুলোতে সেসব মালামাল বিক্রি হতে দেখেছে। এভাবে শেখের সহচররা লাভবান হয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন রেডক্রস প্রধান মোস্তফা, শেখের নিজের পুত্র কামাল এবং কামালের বন্ধু মন্টু। এমনকি জেলা এবং মহকুমা পর্যায়ের দলীয় কর্মকর্তারাও বিপুল পরিমাণ সাহায্য তসরুফ করেন।

আরো ক্ষতিকর হয় যেটা, শেখ অযোগ্য লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। তাঁরা তুলনামূলকভাবে উচ্চশিক্ষিত হলেও বৌদ্ধিক দিক থেকে ছিলেন

www.pathagar.com

একই রকম অলস। পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদদের সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার শূন্য করে ফেলে। তাঁদের অনুসৃত নীতির কারণে ব্যাপক হারে পুঁজি দেশের বাইরে চলে যায় এবং বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। পরিকল্পনা কমিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন (?) এবং পূর্ব ইউরোপের মতো দেউলিয়া অর্থনীতিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং বিশ্ব ব্যাংককে এড়িয়ে যায়। এমনকি বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালে পরিকল্পনা কমিশন তাঁকে গুরুত্ব না দেয়ার তাগিদ দেয়। ফলে বাংলাদেশে পশ্চিমা সাহায্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। তাছাড়া অধিকাংশ শিল্প ও বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হয়। এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের চরম অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের শিল্পভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়। উপরন্তু কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা বৈদেশিক সম্পর্ক ও আইন বিষয়ে শেখকে কুপরামর্শ প্রদান করেন এবং শেখ তা গ্রহণ করেন। যেমন, সন্দেহবশত গ্রেফতার ও অন্তরীণ রাখার জন্যে এমন আইনপ্রণয়ন করা হয় যা পাকিস্তানীদের ব্যবহৃত আইনের চেয়েও কঠোর এবং এমন সব ডিক্রি বা অধ্যাদেশ জারি করা হয়, যেগুলো ছিল আরো কঠোর। তাছাড়া ছিল কিছু গুপ্ত সংগঠন এবং নতুন এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সঙ্গে মুজিবের সম্পর্ক। নতুন এই সংঘাতপূর্ণ অবস্থাটি মুজিব তেমন বুঝতেন না; কিন্তু এই অবস্থার কারণে তাঁর শত্রুদের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতো প্রায়ই। তিনি গুপ্তহন্তাদের সঙ্গে চক্রান্তে অংশ নিয়েও নিজের মৃত্যু ত্বরান্বিত করেন। এমন এক গুপ্তহন্তারকের নাম দালাল, যে পরে তাঁকে হত্যা করতে সাহায্য করে। উপরন্তু মুজিবকে দেখা হতে থাকে ভারতের ক্রীড়ানক হিসেবে। ফলে বর্ণাশ্রমভিত্তিক হিন্দুত্ববাদের পুরনো ভয় পুনর্জাগ্রত হয়। শেষত তাঁর শাসনকালে সারা দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এরকম এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় মুজিব যখন মারা গেলেন তখন ইসলাম আবার সম্মানীয় আসনে সমাসীন হয়েছে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের হাতে পড়ে ধর্মনিরপেক্ষতা এক নিন্দনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ফলে জনগণ মুসলিম লীগ ও জামায়াত-এ-ইসলামীর কুকীর্তি এবং তারা যে পাকিস্তানীদের সাহায্য করেছিল তা ভুলতে শুরু করে। সেই সাথে তারা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় আকুল হয়ে ওঠে। এমনকি যারা তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ করেছে তাদের অনেকের কাছে শেখের আমল এক তিক্ত আশাভঙ্গের কাল হিসেবে প্রমাণিত হয়। ১৯৭৪ নাগাদ দুর্ভিক্ষ দেশকে গ্রাস করে। ফিরিয়ে আনে ১৯৪৩-এর পুরাতন ভীতি, ফিরিয়ে আনে জয়নুল আবেদীনের আঁকা বাস্তবতাকে।

অধিকন্তু, তাঁর দল প্রায় সবকটি সংসদীয় আসনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও শেখ আরো বেশি এবং আরো বেশি ক্ষমতা চাইতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ সালে

www.pathagar.com

'বাকশাল' নামক একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করে সম্পূর্ণত একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। 'বাকশাল' বর্তমানে একটি ঘৃণিত শব্দ। শব্দটি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ-এর শব্দসমূহের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত। ১৯৩০-এর দশকে ফজলুল হকের গঠন করা দলের সঙ্গে নামের দিক দিয়ে মিল থাকলেও এই দুই দলের মধ্যে ছিল বড় ধরনের পার্থক্য। বাকশালের ভেতর শুধু যে দেশী মার্কসবাদীদেরই অবস্থান ছিল তা নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এই দলের বৈদেশিক মৈত্রীও ছিল। তাছাড়া ফজলুল হক স্বপ্নেও কখনো একদলীয় রাষ্ট্র চাননি। পরিহাসের ব্যাপার হচ্ছে, মুজিবের বাকশাল যতটা না কম্যুনিস্ট ছিল তারচেয়ে বেশি ছিল কর্পোরেটিস্ট, যাকে প্রায় ফ্যাসিবাদী বলা যেতে পারে। এতে করে মনে হয় মুজিবের সরকার সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে গান্ধী-নেহরুর কংগ্রেস পার্টির আদর্শের চেয়ে সুভাষ বসুর আদর্শের মিল ছিল বেশি।

দুটি ঘটনা শেষ পর্যন্ত মুজিবকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। প্রথম ঘটনা : তাঁর দুর্নীতিপরায়ণ গোমস্তা বন্ধুদের একজনের দ্বারা এক আর্মি অফিসারের স্ত্রীর অপমানিত হওয়া; দ্বিতীয়টি, শেখের ঘনিষ্ঠ একজন ধর্ষণকারী ও হত্যাকারীর মুক্তিলাভ। এই দুই ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় দুই আর্মি অফিসার তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৫ সালের আগস্টে শেখ, তাঁর সম্পূর্ণ পরিবার এবং বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীসহ বিশজনের বেশি মানুষকে শেখের বাড়িতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা কেবল বেঁচে যান; তাঁরা তখন লন্ডনে ছিলেন। আর হত্যাকারীরা– সবাই ছিল সেনা-কর্মকর্তা– তাঁরা বেঁচেই থাকেন এবং এখনো আছেন; বাংলাদেশের সমাজে সাধারণভাবে একটি সম্মানের আসনও তাঁদের আছে। এই ব্যাপারটি দেশের রাজনীতিকে এখনো তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে।

এখন শেখের শাসনাধীন বছরগুলোর বিশ্লেষণ অনাবশ্যক হবে না। তাঁকে শুধু যে মহান ব্যক্তি বা আত্মোৎসর্গী শহীদ হিসেবে গণ্য করা হয় না তাই নয়, তাঁকে যতটা সম্মান দেখানো দরকার তা-ও দেখানো হয় না। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজনীতির নিচুশ্রেণীয়দের সঙ্গে– অসৎ গোমস্তা, দুর্বৃত্ত; যারা জমিদারদের হয়ে কৃষকদের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করত– তাদের সঙ্গে অবলীলায় মিশেছেন। তাঁর আহূত হরতালসমূহ প্রায়শ সফল হয়েছে ভাড়াটে গুণ্ডাদের সহিংসতার ভয়ে। তাছাড়া অনেকেই জানে, মুজিব বিদেশী সূত্র থেকে বিশেষত ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অর্থ পেতেন। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও অনেক সময় ধর্মঘট 'মীমাংসা' করে দেয়ার বিনিময়ে তিনি অর্থ পেতেন। তবে তিনি নিজের জন্যে কখনো অর্থ নেননি; তিনি অর্থ নিতেন তাঁর আন্দোলনের জন্যে।

www.pathagar.com

অধিকন্তু ১৯৩০-এর দশকের গোপন সংঘগুলোর সদস্যদের মতো তিনিও যেন তাঁর বন্ধুদের প্রতি অনুগত থাকার শপথ নিয়েছিলেন। এই আনুগত্য কখন? যখন তারা একজন আর্মি অফিসারের স্ত্রীকে অপমান করে, যখন তারা একজন নববধূকে ধর্ষণ করে এবং তার বরকে হত্যা করে তখনো। সত্য, সততাপূর্ণ মতপার্থক্য বা শাসন পরিচালনার জন্যে অপরিহার্য বিচক্ষণ কূটনীতি নয়, আনুগত্যই হয়ে উঠেছিল তাঁর চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি মোটেও বিচক্ষণ ছিলেন না, বরং উল্টোটাই ছিলেন। তাই আনুগত্যের খুব প্রয়োজন ছিল তাঁর এবং একবার যখন ক্ষমতায় এলেন, তিনি জনগণের সততা ও নিষ্ঠা এবং তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করলেন। তিনি যে জনগণের সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এটা যেন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না, গুরুত্বপূর্ণ ছিল আনুগত্য।

শেষত, আর দশজন বৌদ্ধিক সীমাবদ্ধতাসম্পন্ন মানুষের মতো তিনিও চেয়েছিলেন আরো ক্ষমতা এবং আরো আস্থা ও আরো আনুগত্য। দেশের একমাত্র দলের একমাত্র নেতা হতে না পারা পর্যন্ত এবং প্রেস সেন্সরশীপ, সন্দেহবশত গ্রেফতার এবং বিনাবিচারে অন্তরীণ রাখার পাকিস্তানীদের ব্যবহৃত আইনের চেয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন না করতে পারা পর্যন্ত তাঁর এই ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি। ক্ষমতামুখী হয়ে যতই তিনি এ ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থার দিকে গেছেন ততই তিনি দূরে সরে এসেছেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন তাঁর জনগণের কাছ থেকে। তখন তিনি আর জনগণের মধ্যে যান না, জনগণের প্রয়োজন-আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন না। তাঁর অন্তর্জ্ঞান, একাত্ম হওয়ার ক্ষমতা, সহানুভূতির বোধ সবই তখন তাঁকে ছেড়ে গেছে।

স্ত্রী এবং সন্তানদের মৃত্যুর পর যে মানুষটি তাঁর বাড়ির সিঁড়িতে হত্যাকারীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন সেই মানুষটি তখন আর আগের মতো সেই মানুষ নেই। ফলে যখন তিনি বলে ওঠেন, 'থাম, আমি তোমাদের বাবা!' তখন তাঁর খুনীরা মোটেই থামেনি। এ.কে-৪৭ দিয়ে তাঁকে তারা শেষ করে দেয়, তখনো তাঁর হাতে ধরা রয়েছে পাইপ। ক্ষমতা এবং বৌদ্ধিক দিক থেকে অলস উপদেষ্টাদের পরামর্শ তাঁকে এতটাই কলুষিত করে ফেলেছিল যে, বুলেটের ঝাঁক তাঁর দেহে প্রবেশ করে এমন একজন মানুষকে হত্যা করে যাঁকে কেউ চিনতো না 'আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!' নৈরাজ্যবাদী মূল্যবোধজাত শব্দগুলো জাতিকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছিল। মুজিবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই ধ্বংস সম্পূর্ণ হলো।

তাঁর মৃত্যুতে অল্পসংখ্যক মানুষই কেঁদেছিল। কোনো প্রতিবাদ সভা বা মিছিল হয়নি। পল্লী এলাকা সেদিন যেমন তেমনি পরের দিনগুলোতেও থাকে শান্ত। কেবল

www.pathagar.com

তাঁর সেরা সময়ে তাঁকে যারা জানত– তাদের মধ্যে এই লেখকও আছে– তাঁরাই শুধু কেঁদেছিল।

তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর প্রতি ইতিহাস সদয় হতে পারে না। তাঁকে জানতেন এমন একজন তাঁকে অভিহিত করেন ইতিহাসের এক অস্বাভাবিক খেয়াল হিসেবে। আমার পরিচিত এক বৃদ্ধ কৃষক আরো ভালো বলেছিলেন : 'তিনি মহান বিরাট হয়েও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি বোধহয় ঈশ্বর হতে চেয়েছিলেন।' এই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর ব্যাধি। শেখ মুজিব এই ব্যাধিতে আক্রান্ত মহান ব্যক্তিদের একজন। দেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী তাঁর স্মৃতিসৌধ। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বাকশাল নামের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ধারার সর্বময় কর্তৃত্ববাদী একনায়কতন্ত্র। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, সরকারের কাঠামো পরিবর্তন করলে একজন 'নতুন মানুষ'-এর অভ্যুদয় ঘটবে। কিন্তু নতুন মানুষ আসেনি, পুরনো আদমই নতুন করে এসেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, শেখ মুজিবের শাসনামল এবং মৃত্যুর কাহিনী সন্নিবেশিত না করা পর্যন্ত বাংলাদেশ জাদুঘরের প্রদর্শন সামগ্রী কখনো পূর্ণতা পাবে না। কারণ শেখ মুজিব নামক বিপ্লব শেখ নিজেই তাঁর লাফায়েৎ ও রবেসপিয়েরে হয়ে উঠেছেন। এবং ওয়াটারলুর আগে যেমন ফরাসী বিপ্লব সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরা যায় না, তেমনি শেখের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিপ্লব শেষ হয়েছে বলে মনে করা সম্ভব নয়। কারণ মুজিব একই সঙ্গে ছিলেন বিপ্লবের সংগঠক ও বলি। রবেসপিয়েরে যেমন ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে এবং লেনিন যেমন রাশিয়ার উদারনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তেমনি মুজিবও সুশিক্ষিত উপদেষ্টা পরিবেষ্টিত থেকে তাদের পরামর্শে উদারনৈতিক পথ ত্যাগ করে এগিয়ে গিয়েছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এক বাংলাদেশী সংস্করণের দিকে, আভ্যন্তরীণভাবে যে রাষ্ট্রের মৈত্রী ছিল দলের সঙ্গে, আর বৈদেশিকভাবে মৈত্রী ছিল আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে।

তবে এ সবকিছুর জন্যে একা শেখকে দায়ী করা যাবে না। হ্যাঁ, ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল। কিন্তু সবাই জানে কিভাবে তাঁর উপদেষ্টারা একের পর এক ভুল নীতি চাপিয়ে দিয়ে দরিদ্র বাংলাদেশকে একের পর এক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শেখ কখনোই বুঝতে পারেননি উপদেষ্টাদের পরামর্শে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করাটা তাঁরই দেয়া গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি যেন বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে পড়েছিলেন। কি করে সেখান থেকে নামবেন বা কোথায় গিয়ে থাকবেন, তা তাঁর জানার বা ঠিক করার উপায় ছিল না।

www.pathagar.com

এই কারণে শেখ আত্মোৎসর্গকারী শহীদ নন, তিনি শিকার– গোমস্তাদের অস্থিরতা এবং লোভের শিকার, সুশিক্ষিত উপদেষ্টাদের বৌদ্ধিক ঔদ্ধত্যের শিকার। এদিক থেকে দেখলে তাঁর নাম ইতিহাস থেকে একেবারে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। যত যাই হোক, অন্য যে কারো চেয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান বেশি।

এটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে স্বাধীনতাযুদ্ধ বিষয়ক প্রদর্শন অংশটিতে শেখের বাড়ির সিঁড়িও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। সেই বাড়িতে তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা একটি ছবি এবং রক্তের দাগ ও গুলিসৃষ্ট গর্ত অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করে তাঁর পিতার স্মৃতি ধরে রেখেছেন। (বাড়িটি এখন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর– *অনুবাদক*।) এই ব্যক্তি মুজিব, এত কিছু করতে চেয়েছিলেন, অথচ তাঁকে বরণ করতে হয়েছে ভয়াবহ মৃত্যু। এর কারণ তিনি এই শতাব্দীর এমন এক রাজনৈতিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন যা মানুষকে ঈশ্বর ভাবতে প্রলুব্ধ করে।

তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, কারণ তিনি যাঁদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথসহ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন এক নতুন মানুষের অভ্যুদয়। সেই মানুষ শুদ্ধতম মানুষ; যে পুরাতন মানুষের অতীতের পুরাতন আদমের স্থলাভিষিক্ত হবে। এই নতুন মানুষ বিশ্বাস করবে সামাজিক উপযোগে, সমাজতন্ত্রে এবং সমাজ পুনর্নির্মাণে, যাতে প্রতিটি মানুষ একজন নতুন মানুষ হিসেবে বিকশিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব বিস্তারি ক্ষমতা বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে পরিবর্তিত করলেও সেই সমাজের মানুষের কোনো উন্নতি ঘটায়নি। আর সে কারণেই মুজিবকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে রক্তের মধ্যে, হাতে পাইপ ধরা অবস্থায়। মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রশান্ত মুখের প্রশান্তি দূর হয়নি। তিনি ছিলেন তাঁর নিজের বিশ্বাসের বলি, তাঁর নিজের আত্মম্ভরিতার শিকার। তিনি শুরু করেন গণতন্ত্রের কথা বলে, আর মৃত্যুবরণ করেন একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করে, যেরকম রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুভাষ বসু। যে কোনো ধর্মপ্রাণ কৃষক মুজিবকে বলতে পারত, আমরা মানুষ হিসেবে জন্মেছি, মানুষ হিসেবেই মরব, এভাবেই চলবে অনন্তকাল। সামাজিক কাঠামো বদল হলেও মানুষ বদলায় না। মানুষ মানুষই থাকে। আমরা কেউই পাপমুক্ত নই, কেউ না।

তার পরেও আমরা ব্যক্তিগতভাবে মুজিবের জন্যে শোক প্রকাশ করি। তিনি ছিলেন সহজ-সরল একজন মানুষ, নিজের জাতি আর জনগণের জন্যে যাঁর ছিল কিছু সহজ-সরল বিশ্বাস। কিন্তু তিনি তাদের জন্যে যা করতে চেয়েছিলেন তা নিজেই বুঝতেন না। ফলে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তবু তিনি বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা। এই অভিধা তাঁর প্রাপ্য। একজন নিখুঁত রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রাপ্য নয়, তাঁর

www.pathagar.com

জনগণের জন্যে তাঁর নিখাদ সহানুভূতির জন্যে। মনে হয় কোনো না কোনোভাবে তাঁর অবসর জীবনের প্রয়োজন ছিল যে, সময়টায় তাঁর পরিবার তাঁকে ঘিরে থাকত, তিনি বসে থাকতেন পাইপ হাতে। আরো মনে হয় 'আমি সাইক্লোন; আমি ধ্বংস'-এর চেয়ে ভালো কোনো এপিটাক তাঁর প্রাপ্য ছিল।

যখন আপনি বাংলাদেশের জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক অংশ দেখতে যাবেন, মুজিবকে স্মরণ করবেন তাঁর সেরা সময়ের পটভূমিতে এবং তাঁর বাড়িতে তাঁর স্মৃতিসৌধে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবেন। জাতীয় জাদুঘর থেকে মোটরগাড়িতে কয়েক মিনিট লাগে সেখানে পৌঁছুতে। একজন গড়পড়তা মানুষ যতদূর উঠতে পারে তিনি ততদূরই উঠেছিলেন। আমাদের ক'জন এর চেয়ে ভালো করতে পারত?

বলা হয়ে থাকে ইতিহাস সত্য তথ্যের স্তূপ, আর আর্ট একজনমাত্র মনুষের ছবি। এটা কেন? যে কারণে জয়নুল আবেদীনের ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময় আঁকা ছবি মানবাত্মার অসহায়ত্বকে অমন মর্মস্পর্শীভাবে মূর্ত করে তোলে, অথচ জাদুঘরের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রদর্শন সামগ্রীগুলোকে মনে হয় গদ্যময়, সাংবাদিকতা-ধর্মী; সেই কারণেই ইতিহাস ও আর্টের মধ্যে এই পার্থক্য তৈরি হয়। নিজের বাড়ির সিঁড়িতে পাইপ হাতে মৃত পড়ে থাকা শেখের ছবিটাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ছবি। ছবিটাতে অসাধারণ কিছু একটা আছে, যা তাঁর সেরা সময়ের আবহকে প্রকাশ করে। ছবিটি একদিকে যেমন আমাদের এই শতাব্দীর রাজনৈতিক মানুষের মহত্ব তুলে ধরে তেমনি তুলে ধরে রাজনৈতিক আশার অসারতার কথা। সেই সাথে, সমাজ নয়, রাজনীতিই মানব জীবনের কেন্দ্রবিন্দু– এই বিশ্বাসের ভ্রান্তিও ফুটে ওঠে এই ছবিতে।

বর্তমান লেখক ১৯৭৩ সালে এক তরুণ শিল্পীর আঁকা একটি ছবি কিনেছিলেন। বিপ্লব নামক বিষয়টির শিল্পিত রূপ এত সুন্দরভাবে আর কোনো ছবিতে মূর্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ। ছবিটিতে দেখানো হয়েছে অদ্ভুত সুন্দর দুধ এবং স্ট্রবেরি রঙের আকাশে কতকগুলো শকুন উড়ছে। ঘুরে ঘুরে ওড়া পাখিগুলোর দৃষ্টি নিবদ্ধ নিচে, রাস্তার ওপর পড়ে থাকা একটি লাশের ওপর। ওই একটিমাত্র লাশ আর উপরে উড়ন্ত শকুনের দল বলে দেয় শেখের সম্পূর্ণ কাহিনী। এই শিল্পী সামাদ, জয়নুল আবেদীনের মতোই অসাধারণ নৈপুণ্যে ধরতে পেরেছেন বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের আতঙ্ককর দিকটি। ওই ছবির দিকে তাকালে শেখের কথা মনে না পড়ে পারে না। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের কাছে ময়দানে পড়ে থাকা ওই একটিমাত্র লাশ সংক্ষেপে বলে দেয় বিপ্লবের কাছে মানুষের আশা এবং সেই আশাভঙ্গের বেদনার কথা।

মুজিবের হত্যাকারীরাও যেমনটা স্বীকার করে, তিনি মারা গেছেন একটি জাতি সৃষ্টি করার (তাঁর মহত্তম উত্তরাধিকার) কারণে নয়, তিনি মারা গেছেন 'একটি বিপ্লব

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ' করার চেষ্টা করতে গিয়ে– কর্তৃত্ববাদী দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ একটি একদলীয় রাষ্ট্র গড়তে গিয়ে। তাঁকে হত্যা করা গেছে তিনি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন বলে।

তবু, তাঁকে স্মরণ করবেন সহৃদয়তার সঙ্গে। সম্মান তাঁর প্রাপ্য। কারণ, তিনি ততটুকুই বুঝতেন যতটুকু তাঁর পরামর্শদাতারা তাঁকে বোঝাত এবং তাই তিনি করতেন যা তাঁর সুশিক্ষিত উপদেষ্টারা করতে পরামর্শ দিতেন। তিনি নন, তাঁর এই উপদেষ্টা-পরামর্শদাতারাই বাকশাল ও চতুর্থ সংশোধনীর স্রষ্টা। আর শেখ, যিনি সম্ভবত সংবিধানের ১১০ অনুচ্ছেদ কখনো পড়েননি, এদের বিশ্বাস করেছিলেন, এদের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শূন্যগর্ভ এক মতাদর্শ চাপিয়ে দিয়ে তারা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাঁকে তাঁর জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। জনগণ কখনো তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, জনগণ তাঁর ভেতর থেকে সবসময় তাঁর সেরা গুণগুলোকেই বের করে এনেছে...।

www.pathagar.com

খুন ও রাজনীতির আরো গল্প

বিশাল জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যিনি একদিন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন যিনি, সেই শেখ মুজিবুর রহমান, বাঙালির বঙ্গবন্ধু, জনগণ থেকে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন দৃশ্যপট থেকে চিরতরে; অবশ্য এই তিরোভাব ছিল শারীরিক, প্রেরণাগত নয়।

তাঁর অন্তর্ধানে শোকাহত হয় বাঙালি, যদিও সেই শোক ছিল অস্ফুট, লুকোছাপা, এমনকি শান্ত। সেই শোক উত্তুঙ্গ কিংবা বিস্ফারিত ছিল না। উত্তরকালের মুজিবকে নিয়ে নয়, বরং তাদের স্মৃতিধার্য অনুপ্রেরণাময় বাঙালি ও বাংলাদেশের সৃষ্টিকর্তাকে ঘিরেই এই অনুচ্চ বেদনার মাতম। তবু এত বড় ট্রাজিক ব্যক্তিত্বের তিরোভাবে, কোনো শোভাযাত্রা বের হয়নি, কোনো সংঘর্ষ ঘটেনি। বঙ্গবন্ধুর তথাকথিত ভক্তরা রইলেন নিষ্ক্রিয় ও নিরুত্তাপ, দূরে দূরে। তবে রাতে এক অশান্ত স্তব্ধতা ছেয়ে গেল সারা দেশে, যখন শেখের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, শেখ হত্যার চক্রান্তকারী মেজর রশিদ ও ফারুকের সমর্থনে খোন্দকার মোশতাক আহমদ এক কার্যকরী সরকার গঠনে তৎপর হলেন। তবে খোন্দকার ব্যর্থ হন। শেখ মুজিবের হত্যার পেছনে ভূমিকা থাকার কারণে খোন্দকার মোশতাককে সিভিল সার্ভিস অথবা সেনাবাহিনী কেউই সমর্থন দেয়নি। তাছাড়া খোন্দকারের ব্যাপক কোনো রাজনৈতিক প্রভাবও ছিল না। অন্যদিকে শেখের অনুসারীরা ছিলেন দুর্বল এবং বিভক্ত– অবশ্যই বিভিন্ন কারণে। উত্তরকালে কেউই নিরঙ্কুশ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, যদিও বিএনপি প্রবল হয়ে ওঠার সময়ে, অর্থাৎ ১৯৯১ সাল পর্যন্ত, আওয়ামী লীগই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে রয়ে যায়। প্রায় ষোলটি বছর ধরে, এখনো পর্যন্ত, আওয়ামী লীগের হাতেই রয়ে গেছে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ; তবে এই নিয়ন্ত্রণের পেছনে দলীয় নেতৃত্ব অতটা নয় যতটা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি কার্যকর আছে।

দুর্নীতি তো ছিলই তাঁর শাসন সময়ে, ছিল তাঁর উদ্ধত অহং, আত্মকেন্দ্রিকতা ও জনবিচ্ছিন্নতা, তবু তার পরও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব এক ইতিবাচক ভূমিকা রেখে যায় এ জাতির জন্যে। তিনি ছাড়া বাঙালি মুসলমানের শতাব্দী-প্রাচীন স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভবপর হতো না। বর্ণহিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এপারের এই

www.pathagar.com

বাংলাদেশই হয়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার। এই বাঙালিরা নিজেরাই নিজেদের নিয়তির নিয়ন্ত্রক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশ কোনো জঙ্গী ইসলামপন্থী দেশ নয়, বাংলাদেশ নামক জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে। আর দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এ দেশ পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি উদারতামনষ্ক ও লিবারাল; কেননা, জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িকতা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এখনো প্রভাবশালী। সর্বোপরি যে সংবিধান নিয়ে জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের, তা আওয়ামী লীগেরই তৈরি : জাতীয় আইনের ভিত্তি হিসেবে যে সংবিধান এখনো একইভাবে বিদ্যমান।

শেখের রাজনৈতিক অভীপ্সা যুগপৎ দেশের সংবিধান ও মানুষজনের হৃদয় ও মনে প্রোথিতমূল। এশিয়ায় এমন জাতি আজ অবশ্য নেইও, যারা উগ্র ইসলামপন্থার আবেগে ধর্মীয় দিক থেকে ভিন্ন ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ওপর চড়াও হয়। বাংলাদেশে মুসলিম রাজনৈতিক দল থাকা সত্ত্বেও এখানকার জাতীয়তাবাদ অঙ্গিকার করে নিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং এই অঙ্গীকার ছিল স্বাধীনতা লাভের বিরাট এক ভিত্তি এবং এর ফলে উদ্ভূত ও বিকশিত হতে পেরেছে বহুত্ববাদী বাঙালি সংস্কৃতি। সর্বোপরি নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্যে এদেশের মানুষের আগ্রহ প্রবল। এই মনোভাব ও উত্তরাধিকারের একমাত্র উত্তমর্ণ শেখ মুজিবুর রহমান। যদিও শেষের দিকে শেখের অনুসারী উপদেষ্টারা বাকশালকেও অনুমোদন দেন; তবু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার জাতিকে সাংবিধানিক পথ ও পদ্ধতিতে পরিচালনা– কোনো একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরশাসন নয়। সাভোনারোলা, লেনিন, হিটলার কিংবা স্টালিনের বিপরীতে বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার তাই শ্রদ্ধার দাবী রাখে। সরকারের চার প্রকার মূলনীতির মধ্যে তিনি 'গণতন্ত্র'কে এড়িয়ে সাম্যবাদ ও জাতীয়তাবাদকে নির্বাচন করেন। আর তার কতিপয় অনুসারী বেছে নেন সেক্যুলারিজম ও গণতন্ত্র।

যদিও শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীনতাত্তোর রাজনৈতিক ধারায় পরিচালিত করেন; তবু যে ব্যক্তি সেই উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করে বিপ্লবকে তার বাঞ্ছিত পথে প্রবাহিত করেন এবং যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তাঁর নাম জিয়াউর রহমান; যে-রাতে মুজিব গ্রেফতার হন সে-রাতেই জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন দখল করে শেখ মুজিবের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মুজিব হত্যার পর এবং দু-দুটো ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর। [একটি খোন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে, আরেকটি ভারতীয় মদদপুষ্ট একজন সামরিক জেনারেলের নেতৃত্বে] স্বাধীনতার প্রতীক ও সেনাবাহিনী চীফ অফ স্টাফ জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেন এবং সামরিক আইন জারি করেন। তিন মাস বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাটার পর জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে চেইন-অফ-কমান্ড ফিরিয়ে আনেন এবং বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক ধারায় পুনরায় সংস্থাপন করেন। মুজিবের পরে জিয়া হয়ে ওঠেন

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশ্নাতীত নেতা এবং মুজিবের মৃত্যুর পর তিনিই ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হন। জিয়া এবং মুজিব অনেক দিক দিয়েই তুলনীয়, জিয়া বঙ্গবন্ধুর অনেক কর্মসূচিই বাস্তবায়ন করেছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসকে বদলে দেয়ার মতো ঘটনা যিনি ঘটান চট্টগ্রামে তিনি প্রথমে ছিলেন একজন মেজর, তারপর জেনারেল, তারও পরে জিয়াউর রহমান। জিয়ার ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্বের চারটি ঐতিহাসিক স্মৃতি চট্টগ্রামকে ঘিরে আছে। এই চট্টগ্রামেই মেজর জিয়া তার সৈন্যদলসমেত, মার্চ ১৯৭১-এ, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে সংঘবদ্ধ হন। জায়গাটি ছিল পতেঙ্গার একটা পার্ক যার কাছেই সমুদ্র সৈকত, যেখানে পড়ন্ত বিকেলে লোকেরা বায়ু সেবনের জন্যে বেরোয় এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যে রেডিও স্টেশন থেকে জিয়া, প্রায় ললাট লিখনের মতো, জাতির স্বাধীনতার ঘোষণা দেন– সেটি ওখান থেকে খুব দূরে নয়। জিয়ার এই ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানীদের তো বটেই বিশ্ববাসীকেও সচকিত করে। এই ঘোষণা প্রতিরোধের সংকেত তো ছিলই, অন্যদিকে এ ছিল সংগঠিত জনপ্রতিরোধেরও ইঙ্গিতবহ। 'শেখ মুজিব এখনো লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছে'– পাকিস্তানের এই মিথ্যে প্রচার দেশ ও বিদেশে প্রমাণিত হয়ে যায় জিয়ার ঘোষণার মাধ্যমে। জিয়ার জীবনের আরো দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই চট্টগ্রাম : একটি হলো সার্কিট হাউস, আরেকটি জিয়া নগর। এ সম্পর্কে পরে আরো অনেক আলোচনা হবে।

এবার দু'দশক পূর্বেকার সেই বিয়োগান্ত মার্চের আলোচনায় আসতে পারি, যখন জিয়া সমগ্র জাতিকে তার অপরিবর্তনীয় পথে পরিচালিত করেন। মুজিববাহিনীর শক্তি সঞ্চয় ও উদ্দীপনার পেছনে জিয়ার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী ছ'মাসে মুক্তিসংগ্রামের প্রচার হতে থাকে ভারতের আকাশবাণী থেকে। পরে বিবিসিও বেতারে প্রচারকার্য চালায়। শেষের দিকে শেখ মুজিবের অনুসারী তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে বেতারের প্রচার চলতে থাকে। বাংলাদেশ বেতারের প্রচার থেকে এ কথা জানা সম্ভবপর হয় যে, জিয়ার নেতৃত্বাধীন সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ত ও কুশলী সেনাদল জেড-ফোর্স থেকে অসামান্য নৈপুণ্যে যুদ্ধ করছে; জিয়ার বাহিনীর সাফল্য ও নৈপুণ্যের পেছনে প্রধান কারণ ছিল, তাঁর দল অন্যসব মুক্তিবাহিনীর মতো অপেশাদার কিংবা আনাড়ি ছিল না, জিয়া তাঁর বাহিনীকে অত্যন্ত দক্ষ করে তুলেছিলেন। চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় জিয়া তাঁর যুদ্ধ শুরু করেন, তারপর এগোন কুমিল্লা ও সিলেটের দিকে এবং সেখানটায় জিয়া বাহিনীর যে যুদ্ধ তা মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বেশ উজ্জ্বলভাবে লেখা থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধে এই ভূমিকা এবং সাফল্য জিয়ার জীবনের উত্তরকালের সাফল্যের ইঙ্গিতবাহী। এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে দেশীয় রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান

www.pathagar.com

দৃঢ়তর হয় এবং এর ফলে স্বাধীনতাত্তোর সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব তাঁর করতলগত হয়। তবে তাঁর এই যাত্রা যে খুব সহজ ছিল তা বলা যাবে না এবং তাঁর নিয়তিও অনুমেয় ও প্রায় নির্ধারিত হয়ে যায়। একজন পেশাদার নৈতিক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি বিদ্রোহী আওয়ামী লীগের গভর্নিং ক্লাসের জন্যে হুমকিস্বরূপ ছিলেন; কেননা, আওয়ামী লীগের ওই অংশটি যুদ্ধের পরিবর্তে ভারতের সঙ্গে কথামালার রাজনীতি চালিয়ে গেছেন। জিয়া হুমকি হয়ে দেখা দেন সিভিল প্রশাসন ও দিওয়ানির প্রতি; যুদ্ধের পরে জিয়া ও মুজিব সরকারের মধ্যেকার সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। কেননা, জিয়া হয়ে ওঠেন অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ; সরকারের যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে জিয়া পাকিস্তান ফেরত সংখ্যালঘু সৈনিক ও অপরাপর মুক্তিযোদ্ধাদের একমাত্র প্রতিভূ ব্যক্তিত্বরূপে আবির্ভূত হন। ব্যক্তিগতভাবে জিয়া ছিলেন কঠোর মনোভাবের অধিকারী এবং তিনি সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। স্বাধীনতার পর জিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনার গৌরবে বলীয়ান হয়ে তাদেরকে পুনরায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সেনাবাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। শেখ মুজিবকে যদি জাতির পিতা বলি, তাহলে জিয়াকে বলতে হবে সেনাবাহিনীর পিতা।

সেনাবাহিনীকে একটা বিভক্ত ও বিশৃঙ্খলা অবস্থায় আবিষ্কার করেন জিয়াউর রহমান। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন দল তো বটেই, পাকিস্তান-ফেরত বাহিনীও সেনাবাহিনীতে তাদের অস্তিত্ব ও অবস্থানের দাবি জানায়– পাকিস্তান-ফেতর বাঙালি অফিসারদের মতোই অনেকটা। এই বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ ছিল অব্যাহত, যদিও মুজিব সরকার তাতে বিশেষ গা করেনি। মুজিব মূলত অন্য একটি বাহিনী গড়ে তোলেন, যা মুজিবী আদর্শের অনুগামী– যা মূল সেনাবাহিনীর সমকক্ষ এবং যা জাতীয় সেনাবাহিনীর মর্যাদা বিভিন্নভাবে ক্ষুণ্ন করে। এই সময়ে জিয়া তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন যারা মুজিব হত্যার কারিগর। অবশ্য তাদের সঙ্গে জিয়া জড়িত হননি, তাদের তিনি রিপোর্টও করেননি। মুজিব হত্যার পর জিয়া সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সেই সুযোগ এসেও গেল, যদিও ওরকম বিশৃঙ্খলা, জটিলতা ও সময় না থাকলে পর জিয়ার সেই অবকাশ কখনোই মিলতো না।

মুজিব শাসনের শেষ দুই বছর– দুই গ্রীষ্মকাল– বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম সময় বর্ষণের বিলম্বে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং সেটা ১৯৭৪ সালের কথা; তার পরের বছর বন্যায় ভেসে গেল বাংলাদেশ এবং আমেরিকা থেকে পাঠানো খাদ্যত্রাণ যথাসময়ে পৌঁছুল না। ক্ষুধাকাতর পীড়িত গ্রামের লোকেরা এসে ভিড় জমাতে লাগল ঢাকা এবং অন্যান্য শহরে এবং সেই পরিস্থিতি বিমূঢ় করে দেয় মুজিব প্রশাসনের অন্তর-বাহির। এই অবস্থা বিফল করে দেয় সরকারকে, রেশনের দোকানের সামনে ভূখা-মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর

www.pathagar.com

হয়, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। যাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য ছিল তারা তা তড়িঘড়ি গুদাম ভর্তিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; সন্দেহ থাকল না, ১৯৪৩ সালের সেই ঐতিহাসিক আকাল পুনরাবৃত হতে চলেছে। যে দুঃস্বপ্নের আঁকিবুঁকিতে ভরে উঠেছিল জয়নুল আবেদীনের ছবি, পুনরায় বাস্তব হয়ে উঠল যেন এ বাংলায়। অবস্থার এই পরিণতি শেখ হত্যার চক্রান্তকারীদের যথেষ্ট আনুকূল্য দেয়। জিয়াউর রহমান মুজিব-হত্যা বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে পারেননি, সেজন্যে মুজিব হত্যায় প্রতিবন্ধকতাও তিনি তৈরি করেননি। জিয়ার নিষ্ক্রিয়তা ও নিরুদ্যম বঙ্গবন্ধুর হত্যার ট্রাজেডির পথ সুগম করে তোলে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার অব্যবহিত পরে যখন পরিস্থিতি ছিল মোশতাকের কব্জায় তখন সামরিক জেনারেল খালেদ মোশাররফ তাজউদ্দিনের সহযোগে ও ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সমর্থনে এক অভ্যুত্থান সংঘটিত করেন। আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা যখন আনন্দে নৃত্য করছিল রাস্তায়, তখনই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আসে জিয়াউর রহমানের জীবনে। তাজউদ্দিন ও আওয়ামী লীগকে শাসন করতে দেয়া যায় কিনা, এই ছিল তাঁর মীমাংসার বিষয়বস্তু। জিয়া মেজর তাহেরের কল্যাণে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হন এবং সিদ্ধান্ত নেন বিদ্রোহ দমনের। এ সময় মোশাররফের বিদ্রোহের মুখে খোন্দকার মোশতাক মুজিব হত্যাকারীদের নিরাপদে দেশত্যাগের সুযোগ করে দেন এবং প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডিন্যান্স জারি করে হত্যাকারীদের অপরাধ থেকে মুক্ত করেন, আর স্বয়ং পদত্যাগ করেন। অব্যবহিত পরে সেনাবাহিনী তাজউদ্দিন ও খালেদ মোশাররফের ওপর চড়াও হয় এবং অল্প সময়ের ভেতর সবাইকে হত্যা করে। এই হত্যা কোথায় হয়েছে তা নিয়ে দুটো কথা শোনা যায়; কেউ বলেন এটা হয়েছে কেন্দ্রীয় কারাগারে, কেউ বলেন বঙ্গবভনে।

এ সময় কর্নেল তাহের আওয়ামী লীগের দুর্নীতি ও মুনাফাবাজির বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন, তাঁর সেই বিদ্রোহ খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তা জওয়ানদের বিদ্রোহ নামে পরিচিত। আওয়ামী লীগের লোকেরা অনাহারে দুর্ভিক্ষে মরে যাওয়া হাজার হাজার মানুষের কথা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল, তারা চেয়েছিল মানুষের চোখ-মুখ বন্ধ করে দিতে– কর্নেল তাহের তা খুলে দেন সবার সামনে। কর্নেল তাহেরের এই বিদ্রোহ আজও স্মরণ করা হয় ফি বছর; যেমনিভাবে রশিদ এবং ফারুক মুজিব-মোশাররফ-তাজউদ্দিনের মৃত্যুদিবসকে মুক্তিদিবসরূপে স্মরণ করেন প্রত্যেক বছর।

সব কথার সারাংশ করলে এই দাঁড়ায় যে, তাহের আসলে মুজিব হত্যাকে জাস্টিফাই করেননি, তিনি তাঁর বিদ্রোহকে জনগণের আকাঙ্ক্ষার অভিপ্রকাশরূপে মূর্ত করে তুলেছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই কথাটাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, জনগণ বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু কামনা

www.pathagar.com

করেনি, জনগণ চেয়েছে ক্ষমতার বদল ও দুঃশাসনের অবসান। শেখ মুজিবকে এভাবে কেন সরিয়ে দেয়া হলো তার কারণ তিনটি। এই ত্রয়ী কারণ এখনো খোলাখুলিভাবে আলোচিত হয়নি। এই তিনটি কারণ হলো : মতাদর্শ, সেক্যুলারিজম এবং রাজাকার। এই কারণত্রয় পরস্পর প্রবিষ্ট এবং ক্ষমতায় আসার পর জিয়াকে এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে হয়।

রাজাকার দিয়ে শুরু করা যেতে পারে আলাপ, তার সঙ্গে জড়িত মুসলিম লীগ এবং জামায়াতে ইসলামী থেকে রিক্রুট করা সশস্ত্র ক্যাডার। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা অখণ্ড পাকিস্তান ও তার ঐক্য সমর্থন করে এবং ইসলামাবাদের ইয়াহিয়ার সঙ্গে দালালি করে তাদেরকে 'রাজাকার' বলা হয়। এদের অনেকেই অবশ্য সশস্ত্র ছিল না। এরা ১৯৭১ সালে বিশ্বাস করত যে, ব্রিটিশ সরকারের দেশভাগ ও অখণ্ড পাকিস্তান পরম সৌভাগ্য এবং এই অংশটি ধার্মিক ও ধর্মনিরপেক্ষ, নাগরিক ও গ্রামীণ সর্বস্তরেই ছিল। বিভিন্ন কারণ ছিল এই পাকিস্তান-মুগ্ধতার, তার মধ্যে প্রধান বোধ করি ভারত বিরোধিতার আবেগ; সেই আবেগের জন্ম হবার দুটো সূত্র আছে– এক, হিন্দুদের বর্ণবৈষম্য ও জাত-পাত ভেদ; দ্বিতীয়ত হিন্দু-জমিদারদের অত্যাচার।

ভারত-বিরোধী পাকিস্তান-মুগ্ধ এসব পাকবাহিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে মদদ যোগায়। রাজাকারদের অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা সেজে যায় বা হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থক– যাদের অনেকে কারাগারে অন্তরীণ ছিল অথবা নিহত হয়। কেউ কেউ করে আত্মহত্যা। রাজাকারদের অনেকে আবার নিঃস্বার্থভাবে পাকবাহিনীর সাহায্যে অবতীর্ণ হয়, কেউ কেউ পাকবাহিনীর পক্ষে প্রপাগাণ্ডায় নামে। কেউ কেউ নিজেদের পোস্টে থেকে পাকবাহিনীকে সাহায্য করে যায়। এরাই সক্রিয় রাজাকার। সংখ্যায় রাজাকারেরা এত বিপুল আর সর্বব্যাপী ছিল যে, মুজিব সরকার তাদের অপরাধের বিচার করতে পারেননি; কেননা, ওদের সনাক্ত করা এবং জেলে পুরে দেয়া দুই-ই বেশ শক্ত ছিল, এমনও আশংকা ছিল যে, বিচার করতে গেলে পর সরকারের নিজস্ব অনেক ঝামেলা দেখা দেবে। এরকম বিপুল জনগোষ্ঠীকে সরকারের বিরুদ্ধপক্ষ করে তোলা মুজিব সরকারের কাছে বাঞ্ছিত মনে হয়নি।

অনেকে আবার স্বেচ্ছায় রাজাকারবৃত্তি করেনি, প্রাণের ভয়ে, চাপে পড়ে করেছে। এদের কেউ কেউ পুলিশ, কেউ কেউ সিভিল প্রশাসনের লোক। এদের সক্রিয় রাজাকার বলা যাবে না। কেননা, এদের অনেকে আড়ালে মুক্তিযোদ্ধাদের মদদ করেছে।

সবশেষে আসে 'সিক্সটিন্‌থ ডিভিশনে'র কথা: এরা ছিল নিরপেক্ষ 'বীর', এরা ১৬ ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত 'নিরপেক্ষ' ছিল। পাকবাহিনী ১৬ ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণ করার পর এসব নিরপেক্ষ লোক নিজেদেরকে (বীর) মুক্তিযোদ্ধারূপে ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

এদের অনেকে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তা ও কেউ কেউ বিচারক ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে কর্তব্য পালন করে গেছেন। কেউ কেউ সুবিধাবাদীও ছিলেন, কেউ কেউ সাহসের অভাবে আনুগত্য প্রকাশ করেনি।

আজকের দিনে রাজাকারদের চিহ্নিত করা খুব কঠিন কাজ নয়; কেননা, মনে রাখা দরকার মার্কিন টরিরা এখনো ইংরেজভক্ত, আর ইংল্যান্ডের নীরদ চৌধুরী তো রয়েছেনই। ইংরেজের স্মৃতি ও নস্টালজিয়া এখনো তাদের মনোলোক ও স্বগতকথনের অনেক অংশ অধিকার করে রাখে। তাদের স্পিরিট এখনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট অথবা ফুটবল ম্যাচের কথা বলা যায়। দর্শকদের উদ্দীপনা সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন পাকিস্তান সমর্থক দর্শকদের সংখ্যা অনেক এবং তাদের মাতামাতি ও লম্ফঝম্প দেখলে মনে হয় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেনি এবং স্বাধীনতালাভের জন্যে ভারত-বাহিনীর যেন কোনো ভূমিকাই ছিল না। ইতিহাসের সকলরকম সন্ত্রাসী বিপ্লবের পেছনেই কোনো না কোনো কঠিন মতাদর্শ কাজ করে গেছে। মতাদর্শের বলিতে নাজী জার্মানির শিবিরে লাখ লাখ লোক মারা যায়, এই মতাদর্শের দোহাই দিয়ে লেনিন-স্টালিন হয়ে ওঠেন লাখ লাখ নিরাপরাধ মানুষের হত্যাকারী। লেনিন-স্টালিনের হত্যাযজ্ঞ হিটলারের চেয়েও বেশি। রাজাকারদের আখ্যানেও এই মতাদর্শই সবক'টি নিষ্ঠুরতার স্রষ্টা। স্বাধীনতার পরে এই মতাদর্শিক লেবেলের জন্যে মুজিব-প্রশাসনের সমর্থক ছিল অনেকে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারেরা যে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, বরং বিরোধিতাই করেছে– তার পেছনে কার্যকর ছিল তাদের নিজস্ব মতাদর্শ; যে মতাদর্শ আজকের গণতান্ত্রিক সাম্যপন্থী আওয়ামী মতাদর্শের তুলনায় অনেক বেশি র‍্যাডিক্যাল ও আমূলবাদী।

বাকশাল যে আন্দোলনের ভেক ধরে এবং আন্দোলনের যে লক্ষ্যবস্তু প্রস্তাব করে তা একই সঙ্গে ভীতিকর ও গণবিরোধী। বাকশাল যে আন্দোলনের ডাক দেয় তা ছিল আমূলবাদী এবং তার উদ্দেশ্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। অথচ সেই ধরনের সাম্যবাদে সাধারণ মানুষের আস্থা মেলেনি– কেননা, সাধারণ মানুষ তার সামান্য জমি-জিরাতের ক্যাপিটাল নিয়ে স্বপ্ন দেখত। এই সামান্য ভূ-সম্পত্তির ভাগ, বণ্টন ও সমতা সাধারণের অকাম্য ছিল, বাংলাদেশের শতকরা ষাট ভাগ কৃষকের জমি ছিল তখন দশ একরেরও কম; সেই সম্বলই তাদের স্বপ্ন, এই সম্বল ও স্বপ্নকে ধরে রাখতে চেয়েছে তারা।

আওয়ামী লীগের আদর্শ ও মতবাদ অন্যদিক দিয়েও ভীতি সঞ্চার করে মানুষের মনে। যেমন সেক্যুলারিজম; ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও মতাদর্শ। এই মতাদর্শ প্রচারের ফলে সরকার হয়ে ওঠে ইসলামের ঘোর শত্রু, অন্তত সাধারণ আমজনতার

www.pathagar.com

চোখে। আওয়ামী লীগের অনেক হিন্দু নেতাও এই সেক্যুলারিজম প্রচার করে, সেটাও ধর্মানুভূতিসম্পন্ন মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে সাধারণ মানুষের নিকট। তবে মাইনরিটির জন্যে সেক্যুলারিজম ভালোই ছিল।

একদিকে আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ এবং অন্যদিকে দলীয় হিন্দু নেতাদের সেক্যুলারিজম প্রচার– এই দুই ঘটনা মিলে এরকম একটি ধারণা তৈরি করে বসে যে বাংলাদেশ বুঝিবা চলে গেছে ভারতের কব্জায়। শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের বাকশালের এক আতঙ্কজনক ডিক্টেটর এবং তার পাঁচমাস পর, জুন ১৯৭৫-এ, সাম্যবাদী ইন্দিরা গান্ধী হয়ে ওঠেন ভারতের ডিক্টেটর। পাকিস্তানীরা যে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আসছিল– অর্থাৎ বাংলাদেশ হজম হয়ে যাবে ভারতের পেটে– তা অন্তত সাধারণ মানুষের সামনে জাজ্বল্যমান সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেখ মুজিব কেবিনেট মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাককে বরখাস্ত করেছিলেন, সেই খোন্দকার মোশতাক যখন শেখের মৃত্যুসংবাদ রেডিওতে ঘোষণা করেন তখন তিনি মুসলিম ঐতিহ্যসম্মত 'আসসালামু আলাইকুম' বলে শুরু করেন। মুজিবের মৃত্যুতে কেঁদেছিল পল্লীবাংলার মানুষজন; তারা বুঝতে পারে, সরকার ভারতেরও নয়, সরকার ধর্মনিরপেক্ষও নয়, তাছাড়া জনগণের সঙ্গে সরকার বিশ্বাসঘাতকতাও করেনি। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সম্পর্কে প্রথম প্রথম মানুষ এ বিশ্বাসই স্থাপন করে যে, সরকার যে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে, তার অর্থ আর কিছুই নয়, ধর্মসহিষ্ণুতা ছাড়া অর্থাৎ সরকার ধর্ম প্রসঙ্গে 'নিরপেক্ষ' অবস্থানে থাকবে। জনগণ স্বপ্নেও ভাবেনি এই জিনিস পরিণত হবে ধর্মের প্রকাশ্য বিরোধিতায়। বস্তুত মুজিবের ওপর তার উপদেশকদের প্রভাব আমজনতাকে ভাবিত করে তোলে।

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, এসব ঘটনার পরিণতি মুজিব বোঝেননি। এসব আইডিয়া তিনি সিরিয়াসভাবে ভেবেছেন বলেও মনে হয় না। কথাবস্তু ও স্টাইলের পার্থক্য মুজিবকে ভাবায়নি। সবচেয়ে বড় কথা, ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন মার্জিত মধ্যপন্থার মানুষ। ট্রাজেডির বীজও এইখানে যে, নিজের মানসিকতার ওপর নির্ভর না করে তিনি চালিত হন অন্যদের দ্বারা, যাদের ওপর দেশবাসীর কোনো আস্থা ছিল না।

জিয়াউর রহমান মুজিবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্বাধীনতার উত্তাপ, আবেগ ও উত্তেজনাকে ভিন্ন মধ্যপন্থী ভারসাম্যমূলক পথে বইয়ে দেন; ফলে থিতিয়ে যায় খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল তাহেরের বিদ্রোহ। জিয়া এমন একটি জাতীয়তাবাদ প্রস্তাব করলেন যা সর্বস্পর্শী : যাতে মাইনরিটি, উপজাতি, ধর্মীয় অনুভূতিকাতর সকল সাধারণ মানুষ– এক কথায় সবার জন্যে উপযোগী। বাংলাদেশকে তিনি অবাধ নির্বাচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মৌলিক শাসনতন্ত্রে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

www.pathagar.com

জিয়ার প্রাথমিক সমস্যা তৈরি হয় সেনাবাহিনীতে; কিন্তু চেইন-অফ-কমান্ড দিয়ে ওইসব বিদ্রোহের আগুন দ্রুত নিভিয়ে দেয়া হয়। বিদ্রোহ করেছে কখনো ইউনিট, কখনো রেজিমেন্ট, কখনো ক্যান্টনমেন্ট। অন্যদিকে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানের বন্দীত্ব উজিয়ে আসা সৈনিকদের ভেতর একটা নীরব নিঃশব্দ সংঘাত রয়েই যায়। আসল ব্যাপার ছিল তখন শৃঙ্খলা ও কমান্ড; যদিও আওয়ামী শাসনামলের পরিণতিতে সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা হয়ে ওঠে প্রায় অপ্রতিরোধ্য। সিভিলিয়ানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি সেনা ইউনিট রাজনীতি-স্পৃষ্ট হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দল-উপদল নিজ নিজ বিশ্বাস-ধারণা নিয়ে সংঘাতমুখর হয়। একক কিংবা একটিমাত্র বিশ্বাস ব্যবস্থা বা প্রত্যয় ছিল না যার ওপর নির্ভর করে সেনাবাহিনী চলতে পারে। বাইরের সিভিলিয়ান দ্বারা প্রতিটি সামরিক ইউনিট রাজনীতির প্রভাববলয়ে অন্তরীণ। এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জটা ছিল এরকম যে, সেনাবাহিনী জাতিকে সেবা করার জন্যে নিজেরাই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। কিংবা সেনাবাহিনীকে বাধ্যতামূলকভাবে ঐক্যবদ্ধ করা হবে। এরই ফলে, জিয়ার সময়, সেনাবাহিনীর ঐক্য সম্পাদনের জন্যে বিদ্রোহী ও অমান্যকারীদের হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলার সমাধানেই জিয়ার অধিকাংশ সময় কেটেছে, তার বাইরে সিভিল রাজনীতিতে মনোযোগ দেয়ার অবসর তিনি প্রায় বেরই করতে পারেননি। সেনাবাহিনীতে এই শৃঙ্খলার নিগড় তৈরি করতে করতেই জিয়ার ছয় বছর ব্যয় হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় জিয়া ওদেরই হাতে নিহত হন।

জিয়াউর রহমান এ সময় বাধ্য হয়েই অন্য অনেক সমস্যার মোকাবিলা করেন। এর মধ্যে প্রধান সিভিল সার্ভিসকে শান্ত রাখা, তাদেরকে যথোপযুক্ত বেতন, নিরাপত্তা, ট্রেনিং ও কাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালিত করা। বিদেশী অনুদান ও ঋণের সাহায্যে জিয়া এই সমস্যার আংশিক সমাধান করেন। ওদিকে বিদেশীরা চাইছিল বাংলাদেশ স্থিত হোক। মুজিব কিন্তু এই স্থিতি আনয়নের কাজ আগেই শুরু করেছিলেন। দাতাদেশগুলোকে জিয়া উন্নত সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা, পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং শিল্পোন্নয়নের জন্যে সাহায্য করতে অনুরোধ জানান। এই ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে।

বাংলাদেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সম্পর্কের তিনি উন্নতি ঘটান। পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করে তিনি ভারত-ভীতি ও কম্যুনিজম-ভীতির ব্যাধি দূর করেন। অবশেষে ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের ব্যানারে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। জিয়া ছিলেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং কার্যকরী পার্লামেন্টের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। তুলনামূলকভাবে তিনি ছিলেন জনপ্রিয়; ব্যক্তিগতভাবে তিনি কর্মোদ্যোগী, ভালো, সাহসী ও সৎ প্রকৃতির মানুষ। বাংলার কৃষক ও মাটির সঙ্গে নিজের ইমেজকে তিনি

www.pathagar.com

এমন অঙ্গাঙ্গি করে তুলেছিলেন যে, আমজনতার লোকপ্রিয় নায়কে পরিণত হন তিনি। তবে তাঁর শত্রু ছিল। কারো কারো বিশ্বাস, মুজিব-হত্যার চক্রান্ত জিয়া জেনেও না জানার ভার করেছেন; তদুপরি তাজউদ্দিন এবং মোশাররফ যখন ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছিলেন, তিনি তা দমন করেন। জিয়ার প্রতি তাঁরাও নাখোশ ছিলেন যারা মুজিব শাসনে সুবিধে পেয়েছেন এবং এদের মধ্যে সামরিক অফিসারেরাও ছিল। এরা বিদেশী সাহায্যের সুবিধে ভোগ করতে চাইতেন, যা জিয়া দিতে রাজী ছিলেন না। জিয়ার সময়ে তাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তিও হ্রস্ব হয়ে আসে। মোটকথা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা সংকুচিত করে আনছিলেন জিয়াউর রহমান এবং তাতে করে বেড়ে যাচ্ছিল সিভিলিয়ানদের ভূমিকা। একজন সৈনিক হিসেবে মার্শাল ল'র মাধ্যমেই ক্ষমতায় আসেন জিয়া; কিন্তু তবু তাঁকে কেবলি একজন সামরিক কর্তা বলা যাবে না; সামরিক শাসনে তাঁর কোনো বিশ্বাস ছিল না। পরবর্তীতে যে বা যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের সঙ্গে জিয়ার এই হলো তফাৎ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এরকম যে, মিলিটারি সরকারকে সহযোগিতা করবে। কিন্তু সরকার মিলিটারিকে সাহায্য করবে না। ক্ষমতা দখলের জন্যে জিয়া সামরিক বাহিনীর সাহায্য নেন কেবল এজন্যে যে, মুজিব সরকারের ব্যক্তিগত বাহিনীও এক ধরনের সামরিক ব্যাপার ছিল। রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর কোনো কর্পোরেট ভূমিকা থাকতে পারে, এ বিশ্বাস জিয়াকে চালিত করেনি। এ ব্যাধিটা তিনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখেছিলেন এবং বাংলাদেশে তা না ঘটুক এটাই কাম্য ছিল তাঁর।

জেনারেল মঞ্জুরের অপরিসীম উচ্চাশাই জিয়ার মৃত্যুর মূল কারণ। জেনারেল মঞ্জুর ছিলেন পাকিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, যিনি পাকিস্তানের আটকাবস্থা থেকে পলায়ন করেন এবং যুদ্ধ করতে আসেন বাংলাদেশে। নিজের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে জিয়া সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে মঞ্জুরকে নিয়োগ করতে অসম্মত হন এবং তার স্থলে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে নিয়োগ করেন। অবশ্য মঞ্জুরকে তিনি চট্টগ্রামের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। চট্টগ্রামে তখন চাকমা উপজাতিদের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধ চলছিল এবং এই সংঘর্ষ ছিল ভারতের মদদপুষ্ট। চট্টগ্রামে গিয়ে মঞ্জুর তাঁর সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। ১৯৮১ সালের মে মাসে জিয়ার সঙ্গে মঞ্জুর চট্টগ্রামে মিলিত হতে চাইলেন তাঁর দুঃখ-দুর্ভোগের বৃত্তান্ত বলার জন্যে।

অতঃপর নিজের নিয়তির দিকে ধাবিত হলেন জিয়াউর রহমান; চট্টগ্রামে গেলেন তিনি সড়কপথে, যেখানে তিনি একদা ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা, যেখানে সৈন্যদের নিয়ে তিনি যুদ্ধ করেছেন, বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মঞ্জুরের সঙ্গে জিয়ার সাক্ষাৎ যথেষ্ট প্রীতিকর ছিল; জিয়া নিজেও তা বোধ করেছেন, তাঁর সঙ্গে আর যে দুজন সফরসঙ্গী ছিল তাদেরও তাই মনে

www.pathagar.com

হয়েছে। মঞ্জুরের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে কোনো হুমকি বা ধমকের প্রয়োজন হয়নি। মঞ্জুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে জিয়া ফিরে আসেন সার্কিট হাউসে; চট্টগ্রাম ক্লাব থেকে একটু এগিয়ে একটা পাহাড়ের ওপর এই সার্কিট হাউস ব্রিটিশদেরই তৈরি। খুব সুন্দর একটা বাড়ি এই সার্কিট হাউস, সামনে বাগান তো আছেই তদুপরি ওখান থেকে চট্টগ্রাম বন্দর দেখা যায়। রাতে যখন তিনি বালিশের ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম করছিলেন, নিজেকে খুব নিরাপদই মনে হয়েছিল তাঁর।

নভেম্বর ১৯৭৪ এবং মে ১৯৮১-এর মধ্যবর্তী এই সাত বছরে বাংলাদেশ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি পুষিয়ে আনছিল। বিভিন্ন সড়ক পুনর্নির্মাণ করা হয়, শিপিং আরম্ভ হয়, শিল্পকারখারা চালু হয় ফের, বিদ্যুৎ বিস্তৃত হয় আগের তুলনায় অনেক বেশি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও বিস্তৃততর হয়; উপরন্তু পশ্চিমের আর্থিক সাহায্য আসতে শুরু করে। মোটরকার এবং হেলিকপ্টারযোগে জিয়াউর রহমান গ্রাম পরিদর্শনে যেতেন; গ্রামের সঙ্গে তাঁর অন্যরকম একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তিনি গ্রাম সরকার গঠন করেন এবং এভাবে তিনি পরিবার পরিকল্পনা ও কৃষি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। জিয়ার সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং প্রাণপণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশ একাত্ম হয়ে ওঠে। পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশ মিলিয়ে একটা আঞ্চলিক ব্লক তৈরির নেতৃত্ব দিতে চাইলেন জিয়া এবং জিয়ার তৎপরতায় বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। জিয়া অনেক কিছু করেছেন। তিনি গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনেন দেশে এবং তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশে সাংবিধানিক শাসন ফিরে আসে। জিয়া মুজিব আমলের তত্ত্ব ও বাগাড়ম্বর বাদ দিয়ে আসল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেন। অন্যদিকে সামরিক বাহিনীকে তিনি সিভিলিয়ান সরকারের প্রতি অনুগত করে রাখেন। ফলে দেশের পলিসি তৈরির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকল না; উপরন্তু সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধেও তিনি হ্রস্ব করে দেন।

জিয়ার মনে এরকম একটা বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর কার্যক্রম ও কর্মসূচি এরশাদ এবং মঞ্জুরও নিশ্চয়ই পছন্দ করছে, অন্তত নীতিগতভাবে। যে কারণে সার্কিট হাউসে সেই রাতে তিনি যখন মাথা রাখলেন নিজেকে তাঁর খুব নিরাপদই মনে হচ্ছিল। নিজের বিয়োগান্ত পরিণতি জিয়া অনুভব করলেন না মোটেও।

জিয়াউর রহমানের পলিসি মোটেও ভুল ছিল না। ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ কমিয়ে জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক উন্নয়নকেই মূলত উৎসাহ যোগান এবং এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। রাজনৈতিক উন্নয়ন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা প্রায়ই খেয়াল করেন না।

www.pathagar.com

জাতির ভবিষ্যতের জন্যে জিয়াউর রহমানের কার্যক্রম যতই ইতিবাচক হোক, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা অন্যদের ভেতর ঠিকই গজিয়ে উঠছিল। জিয়ারও শত্রু ছিল, সমালোচক ছিল, প্রতিপক্ষ ছিল। জিয়া সেটা জানতেন না তা নয়, তবে তিনি তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আগ্রহী ছিলেন। তিনি চাইতেন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হোক। এই প্রত্যাশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল এক ধরনের আবেগ, যে আবেগের তাড়নায় তিনি চট্টগ্রাম চলে গিয়েছিলেন।

সার্কিট হাউস অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখান থেকে বিকেল বেলায় সমুদ্রসৈকত ও বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জমান সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে। মেহগনি কাঠ দিয়ে সার্কিট হাউসের অভ্যন্তর সজ্জা করা হয়েছে। যাই হোক, একটা বড় সিঁড়ির ওপরের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তঁর মাথার নিচে একটা বালিশ, বালিশের নিচে একটা পিস্তল। নিষ্ক্রিয় এই ঘুমের ভেতর হঠাৎ গুলির শব্দ। জিয়া অপেক্ষা করলেন। ভয়ঙ্কর গর্জন করে সিঁড়ির নিচের দরোজা খুলে গেল, জিয়া শুনলেন। দ্রুত তিনি এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির ওপরে, তাঁর হাতে পিস্তল– একেবারে সৈনিকের মতো। কোনো সুযোগ পেলেন না তিনি। গুলির পর গুলি ভেদ করে গেল তাঁর শরীর। গুলির পর গুলি বর্ষিত হলো তাঁর ওপর; এ-কে-ফোরটি সেভেন থেকে সেভেন পয়েন্ট সিক্সটি টু পর্যন্ত বুলেট তাঁকে বিদ্ধ করেছিল।

জিয়ার হত্যা সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর মৃতদেহের অবশেষ একটা ট্রাকে করে সার্টিক হাউস থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়; যেসব রাস্তা দিয়ে তাঁর মৃতদেহের অবশেষ নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে সবে বিস্তীর্ণ জিয়ার মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিমাখা। অবশেষে কর্ণফুলী নদীর তীরের পথ ধরে তাঁর মৃতদেহ এনে রাখা হয় একটা পাহাড়ের পাদদেশে। সেখানে সৈনিকেরা একটা গর্ত খুঁড়ে তাঁর রক্তাপ্লুত শবদেহ ওখানে ফেলে দেয়। এই জায়গার নাম জিয়ানগর। জিয়ার হত্যার প্রথম স্মৃতিচিহ্ন এই জায়গা এবং এখনো জায়গাটি সেই চিহ্ন ধারণ করে আছে। জিয়ার মতোই মৃত্যু হয়েছিল মুজিবের, তাজউদ্দিনের, মোশাররফের, তাহেরের; তবে জিয়ার সমাপ্তি ওদের তুলনায় খানিকটা উত্তম।

তবে বিরূপ রাজনৈতিক নেতাদের নিয়তি এরকমই হয়। মুজিবের শাসনামলে কারাকক্ষে ফজলুল কাদের চৌধুরী মারা যান। ফজলুল কাদের পাকিস্তান সংসদের স্পীকার ছিলেন এবং ছিলেন রাজাকার; তবে তাঁর রাজাকারবৃত্তি কোনো সুবিধের অন্বেষণে নয়, এ ছিল তাঁর আদর্শ। আদর্শগতভাবে ফজলুল কাদের চৌধুরী রাজাকার ছিলেন। ফজলুল কাদের চৌধুরীর মৃত্যু শেখ মুজিব দেখেও না দেখার ভান করেন। এর পরে তো মেজর ফারুক ও মেজর রশিদের গুলিতে শেখ নিজেই প্রাণ হারান। তাজউদ্দিন ও মোশাররফও অভ্যুত্থানের খেলায় নেমেছেন। ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে চেয়েছেন তাঁরাও এবং বন্দুকের নল তাদেরও ছাড়েনি। তাহেরও একটা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং জিয়ার সম্মতিতে ফাঁসির মঞ্চে তাঁরও মৃত্যু হয় (গ্রন্থকার কর্নেল তাহেরের মৃত্যু ফায়ারিং স্কোয়াডে লিখেছেন- *অনুবাদক*)। এরপর এল জিয়ার পালা; এই জিয়াও বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে হাজারখানেক অফিসারকে হত্যা করেন। জিয়ার ট্রাজেডি সংঘটিত হলো এমন একটা অঞ্চলে, যেখানে তাঁর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। জিয়া নগরেই জিয়াউর রহমানের প্রথম সমাধি। নিয়তির যে পথ তাঁকে নির্মাণ করেছিল, সে পথই তাঁকে নিঃশেষ করে। তবে জিয়ার মৃত্যু হয় ভালোভাবে। তাঁর মৃত্যুতে অনেক মানুষ কেঁদেছে। জিয়া মৌলিক দৃষ্টিবৈভবসম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

তবে আমাদের মতো সিভিলিয়ানরা জিয়ার মতো একজন সৈনিকের মৃত্যুতে– যিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং বিয়োগান্ত পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করেন বিশেষ শোকাহত হয় না। সিভিলিয়ানদের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি এমন রয়েছেন যারা বুঝতে পারেন যে সৈনিকেরাও তাঁদের মতো মানুষ, তাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভয়-ভীতি আছে। সৈনিকদেরও গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়ে ভরসা আছে, যদিও জিয়ার মতো সৈনিক কমই মিলবে যিনি ন্যায় ও গণতন্ত্রের ওইসব আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে চেয়েছেন মুজিব, কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পর তাঁর ট্রাজিক জীবনাবসান ঘটে এবং জিয়াউর রহমান এসে সেই আদর্শকে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেন। এই দিক থেকে জিয়াকে একজন মহান ব্যক্তিত্ব বলতেই হবে। জাতির গণতান্ত্রিক সংবিধানকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন জিয়া। ক্ষমতাকে কোনো একটা জায়গায় কুক্ষিগত করতে চাননি জিয়াউর রহমান। বরং প্রাচীন রোমের সিনসিনেটাস, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন এবং ব্রিটেনের ওয়েলিংটনের মতো তিনি জাতীয় সংবিধানকে সিভিল প্রশাসনের কর্তৃত্বে প্রবাহিত করেন। এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতেও জিয়া গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য তৈরি করেন।

জিয়ার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার কিছুদিন পরে যেসব অফিসার ওই হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। চট্টগ্রাম থেকে পালানোর পথে মঞ্জুরকে গ্রেফতার করে মেরে ফেলা হয়। তবে এসব ঘটনা খুব টানে না আমাদের। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর ও কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনা হলো, আমরা এখনো জানতে পারিনি, অন্য কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহু ধরনের সংশয় জিয়ার হত্যাকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে ওঠে। জিয়াউর রহমান তাঁর বডিগার্ড ছাড়া সার্কিট হাউসে গেলেন কেন? কেনই-বা এ ধরনের একটা সাংঘাতিক ঘটনার খবর সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ আগে থেকে জানতে পারবে না? চক্রান্তকারীদের মধ্যে জেনারেল এরশাদও কি একজন ছিলেন? এরশাদ কি প্রথমে হত্যাকারীদের উৎসাহ দিয়ে পরে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন? সিভিলিয়ানদের মধ্যে কেউ কি মঞ্জুরকে সমর্থন করেছিলেন জিয়াকে হত্যা করার জন্যে? নাকি কোনো বিদেশী শক্তিও এই হত্যার পেছনে ছিল, যেমন ভারতের মতো দেশ; কেননা ভারত বিএনপিকে পছন্দ করত না। এসব ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার শেষাবধি থেকে যায়; তা হলো, যা জানি তা সন্তোষজনক নয়, অন্যদিকে সম্ভাবনা এবং আশঙ্কা ও সংশয় অন্তহীন। এক্ষেত্রে অনেকেই একটা বিশ্বাস পোষণ করেন, যেমন আমি নিজেও যে, জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পেছনে এরশাদের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী এবং কতিপয় সিভিলিয়ান কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এরশাদের সামরিক বন্ধুবান্ধব, এরশাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বক্তব্য এবং সে সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রভৃতি বিবেচনা করলে সহজেই বোঝা যায় এরশাদ নাটের গুরু ছিলেন। যদিও এরশাদ জিয়া হত্যার সবকিছু জেনেও না জানার ভান করেছেন; যেমনিভাবে জিয়া নিঃশব্দ ছিলেন মুজিব হত্যার সময়। জিয়া মুজিবকে সতর্ক করেননি, এরশাদও জিয়াকে কিছু জানতে দেননি। জিয়ার জীবনাবসানের চক্রান্ত অনেকেই জানতেন। কিছু কিছু সংবাদপত্র নিশ্চিত জিয়ার হত্যা, কথা জানত। বিদেশী কূটনীতিকদেরও ব্যাপারটি খুব অজ্ঞাত ছিল না।

'ট্রাজেডি' শব্দটিতে যে গ্রীক ব্যঞ্জনা আছে, জিয়াউর রহমানের মৃত্যু যেন তাই। জিয়ার সেই যে একটা অভিপ্রায় এবং প্রত্যয় যে, সামরিক বাহিনী সংবিধানের সেবা করবে, সংবিধান নিয়ন্ত্রণ করবে না– এটাই জিয়ার মৃত্যুর মূল কারণ। মুজিবের মৃত্যুর পর মানুষ কেঁদেছিল, জিয়ার মৃত্যুর পরও মানুষ কেঁদেছে; তবে কেউ নৃত্য করেনি রাস্তায়; এইটা একটা বড় ব্যতিক্রম। মুজিবকে অনেকে ভালোবাসত, আর জিয়াকে করত শ্রদ্ধা। জনগণ জিয়ার রক্ত চায়নি, যে রকম হয়েছিল মুজিবের ক্ষেত্রে। পাকিস্তান পর্বে বাংলাদেশীরা তাদের শাসককে হত্যা করেনি প্রায় বিশ বছরের মধ্যে; অথচ স্বাধীনতার পর এক দশকের মধ্যে তারা দু-দুজন নির্বাচিত জনপ্রিয় মুক্তিযোদ্ধা প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে– বাংলাদেশের ইতিহাসে এই এক আয়রনি। শেখের মৃত্যু হলো ধানমণ্ডিতে তাঁর প্রিয় বাড়িতে, আর জিয়ারও জীবনাবসান তাঁর প্রিয় চট্টগ্রামে।

মে ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান নিহত হন, কিন্তু তখনি এরশাদ ক্ষমতা দখল করেননি। সংবিধান অনুসারে বৃদ্ধ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তার তিনমাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে নির্বাচনের ডাক দেন। নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হলেন বাংলাদেশের মেধাবী আইনজ্ঞ আওয়ামী লীগের চাচাতুল্য ড. কামাল হোসেন। বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট সাত্তার তিনভাগের দুইভাগ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। জিয়াউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা যে মানুষের মনোলোকে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল এই সমর্থন তার প্রমাণ, অন্যদিকে মুজিবের একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের প্রত্যাখ্যানেরও এ এক দলিল।

www.pathagar.com

আশি বছরের বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট সাত্তার এই সমর্থন লাভের পর তাঁর কেবিনেট গঠন ও পার্লামেন্ট নির্মাণে মনোযোগ দিলেন। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং এই সময়ে জিয়ার বিএনপি'র অনেক লোক ভালো অবস্থান পেয়ে যায়; কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত পথে নয়। প্রেসিডেন্ট সাত্তার তাঁর পার্টিতে কে গুরুত্বপূর্ণ কে গুরুত্বহীন তা নির্ণয় করতে গিয়ে যথেষ্ট অজ্ঞতা ও আনাড়িপনার পরিচয় দেন। এসব ভুল তাঁর জন্যে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

তবে মূল হুমকি আসে সেনাবাহিনীর দিক থেকে এবং তা রাজনৈতিক হুমকি ছিল না। মঞ্জুর চলে গেলেও আশঙ্কা কমেনি। এমনও হতে পারে যে, মঞ্জুর জাতিকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন, এ নিয়ে তর্কও চলতে পারে। সত্য যা-ই হোক, সাত্তারের সংক্ষিপ্ত সময়কালে সামরিক এজেন্টরা রাজনীতিক দুর্নীতি নিয়ে বেশ কানাঘুষা করতে থাকে। এ পর্যায়ে 'জাতীয় শৃঙ্খলা' নিশ্চিত করার বিষয়ে স্থানীয় ও বিদেশী সংবাদ মাধ্যম লেখালেখি করে। বিদেশী দূতাবাসমূহ বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ায় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। ইত্তেফাকের মতো বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের সম্পাদকীয়গুলোতে মুক্ত বাণিজ্য, মুজিবী সাম্যবাদের বিপর্যয় এবং জিয়ার উদারতন্ত্রীকরণ নিয়ে লেখালেখি হতে থাকে। ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে সবাই প্রায় নিশ্চিত ছিল যে, এরশাদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের কতিপয় মুরব্বী এই ঘনায়মান অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানায় এবং এই অভিনন্দন বিগত নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধজাত। তবে কতিপয় আওয়ামী লীগারের অভিনন্দন ও উল্লাসের কথা বর্তমান গ্রন্থের লেখক ব্যক্তিগতভাবে জানে। কাজেই সে সময়ে একটাই প্রশ্ন ছিল যে, 'অভ্যুত্থান' তো হবে, কিন্তু কখন সেটা?

মার্চ মাসের শেষে অভ্যুত্থান হলো এবং অভ্যুত্থান ছিল রক্তপাতহীন। প্রেসিডেন্ট সাত্তার একযোগে অফিসার ও সামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিহত হন।

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায় এই আরোহণ ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো। এবং এই ঘটনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক বাহিনী দ্বিতীয়বারের মতো দখল করল ক্ষমতা; কিন্তু এই সময় এবং জিয়ার ক্ষমতায় আসার সময় ছিল অনেক তফাৎ। জিয়াউর রহমান একটা বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যের সময়ে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক হয়েছিলেন; কিন্তু এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ ছিল শান্তিপূর্ণ একটা সময়ে। এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন, যখন বিপুল ভোটে জয়ী গণতান্ত্রিক সরকার দেশ চালাচ্ছে এবং কোথাও কোনো গোলযোগ নেই। মার্শাল ল'র একটাই যুক্তি যে, এরশাদ ক্ষমতা চাইছে; অন্য কিছু নয়। পশ্চিম, ধর্মীয় সংগঠন বা অন্য কোনো রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে নয়, এরশাদ ক্ষমতায় চড়লেন একটা নতুন উচ্চাশী শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে।

www.pathagar.com

বিএনপি'র শত্রুরা এরশাদের সামরিক শাসনকে স্বাগত জানায়। শত্রুদের ভেতর আওয়ামী লীগাররা আছে এবং তাদের সমর্থনের নিজস্ব যুক্তিও আছে; আছে কিছুসংখ্যক সামরিক অফিসার, যারা জিয়ার মৃত্যুতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং এরশাদের অভ্যুত্থানে আনন্দিত হয়। কেননা, এরশাদ তাদের অনেক সুবিধে পুনরায় ফিরিয়ে দেবে; ব্যবসায়ী একটা শ্রেণীও এর মধ্যে আছে, যারা মুজিব সরকারের সময় জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি পুনরায় হস্তগত করতে চায়; এক উদীয়মান ব্যবসায়ী শ্রেণীও এরশাদকে স্বাগত জানায়, যারা ক্ষমতায় অংশগ্রহণের জন্যে একটি নতুন শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে বেশ উদগ্রীব হয়েছিল। এসব নতুন ব্যবসায়ী বিপর্যস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অপশিক্ষায় শিক্ষিত এবং নতুন ধরনের নৈতিকতার প্রবক্তা এবং এরা দুর্নীতিবাজ সংসদ সদস্যদের থেকে শুরু করে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে অপকর্ম করে ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা করেছে। সিভিল সার্ভিসের অনেক ব্যক্তিও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং পরে এরশাদের কেবিনেটে ঢোকে– যখন এরশাদ বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট হয়ে বসলেন। তবে দুর্নীতির কারণে অনেকে পদত্যাগও করে।

এরশাদ জিয়ার মতো পরিচিত কোনো ব্যক্তি ছিলেন না যখন এলেন তিনি ক্ষমতায়; জিয়াকে মানুষ চিনত, এরশাদকে চিনত না। মুক্তিযুদ্ধের সময় এরশাদ ছিলেন পাকিস্তানে অন্তরীণ; কাজেই তিনি এমনকি মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন না। তবে যুদ্ধের পরে এরশাদ কোনো প্রকাশ্য রাজনীতিও করেননি, যা করেছেন তা পর্দার অন্তরাল থেকে। এরশাদ অনেক রমণী ও পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় পুরুষ ছিলেন, এক ধরনের লাজুক স্বভাবের ভদ্র-সদ্র মানুষ ছিলেন তিনি; কথা বলতেন কম, বেশিরভাগ থাকতেন শ্রোতা এবং চেনা-জানার সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়েছে। তবে এরশাদের ব্যাপক সামরিক সমর্থন ছিল এবং চেইন-অফ-কমান্ডের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তিনি বেশ উপভোগ করেছেন। এর একটা কারণ ছিল যে, তিনি সামরিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের সঙ্গে পলিসি ও কার্যধারা আলোচনা করতেন এবং মনোযোগ দিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করতেন। সামরিক শাসনের প্রথমদিকে পুরনো সংসদ ভবন হয়ে ওঠে তাঁর 'সামরিক সংসদ' এবং সেখানেই তিনি তাঁর শাসনসংক্রান্ত আলোচনা করতেন। অবশেষে ইংরেজি দৈনিক '*দি নিউ নেশন*'-এ এরশাদ একটা বিবৃতি দেন এবং সেখানে সাংবিধানিক শাসনের দিকে ফেরার কথা বলা হয়। তবে সাংবিধানিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে এমন কিছু কারিগরি এরশাদ করেন, যাতে ওই শাসনের পলিসিতে মিলিটারির ভূমিকা থাকতে পারে। এরশাদের এই মনোভঙ্গি জিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা জিয়া সিভিলিয়ানদের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমিকতায় আস্থাবান ছিলেন।

যদিও সামরিক ট্রাইব্যুনালের রায়ে অনেক রাজনীতিবিদকে জেল-হাজতে যেতে হয়েছে, বৈধ কিংবা অবৈধ অভিযোগে এবং অনেক ব্যবসায়ীও মিলিটারিকে ঘুষ না

www.pathagar.com

দেয়ার অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছেন; তবু এরশাদের আট বছরের শাসনকাল মোটের ওপর শান্তই ছিল বলা যায়। তবে হ্যাঁ, কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তাঁর সময়ের; যেমন খুনী মিলিটারিদের ক্ষান্ত হওয়া, দশকের মতো দীর্ঘ কারফিউ তুলে নেয়া, বিচারহীনভাবে অন্তরীণ মুজিব-জিয়া আমলের বিভিন্ন বন্দির মুক্তি ইত্যাদি। ব্যবসায়ীরা ফিরে আসে তাদের কাজে, নতুন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে দেশব্যাপী চাকরির বাজার সম্প্রসারিত হয়। অবকাঠামোগত উন্নয়নও ঘটে, নদীর ওপর সেতু নির্মিত হয়, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চলে যায়। রপ্তানি এলাকাও স্থাপিত হয়। উপরন্তু টিউবওয়েল ইঞ্জিন থেকে শুল্ক তুলে নেয়ার ফলে কৃষকদের সুবিধে বাড়ে এবং বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মাধ্যমে রাসায়নিক সার উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়।

অর্থনৈতিকভাবে দেখা যায় এরশাদের সময়ে মানুষের গড় উপার্জন ১৩০ ডলার থেকে উন্নীত হয়ে ১৭০ ডলারে পৌঁছেছে। এরশাদের সময়ে দুর্ভিক্ষ হয়নি, বন্যা-প্লাবনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানি ঘটেছে কম– ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্গত লোকেরা যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে। এরশাদ একটা নতুন পরিকল্পনাও তৈরি করেন, যা ছিল মূলত মুজিবের চিন্তা; তা হলো, দেশব্যাপী উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা গ্রামপর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই উপজেলা বা প্রশাসনের ইউনিটগুলো খাদ্য উদ্বৃত্ত জমা করে রাখতে পারত কঠিন সময়ের জন্যে। জিয়ার গ্রাম-সরকারের তুলনায় এরশাদের উপজেলা পরিষদ অধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়।

সংক্ষেপে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্ত উৎসের সমর্থনে এরশাদের শাসনামলে বাংলাদেশে ভালো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে একে উন্নয়ন বলা যাবে না। এরশাদ কিংবা তাঁর বিদেশী সমর্থকেরা রাজনৈতিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দেননি, তাদের কাছে অর্থনৈতিক উন্নতিই ছিল একমাত্র। রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে একটি দেশের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের দরোজা খোলে এবং এমন একটি স্বাধীনতার আবহ সৃষ্টি হয় যা উদ্ভাবনাময়, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও সঠিক উন্নয়নের সহযোগী। এরশাদ রাজনৈতিক উন্নয়ন চাননি, রাজনৈতিক স্বাধীনতাও তাঁর সময়ে ছিল না। স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সমাজের যে বৃহত্তর বিকাশ ঘটে, সেটা এরশাদের বাঞ্ছিত ছিল না। রাজনৈতিক উন্নয়ন বরং এক ধাপ পিছিয়ে পড়ে তাঁর সময়। মুজিব বা জিয়া কারো মতোই ছিলেন না এরশাদ, মানুষের সঙ্গে ওদের মতো সম্পর্ক তাঁর ছিল না। জনতা বা কৃষক সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করার ক্ষমতা তাঁর ভেতর দেখা যায় না। টেলিভিশন-রেডিওতে তাঁকে নিরক্ত, পাংশুই মনে হতো। এরশাদ খুব ভালো কাপড়-চোপড় পরতেন, ছিলেন দীর্ঘকায়, কিন্তু বিচ্ছিন্ন। যদিও তিনি যে ওরকম বিচ্ছিন্নতা চাইতেন তা নয়, কিন্তু তাঁর ভঙ্গিটাই ছিল ওরকম দূরবর্তী। মন্থর গলফ

www.pathagar.com

গেম তাঁর প্রিয় ছিল, ভালো পোশাক-আশাকে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন; এবং স্মার্ট রমণীদের প্রতি তাঁর দারুণ দুর্বলতা ছিল। এই হলেন এরশাদ। এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চয়ই কোনো ম্যান-অফ-দ্য-পিপলের বৈশিষ্ট্য নয়। এরশাদের ব্যক্তিত্বে আসলে তাঁর সময়ের অপশিক্ষিত নতুন শ্রেণীর মূলবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। এরশাদ যখন সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করলেন, সংবিধান বিষয়ে তাঁর যে কোনো মহৎ আগ্রহ কিংবা বিরাট কোনো দায়িত্ব চেতন কৌতূহল ছিল– তা নয়। সংবিধানকে তিনি নৈতিকতার অর্থে গ্রহণ করেননি। এ তাঁর প্রিন্সিপলও ছিল না। সংবিধানের প্রতি জিয়ার যে আকুতি ও মমত্ববোধ ছিল তা এরশাদে অনুপস্থিত। এসব মমতা ভালোবাসা নিয়ে এরশাদ ভাবিত ছিলেন না, তাঁর ভাবনা ছিল একটাই এবং তা খুব সহজ ও সুস্পষ্ট, তা হলো : এটা তাঁর লাভ করবে না ক্ষতি করবে। তার ফলে এরশাদ যদিও সংবিধান ফিরিয়ে আনলেন– বাস্তব বা প্রেরণা কোনো দিক দিয়েই এ থেকে তিনি অভিষিক্ত হননি। একটা সংবিধান বোঝা এবং উপলব্ধির জন্যে যে মেধা ও শ্রম নিয়োগ করা দরকার, এরশাদ তাতেও উৎসাহী ছিলেন না। কাজেই সংবিধান রক্ষার জন্যে প্রাণপণ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এরশাদ অন্যসব মিলিটারি শাসনামলের মতো এইটুকু কেবল বোধ করেছেন যদি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে তাহলেই যথেষ্ট, রাজনৈতিক উন্নয়নের কোনো দরকার নেই। তাছাড়া ব্রিটিশ দূতাবাস বলি কিংবা মার্কিন দূতাবাস– কেউই তো কেয়ার করে না বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো কি হলো না। স্নায়ুযুদ্ধের বছরগুলোতে প্রায় সবাই ধরে নেয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নই সবকিছু, রাজনৈতিক উন্নয়ন পরের ব্যাপার।

যাকে বলে নির্বাচনের প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেমন ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচন, সেসব এরশাদের সময়ে বিশেষ ছিল না। এরশাদ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি সমর্থন করতেন না নির্বাচনে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবেগ এরশাদের ভেতর ছিল না, তিনি ছিলেন স্বতঃসিদ্ধতায় বিশ্বাসী। এরশাদের সময়ে শক্ত অপজিশনও লক্ষ্য করা যায় না, যেটা তাঁর সময়ের ও শসানের বিরাট দুর্বলতা।

এরশাদ তো প্রায় বিনা প্রদিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট হন; কিন্তু নিজের কর্মধারা বিষয়ে তাঁর কোনো মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। তাঁর সময়ে যেসব সমস্যা হয়েছে তিনি সম্ভবপর উপায়ে তা সমাধান করে ফেলেছেন। আর একান্ত কঠিন কোনো মুহূর্ত এলে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে তিনি খতিয়ে দেখতেন তাঁর ক্ষমতা কতটুকু এবং কতটুকু অন্যদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষ। এরশাদ উপদেষ্টা-নির্ভর ছিলেন, নতুন নতুন উপদেষ্টা তৈরি করে নিতেন তিনি এবং প্রয়োজনানুসারে তাঁদের মাধ্যমে কাজ চালাতেন। এরশাদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সংঘাত এসব এড়িয়ে চলতেন; নির্বাচনকে আমরা যে অর্থে একটা সংঘাতের মতো দেখি, এরশাদের নির্বাচন তা

www.pathagar.com

ছিল না। এরশাদ এমনকি তাঁর নিজের স্টাফদের সঙ্গেও সংঘাতে যাননি। সিদ্ধান্তের বেলায় তিনি লক্ষ্য রাখতেন যাতে কোনো সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি না হয়। অনেকটা যেন ভাগ্যনির্ভর; আট বছরে এরশাদ কোনো মৌলিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি।

এসব কারণে এরশাদ বুঝতে ব্যর্থ হন যে, বিরোধী দল তাঁর আয়তন ও পরিধি ইতিমধ্যেই মেপে ফেলেছে এবং তিনি যে সম্পূর্ণরূপে নীতিহীন সেটাও আন্দাজ করে নিয়েছেন। এরশাদকে বিরোধী দল বুঝে নেয় একেবারে বাংলাদেশের কায়দায় এবং হরতাল ও ছাত্র অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নগরের জীবন ও বিশ্ববিদ্যালয় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাঁর শাসনের শেষদিকে হরতাল-ধর্মঘট ইত্যাদির তো কোনো শেষ ছিল না এবং সেসব বন্ধ করার ক্ষমতাও এরশাদের ছিল না। এরশাদের ক্ষমতা বা প্রয়াসের মধ্যে কেবল এটুকুই বাকি ছিল যে, কোনোরকম যদি অপজিশনে ভাঙ্গন ধরানো যায়। ১৯৮৯ সাল থেকেই দেয়ালে দেয়ালে তাঁর বিরুদ্ধে লেখা হতে থাকে। যে তিনজন মন্ত্রী তাঁর কৌশলে একাত্ম হতে চাননি, তাঁদের তিনি বরখাস্ত করেন; আর ওদিকে বিরোধী দলগুলোতে আরো বেশি ঐকমত্য তৈরি হতে থাকে ও তা বাড়তে থাকে এবং এভাবে তাঁর পতন ও নিয়তি ঘনীভূত হয়।

তাঁর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা তাঁকে অপ্রিয় করে তোলে জনগণের মধ্যে; অর্থ ও নারীর প্রতি তাঁর আসক্তির কথা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তাছাড়া বিরোধী দল বুঝেছিল যে, এরশাদকে চ্যালেঞ্জ করলে তাঁর জবাব তিনি দিতে পারবেন না। অর্থাৎ পরিস্থিতি এমন হয়ে আসে যে, এখন কেবল বিমানবন্দরে অপেক্ষ্যমাণ প্লেনে উড়াল দেয়াটাই বাকি।

অক্টোবর ১৯৯০ সালে সেই সমাপ্তি ঘনিয়ে এল। এরশাদের বিরোধী দল ও ছাত্রকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়, গণ-ধর্মঘটের ডাক দেয়, তার সঙ্গে এসে যোগ দেয় বিপুল সর্বজনীন সমর্থন। এরশাদ হয়ে ওঠেন হাস্যকর এবং সেনাবাহিনীও তাকে কোনো মদদ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এরশাদ সবদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাছাড়া সেনাবাহিনীতে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভীষণ, ফলে সেনাবাহিনী ভাবতে থাকে এরশাদকে বিচ্ছিন্ন রেখে যতদূর যা করে নেয়া যায়। হরতাল বেড়ে গেল আরো, ধর্মঘট হয়ে উঠল নিত্যকার ঘটনা; এক পর্যায়ে সৈন্যরা গুলিবর্ষণেও রাজি হলো না। অবস্থা এক গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়, সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা তাতে আরো ইন্ধন জোগায়। এরশাদের নিজেদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও টলে যায়, সিকিউরিটি তাঁকে সাহায্য করবে না জানিয়ে দেয়। এরশাদের উপদেষ্টারা তাঁকে অনুরোধ করেন পালিয়ে যেতে। কিন্তু এরশাদ গেলেন না; ভাবলেন হয়তো সামলে নেয়া যাবে, হয়তো টিকে যাবেন কোনোরকমে। এই হলো তাঁর ভুল। প্রথম এবং প্রধান ভুল। ললাট লিখনের নির্দেশে চালিত হলেন এরশাদ; প্রথমে তাঁকে গৃহে অন্তরীণ করা

www.pathagar.com

হলো, তারপর পাঠিয়ে দেয়া হলো ঢাকা জেলে। এ বই যখন লিখছি, জেলে এরশাদের দু'বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। জেলে গলফ নেই, রমণী নেই, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ নেই। তদুপরি খারাপ খাবার– এ নিয়ে তিনি নালিশও করেছেন।

এরশাদ সেই ব্যক্তি যাঁকে আততায়ীরা হত্যা করেনি; এ থেকে দেশের ও বিরোধীদলীয় রাজনীতির পরিপক্কতা আন্দাজ করা যায়। ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পর এরশাদ বর্তমান লেখককে বলেছিলেন, বাংলাদেশ শাসন করার সমস্যা হলো 'তুমি জানবে কিভাবে শেষ হবে এটা; কিন্তু জানবে না 'কখন' শেষ হবে।'

ক্যান্টনমেন্টের বিরাট বাড়িতে এরশাদ থাকতেন, সেখানে শোভমান ছিল প্রেসিডেন্ট জিয়ার একখানা ছবি। এরশাদ আপাতভাবে হত্যার জন্যে প্রস্তুত থাকলেও জেল-হাজতের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তবে মৃত্যুদণ্ডের স্বপ্ন দেখেছেন বলে বছরখানেক আগে তিনি বলেছিলেন তাঁর এক মন্ত্রীকে। আমরা যারা বিদেশী কিংবা বিদেশাগত, যাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পর্কে উৎসাহ আছে, তাদের একটাই আশা যে, এরশাদের জেল ও পরিণতি যা-ই হোক, এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে খুনের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের একটা অবসান অবশ্যই ঘটবে।

উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার হলো, মুজিবকে যারা হত্যা করেছে সেই মেজর রশিদ কিংবা ফারুক এখনো বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে বাংলাদেশে; যেরকম রয়ে গেছে জিয়া হত্যার পরিকল্পনাকারীরাও। অন্যদিকে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হলো, এরশাদকে তাঁর ব্যাপক দুর্নীতি কিংবা সন্ত্রাস কিংবা একজন বৈধ নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার অপরাধে নয় বরং লাইসেন্সবিহীন একটা বন্দুক রাখার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। উক্ত বন্দুকটি ছিল এক বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের উপহার।

তবে এই ব্যাপারটি অবশ্যই ছোট করে দেখা যাবে না যে, একজন বাংলাদেশী শাসক খুব ভালোভাবে তাঁর ক্যারিয়ারে উপসংহার টেনেছেন; তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়েছে এবং বিচারক তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন; তিনি মেনে নিয়েছেন তাঁর দণ্ড এবং সেই প্রক্রিয়ায় তাঁর আপিলও চলছে। যে সংবিধান নিয়ে কোনো উৎসাহই ছিল না এরশাদের, সেই সংবিধানই তাঁকে প্রতিরোধ করেছে এবং অক্ষত রেখেছে।

এরশাদকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে তাঁর খুনের জন্যে, কারাবন্দীদের হত্যা করার জন্যে, সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করার জন্যে। এরশাদের শাসন ছিল মসৃণ, এমনকি সেনসিটিভ, মুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। তাঁর সরকারের অর্থনৈতিক পলিসি শেষ পর্যন্ত একটা বোমবিং ইকোনমির জনক এবং তার উত্তুঙ্গ প্রকাশ ঘটে ঢাকায়, তার বাইরেও। এরশাদ গ্রাম পরিদর্শনও করেছেন। এরশাদ দেখেছেন বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণসামগ্রী দুর্গত অঞ্চলে দুদ্দাড় পৌঁছে যাচ্ছে। সিভিল সার্ভিসে এক ধরনের শৃঙ্খলাও এনেছেন।

www.pathagar.com

এরশাদ যদি তাঁর শাসনামলের সাফল্য বিষয়ে পরিতৃপ্ত হতেন তাহলে তিনি বিবেচিত হতে পারতেন বাংলাদেশের একজন বড় নেতারূপে। এরশাদ যদি গণতন্ত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকতেন, তাহলে তিনি নিজের যোগ্যতায় নির্বাচিত হতে পারতেন।

এরশাদকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাদের সেজন্যে একটা দুঃখ হয় যে, তাঁর সমাপ্তি হলো কারাগারে এবং লোকেরা তাঁকে একজন প্লেবয় ও সংকীর্ণ নেতা ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। তবে যাঁরা তাঁর সমস্ত কার্যক্রম দেখেছেন, তাঁদের বিশ্বাস, এরশাদের যে উপসংহার ঘটলো, সেটা মোটের উপর ভালোই; কেননা, অন্তত এরকম তো হয়নি যে, এরশাদের পতনের সঙ্গে এমন কেউ তো ক্ষমতা নিয়ে নেয়নি যারা সংবিধান বিরোধী এবং সংবিধানের নীতিমালার সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

এরশাদ গ্রেফতার হবার পরে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত অস্থায়ী সরকার ক্ষমতার ভার নেয়। কয়েক মাস পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং বিএনপি'র খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন সংসদ সৃষ্টি হলো। অব্যবহিত পরেই সংবিধান সংশোধিত হয় এবং প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেমের বদলে পার্লামেন্টারি সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই সঙ্গে বাকশালী সংশোধনী বাতিল করে দেয়া হয়। কিছু মাস অতিবাহিত হবার পর রেফারেন্ডামের সাহায্যে এই সংশোধনী বৈধ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষমতায় সিভিলিয়ানরাই আছে, তারাই সরকার চালাচ্ছে। তবে সামরিক বাহিনী আবার ফিরবে কিনা এ নিয়ে গুজব একেবারে চলে যায়নি। আশা করি, সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করবে না। এই রকম ভরসাই করি যে, সেনাবাহিনী হয়তো এই প্রথমবারের মতো, অল্পবয়েসী এই দেশটিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হতে দেবে। তবে সেনাবাহিনীতে একটা প্রশ্ন কিন্তু আছেই, তা হলো, কোন ঐতিহ্য প্রবাহিত থাকবে বাংলাদেশে– এরশাদের? না জিয়াউর রহমানের? জিয়াউর রহমান তো বিশ্বাস করতেন, সেনাবাহিনী সংবিধানের সেবা করবে– তার উল্টোটা নয়।

তবে বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের রাজনীতি ক্রমাগত একদিক থেকে অন্যদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনো ব্রাহ্মণকতা, কখনো গজিয়ে ওঠা নতুন শ্রেণীর মতাদর্শ, কখনো ঔপনিবেশিকতা– এসবের ভেতরে বাংলাদেশ অবিরাম আবর্তিত। যে দেশে উন্নয়ন একটা নতুন শ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে, যে দেশে গণতন্ত্রের একটা অনুশীলন অব্যাহত, সেই দেশে, এখনই একজন নতুন কবির আবির্ভাবের বড় প্রয়োজন। বাংলাদেশ এমন একটা দেশ যেখানে দু'দশক ধরে একটা সংবিধান টিকে আছে, আর এই সংবিধান নিয়ে অনেকে এখনো স্বপ্নকাতর; এই সংবিধান তাঁদের প্রিয়, জাতির পথ চলার আলোকবর্তিকা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনের বিশ্লেষণে দুটো জিনিস প্রায়ই নজরে পড়ে না কারো। প্রথমটা হলো, জাতির সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশ হাইকোর্টের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

ফিরে যায়। যেমন শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্ট হন– যদিও কেবল নামেই, তবু তো 'প্রেসিডেন্ট': আবার জিয়ার মৃত্যুর পর বিচারপতি সাত্তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং পরে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট হন। এবং এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আইন ও বিচার কিংবা বিচারপতির প্রতি এই শ্রদ্ধা বাংলাদেশের একটা বিরাট দুর্লভ বৈশিষ্ট্য বলতেই হবে। আদালতের অনেক অসংগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের মানুষ আদালতের প্রতি খুবই আস্থাশীল, যেটা এশিয়ার আর কোনো দেশে দেখা যায় না। আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতি এ দেশবাসীর অপরিসীম মমতা রয়ে গেছে।

এরশাদ সরকারের পতনের অনেক কারণ ছিল; তার কিছু কিছু বিবৃত হয়েছে। তবে একটা কারণ হলো, বিরোধী দলের সম্মিলিত ঐক্য, যে ঐক্যের মূল কথা এরশাদের পতন দলমতনির্বিশেষে কাম্য। এই ঐকমত্যের মাধ্যমে লুপ্ত হয়ে যায় দলীয় ভিন্নতা এবং এই ঐকমত্য দ্বারা কোনো একটিমাত্র দল লাভবান হয়েছে এমনটা বলা যাবে না। এই ঐকমত্যের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে পরিবর্তনগুলো ঘটে, তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একটা স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও উন্মুক্ত নির্বাচন– এমন নির্বাচন যার ফলাফল আগে থেকে আন্দাজ করা সম্ভবপর হয়নি বিএনপি'র পক্ষেও নয়, আওয়ামী লীগের পক্ষেও নয়; উপরন্তু এর ভিত্তিতে সরকার ব্যবস্থায় পালাবদল ঘটে– প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি থেকে বাংলাদেশ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। উপরন্তু বাকশালের যে চতুর্থ সংশোধনী ছিল, তাও এ সময় বাতিল করা হয় এবং তাও ঐকমত্যের ভিত্তিতে। নাগরিক সমাজে যে নতুন রাজনৈতিক সজাগতা বর্তমান বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে, তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই সচেতনতা ও জাগরণের ফলে মানুষ নতুন ধরনের স্বাধীন প্রত্যয় ও আশা-ভরসায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

শেষ কথা হলো, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঐকমত্য সংবিধানের শক্তি ও অবস্থান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে; সবার ওপরে সংবিধান এবং এই সংবিধান জাতির– সেনাবাহিনী বা কোনো রাজনৈতিক দল ইচ্ছে করলেই এর অন্যথা করতে পারে না এই বিশ্বাস এখন বেশ দৃঢ়। কাজেই মুজিব বা এরশাদ, কারো পথই বাংলাদেশে গ্রাহ্য হয়নি। আশা করা যায়, এর ফলে গণতান্ত্রিকতার ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক উন্নয়নের উত্তরাধিকার তৈরি হবে, যার ফল ভোগ করবে আজ ও আগামীদিনের প্রজন্ম। গত দুই দশকে এই ক্ষুদ্র দেশটি অনেক দুঃখ ও বেদনার ভেতর দিয়ে গেছে; কিন্তু রাজনৈতিক উন্নয়নের এই পরিণতি তার মহৎ অর্জনের অন্যতম। একে ছোট করে দেখা যাবে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ আর আমেরিকা– এ দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধসূত্রটি কোথায়? বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সাহায্য প্রদান এবং ঠাণ্ডা লড়াইকালে যুক্তরাষ্ট্রের পরাশক্তির ভূমিকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মার্কিনী যেমন তেমনি বাংলাদেশীরাও– কেউই এই সম্বন্ধের প্রকৃতিটি বুঝতে পারে না। এটা দুর্ভাগ্যজনক, যদিও প্রশ্নটির জবাব যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক।

বাস্তবতার নিরিখে সম্পর্কটি সহজ-সরল না হলেও তুলনামূলকভাবে পুরাতন। এর সূচনাকাল অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের প্রায় আড়াই শতাব্দী পেছনে– ১৭৫৭ সালে ফিরে যেতে হবে, যখন গ্রেট ব্রিটেন বাংলা দখল করেছিল। এর ছাব্বিশ বছর পরে ১৭৮৩ সালে আমেরিকা মহাদেশের ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা অর্জন করে এখনকার যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে [আমেরিকা ৪ঠা জুলাই ১৯৭৬ সালে স্বাধীনতা লাভ করে; কিন্তু তখন তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে এবং ভার্সাই সন্ধির ফলে ইংরেজ সরকার আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করেন ১৯৮৩ সালে– *অনুবাদক*]। ১৭৫৭ থেকে ১৭৮৩– এই ছাব্বিশ বছর যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের শাসক ছিল অভিন্ন-ব্রিটিশ সরকার। এই অতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ সম্পর্ক সূত্রটি পরবর্তীকালেও বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে অটুট থেকেছে, যদিও উভয় পক্ষই ক্ষেত্রবিশেষে ইচ্ছাকৃতভাবে, এই সম্পর্ক সূত্রটাকে অবহেলা করেছে অথবা ভুলে থাকছে। কারণ এই সম্পর্কসূত্রটি অনেকাংশে দ্ব্যর্থতাসূচক এবং কখনো কখনো তা ছিল নিষ্ফলা ও বৈপরীত্যমূলক।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার এই সম্বন্ধটি বুঝতে হলে প্রথমেই স্মরণ করতে হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের কথা, ১৭৬৩ সালে যার নিষ্পত্তি হয়। মার্কিন ঐতিহাসিকরা একে উল্লেখ করে থাকেন 'ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধ' নামে, আর ভারতীয় ঐতিহাসিকরা একে অভিহিত করেন 'সাত বছরের যুদ্ধ' নামে। এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা কানাডা, ক্যারিবিয়ান, বাংলা এবং তেরটি আমেরিকান উপনিবেশে ফরাসীদের পরাজিত করে এবং উপনিবেশগুলো হয়ে ওঠে বর্ধিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। উপনিবেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ছিল বাংলা, যা তখন ব্রিটিশ পরিচালিত ইস্ট

www.pathagar.com

ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন ছিল। এই প্রথম 'বিশ্বযুদ্ধের' পর আমেরিকান উপনিবেশগুলোতে বসবাসকারীরা লন্ডরের সাথে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করল।

তারা দেখল, তারা, সেই সাথে জ্যামাইকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজও আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চোখের মণি হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। বরং তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নব অর্জিত সম্পদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। কোম্পানির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা দেশে ফিরে গ্রামের বাড়ি এবং পার্লামেন্টে আসন কিনে জাঁকিয়ে বসছে এবং 'নবাব' অভিধায় ভূষিত হচ্ছে। ভারত থেকে যে সম্পদ তখন আসছিল তা আমেরিকার উপনিবেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বারা লব্ধ সম্পদের চেয়ে বহুগুণ বেশি– প্রায় ৪০ লাখ পাউন্ড স্টার্লিং, এখনকার দামে প্রায় ৪ হাজার কোটি ডলার। এই সম্পদ আসছিল কর্নেল ক্লাইভের বাংলা লুণ্ঠনের ফলে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্লাইভ এই লুণ্ঠন শুরু করেন। এই সম্পদ এমন এক সময় ব্রিটেনে আসতে শুরু করে যখন ১৩টা আমেরিকান উপনিবেশ থেকে যে অর্থ আসছিল তার চেয়ে বেশি ব্রিটেনকে খরচ করতে হচ্ছিল ফরাসী ও ভারতীয় যুদ্ধে। যে সময়টায় আমেরিকার উপনিবেশগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আয় হচ্ছিল– ১৭৭০-এর দশকে টাউনশেন্ড শুল্ক আরোপিত থাকাকালে– তখনো তার পরিমাণ ছিল টেনেটুনে ৪ লাখ পাউন্ড স্টালিং।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরের সময়টাতে বিশেষ করে ১৭৬৫ থেকে ১৭৮৩ পর্যন্ত, ব্রিটেনে বাংলা ছিল সবচেয়ে গরম বিতর্কের বিষয়। সে সময়কার প্রখ্যাত সাংবাদিক কবেট লিখেছেন, পার্লামেন্টে বাজেট আলোচনায় যত সময় ব্যয় হয় ভারত সম্পর্কে আলোচনায়ও প্রায় তত সময় নেয়া হচ্ছে। কখনো কখনো বছরে ন'টা পর্যন্ত সংসদীয় নিবন্ধ (পার্লামেন্টারি পেপারস) এই বিষয়ের ওপর উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতের এত গুরুত্বলাভের কারণ আর কিছুই নয়, সেখান থেকে আসছিল অসামান্য সম্পদ, এত সম্পদ যা উত্তর আমেরিকা সম্পর্কে ব্রিটিশদের মোহমুক্তি ঘটিয়েছিল।

এটা সবার জানা যে, আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছিল টাউনশেন্ড শুল্ক আরোপের কারণে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের উদ্বৃত্ত চা যাতে ইংল্যান্ডের মাধ্যমে না পাঠিয়ে সরাসরি উপনিবেশগুলোতে পাঠাতে পারে সেজন্যে এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল। এর ফলে শুল্ক দিতে হতো উপনিবেশে বসতি স্থাপনকারীদের। যদিও এই শুল্ক কমিয়ে ইংল্যান্ড মাত্র হাজার চল্লিশেক পাউন্ড স্টার্লিং অতিরিক্ত অর্থ আয় করতে পেরেছিল এবং উপনিবেশে বসতকারীদের চায়ের জন্যে ৩০ শতাংশ কম শুল্ক দিতে হতো। তথাপি, এই শুল্কই বিপ্লবের বীজ উপ্ত করেছিল। বিপ্লব সংগঠিত করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাই যা জানে তা হচ্ছে : এই প্রতিনিধিত্বহীন শুল্কের (ট্যাক্সেশন-উইদাউট রিপ্রেজেনটেশন) অবসান ঘটানো। আরেকটি বিষয়, যা বহুলাংশে ভুলে যাওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

www.pathagar.com

সম্পর্কে উপনিবেশগুলোর ভয়– তারা এর মধ্যে জেনে গিয়েছিল কোম্পানিটি বাংলায় কি রকম লুণ্ঠনক্রিয়া চালাচ্ছে।

যাহোক, আমেরিকানরা যা-ই ভেবে থাকুক না কেন, ঘটনার নিয়ন্ত্রক ছিল ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাবিদরা। লর্ড টাউনশেন্ড, লর্ড নর্থ এবং লর্ড ফক্স যুক্তি দেখান যে, উপনিবেশগুলোকে তাদের নিজস্ব উপায়ে ইংল্যান্ডকে অর্থের যোগান দিতে হবে এবং আরো সতর্কতার সাথে তাদের শাসন করতে হবে। এই নীতির ভিত্তিতেই আমেরিকানদের সামনে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হবে। এই নীতির ভিত্তিতেই আমেরিকারনদের সামনে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হবে। সে চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। যুদ্ধ সংক্ষিপ্ত হবে এই ধারণা করে লন্ডনস্থ মন্ত্রণালয় আমেরিকায় সৈন্য পাঠায়।

ব্রিটেন আগে থেকেই স্পেন, ফ্রান্স এবং হল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এখন যুধ্যমান শক্রর তালিকায় যোগ হলো উপনিবেশগুলো। এই যুদ্ধের মাঝখানে লর্ড চ্যাটহাম (সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট) লর্ড বেকফোর্ডের পরামর্শে রাজাকে মন্ত্রণা দিলেন লর্ড নর্থকে পদচ্যুত করার। বেকফোর্ডের লন্ডনের অর্থলগ্নিকারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অতএব বলার অপেক্ষা রাখে না লর্ড নর্থকে পদচ্যুত করার পরামর্শ দেয়ার পেছনে তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ছিল। রাজা চ্যাটহামের পরামর্শ মতো কাজ করেন। এর ফলে চ্যাটহাম বাংলাকে রক্ষা করার প্রয়াস জোরদার করার সুযোগ পেলেন, তার জন্যে যদি আমেরিকার উপনিবেশগুলো হারাতে হয় তাতেও আপত্তি নেই। চ্যাটহাম যথার্থই বুঝেছিলেন, পরের বহু বছর যাবৎ ব্রিটিশ রাজকোষ ও অর্থলগ্নিকারীদের তহবিল কতটা স্ফীত থাকবে তা নির্ভর করছে বাংলার ওপর, আমেরিকার ওপর নয়। বাংলা তখন ব্রিটিশ লুণ্ঠন, ব্যাপক বন্যা এবং অপশাসনে জর্জরিত হলেও লর্ড চ্যাটহাম এবং লন্ডনের অর্থলগ্নিকারীরা এটা দেখতে এবং বুঝতে ভুল করেননি যে বাংলা ব্রিটেনের জন্যে বিপুল অর্থাগমের সম্ভাবনা প্রকাশ করছে এবং সেই অর্থ আমেরিকার উপনিবেশগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ব্যয় করার চেয়ে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনিয়োগ রক্ষার কাজে ব্যয় করা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

চ্যাটহাম যাতে তাঁর যুক্তিকে আরো শাণিত করতে পারেন সেজন্যে তাঁকে সাহায্য করেন শেলবার্ন। তিনি চ্যাটহামকে বোঝান যে, আমেরিকান উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে গেলেও তাদের সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্য অব্যাহত রাখা যাবে, ফলে উপনিবেশগুলো হারানোর ক্ষতি লন্ডনের খুব একটা গায়ে লাগবে না। কিন্তু বাংলা এবং ভারতের ব্যাপারটা আলাদা। শেলবার্নের এই যুক্তি চ্যাটহাম ও তাঁর অনুসারীদের পছন্দ হলো এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা আমেরিকায় যুদ্ধ বন্ধ করে উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দেয়ার পক্ষে সাফল্যের সাথে তাদের যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করলেন।

www.pathagar.com

চ্যাটহাম ১৭৭৮ সালে মারা যান। এর পাঁচ বছর পরে প্রথমে শেলবার্ন এবং তারপর চ্যাটহামের পুত্র উইলিয়াম পিট লন্ডন নগরী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হন। অবশেষে বেকফোর্ড, শেলবার্ন এবং উইলিয়াম পিট-এর চেষ্টায় তেরটি উপনিবেশ এবং ফ্রান্স, হল্যান্ড ও স্পেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয়; পাশাপাশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বাড়ানোর জন্যে বাংলায় প্রশাসন সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়। এভাবে বাংলাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্যে আমেরিকার উপনিবেশগুলো বিসর্জন দেয়া হয়। প্রশ্নাতীতভাবেই ব্রিটিশদের কাছে বাংলা ছিল দেশে কর-হার কম রেখে পর্যাপ্ত রাজস্ব আয়ের একমাত্র উৎস। আর লর্ড চ্যাটহাম– তিনি ভারত থেকে ভাগ্য ফেরালেও তাঁকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সঙ্গে পেনসিলভেনিয়ার পিটসবার্গ শহরের নামকরণ করে।

এভাবে প্রধানত বাংলার সম্পদের বিনিময়ে আমেরিকার উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা পেল। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলা সম্পর্কের সকল পর্যায়েই এই পরোক্ষতা লক্ষণীয়। এর একটা কারণ বাংলা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে দূরের জায়গাগুলোর একটা– যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থান থেকে প্রায় ১৮০ ডিগ্রী অক্ষাংশ দূরে। তাছাড়া নিরাপত্তা বা বাণিজ্য– কোনো দিক থেকেই বাংলা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ফলে এই দু'দেশের সম্পর্ক সবসময়ই পরোক্ষ, তির্যক এবং দ্ব্যর্থবোধক থেকে গেছে। অন্য কোনো পক্ষ বা অন্য কোনো লক্ষ্য সবসময় প্রত্যক্ষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করা যাক।

আজকাল যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের কাছেই পাটের বস্তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোর বন্দরসমূহে এবং উত্তরের শস্য উৎপাদনকারী এলাকাগুলোতে তা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। লন্ডনের বাজারে শস্য ও তুলা বিক্রি করার অন্যতম শর্ত ছিল, সব চালান পাটের বস্তায় হতে হবে। কারণ পাটের বস্তা যেমন মজবুত তেমনি তাতে ভরা শস্যের ওজন বা মাপ নেয়াও সহজ। তাছাড়া পাটের বস্তায় করে রেল, ওয়াগন বা জাহাজযোগে মাল পরিবহণ করাও সুবিধাজনক। তাই সাভানা, নিউ অর্লিয়েন্স বা শিকাগোর তুলা এবং শস্য সমান মাপের পাটের বস্তায় করে চালান দেয়া হতো। দীর্ঘদিন এটা চলেছে। একইভাবে ১৯৭০-এর দিকে কৃত্রিম তন্তু বা সিনথেটিক এসে পাটের বাজার মন্দা করে দেয়ার আগ পর্যন্ত আমেরিকায় তৈরি সব কার্পেটেরই ব্যাকিং থাকত পাটের। এভাবে প্রধানত লন্ডনের বাজারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলার মধ্যে এক ধরনের পরোক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনকি এখনো সেই সম্পর্ক কিছুমাত্রায় টিকে

www.pathagar.com

আছে। চট্টগ্রামের অল্প কয়েকটি পরিবার পেনসিলভেনিয়ার সাভানা এবং অন্যান্য স্থানের দু-একটি পরিবারের সাথে আজও যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে।

আরেকটি পরোক্ষ সম্পর্কসূত্র পাওয়া যায় আমেরিকার প্রারম্ভিক যুগের চীনা বাণিজ্যের মধ্যে। সে সময় যেসব আমেরিকান ব্যবসায়ী চীনে কার বিক্রি করত, তাদের মূল্য পরিশোধ করা হতো রুপা দিয়ে। ব্রিটিশ চা ক্রেতারা সেই রুপা ধার করত আমেরিকা থেকে। রুপার বদলে আমেরিকানরা পেত নোট, যা লন্ডনে বিনিময়যোগ্য ছিল। সেই যুদ্ধে অনেক আমেরিকান জাহাজ চীনে মাল খালাস করার পর পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বন্দরে যেত (অনেক সময়ই দেখা যেত কলকাতা বন্দরে ব্রিটিশ জাহাজের চেয়ে আমেরিকান জাহাজ বেশি) লন্ডন, নিউইয়র্ক বা বোস্টনগামী মাল নেয়ার জন্যে। লন্ডনে জাহাজগুলো পাট অথবা তুলাজাত দ্রব্য বোঝাই দিয়ে দেশে ফিরত।

আরেকটি পরোক্ষ যোগসূত্র তৈরি হয় ১৭৮৪ সালে, যখন যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডে তুলা রপ্তানি করে। ওই ঘটনায় বেশ একটা হই-চই হয়েছিল, কারণ শুল্ক কর্তৃপক্ষ ধারণা করেছিল ওই তুলা ওয়েস্ট ইন্ডিজে উৎপাদিত। তখন পর্যন্ত ব্রিটেনের বৃহত্তম তুলা সরবরাহকারী ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যাহোক, পরবর্তী তিন দশকের মধ্যে দীর্ঘ আঁশের যুক্তরাষ্ট্রীয় তুলা ম্যাঞ্চেস্টার এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র উৎপাদকদের প্রিয় সামগ্রী হয়ে ওঠে। হুইটনি কটন জিন আবিষ্কার করেন। এবং যে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পথে ছিল যুক্তরাষ্ট্রে তা নতুন করে আসন গেড়ে বসে। প্রথমদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বসতকারীরা দাস কিনত ব্রিটিশ দাস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। দক্ষিণে তুলা হয়ে ওঠে রাজা, আর ম্যাঞ্চেস্টারের উদারনৈতিকদের কাছে দাসপ্রথা হয়ে দাঁড়ায় তুলা পাওয়ার উপায়ের চাইতে সামান্য বড় একটা ব্যাপার।

এই কাহিনীতে বাংলার অবস্থান কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব ইংল্যান্ডে তুলাজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত। ১৬৯০ সালে কলকাতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তী দশকে বাংলার সঙ্গে লক্ষণীয় বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার পর ১৭০০ সালে ব্রিটেন তার নিজের উৎপাদন শিল্পের বিকাশের স্বার্থে দুটো কাজ করে। প্রথমত, বেশ কয়েক প্রকার বস্ত্রসামগ্রীর আমদানি নিষিদ্ধ করে এবং দ্বিতীয়ত, বাংলা ও ভারতের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের উপনিবেশগুলোতে এক ধরনের তুলা উৎপাদক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে ব্রিটেনের নিজস্ব বস্ত্র ও তৈরি পোশাকশিল্প ব্যাপক উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। নিজের বস্ত্রশিল্পের যত উন্নতি হতে লাগল ব্রিটেন ততই বাংলার বস্ত্র উৎপাদন কমিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে লাগল।

ব্রিটিশ বস্ত্র রফতানির পরিমাণ যখন বেড়ে গেল, তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে তুলা উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছিল না। এ

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান করল যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে তখন তুলা উৎপাদন ক্রমশ বাড়ছে। অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ওয়েস্ট ইন্ডিজের তুলার স্থান নিতে শুরু করল। ব্রিটেন এবং তার সাবেক উপনিবেশগুলো যখন এভাবে ক্ষণে ক্ষণে উপকৃত হচ্ছে তখন বাংলা ক্রমশ দুর্দশায় নিপতিত হচ্ছে। এই অবস্থা চরম রূপ নেয় যখন যুক্তরাষ্ট্রের সুতায় উৎপাদিত ব্রিটিশ বস্ত্রসামগ্রী বাংলায় এবং ভারতে বিক্রি শুরু হয়। ১৮৩০-এর দশক নাগাদ যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের প্রধান তুলা সরবরাহকারী হয়ে ওঠে, অন্যদিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বস্ত্রশিল্প বাংলার বিপুল সম্পদ আহরণের উৎস ছিল, এই সময় নাগাদ তা হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত। এভাবেই ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষভাবে বাংলার বস্ত্রশিল্পের ক্ষয়ের দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

তুলা রাজের এই প্যাঁচাল কাহিনীর একটি কৌতূহলোদ্দীপক পাদটীকা হচ্ছে দাসপ্রথা। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটেন এক রাজকীয় বৈবাহিক চুক্তির অংশ হিসেবে পর্তুগালের কাছ থেকে দাস ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। পরে যখন ব্রিটেন বস্ত্রসামগ্রীর জন্যে বাংলার ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে চাইল তখন যুক্তরাষ্ট্রে তুলার উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে দাসের প্রয়োজন দেখা দিল। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা আফ্রিকাস্থ ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে দাস কিনতে শুরু করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের তুলা শিল্প দাসপ্রথার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার পর খুব বেশিদিন যাওয়ার আগেই, ১৮০৮ সালে, ইংল্যান্ড দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করে। এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ব্রিটিশ নাগরিকেরা দক্ষিণের ক্রম প্রসারমান তুলা ক্ষেত্রগুলোর জন্যে দাস সরবরাহ অব্যাহত রাখে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলার মধ্যে আরো একটি পরোক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল যা হেরোইন ব্যবসার উদ্ভবের সাথে সম্পর্কিত। এই কাহিনীর শুরু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। সে সময় ব্রিটেন চায়ের মূল্য পরিশোধে সহায়তার জন্যে চীনে আর বাংলার বস্ত্রসামগ্রী রপ্তানি করে না বা করতে চায় না। ফলে ব্রিটেনের চীনা বাণিজ্যে ভারসাম্য আনার জন্যে বিকল্প রপ্তানি পণ্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখা দিল। চীনে যুক্তরাষ্ট্রের ফার রপ্তানিকারকদের জন্যে অনেক বড় বাজার থাকলেও ব্রিটিশ পণ্য উৎপাদকদের বাজার সেখানে ছিল সীমিত। যাহোক, আকস্মিকভাবেই ব্রিটেন ভারতে উৎপাদিত আফিম চীনে রপ্তানি শুরু করে। এই রপ্তানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা জন স্টুয়ার্ট মিল। বিশিষ্ট উদারনৈতিক চিন্তাবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল আর তিনি একই ব্যক্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে এই ব্যবসা বিরাট আয়তন লাভ করে। শেষ পর্যন্ত এই আফিম ব্যবসার কারণে ব্রিটেনকে চীনের সাথে দু'দুটি যুদ্ধ লড়তে হয়েছিল। চীন চাইছিল এই 'ব্যবসা' বন্ধ করতে। কিন্তু ব্রিটেন তা করতে রাজী ছিল

www.pathagar.com

না। কারণ এই ব্যবসার দ্বারা ভারতকে কণামাত্র সমৃদ্ধ না করেও ব্রিটেন বিপুল সম্পদ আহরণের পাশাপাশি এশিয়ায় ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারছিল। আর যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে দেখলে, আফিম ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ লন্ডনের পুঁজি বাজারকে সমৃদ্ধ করছিল, ফলে তাদেরকে জাহাজ ভরে আর ধাতব মুদ্রা চীনে নিতে হতো না। এই সূত্রে আমেরিকার জন্যে ঋণ পাওয়াও সহজ হয়ে উঠেছিল।

'সরকারি' যোগসূত্র প্রসঙ্গে বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বড় ধরনের একটা যোগাযোগ ঘটেছিল। অবশ্য সেটাও ছিল পরোক্ষ যোগাযোগ। জাপান আসাম ও বার্মা আক্রমণ করার পর যুক্তরাষ্ট্র ভারত রক্ষায় ব্রিটেনকে সাহায্য করার জন্যে বিরাট এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। জেনারেল স্টিলওয়েলের নেতৃত্বে মার্কিন বাহিনী কলকাতা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় অবস্থান নেয় এবং জাপানীদের পরাজিত করে বার্মা মুক্ত করায় সাহায্য করে। জেনারেল স্টিলওয়েল ছিলেন চীনে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। সে সময় বহুসংখ্যক মার্কিন পাইলট সাফল্যের সঙ্গে হিমালয়ের 'কুঁজ'-এর ওপর দিয়ে বিপুল পরিমাণ মালামাল পরিবহন করে অবরুদ্ধ চীনকে স্বস্তি দিয়েছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সবল প্রয়াস পরোক্ষভাবে বাংলাকে সাহায্য করেছে; প্রথমত, জাপানীদের প্রতিহত করার মাধ্যমে; দ্বিতীয়ত, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশটিতে খাদ্য সরবরাহে সহায়তা করার দ্বারা।

যুদ্ধ শেষ হলে পরে, যুদ্ধের সময় সহায়তা করার মূল্য বাবদ এবং যুদ্ধোত্তরকালীন ঋণ হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের ওপর তার সাম্রাজ্যকে অবাধ বাণিজ্যের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়ার চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের কারণে ব্রিটেন ১৯৩৩ সালের ইম্পেরিয়াল ট্যারিফ প্রেফারেন্সেজ সংশোধন করে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য ভারত এবং অন্য সব ব্রিটিশ উপনিবেশে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পায়। এই পরোক্ষ বিষয়টির সঙ্গে ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল কূটনৈতিক চাপ (আত্মসেবামূলক একটি অবস্থান, যা ছিল আদর্শবাদী বাগাড়ম্বর ও ব্রিটেনের ওপর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাজাত) যুক্ত হওয়ায় ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ত্বরান্বিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলা সম্পর্কের দিক থেকে বিচার করলে ওই বছরটি বেশ তাৎপর্যবহ। ১৬৪ বছরব্যাপী এক কালপর্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা করছে বছরটি– যে কালপর্যায়ের সূচনা ১৭৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে এবং অন্য সব দেশকে বাংলাসহ ভারতের দিকে তাকাতে হতো সম্পূর্ণ ব্রিটিশ চোখ দিয়ে, লেনদেনও করতে হতো ব্রিটেনের মাধ্যমে। এতে বাংলার অবস্থার যে খুব একটা হেরফের হয়েছিল তা অবশ্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা খুব একটা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ছিল না। বরং মাত্র দু'দশক আগে, বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালে এর বিপরীতটাই ছিল সত্য।

ঘটনাটি ঘটে ১৯৭১ সালে যখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের চরম মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র ঠাণ্ডা লড়াই অবসানের লক্ষ্য নিয়ে কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের এক গোপন কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়। উপায়টা ছিল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী (পরে প্রেসিডেন্ট) ভুট্টো মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এই কূটনৈতিক উদ্যোগের সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাময় মুহূর্তে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। লর্ড চ্যাটহাম যা করেছিলেন এ সময় হেনরি কিসিঞ্জার তার উল্টোটা করলেন। বাংলার পক্ষ না নিয়ে তিনি নিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ কনসাল জেনারেল তখন বারবার তাগিদ দিয়ে চলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষই নেয়া উচিত। এভাবেই ঘটে ব্যাপারটি, যাকে এখন পর্যন্ত অনেকে পাকিস্তানের অন্যায় কাজের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব বলে গণ্য করে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই পক্ষ বাছাই যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ককে এমন তিক্ত করে তোলে যার রেশ বহু বছর অব্যাহত থেকেছে। তাছাড়া ব্যাপারটি বাংলাদেশে এমন এক যুক্তরাষ্ট্র বিরোধিতার উত্তরাধিকার রেখে গেছে যা মাঝে-মধ্যেই উস্কে ওঠে। যেমন ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় বিক্ষুব্ধ জনতা ঢাকাস্থ আমেরিকান ক্লাবের [আমেরিকান ক্লাব বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব বাংলাদেশে নেই। 'আমেরিকান ক্লাব'-এর স্থলে হবে 'আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিস', ঢাকাস্থ ইউসিস অফিসে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালায়– *অনুবাদক*] বিপুল ক্ষতি সাধন করে এবং অনেক বাংলাদেশী দাবি জানায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন প্রয়াসের সহায়তার জন্যে পাঠানো বাংলাদেশী সৈন্যদের যেন যুদ্ধে ব্যবহার করা না হয়। কিসিঞ্জার পাকিস্তানের পক্ষ নেয়ায় বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় ১৯৭৬-এর আগে তা শুকায়নি। অবশ্য কিসিঞ্জারের পক্ষাবলম্বন যে সঠিক ছিল তা পরে প্রমাণিত হয়েছে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের ঐতিহাসিক চীন সফরের মধ্য দিয়ে। আসলে সে সময়কার সেই উত্তপ্ত অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের তাৎপর্য অনেক আমেরিকান এবং অধিকাংশ বাংলাদেশীর পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা চীনা মিশনের কথা জেনেছিলেন অনেক পরে।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলা সম্পর্কের পরোক্ষতার ব্যাপারটি এখনো একদিক থেকে বজায় আছে। যেমন : ১৯৭১ সালের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সময় যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান শক্তি তথা আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে ঘোষণা করে। যে আশা থেকে এই ঘোষণা দেয়া হয় তা হচ্ছে, শুভবুদ্ধি ও আন্তর্জাতিক আইনের সীমায় থেকে ভারত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্যে দায়বদ্ধ থাকবে। বস্তুত, ভারত ইতিমধ্যে সেই ভূমিকা পালন করেছে একবার ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সাহায্য করে, আরেকবার ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে শ্রীলঙ্কার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করে। অতএব, পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভারতের ওপর নির্ভর করে যুক্তরাষ্ট্র বোধগম্যভাবেই বাংলাদেশকে ভারতীয় প্রিজমের ভেতর দিয়ে দেখেছে। এর আরো একটা কারণ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দারিদ্র্য এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে দক্ষিণ এশিয়ার এবং সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর বার্মারও অস্থিতিশীলতার সম্ভাব্য উৎস হিসেবে দেখে থাকে।

আরেকটি উদাহরণ : অর্থনীতির আধুনিকীকরণে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে এবং দেশকে স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাখায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহায়তা করছে। এর বাইরে অফিসার প্রশিক্ষণের অতিরিক্ত তেমন কোনো সামরিক সহযোগিতা স্বার্থ যুক্তরাষ্ট্রের নেই। সত্যি কথা বলতে কি, ঠাণ্ডা লড়াই অবসানের পরিপ্রেক্ষিতে কেবল পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এর কারণ পাকিস্তানের পারমাণবিক সামর্থ্য। তবে সম্ভব হলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথেও বোঝাপড়া করবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এদেশের ধারণা বেশ কয়েকটি লৌকিক কল্পকাহিনীর রঙে রঞ্জিত। যুক্তরাষ্ট্রের মতলব সম্পর্কিত এই কাহিনীগুলোর সৃষ্টি অংশত ব্রিটেনের দ্বারা, অংশত ব্রিটিশ প্রভাবিত বাংলাদেশী বস্তুনিষ্ঠদের দ্বারা। যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী অনুভূতির জন্ম দেয়ার জন্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র যখন ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা দেয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছিল তখন ব্রিটিশরা পাঁকে প্রকারে এবং গুজব ছড়িয়ে এমন ধারণার জন্ম দেয় যে, ব্রিটেন চলে গেলে যুক্তরাষ্ট্র এসে ভারতের দখল নেবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থূলতা ও সম্পদ ব্রিটিশদের অপছন্দের কারণ ছিল। ব্রিটিশ ভাবধারায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মনেও এই অপছন্দ কম-বেশি সঞ্চারিত হয়েছিল। এর সঙ্গে এই গুজব যুক্ত হয়ে আমেরিকানদের যে ভাবমূর্তি দাঁড়াল তা হচ্ছে তারা কুশিক্ষিত, দরাজ দিল; তবে আহাম্মক, অলস, অস্থিরমতি এবং আরো খারাপ যেটা, তারা অত্যন্ত শঠ প্রকৃতির।

এই মার্কিন বিরোধী অনুভূতি আরো উদ্দীপিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, যখন দেশে বেড়ে ওঠা কম্যুনিস্টরা যুক্তরাষ্ট্রকে নব্য সাম্রাজ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করে। এই কম্যুনিস্টরা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানগুলোকে সমর্থন করে কুখ্যাতি কুড়িয়েছিল। এখন জনসমর্থন লাভের জন্যে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিন্দা ছড়াতে

www.pathagar.com

থাকে। সমগ্র ঠাণ্ডা লড়াইকালে এ ধরনের দাবি এবং প্রচারণা চালিয়ে এই কম্যুনিস্টরা এবং আরো কিছু বাংলাদেশী নেতা যুক্তরাষ্ট্রকে তুলে ধরে বাংলা, বাংলাদেশ এবং সমগ্র ভারতের জন্যে এক হুমকি হিসেবে। পূর্ব এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং কৌশলগত (স্ট্রাটেজিক) স্বার্থ অকিঞ্চিৎকর হওয়া সত্ত্বেও এই প্রচারণা চালানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে এমন নেতিবাচক ধারণা পাকিস্তান আমলেও বিস্তারলাভ করেছে; কেননা, সে সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রদত্ত সাহায্যের অধিকাংশই যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। এর কারণে পশ্চিম পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছাকাছি হওয়ায় তার কৌশলগত গুরুত্ব দারিদ্র্যপীড়িত, প্রাকৃতিক সম্পদে দরিদ্র, জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে বেশি ছিল। অধিকন্তু, ১৯৬০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী বামপন্থী আন্দোলনের পুনরুত্থান, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে চরমপন্থী নক্সালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মিত্রতা ও পাকিস্তানের শত্রুতার মতো ব্যাপারগুলোর প্রভাবে ১৯৪৭-৭১ কাল পর্যায়ে বাংলাদেশীদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭২ সালে কিসিঞ্জারের পাকিস্তানের দিকে 'ঝোঁক' এই ক্ষতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

শেষত এবং এবারও পরোক্ষভাবে, যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আরেকটি কুখ্যাত 'ঝোঁক' বা পক্ষাবলম্বনের কারণে। এই বিষয়টির কেন্দ্রস্থলের সত্যটি হচ্ছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে, এবং বাংলাদেশে কিছু উপজাতীয় মানুষ রয়েছে যারা জাতিগতভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়। চট্টগ্রাম জেলা এবং মধ্যাঞ্চলীয় বাংলাদেশের কিছু অংশ এক সময় আরাকান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আজকের বার্মা থেকে মগরা এই অঞ্চল শাসন করত। এই সত্যের আলোকে ব্র্যাক বাংলাদেশকালে পাকিস্তান সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা সিয়াটোতে যোগ দেয়। সিয়াটো ছিল ন্যাটোর এশীয় রূপ। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের আগে ও সমসাময়িককালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতন্ত্রায়ণ প্রয়াসের সহায়তার জন্যে এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক শক্তি। যাহোক, পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান পরাজিত হলে সে সিয়াটো থেকে বেরিয়ে আসে। এই সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে 'ঝুঁকে' ছিল বলে বাংলাদেশ সিয়াটোতে যোগ দেয়নি।

এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি ব্যাপার ছিল যা যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ককে টানটান উত্তেজনাময় করে রেখেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, এখন পর্যন্ত এই উত্তেজনার সর্বাঙ্গীণ অবসান হয়নি। ব্যাপারটি হচ্ছে : ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় অনেক উচ্চপদস্থ বাংলাদেশী এবং অন্য অনেকে মনে করতেন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের

www.pathagar.com

সাগর-পথগুলো 'নিয়ন্ত্রণ' করার জন্যে বঙ্গোপসাগরে একটি সামরিক ঘাঁটি গড়তে চায়। অনেকে এখনো মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ করায়ত্ত করার ফিকিরে আছে। ফলে ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভয়াবহ হারিকেন ও জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানার পর যখন ত্রাণকাজে সহায়তার জন্যে মার্কিন সৈন্য পাঠানো হয় তখন অনেকেই অসহায় হাসি হেসে ভেবেছিলেন, এবার যুক্তরাষ্ট্র তার দীর্ঘ লালিত লক্ষ্য অর্জন করতে যাচ্ছে। তখন আরো একটি কারণে এই ধারণা বেশ জোরালো হয়েছিল যে, এমন এক সময় এই উদ্ধার তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন দেখা দেয় যখন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন থেকে তার নৌ-ঘাঁটিটি বঙ্গোপসাগরের পূর্ব প্রবেশদ্বার সিঙ্গাপুরে সরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কিছু কিছু বাংলাদেশীর এই ধারণাশক্তি পায় কয়েকটি ভৌগোলিক বাস্তবতা থেকে। যেমন– তেল, খনিজ এবং বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চলীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীন পৃথিবীর সবচেয়ে কম স্থিতিশীল অঞ্চলগুলোর অন্যতম। অঞ্চলটি বার্মা, লাওস, ভিয়েতনাম, ভারত এবং বাংলাদেশের ঠিক উত্তরে অবস্থিত। এর সন্নিহিত অঞ্চলগুলোতে রয়েছে ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অংশবিশেষের বিপুল জনগোষ্ঠী। এই অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর বার্মায় চীনের স্বার্থ এবং সমগ্র বার্মায় (একসময় ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল) ভারতের ঐতিহ্যগত স্বার্থের দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় এই অঞ্চলে সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দেয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে। আর একবার যদি তা ঘটে, সেক্ষেত্রে আশপাশের অঞ্চলেও সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই তেমন সময় যদি কখনো আসে, যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করবে না। এটা এক দীর্ঘমেয়াদী উদ্বেগের বিষয় হলেও তা যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্রান্তিক ভূমিকা পালন করছে। এই ভূমিকা বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ স্বার্থ আছে বলে নয়, বাংলাদেশ সন্নিহিত অঞ্চলগুলো– যেমন চীন এবং ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে সেসব অঞ্চলের কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকা।

এবার আসা যাক যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ইতিবাচক দিকগুলোর প্রসঙ্গে। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসে ১৯৭৫-এর পর থেকে বাংলাদেশকে দেয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের কথা, যা বাংলাদেশকে অগ্রগতি অর্জনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। সামগ্রিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাহায্যদাতা। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রতিরোধের জন্যে খাদ্য সহায়তা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে সাহায্য এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন, সড়ক-সেতু ও অন্যান্য অবকাঠমো নির্মাণ এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে সাহায্য করে থাকে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল মজুদ আবিষ্কার হওয়ার ফলে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের

www.pathagar.com

সহায়তায় অনেকগুলো গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও নাইট্রোজেনঘটিত সার কারখানা নির্মিত হতে পেরেছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের খোলাবাজার নীতি অনুসরণের ফলে বাংলাদেশে এক বর্ধিষ্ণু গার্মেন্ট শিল্প গড়ে তুলতে পেরেছে। এসবই বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ইতিবাচক দিক। এছাড়া এই সম্পর্ক উন্নয়নে অবদান রেখেছেন এবং এখনো রাখছেন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতরা ও তাঁদের স্টাফবৃন্দ, যাঁরা বাংলাদেশ এবং এর সমস্যাবলী ও সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কে আগ্রহী এবং মানুষ হিসেবেও যাঁরা মোটামুটি যত্নশীল, সহানুভূতিসম্পন্ন এবং পছন্দনীয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এই প্রাপ্তির বিনিময়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে এবং যুদ্ধ ও শান্তির অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু হিসেবে কাজ করেছে। ঠাণ্ডা লড়াইকালে আনুষ্ঠানিকভাবে জোটনিরপেক্ষ থাকলেও বাংলাদেশ চরমপন্থী দেশ নয়, এমনকি শেখ মুজিবের আমলেও ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে এই মুসলিম দেশ ফিলিস্তিনীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু কখনোই বাংলাদেশ চরমপন্থী মুসলমানদের মতো আচরণ করেনি। বরং বরাবরই এর অবস্থানে ধর্মমুখিনতার চেয়ে বামঘেঁষা ভাবই বেশি দেখা গেছে। তাই বলে সৌদি আরব ও জেরুজালেমের মুসলিম পবিত্র স্থানগুলোর সঙ্গে এর বন্ধনকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

একইভাবে ইসলামী ব্লক বা জাতিসংঘের ৪৬ জাতি গ্রুপের মধ্যে থেকেও বাংলাদেশ এক শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে গেছে। তবে বিশ্বের ১০% মুসলমানের আবাসভূমি বাংলাদেশের ভূমিকা সবসময়ই গঠনমূলক। প্রধানত মুসলিম জাতিসমূহের জন্যে অর্থনৈতিক সাহায্য এবং মুসলিম উম্মাহ বা ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শান্তি রক্ষার ব্যাপারেই বাংলাদেশের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থেকেছে। এই গণ্ডির মধ্যে থেকেও বাংলাদেশ প্রায়শই তার মধ্যপ্রাচ্যীয় মুসলমান বন্ধুদের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকে। অন্যদিকে এই বন্ধুরা বাংলাদেশকে নিয়মিত সাহায্য প্রদান করে।

ভবিষ্যতে বহমান সময়ের সাথে সাথে, ভারতের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে বাংলাদেশের জাপান ও চীনের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার সম্ভাবনা আছে; সেই সাথে তুলনামূলক কম মাত্রায়, দেশটি ইউরোপীয় সমর্থনের উপরও নির্ভর করবে- বিশেষত ব্রিটেন ও জার্মানীর ওপর। এই দুটি দেশ বাংলাদেশ সম্পর্কে গভীর আগ্রহ দেখাচ্ছে। একই রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক এবং হল্যান্ড। পাশাপাশি, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান হওয়ায় পররাষ্ট্র বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এখন আর তেমন উদ্বেগ নেই বলে বাংলাদেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমেই আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, যেখানে দুই দেশ

www.pathagar.com

প্রায়শই একে অপরের পাশে এসে দাঁড়ানোর কারণ খুঁজে পায়। এরকম পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্রমেই আঞ্চলিক এবং আধা-আঞ্চলিক গ্রুপিংয়ের মধ্য দিয়ে পরিশোধিত হবে, সেই সাথে এই গ্রুপগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সহায়তা যোগাবে এবং দেশটিকে উন্নয়নশীল বিশ্বে স্থান করে দেবে।

পরিশেষে, বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের কোনো চিত্রই সম্পূর্ণ হবে না, যদি না যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা শুভেচ্ছা দূতরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়। তাঁরা হলেন বিভিন্ন প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিক মিশনারী গ্রুপের সদস্য এবং প্ল্যানড্ প্যারেন্টহুড, কেয়ার, সেভ দ্য চিলড্রেন, ইউএসএ, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, এশিয়া ফাউন্ডেশন এবং ক্যাথলিক রিলিফের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মী। তাঁদের কাজ, নিষ্ঠা এবং নৈপুণ্য দিয়ে তাঁরা বছরের পর বছর অনানুষ্ঠানিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে অমূল্য ভূমিকা রেখে গেছেন, কখনো কখনো যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতির বাইরে গিয়েও।

সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে পোক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠছিল মিশনারীদের দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে। তারপর অনেক বছর যাবৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের বাংলা প্রবেশের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে রাখে। অবশেষে একদল ব্যাপ্টিস্ট কলকাতার কাছে শ্রীরামপুরে একটা ছাউনি স্থাপনে সক্ষম হন। সেখানে তাঁরা একটি খ্রিস্টান ছাপাখানা স্থাপন করেন। এ ছাপাখানাই শেষ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা ভাষার পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করে এবং সারা বাংলায় খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষা বিস্তারের সূচনা ঘটায়। লিখিত শব্দ-বাক্য নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক– বিশেষ করে ধর্ম বিষয়ে বাক্য বিনিময় শুধু যে বাংলা ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল তা-ই নয়, বাঙালির আলোকপ্রাপ্তিরও সূচনা ঘটায়। এই বাকযুদ্ধের মধ্যে উদ্ভব ঘটে হিন্দুত্ববাদের সংস্কৃত রূপ ব্রাহ্ম ধর্মের, যার সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। সেই সূচনা যুগের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপ্টিস্টদের উত্তরাধিকার এখনো টিকে আছে, কারণ এই মিশনারীরা ব্রিটিশ সমর্থিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা অনেক স্কুল এবং হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা করেন যেগুলো টিকে গিয়েছিল এবং এখনো টিকে আছে অথবা অন্তত পক্ষে স্কুল-হাসপাতাল গড়ে তোলার মডেল হিসেবে কাজ করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, এই মিশনারীদের শিক্ষা ও চিকিৎসাবিষয়ক কাজ বাংলার ইতিহাস আলোচনাকালে কখনোই পর্যাপ্ত মনোযোগ পায়নি।

একই রকম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল ক্যাথলিক চার্চের হলিক্রস অর্ডারের দুটি শাখা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী জেসুইটরা তাদের ঢাকার মিশন

পরিত্যাগ করলে পোপ ফ্রান্সের হলিক্রস অর্ডারকে সে ভার তুলে নিতে বলেন। কিন্তু ভারত শেষ পর্যন্ত হলিক্রস অর্ডারের যুক্তরাষ্ট্রীয় ও কানাডীয় শাখাগুলোর কাঁধে চাপে। ইন্ডিয়ানার সাউথ বেন্ডের স্কুলগুলোর নাম অনুসারে ঢাকায় বেশ কয়েকটি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেগুলোর মধ্যে আছে নটর ডেম কলেজ এবং হলিক্রস স্কুল ও কলেজ। এখন পর্যন্ত এগুলো প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সেরা কলেজ বলে গণ্য হয়ে থাকে। এবং এখনো এই স্কুল-কলেজগুলো পরিচালনার দায়িত্বে আছেন হলিক্রস অর্ডারের প্রবীণ যাজকগণ। তাদের বাংলায় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় টান লক্ষ্য করা যায়।

এই ধর্মযাজক, যারা পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং যাদের অনেকে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সেখানে বাস করেছেন বা করছেন, তাঁরা তখন তাঁদের স্কুল-কলেজে শিক্ষার মান ও শুদ্ধতার সর্বোচ্চ আদর্শ বজায় রেখেছেন, যে কারণে তাঁদের স্কুলগুলো ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তু; ফলে সেগুলোতে ভর্তি হওয়াও কঠিন। এই ধর্মযাজকেরা সারা দেশে, কখনো কখনো একা, স্কুল, হাসপাতাল, চিকিৎসালয় এবং অনাথ আশ্রম পরিচালনা করেন অথবা এগুলোর জন্যে অর্থ যুগিয়ে চলেছেন; এবং শুধু শিক্ষা বা চিকিৎসা নয়, কখনো কখনো খাদ্য এবং অন্যান্য সহায়তাও দিয়ে চলেছেন। তাঁদের কাজের উত্তরাধিকার সর্বত্রই চোখে পড়ে। যেমন– তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে বেরোনো ছাত্রছাত্রীদের তাদের পছন্দের বিষয়ে সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের চাইতে বেশি। তাদের অনেকেই তুলনামূলকভাবে অসচ্ছল পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পায়। এবং তাদের বাবা-মায়ের মতো অনেকেই যদিও ইংল্যান্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি; তথাপি ক্রমবর্ধমান হারে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার্থে যাওয়ার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নিচ্ছে। ফলে সারা যুক্তরাষ্ট্রেই হার্ভার্ড, প্রিন্সটন, উইলিয়ামস এবং বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠানে যেমন, তেমনি পেনসিলভেনিয়ার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্বল্পখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়েও আজ তাদের দেখা যায়। তাদের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরে আসে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃপদে আসীন হয়। এভাবে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমশ উষ্ণতর হচ্ছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ টিকবে তো ?

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং সারা পৃথিবীর স্বীকৃতি পায় তখন সবার আগে যে প্রশ্নটা দেখা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে– দেশটা টিকবে কি?

কারণ, যে দেশটা আত্মপ্রকাশ করল সেটা, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে, মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে সবার নিচে ছিল এবং যুদ্ধের পর আরো দেউলিয়া হয়ে গেল। সেতুগুলো বোমায় বিধ্বস্ত হওয়ায় রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হলো; ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটতে লাগল; বেশিরভাগ শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা হলো। কারণ, এগুলোর বেশিরভাগ মালিকই বিদেশী অথবা পাকিস্তানী ছিল; বৈদেশিক মুদ্রার এত অভাব দেখা দিল যে, সাধারণ আমদানি তো দূরের কথা, জীবনরক্ষাকারী ওষুধ এবং জরুরি জিনিসপত্রের মারাত্মক অভাব দেখা দিল; এমনকি বাংলাদেশের তখন নিজস্ব মুদ্রাও ছিল না, পাকিস্তানী রুপীর উপর 'টাকা' ছাপ দিয়ে চালানো হতো। তাছাড়া লাখ লাখ গ্রামবাসী বাস্তুচ্যুত হয়েছিল এবং ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল। হিন্দুদের বেশিরভাগই ফিরে আসেনি, আর এলেও সেসব উদ্বাস্তুর বেশিরভাগই শহরে এসে উঠেছিল। শহরের নোংরা এলাকায় তারা শোচনীয় জীবনযাপন করত; পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট অবাঙালিরা দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন 'রিফিউজি ক্যাম্পে' আশ্রয় নিল এবং পাকিস্তানে পাঠানোর অপেক্ষায় রইল; বাস, রেল এবং বিমান ভ্রমণে সমস্যা দেখা দিল; ভারত ও বার্মা এবং বঙ্গোপসাগরের কিনারঘেঁষা দেশগুলোর সঙ্গে চোরাচালান, মুদ্রা এবং বেশিরভাগ জিনিসপত্রের কালোবাজারি মারাত্মক আকার ধারণ করল।

তদুপরি, স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকাকে একটা বড় ধরনের বিভাগীয় শহর বলে মনে হলো, এমনকি ঢাকাকে তখন পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি, করাচী কিংবা লাহোরের সঙ্গেও তুলনা করা যেত না। ঢাকা তখন বুড়িগঙ্গা নদী থেকে দুই মাইল (ফার্মগেট এলাকা, এখন যেখানে সোনারগাঁ হোটেল অবস্থিত) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সংসদ ভবন তখন তৈরি হচ্ছে এবং সেটাই ছিল শহরের শেষ প্রান্ত। বড় বড় সড়কগুলোর মাঝখানের আইল্যান্ডে বিশাল বিশাল গাছ দেখা যেত এবং শহরে মাত্র

www.pathagar.com

দুটো উঁচু বিল্ডিং ছিল, একটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এবং অন্যটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভবন। বেশিরভাগ বিদেশীই ধানমণ্ডিতে থাকত। বনানী এবং গুলশানের তখন উন্নয়ন কাজ চলছিল এবং সেগুলো ছিল শহরের শেষপ্রান্তে। আয়তনের দিক থেকে দুই দশক আগের ঢাকা এখনকার ঢাকার মাত্র অর্ধেক ছিল।

রাজনৈতিক দিকের কথা বলতে গেলে, দেশের জনগণ যখন সাংঘাতিক রকম ঐক্যবদ্ধ, সমাজতন্ত্রভিত্তিক একটা অবাস্তব বাতাস বইছিল, বিরাজ করছিল স্বনির্ভরতার একটা বেখাপ্পা আমেজ, বিদেশীদের প্রতি অহেতুক ভীতি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পূর্বাঞ্চলীয় জোটের মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তখন অপ্রয়োজনীয় না হলেও প্রথম দিকে শক্তিশালী ছিল না; এবং প্রকৃতপক্ষে দুঃখজনক হলেও ন্যায়সঙ্গত কারণেই পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়েছিল, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। কোনো সন্দেহ নেই মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত, রাশিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এবং সেটা শুধু মিত্র হিসেবেই এবং সাহায্যদাতা হিসেবে নয়; বরং এখন যে ব্যাপারটাকে প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে, স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, মনোবল এবং নৈতিক নেতৃত্বের গুণাবলীর দিক থেকেও পৃথিবী এখন অনেক আলাদা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের অন্যায় সুবিধাভোগের ব্যাপারগুলো ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আর তাদেরকে, তাদের সেই অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় না।

তাই বলে পশ্চিমা বিশ্ব নবজাত এই দেশটাকে উপেক্ষা করেনি। ১৯৭০ সালের শেষদিক থেকে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের জন্যে এবং ১৯৭১ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে পাকিস্তানীরা মেনে না নেয়ায় পূর্ববঙ্গের জনতার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের হিংসাত্মক হয়রানি এবং তাদের প্রতি বাংলাদেশীদের বিদ্রোহের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পশ্চিমের সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিতে লন্ডন, নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব র‍্যালি প্রমাণ করে পশ্চিমা গণমত সংগ্রামকে সমর্থন করেছিল; যদি মার্কিন সরকার সবেমাত্র উড়তে শেখা বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন স্থগিত রেখেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে ছিল।

যাহোক, ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং নৌ ও বিমানবন্দরগুলো খুলে দেয়ার পর স্রোতের মতো সাহায্য আসতে থাকে, প্রথমে ভারত থেকে এবং তারপর বিভিন্ন পশ্চিমা সরকার ও বেসরকারি সংস্থা থেকে। এসব সাহায্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল খাদ্য, ওষুধ, কম্বল, পোশাক, গৃহ ও সড়ক নির্মাণসামগ্রী এবং অন্য জনসেবামূলক দ্রব্যাদি আর সব রকমের যন্ত্রাপাতি। এল ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনিয়ার, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ। ত্রাণসামগ্রীর এই প্রবাহ সর্বত্র

www.pathagar.com

দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। যেমন, পুরনো বিমানবন্দরের কাছে, এখন যেখানে পর্যটন কর্পোরেশনের অফিস, পার্কিং লট, খোলা জায়গায়, স্পেয়ার পার্টসের অপেক্ষায় পড়েছিল প্রচুর পরিমাণ ভারী যন্ত্রপাতি। উন্নয়ন সংগঠকদের মধ্যে, এমনকি বহুজাতিক সংগঠকদের মধ্যেও যারা তখন বাংলাদেশে ছিলেন, একটা হতাশা বিরাজ করছিল। একজন এক ককটেল পার্টিতে লেখককে সেই হতাশার কথা বলেও ফেলেছিলেন। ১৯৭২ সালের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফরের পর রাজনৈতিক দিক থেকে সহানুভূতি পাওয়ার এবং ভ্রমণ করার জন্যে বাংলাদেশ ছিল দ্বিতীয় স্থানে।

যাহোক, আরো অনেকগুলো ব্যাপার প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর দেশটার মতিগতি সন্দেহজনকই রয়ে গেল। যুক্তরাষ্টের স্টেট ডিপার্টমেন্টের হতাশার ভাষায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ঝুড়ি এবং 'তলাহীন ঝুড়ি'র রূপ নেয়। এই আবহটা এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের এই আন্তর্জাতিক বদনামের কারণগুলো স্পষ্ট। মাত্র পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তনের এক ভূখণ্ডে প্রায় পঁচাত্তর মিলিয়ন মানুষ নিয়ে (তাইওয়ানের পর পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা) আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। তখন বাংলাদেশীদের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ১০০ ডলার। সুদিনে দেশের মোট ভূমির তিনভাগের একভাগ পানি থাকে এবং বর্ষাকালে প্রায় ৭০ ভাগ ভূমি ডুবে যায়। উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদ নেই দেশটার। জ্বালানি আমদানি করতে হয়। সড়ক তৈরির জন্যে পাথর এবং নুড়ি নেই (যদিও সড়কগুলোকে বন্যার স্তর থেকে উঁচু করে তৈরি করতে হয়)। ১৯৭২ সালের মূল বন্দর বন্ধ ছিল এবং নৌকা দিয়ে মাল খালাস করার পর মালবাহী জাহাজগুলো ভিড়তে পারত। শিক্ষার হার ছিল পৃথিবীর সর্বনিম্ন।

দেশটা সম্পর্কে অকপট এবং ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এখনো ভোলেনি লেখক। যেমন, একদিন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা উঠতেই একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন লেখক, এদেশের সেরা ব্যবসায়ী ব্রেন হচ্ছে বিহারী এবং হিন্দু, এদের প্রায় সবাই দেশত্যাগ করার ফলে যেসব মুসলমান ব্যবসাবাণিজ্যের নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের বেশিরভাগই মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার উন্মাদ, সমাজতন্ত্রী, নয়তো মুসলমান ধর্মান্ধ। হয়তো একদিন দেশটাকে ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে। এসব মধ্যযুগীয় মানসিকতাসম্পন্ন বাংলাদেশীরা শুধু যে ব্যবসায় মার খাবে তা-ই নয়। এমনকি এদেশের অজ্ঞ মুসলমান কৃষকদের স্বভাবও বদলাবে না এবং এরা নতুন সার কিংবা নলকূপ ব্যবহার করবে না।

www.pathagar.com

তখনকার জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতামত ছিল, নাটকীয়ভাবে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে না পারলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং সম্ভবত এর ফলাফল দাঁড়াবে ১৯৮০'র দশকের শেষদিকে গণমৃত্যু। একই ছিল কৃষি বিশেষজ্ঞদের ধারণাও। বিশ্ববাজারে পাটের জায়গা দখল করে নিচ্ছে কৃত্রিম তন্তু। নগদ টাকার ঘাটতি দেখা দিচ্ছে কৃষকদের। কিছু কিছু কৃষিবিদের মতামত হলো, বর্ষা মৌসুমে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকে, কাজেই দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে শুকনো মৌসুমে সেচ সুবিধা বাড়াতে হবে। তাছাড়া দেশের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক উত্তরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সেচ সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। অনেকের মতে, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হলে ব্যাপক বিদ্যুতায়ন প্রয়োজন হবে অথবা খাল-বিল সংস্কার করে সেগুলোতে পানি মজুদ করতে হবে। এর সঙ্গে দ্রুত বর্ধনশীল এবং অধিক ফলনশীল বীজের প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন হবে সারের, কীটনাশকের।

উৎস একই থাকলেও চাহিদা বহুগুণ বেড়ে গেল। অসহায় উপলব্ধিটা ১৯৭৪ সালে চরম অবস্থায় পৌঁছল। দেশের এক অংশে দেখা দিল প্রচণ্ড খরা এবং অন্যান্য অংশে বন্যা এবং তার সঙ্গে যোগ হলো খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত অব্যবস্থা। এর ফলশ্রুতিতে দেখা দিল চরম দুর্ভোগ এবং অসংখ্য মৃত্যু। 'ঝুড়ি' অপবাদটা পুরোপুরি বাস্তবে রূপ নিল এবং ম্যালথাসের 'জনসংখ্যা বোমা'র তত্ত্বটা প্রমাণ হতে চলল। সাহায্য আসা সত্ত্বেও, রাস্তাঘাট এবং দালান-কোঠার উদ্বোধন হলেও অনেকের কাছে দেশটাকে ১৯৪৩-এর চেয়েও দরিদ্র মনে হলো। অবস্থা এত শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, আমেরিকান এক ওষুধ কোম্পানির জনৈক দরদী কিন্তু নিরাশ ম্যানেজার আরো যন্ত্রপাতি আনার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল এটাকে দান হিসেবে দেখানো যাবে। তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি যে, বাংলাদেশ তার সমস্যাগুলো : ক্ষুধা, যুদ্ধ এবং সম্ভবত অর্থনৈতিক ধস বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া কাটিয়ে উঠতে পারবে।

তাই আজ পর্যটকরা আপনা আপনি এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের জন্মহার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা এবং মাথাপিছু আয়, অপুষ্টি, রোগ-ব্যাধি এবং গ্রাম উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চায়। মনে হয় অগ্রগতির চিন্তা এমনকি আশাও আগে থেকেই ছেড়ে দিয়ে এসেছে ওরা। এটাও অবশ্য অকারণ নয়। কেননা, বাংলাদেশ এখনো গরীব দেশগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশ সম্পর্কে এ ধারণাটা কাটতে সম্ভবত আরো এক দশক লাগবে। যাহোক, মূল প্রশ্নটার উত্তর ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে : অকল্পনীয় কোনো বিপর্যয় না ঘটলে, বাংলাদেশ টিকে থাকবে এবং ভবিষ্যতে অগ্রগতি অর্জন করবে।

www.pathagar.com

এই আশাবাদের উপযুক্ত কারণ রয়েছে। খাদ্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে, জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ, সেচ সুবিধার প্রসার, নতুন বীজ, সার, উন্নত সড়ক ব্যবস্থা, সংরক্ষণ সুবিধা এবং বাজারজাত করার পদ্ধতি। ১৯৭৪-এর পর দুর্ভিক্ষের আলামত দেখা যায়নি। দেশের প্রায় সর্বত্র অল্প ঠাণ্ডা এবং হিমায়িত অবস্থায় খাদ্য মজুদ করার জন্যে ওয়ার হাউস গড়ে তোলা হয়েছে। বিদ্যুৎব্যবস্থা, যা একসময় রাজধানীসহ শহরগুলোতেই অনিয়মিত ছিল, এখন জেলা শহরগুলোতেও সুষ্ঠু এবং গ্রামের দিকেও এগিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পাওয়ার গ্রিড এখন সারা দেশে বিস্তৃত হয়েছে। সবগুলো গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকলেও এখন সেগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া সম্ভব। রাসায়নিক সার এখন সহজলভ্য এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস। নলকূপের রূপালি পানির ধারাগুলো সবুজের মাঝে ফুটকির মতো ছিটিয়ে আছে। বিভিন্ন রকমের বীজ এবং ফসলের প্রতি কৃষকদের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন বাংলাদেশের কৃষকেরা এত বেশি বৈচিত্র গ্রহণে প্রস্তুত যা অনেকে আশাও করতে পারেনি। পোশাক প্রস্তুত, বস্ত্রশিল্প, চামড়াজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদির সংযোজন, জুতা তৈরি এবং মেশিন টুলসের বেচাকেনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। গ্রামের উদ্বৃত্ত জনসংখার একটা অংশকে এখন শহরগুলো শুষে নিতে পারে। কারণ, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার হার বাড়ছে। সংসদ ভবন থেকে উত্তরে ঢাকা শহর দশ মাইল প্রসারিত হয়েছে। এর একটা কারণ, অন্য আঞ্চলিক শহরগুলোকে বাদ দিয়ে ঢাকায় সরকারি তহবিলের অপরিকল্পিত ব্যয় এবং রাজধানীতে কর্মসংস্থানের সুযোগ। যেখানে কাজ নেই মানুষ সেখানে থাকে না। মানুষের ধর্মই হচ্ছে অগ্রগতিমুখী হয়ে এগিয়ে যাওয়া।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদিকে লাভজনক এবং আরেক দিকে ক্ষতিকর হচ্ছে। অবশ্য এই লাভ-ক্ষতির পাল্লাটা ক্ষতির দিকেই ভারী। বাংলাদেশ শ্রমশক্তির আধার। এই শ্রমশক্তি দু'দিক থেকে দেশকে সাহায্য করছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য শ্রম ঘাটতির দেশগুলোতে অস্থায়ী চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে হাজার হাজার বাংলাদেশী। এসব প্রবাসী বাংলাদেশী প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচ্ছে। এর ফলে দেশে মাথাপিছু আয় বেড়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন বিনিয়োগ সরঞ্জাম কেনার বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দিচ্ছে। বিদেশে চাকরিরত এসব শ্রমিক নতুন নতুন পেশায় দক্ষতা অর্জন করছে এবং কখনো কখনো বাড়ি ফিরে ব্যবসায় লেগে যাচ্ছে কিংবা নতুন প্রযুক্তি ও দক্ষতা দেশে নিয়ে আসছে। এসব দক্ষতা অল্প সময়েই তার নিজ গ্রামে নতুন ধারায় সৃষ্টি করছে। গ্রামে বিদ্যুতায়নের জন্যে অন্যদের সংগঠিত করে এরা– কারণ এসব বিদেশ-ফেরত শ্রমিক জেনে এসেছে উন্নয়নের জন্যে বিদ্যুতায়ন কতটা জরুরি।

www.pathagar.com

দেশে থেকে-যাওয়া শ্রমশক্তি সস্তা শ্রমে শিল্প স্থাপনে আগ্রহীদের আকর্ষণ করেছে। ইদানীং এ ধরনের শিল্প স্থাপনকারীদের সংখ্যা বাড়ছে, বিশেষ করে বিভিন্ন রপ্তানী অঞ্চলে। ১৯৫০-এর দিকে এ ধরনের রপ্তানি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ান সফলভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচনা করেছিল।

এভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকদের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ শুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। কারণ, অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোও এই পদ্ধতির সূচনা করে গ্রামভিত্তিক অর্থনীতিকে গ্রাম-শহরভিত্তিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করেছিল। তবে এখনো এই ব্যবস্থা বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত গ্রামীণ শ্রমশক্তির পুরোটা আত্মীকরণ করার ক্ষমতা অর্জন করেনি।

এখানে বলা দরকার, কৃষি থেকে শ্রমশক্তির শিল্পমুখী এই ঝোঁকই উন্নয়নের প্রথম লক্ষণ। অবশ্য ১৯৭১-এর আগেই এই ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল; কিন্তু তখন সেটা জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল অংশ ছিল না। ১৯৭২ থেকে, বিশেষ করে গত কয়েক বছরে এই প্রক্রিয়াটা অধিক সনির্বন্ধ, অধিক সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। এটা দেশের পরিকল্পনাবিদদের কৃষি উন্নয়ন থেকে নিরাপদ নগরায়ন এবং শিল্পায়নের দিকে যেতে বাধ্য করেছে। এই সন্ধিক্ষণটা খুবই স্বাভাবিক, পরিবর্তনের একটা লক্ষণ, উন্নতির লক্ষণ। তার পরেও পদ্ধতিটা কষ্টকর; কারণ এটা গ্রামীণ পরিবারগুলোকে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি এবং জীবনযাত্রা ছেড়ে শহরে স্থায়ীভাবে টিকে যেতে বাধ্য করেছে। ক্ষুদ্র-কানি গ্রাম থেকে পার্শ্ববর্তী বড় গ্রামে, সেখান থেকে মহাকুমা শহরে, তারপর জেলা শহরে, বিভাগীয় শহরে এবং শেষ পর্যন্ত ঢাকায়। গ্রাম থেকে শহরের দিকে বহমান মানুষের এই যাওয়া অনেকটা নদীর মতো। এদের মধ্যে যাদের অবস্থা দেখে মন আকুল হয় তারা ঢাকা এবং চিটাগাং-এর বস্তিবাসী, যাদের বেশিরভাগই মহিলা এবং শিশু, এরা টোকাই। বিক্রি করা যাবে না এমন এক টুকরা খাবার কিংবা ছাঁটছুটের আশায়, জঞ্জালের স্তূপে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ওরা। এই প্রক্রিয়ায় যারা স্বাস্থ্যবান শুধু তারাই টিকে থাকে। এই লম্বা স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বুড়ো এবং দুর্বলদের পরিণতি কি হয় কে জানে?

তার পরও, এই অভিপ্রয়াণই হচ্ছে উন্নয়নের লক্ষণ, কারণ কোনো দেশই শিল্প এবং কৃষির ভারসাম্যের পাল্লা শিল্পের দিকে না ঝোঁকানো পর্যন্ত সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশে মোট কর্মসংস্থানের ৭৭.৫ ভাগ কৃষিখাতে হতো। ১৯৮৬ সালে সেই হার ৫৭.২ ভাগে নেমে আসে। তবু দেশটা যখন এই যন্ত্রণাদায়ক.অর্থনৈতিক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে তখন এর প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করছে। কাজেই ঢাকার নগরায়ন আরো বাড়বে। তবে গত দশ বছরে সারা দেশে ৪৬০টি উপজেলা যেভাবে বেড়ে উঠেছে এবং নগরায়নে যে গতি সঞ্চার

www.pathagar.com

করেছে ১৯৭১ সালে সেটা কল্পনাও করা যায়নি। এসব উপশহরে যদি কুটির শিল্পের প্রসার ঘটানো যায় তাহলে এগুলো কাজের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে আসা জনশক্তিকে আত্মীভূত করে নিতে পারবে। কিন্তু শিল্পায়নের মৌলিক প্রয়োজনগুলো, যোগযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং টেলিফোন ব্যবস্থা এখনো উপজেলা পর্যায়ে প্রসারিত হয়নি। তাই এসব উপশহরে শিল্পায়নও আশানুরূপ গতি সঞ্চার করেনি। অবশ্য কয়েক জায়গায়, যেখানে নদীর মাধ্যমে সস্তা পরিবহনের সুবিধা রয়েছে, শিল্পায়ন যথেষ্ট দ্রুত গতি সঞ্চার করেছে।

এটাও একটা আশার কথা যে, বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫ ভাগ। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৬০ দশকের চেয়ে অনেক বেশি। কৃষিখাত সম্পর্কে বলা যায়, ফসলের বহুমুখীকরণ এবং স্বল্পমূল্যের শ্রমশক্তি নিয়োগের ফলে মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব এশিয়ায় ফল ও শাকসবজি রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে নাটকীয় গতিধারা সঞ্চার হয়েছে। ইতিমধ্যেই মালবাহী বিমানে করে সৌদি আরবসহ অনেক দেশে বিভিন্ন শতমূলী সবজি, ফুলকপি, তরমুজ, খরমুজ, আম এবং শুকনো মরিচ রপ্তানি করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে গুটিবসন্ত ও কুষ্ঠরোগ কার্যকরভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং ম্যালেরিয়াও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। উদরাময় জাতীয় রোগসমূহ, বিশেষ করে কলেরা, যক্ষ্মা ও শ্বাস-প্রশ্বাস সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রোগের পর দ্বিতীয় হন্তারক ব্যাধি। অবশ্য এগুলো এখন অতটা মারাত্মক নয়। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকাস্থ আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্রে ওরাল রিহাইড্রেশান সল্যুশন (ORS) উদ্ভাবন করে। এই সল্যুশনের প্রস্তুত প্রণালী এবং প্রয়োগের ব্যাপক প্রচারের ফলে এবং গ্রামের মহিলাদের এই স্যালাইন প্রস্তুত প্রণালী শেখানোর ফলে উদরাময়, ডায়রিয়ায় মৃত্যুর হার ১৯৭২ সাল থেকে ৮০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

অবশ্য গ্রাম ছেড়ে শহরে অভিপ্রয়াণকারী জনতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে তাদের পুষ্টিহীনতা। শহরের ঘিঞ্জি বস্তি এলাকাগুলোর বাসিন্দারাও ব্যাপক পুষ্টিহীনতার শিকার। তবে পর্যাপ্ত না হলেও স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি ঘটছে এবং গর্ভনিরোধ বড়ির সহজলভ্যতার ফলে জন্মহার নিম্নমুখী হয়েছে। কয়েকটা সূত্র অনুযায়ী ৪৫ শতাংশের বেশি বাংলাদেশী মহিলা কোনো-না-কোনো ধরনের গর্ভনিরোধক ব্যবহার করে। এটা সম্ভব হয়েছে দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশন (এফপিএ)-এর সমর্থনপুষ্ট স্থানীয় মহিলা সংগঠনসমূহের প্রচেষ্টার ফলে।

www.pathagar.com

উল্লেখিত উন্নয়ন বা অগ্রগতি সত্ত্বেও বাংলাদেশকে আরো কয়েক বছর সাহায্য, বিনিয়োগ এবং বিশেষজ্ঞ দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে। যদি পিছু হটার মতো বড় কোনো কারণ সৃষ্টি না হয় তাহলে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখন বাংলাদেশের যে অবস্থান সেটা হচ্ছে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তর, ক্রান্তিকাল। আরো অনেকটা পথ টেনেটুনে এগোতে হবে বাংলাদেশকে এবং পৃথিবীর আর সব অঞ্চলের যে ধরনের সমস্যা থাকে ঠিক তেমনি সমস্যাকে মোকাবিলা করেই এগোতে হবে। এবং তখনই বলা যাবে, দেশটা 'টেক অফ' করেছে, অর্থাৎ নিজে নিজে চলার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অতএব, দেশটার টিকে থাকার ব্যাপারে যে চরম অনিশ্চয়তা ছিল সেটার জবাব পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ এখন আর 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নয়। যদিও এখনো সে অনেক গরীব, তাই বলে অনড় বসে নেই সে। বাংলাদেশ এখন একটা উন্নয়নশীল, বাড়ন্ত, গতিশীল দেশ এবং উন্নয়নের প্রথম ধাপ টপকে যাওয়ার ক্ষমতা তার আছে। শান্তি বজায় থাকলে এবং বিশ্ববাজার উন্মুক্ত থাকলে ধারাবাহিক অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ার মতো কোনো অর্থনৈতিক কারণ নেই। এবং সর্বশেষ জরিপ হচ্ছে মাত্রাতিরিক্ত দারিদ্র্যই দেশটাকে প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবে এবং অন্নের জন্যেই একে অনেক পরিশ্রম করতে হবে আর এভাবেই অগ্রগতি অর্জিত হবে।

তার পরও জনসংখ্যা সমস্যাটা ন্যাংটো হয়ে ঝুলে থাকছে। দেশটার জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার ২.৪% বজায় থাকলেও ২০২২ সাল নাগাদ জনসংখ্যা ২২০ মিলিয়নে গিয়ে ঠেকবে এবং প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি হবে। এই মৌলিক সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে : এই বিশাল জনসংখ্যার ভার কি বইতে পারবে বাংলাদেশ?

জনসংখ্যার সম্পূর্ণটাই যদি দেশে থেকে যায়, তাহলে এই মুহূর্তে সেটা কল্পনাও করা যায় না। অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্যে অর্থ আসবে কোত্থেকে, দ্বিগুণ জনসংখ্যার জন্যে পর্যাপ্ত শিল্পকারখানা স্থাপনের কিংবা এর বিরাট খাদ্যের চাহিদা কিভাবে মেটাবে কৃষিখাত? এই মুহূর্তে সমস্যার যে সমাধান পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বিপুলসংখ্যক লোকের অভিপ্রয়াণ ঘটাতে হবে। এর জন্যে প্রথমেই বেছে নিতে হয় মধ্যপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার মতো শ্রমঘাটতির দেশগুলোকে। তারপর সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী ভারত কিংবা বার্মায় ঢুকে পড়তে হবে এবং তেমন কিছু ঘটলে মারাত্মক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যেই ভারতের আসাম রাজ্যে তথাকথিত বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ নিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্ত দিয়ে

www.pathagar.com

আরাকান অঞ্চলের রোহিঙ্গাদের ঠেলে দিয়েছে বার্মা। আগামী দুই দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ সাংঘাতিক রকম বেড়ে যাবে। পূর্বদিক থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাছাড়া মেক্সিকো এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের লোকজন যেমন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করছে ঠিক তেমনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত এবং বার্মায় ঢুকতে পারে বাংলাদেশীরা।

এভাবেই এই ভয়াবহ জনসংখ্যা সমস্যাটা বাংলাদেশ সম্পর্কে যে কোনো আশাবাদ আচ্ছন্ন করে রাখে। আর এ কারণেই 'ঝুড়ি'র অপচ্ছায়াটা কখনো বাংলাদেশকে ছেড়ে যাচ্ছে না। অধিকন্তু এই সমস্যা অত্যন্ত জরুরি বিষয় হিসেবে গৃহীত না হওয়ায় বাংলাদেশের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বাংলাদেশ সম্পর্কে আশাবাদী হয়েও হতাশ হচ্ছে।

এই সমস্যাটাকে কাটিয়ে উঠতে হলে বাংলাদেশের পরিকল্পনাবিদদের তিনটা মূল কারণ মোকাবিলা করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে, পরিবার পরিকল্পনার কার্যকর অভিযান, এক্ষেত্রে প্রত্যেক মা এবং প্রত্যেকটা শিশুর জন্যে পর্যাপ্ত পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান, প্রাক-প্রসব এবং প্রসবোত্তর সেবা প্রদান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পরামর্শ আরো সুলভ করা এবং সর্বোপরি সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন।

দ্বিতীয় উপাদানটা সামাজিক। বিলম্বে বিবাহ এবং ছেলে-মেয়ে উভয়কে বর্ধিত শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলা। এর ফলে মেয়েদের সন্তান উৎপাদন শুরুর সময় বিলম্বিত হবে এবং জনগণকে আরেকটা অর্থনৈতিক ধাপে নিয়ে যাবে যার ফলশ্রুতিতে মেয়েদের প্রতি আচরণ আরো সহনশীল হবে এবং শেষ পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন হ্রাস পাবে। কারণ সব সমাজেই অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল পরিবারগুলোতে মেয়েদের প্রতি তুলনামূলকভাবে অধিক সম্মান দেয়া হয়ে থাকে এবং এসব পরিবারে সন্তান জন্মের হারও কম। কারণটা খুবই সহজ। পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় এবং শিশুমৃত্যুর হার কমে যায় এবং ওসব শিশু ভবিষ্যতে পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাছাড়া শিক্ষার উপকার বহুবিধ। শিক্ষিত পরিবারের অভিভাবকেরা বুঝতে পারে সন্তানের সংখ্যা কম হলে তাদের ভালোভাবে শিক্ষিত করা যায় এবং সন্তানেরা শিক্ষিত হলে তারা ভবিষ্যতে সুখে থাকতে পারবে।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটা হচ্ছে শিল্পায়ন। কারণ, শিল্পায়নের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নগরায়ন হয় এবং এর ফলে জন্মহার কমে যায়। কারণ, শহুরে জীবন ব্যয়বহুল হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই জন্মহার নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবে একটা জনসমষ্টি বর্ধিত স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা পেয়ে এবং শহুরেকরণের মাধ্যমে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ক্রান্তিকাল পৌঁছে যেখান থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত হ্রাস পায়। উন্নত বিশ্বের বেশিরভাগ

www.pathagar.com

দেশেরই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয় নিম্নমুখী কিংবা এর কাছাকাছি। অনেকগুলো নব্য শিল্পায়িত দেশেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম অথবা শূন্যের কোঠায়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই পর্যায়ে পৌঁছতে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে বাংলাদেশকে।

তার পরও অগ্রগতি হচ্ছে। জনসংখ্যা পরিকল্পনার প্রথম অংশটা ধীরে ধীরে সুদক্ষ হয়ে উঠছে, যার ফলে বেশিরভাগ মানুষই পরিবার পরিকল্পনার সেবা গ্রহণ করতে পারছে। এমনিভাবে স্বাস্থ্যসেবা বাড়ছে, সামান্য হলেও সঠিক পথেই এগুচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেলেও এক্ষেত্রে ঘাটতি রয়ে গেছে এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক ক্রান্তিকালে পৌঁছতে পারেনি, যদিও নগরায়নের জন্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে সমস্যাটা হচ্ছে, এই বৃদ্ধি স্তরে পৌঁছতে হলে বাংলাদেশকে আরো বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে এবং আরো বড়মাপের সাহায্য পেতে হবে। বাংলাদেশে এই শেষ উপাদানটার সংকটই তীব্র।

জনসংখ্যা বোমাটা [যেটা আস্তে আস্তে বিস্ফোরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে] যাতে দেশটার কাঠামো ভেঙে ফেলতে না পারে, সেজন্যে এই লেখকের মতে, এদেশের নেতাদের উচিত সামাজিক পরিবর্তনের জন্যে অত্যন্ত কঠোর কার্যক্রম গ্রহণ করা। আর এ ধরনের কার্যক্রম যে গ্রহণ করা হবে তাতে লেখকের কোনো সন্দেহ নেই। কারণ অবাস্তব সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নিয়ে দেশটার অভ্যুদয় ঘটলেও, বাংলাদেশীরা যে বাস্তববাদী সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে।

প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঠিকই ঘটাবে বাংলাদেশ এবং টিকে থাকবে; যদিও সে পদক্ষেপগুলো বিদেশীদের কাছে অত্যন্ত মন্থর মনে হবে। গত বিশ বছরে বাংলাদেশ তার জন্মলগ্নের অধিকাংশ নৈরাশ্যবাদী ধারণাকে ভিত্তিহীন বলে প্রতিপন্ন করেছে। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকের সঙ্গে তুলনা করলে যথেষ্ট ভালো করেছে বাংলাদেশ। তাইওয়ান কিংবা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ভালো না করতে পারলেও ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের চেয়ে ভালো করেছে। তবু বাংলাদেশের অবস্থা পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত নয় এবং ব্যর্থতার ভয়ও রয়ে গেছে।

টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের বন্ধু প্রয়োজন। পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব– এই তিনদিক থেকে বাংলাদেশকে বেষ্টন করে রেখেছে ভারত। দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরও নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতের নৌবাহিনী। কাজেই স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। বাংলাদেশের তুলনায় ভারত অনেক বেশি বড়, অনেক বেশি শিল্পসমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে ১.২ মিলিয়ন সৈন্যের সামরিক প্রতিষ্ঠানের ভার বহন করতে সক্ষম বিশাল শিল্প বুনিয়াদ। সামরিক ক্ষেত্রে যে কোনো মুহূর্তে বাংলাদেশ দখল এবং শাসন করতে পারে ভারত। বাইরের কোনো শক্তির বাংলাদেশে তেমন কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ নেই যার জন্যে সেই

www.pathagar.com

শক্তি বাংলাদেশের পক্ষে হস্তক্ষেপ করবে। ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম বার্মা সীমান্তে চীনের পর্যাপ্ত শক্তি রয়েছে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলে চীনের এগিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। বেইজিং এবং নতুন দিল্লীর মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে গেলেই কেবল চীনের কাছে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেটা ছাড়া বাংলাদেশের চীনের আর কোনো সুস্পষ্ট স্বার্থ নেই।

ভারত এবং বাংলাদেশ পরস্পরের বন্ধু, না শত্রু?

আগেই বলা হয়েছে ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করার সময় ভারতের মুসলমানেরা হিন্দুদের অধীনে থাকতে চায়নি বলেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই নীতিগত অবস্থানের জন্যেই ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তানের পারস্পরিক শত্রুতার, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর সমস্যাসহ, কারণও এটাই।

হিন্দুদেরও এমনি একটা বিচ্ছিন্নতা বোধ; অধিকন্তু, ইসলাম ধর্মের প্রতি ঘৃণা বা ভয় রয়ে গেছে। আর তাই আধুনিক ভারতের স্থপতিরা ভারতের সীমান্তের ভেতর বড় রকমের মুসলমান সংখ্যালঘুর অবস্থান চাননি– যে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, মোগল আমলে, উপমহাদেশ শাসন করেছিল এবং ভারতের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং আইনগত জীবনে বড় ধরনের অবদান রেখেছিল। একজন মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে অবিভক্ত ভারত এবং স্বাধীন পাকিস্তানসহ বিভক্ত ভারত এই দুটোর মধ্যে দ্বিতীয়টিকে পছন্দ করেছিল ভারতীয় হিন্দুরা। একমাত্র গান্ধী ছাড়া সব বড় নেতাই, নেহরু এবং বল্লভ ভাই প্যাটেলসহ এটাকে সহজভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে দুই পক্ষের নেতারাই রবার্ট ফ্রস্টের 'সুরক্ষিত সীমান্ত সৎ প্রতিবেশীর সৃষ্টি করে' এই ধারণা অনুযায়ী দেশ বিভাগ মেনে নেয়।

এখনো বাংলাদেশের দুই বিশাল প্রতিবেশীর, পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েন চলছে। জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বৈরিতা চলছে। এই দুই দেশের সম্পর্কের স্বরূপ হচ্ছে সীমান্তে বিপুলসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন, বিমানবাহিনীর সতর্কাবস্থা, সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া, এমনকি বিচ্ছিন্ন লড়াই পর্যন্ত। কিন্তু গুরত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো বাংলাদেশ কিংবা ভারতের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে না। এমনকি বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল তখনো ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কোনো দিকেই তেমন কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরক্ষা বাহিনী ছিল না। এখনো সেই অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, ভারতের সেনাবাহিনীর আট ভাগের এক ভাগ, সতর্কাবস্থায় নেই। এদের পরস্পরের সঙ্গে

যুদ্ধের কোনো যৌক্তিক পরিকল্পনাও নেই, যা অদূর ভবিষ্যতে দুই দেশের যুদ্ধের সম্ভাবনা নির্দেশ করতে পারে। অনেক বছর আগে লন্ডন থেকে দিল্লী যাওয়ার পথে বিমানে এই লেখককে ভারতীয় জেনারেল বি,কে, নেহরু বলেছিলেন, 'ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানের (তৎকালীন) মধ্যে যুদ্ধের সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে ভারত বিজয়ী হবে এবং ওই অঞ্চলটাকে ভারতের অঙ্গীভূত করতে হবে।'

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের আগে এই মন্তব্যটা, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ এবং ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের সময়টায় পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশ তখন ভারতের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সম্ভবত মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাদের সহজেই পরাজিত করতে পারত। তা না করে ভারত বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এবং দ্রুত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়। ওরা ১,০০,০০০ পাকিস্তানী বন্দীকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। এর একটা কারণ হতে পারে, দরিদ্র ভারত বাংলাদেশকে তার বিপর্যস্ত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ঢোকাতে চায়নি; কারণ তাহলে সেটা হতো ক্রুদ্ধ মুসলিম বাংলা। আরেকটা কারণ হতে পারে, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে ভারত এবং নতুন জন্ম নেয়া দেশটার কাছে বড় ধরনের কিছু দাবী না করে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে। এই কাজটার জন্যে তৎকালীন ভারতীয় রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রজ্ঞা ও দক্ষতা এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিলেন।

সেই তখন থেকে, মাত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে দূরবর্তী, সন্দেহাকীর্ণ এবং টানটান করে রেখেছে। এই কারণটা হচ্ছে ফারাক্কা বাঁধ। এই বাঁধের সাহায্যে ভারতের গঙ্গা দিয়ে বাংলাদেশের পদ্মায় আসা পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে ভারত এবং নিজের কাজে লাগাচ্ছে। দুই বছরের বিরামহীন আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও বাঁধটার যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশের আপত্তিকে পাত্তা দিচ্ছে না ভারত, বরং বাংলাদেশের পানি ব্যবহারের বিকল্প প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে আসছে। কিন্তু ফারাক্কা ছাড়াও এখন একই ধরনের বাঁধের সাহায্যে যমুনা অথবা ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি প্রত্যাহার করার ভারতীয় পরিকল্পনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে বাংলাদেশ। যদিও এই পরিকল্পনাটা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং সম্ভবত এই বাঁধ ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েরই উপকার করবে। কিন্তু বাংলাদেশ ফারাক্কার অভিজ্ঞতা থেকে ভয় পাচ্ছে যে, এ ধরনের কার্যক্রম এই বদ্বীপের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাবে। কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম সক্রিয় বদ্বীপ। এই বদ্বীপের ওপর দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিঠা পানির প্রবাহ সাগরে নামে। বাংলাদেশের মাটি এত উর্বরা হওয়ার কারণও এটাই। বাংলাদেশ ভয় পাচ্ছে। যে

www.pathagar.com

কোনো ধরনের সামান্যতম প্রক্রিয়া, যা এই মিঠা পানির প্রবাহে বিঘ্ন ঘটাবে, এই বদ্বীপের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাবে। আজকের এই পরিবেশ সচেতনতার যুগে এ ধরনের ঝুঁকি নেয়া অত্যন্ত কঠিন।

এই পানি সমস্যা ছাড়া বাণিজ্য ঘাটতি, চোরাচালান কিংবা সীমান্ত সমস্যার মতো বিরোধগুলো নেহাৎই গৌণ। সম্ভবত আরো একটা জটিল সমস্যা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। কারণ কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে তথাকথিত অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে রুদ্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয় ভারত। ভারতের আসাম রাজ্যে সত্যিই যথেষ্ট অভিপ্রয়াণ ঘটছে। এদিকে ভারতের আসাম এবং বাংলাদেশের সিলেট জেলার একটা এজমালি পাহাড় রয়েছে, আছে অভিন্ন নদী এবং সম্পূরক অর্থনীতি। তাই ভবিষ্যতে যদি বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা না যায় এবং এর ফলশ্রুতিতে সংঘটিত অভিপ্রয়াণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় তাহলে এক মারাত্মক কূটনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে। তবু মনে হয়, এই সমস্যাও ভবিষ্যতে ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত নষ্ট করতে পারবে না। তবে দুই পক্ষেরই হৃদ্যতা বজায় রাখতে হবে। বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী দোহার ভাষায়, 'দিল্লী যতদিন অনড় থকবে, আমাদের বিষয়গুলো ততদিন অনড় থাকবে।'

সবশেষে, পর্দার আড়ালে আরো একটা সমস্যা রয়েছে যেটা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে। মাঝে-মধ্যে এই সমস্যাটা পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি বেরিয়ে আসেনি, সমস্যাটা হচ্ছে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হয়ে বৃহত্তর বঙ্গের আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলন এখনো পর্যন্ত তেমন জোরালো হয়নি; তবু অবিভক্ত বাংলায় আওয়াজটা যথেষ্ট পুরনো, সেই ১৯০৫ সালের এবং এখনো টিকে আছে। অবশ্য কেউই এটা সফল হওয়ার সামান্যতম রাজনৈতিক সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীদের হাতে নিহত (পঁয়ত্রিশ হাজার) বুদ্ধিজীবী অনেকের কাছে এই আন্দোলন প্রভাব ফেলেছিল। যাহোক, একই ভাষা এবং কৃষ্টির ফলে একটা শ্রেণীর কাছে পুনরেকত্রীকরণের স্বপ্নটা একনো টিকে আছে। কিন্তু এই সমস্যা টিকে থাকলে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে এই একত্রীকরণ আন্দোলন, বিশেষ করে উভয় বঙ্গের জনসংখ্যা বাড়ার ফলে এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে। এ ধরনের একটা সম্ভাব্য ঘটনা ঢাকা এবং দিল্লী উভয়কেই বেকায়দায় ফেলবে। কারণ, এই আন্দোলন উভয় সরকারকেই অস্থিতিশীল করে তুলবে।

এই আন্দোলন সফল না হওয়ার মূল কারণগুলো হচ্ছে, দুই বঙ্গের বহু বছর ধরে বিচ্ছিন্ন থাকা, পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের দিল্লীমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলাদেশের

www.pathagar.com

স্বাধীর জাতির মর্যাদা উপভোগ। তাছাড়া আজকের নতুন প্রজন্মের তাদের বাপ-দাদাদের মতো আবেগিক প্রস্তুতি নেই। অবিভক্ত বাংলার সবল আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরেকটা বাধা হচ্ছে ভারতের হিন্দু মৌলবাদী দল, ভারতীয় জনতা পার্টির নেহরুর কাঙ্ক্ষিত ভারতের সেক্যুলার পরিচিতি পাল্টে গোঁড়া হিন্দু পরিচিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। দীর্ঘ পনের বছর সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত এবং সম্ভাব্য সীমান্ত সংশোধন এবং মুসলিম অভিবাসন চলতে থাকায় ব্যবসাবাণিজ্যে মুসলমানদের প্রভাব বিস্তারের ভয়ে ভীত পশ্চিমবঙ্গে অতর্কিতে হানা দিয়েছে মৌলবাদী বিজেপি। সীমান্ত বিতর্কের ফলে অন্যান্য অঞ্চলের বসবাসকারী হিন্দু এবং মুসলমানেরা, যাদের কাছে পশ্চিমবঙ্গকে অধিক নিরাপদ মনে হবে, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্যাটা সেই ভারত বিভাগের সময়ই সৃষ্টি হয়েছে। উপমহাদেশকে ভাগ করার সময় ব্রিটিশরা তাড়াহুড়োর জন্যে কিংবা অসাবধানতার ফলে, অনেকগুলো গ্রাম এবং অঞ্চলকে বিপরীত অংশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। এমনি একটা অঞ্চল হচ্ছে তিনবিঘা। চূড়ান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, অবিভক্ত বাংলার স্বপ্ন এপার-ওপার উভয় বাংলার অনেক মানুষের মনেই গাঁথা রয়েছে, ১৯৫৪ সালে এই আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শরৎ বসুর আবেগ এই অঞ্চলকে এখনো তাড়া করছে।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে 'সাউথ এশিয়ান রিজিয়নাল কো-অপারেশন (সার্ক)' গড়ে তোলার আহ্বানের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সার্ক গঠনের পর থেকে প্রতি বছর সার্কভুক্ত দেশগুলোর : ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন পর্যায়ের কূটনৈতিক কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেছে এবং ব্যবসাবাণিজ্যের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করছে। দুঃখজনকভাবে ভারত এবং পাকিস্তানের শীতল সম্পর্কের কারণে এবং দেশবিভাগের পর থেকে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে অর্থনীতির ভিন্নমুখী বিকাশের ফলে এই দেশগুলোর (সার্কভুক্ত) বৃহত্তর সহযোগিতা ব্যাহত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে গত কয়েক বছরে দ্রুত উদারনৈতিক অর্থনীতির দিকে নিয়ে যাওয়া হলেও এখনো সেই অর্থনীতি বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের মতো উন্মুক্ত নয়। তাই অনেক বিদেশী পণ্য বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে ভারতে চলে যায়। তবু উপসংহারে বলা যায়, সার্ক সবেমাত্র 'আদল' পেতে শুরু করেছে এবং এই উপমহাদেশের অর্থনৈতিক শক্ত সুতায় গাঁথার একমাত্র অবলম্বন।

তার পরও বাংলাদেশ ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে গত বিশ বছরে পূর্ব এশীয় দেশ জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে

www.pathagar.com

সম্পর্ক জোরদার করেছে। একইভাবে সে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত করেছে এবং দক্ষিণ এশীয় দেশ নেপাল, বার্মা ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করেছে।

এসবের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিজেকে এখন 'র' (RAW)-এর কাছে এতটা অবারিত মনে করে না। বাংলাদেশে 'র' (Research and Analysis Wing)-এর অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। বাংলাদেশ 'র'-এর এই জোরালো উপস্থিতির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে : এদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের দিকে খেয়াল রাখা, কিছু সেক্যুলার গোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো, ভারতের সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণে উৎসাহী বাংলাদেশী মুসলমানদের সহযোগিতা করা, মাঝে-মধ্যে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গের একই ভাষাভাষী গোয়েন্দাদের ওপর নজরদারী করা এবং এদেশের কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ যেগুলো সম্পর্কে ভারত যথেষ্ট আগ্রহী। কারণ, দিল্লী ভুলতে পারেনি, বাংলার মাধ্যমেই পুরো ভারত জয় করেছিল ইংরেজরা। অন্যান্য এশীয় দেশগুলো, ভারত প্রভাবশালী আঞ্চলিক শক্তি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীন থাকুক এটাই চায়, ওরা চায় ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ টিকে থাকুক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিনিয়োগ এবং ভ্রমণ

বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হয় কি?

জবাবটি হচ্ছে 'হ্যাঁ, কিন্তু...।

বাংলাদেশে রয়েছে অন্যান্য দেশের তুলনায় বিরাট তবে দরিদ্র এক জনগোষ্ঠী। সাম্প্রতিককালে সড়ক, বিদ্যুৎ এবং জ্বালানির এক নতুন অবকাঠামো গড়ে উঠলেও তা এখনো যথাযথ মাত্রায় ব্যবহার হচ্ছে না। বাজার হিসেবে এ দেশটির সামর্থ্য নেই বললেই চলে। ফলে যেসব কোম্পানি শিল্পজাত অথবা ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে তাদের কাছ থেকে দেশটি খুব বেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারেনি। বরং, প্রতিকূল নিয়ম-কানুন অথবা ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যকলাপ দ্বারা সরকার বিনিয়োগ বিতাড়িত করেছে। এটা হয়েছে অংশত স্থানীয় উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে, অংশত নিছক আমলাতান্ত্রিক বিদেশী-ভীতি বা মতাদর্শগত কারণে। বাংলাদেশ সেই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে আগ্রহী যারা সস্তায় শ্রম চায়। বিনিয়োগ সংক্রান্ত আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্যে একটি 'ওয়ান স্টপ' বা এক দপ্তরেই সব কাজ সমাধা হতে পারে এমন দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্যে বড় ধরনের প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। যদিও এই প্রচারাভিযানের সাফল্যের মাত্রা খুব বেশি নয়। যা-ই হোক, বুদ্ধিমান বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা এই দেশে স্থানীয় অংশীদারদের সাথে নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী হচ্ছে। কারণ, স্থানীয় অংশীদাররা বাংলাদেশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার সমস্যাবলী তথা অসংখ্য নিয়ম-কানুন, বিধিনিষেধ, কর সংক্রান্ত জটিলতা, বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া, ভূমি ব্যবহার এবং এই রকম আরো প্রতিবন্ধক অতিক্রমে সহায়তা করতে পারে। বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করা সহজ নয়। উদাহরণস্বরূপ, কাজ পাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে আছে যে বাংলাদেশীরা তারাই কাজ পাওয়ার পর দ্রুত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে বিভিন্ন দাবিদাওয়া উত্থাপন করে এবং তাদের ইচ্ছার সপক্ষে রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থনও আদায় করে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। যেমন : ১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সকল বেসরকারি কোম্পানি বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের ১০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে,

www.pathagar.com

এই ঘোষণা দেয়ার আগে তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথেও কোনোরকম আলোচনা করেননি। একইভাবে বাংলাদেশীদের মধ্যে অনুমাননির্ভর একটি ধারণা আছে যে, বিদেশীরা ধনী এবং পারিশ্রমিক হিসেবে যা তারা দিচ্ছে বা দিতে চাইছে তারচেয়ে বেশি দেয়ার ক্ষমতা তাদের আছে। তাছাড়া কি পরিমাণ মুনাফা বিদেশীরা দেশের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে এ নিয়েও প্রত্যেকের মাথায় জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। মোদ্দাকথা হচ্ছে, তারা বিনিয়োগ আশা করলেও অল্পসংখ্যক বাংলাদেশীই বোঝেন বিদেশী বিনিয়োগকারীরা কি চাইছে, বা বিনিয়োগ আকাঙ্ক্ষায় প্রতিবেশি দেশগুলো কি ধরনের সুবিধা ও শর্ত দিচ্ছে।

আরো খারাপ যেটা, বিনিয়োগ প্রস্তাব উত্থাপনের সময় মোটা দাগে দেয়া সব শর্ত সরকার মেনে নিলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বিনিয়োগকারী দৈনন্দিন যে সমস্যাবলীর মুখোমুখি হন সেগুলোর নিরসনে সরকারি মন্ত্রী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কারোই তেমন কোনো আগ্রহ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, টাকা একবার দেশে এসে গেলে সরকার মনে করতে থাকে বিনিয়োগকারীর জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছুই করা হয়েছে এবং এরপর সরকার বিনিয়োগকারীর কাছে নানা রকম দাবি তোলার ভূমিকাটি গ্রহণ করে।

এর পরেও সত্য কথা হচ্ছে, বাংলাদেশ বিনিয়োগ চায়। দেশটির বিনিয়োগের প্রয়োজনও আছে। কেউ কেউ এসেছেন বিনিয়োগ করতে এবং তা থেকে ভালো ফলও পেয়েছেন। আবার কেউ কেউ এসে ফিরে গেছেন। কেউ কেউ আসার পর অনুধাবন করছেন, দেশটিতে বিনিয়োগের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর নয়। বাংলাদেশে বিনিয়োগের কথা যারা ভাবেন তাদের মধ্যে প্রায়ই একটা সন্দেহ কাজ করে, এক ধরনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি হয় যে, এমনকি স্থানীয় অংশীদাররাও শকুনের মতো অপেক্ষায় আছে, যদি কোনো বিনিয়োগকারীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে আর সেই সুযোগে ছোঁ মেরে 'কিছু' হাতিয়ে নেয়া যায়। অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, এটা এখনো বিনিয়োগের উপযুক্ত স্থান হয়ে ওঠেনি। এর কারণ বাংলাদেশ এটা বোঝে না যে, বিনিয়োগের সঙ্গে পারস্পরিক দান-প্রতিদানের একটা ব্যাপার সম্পর্কিত। উপরন্তু, এখানে সরকার কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা দেয় না, যদি না বিনিয়োগকারী খোদ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আর বিনিয়োগকারীর পক্ষে মন্ত্রীর সাথে দেখা করা সম্ভব হবে এমন নিশ্চয়তাও কেউ দিতে পারে না।

এই সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে : বাংলাদেশ এখনো উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং বিদেশী বিরোধী ধ্যানধারণার আবেশে আচ্ছন্ন। এসব ধ্যানধারণার কোনো কোনোটা সমাজতান্ত্রিক ছোপ লাগা; তবে বেশিরভাগেরই জন্ম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘ লুণ্ঠনের স্মৃতি থেকে। বাংলাদেশীদের মনে এই ভয়

www.pathagar.com

সততই বিরাজ করে যে, একটি বিদেশী কোম্পানি যেহেতু একবার দেশ দখল করে নিয়েছিল, পরিবেশ-পরিস্থিতি ব্যাপকভাবে বদলে গেলেও সেরকম ঘটনা আবার ঘটতে পারে। ভারত, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গেও এই লক্ষণ দৃশ্যমান, যেমন দৃশ্যমান বার্মা, চীন, ভিয়েতনাম এবং লাওসেও। এদিক থেকে বললে বাংলাদেশের আচরণ খুব অস্বাভাবিক নয়। পার্থক্য শুধু এই, বাংলাদেশ অন্যদের চেয়ে বেশি ভীরু এবং হয়তো বা পরিস্থিতি বোঝার ব্যাপারে কম সক্ষম। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে প্রকৃতই তারা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ে যোগ দিতে চায়, ততক্ষণ এদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক হতে হবে, সীমিত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে, একটি লক্ষ্য অর্জিত হলেই কেবল আরো লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেভাবেই তহবিলের অঙ্গীকার করা উচিত হবে, আর যত দ্রুত সম্ভব বিনিয়োজিত পুঁজি তুলে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী ভীতি এবং পূর্বে উল্লেখিত উগ্র ভাষা-প্রেম এই জাতির চেতনার অংশ। বাংলাদেশীদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটতে এখনো বাকি আছে। স্বাধীনতার বিশ বছর পরে এটা খুব অস্বাভাবিক নয়। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্র এটা দেখা গেছে। তবে স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় থাকে তবে তা হবে বিপর্যয়কর।

বাংলাদেশ কি ভ্রমণের জন্যে নিরাপদ?

জবাব হচ্ছে, 'হ্যাঁ'। এক্ষেত্রে কোনো কিন্তু নেই।

বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ একটি দেশ। জনগোষ্ঠী সমজাতিক (হোমোজিনিয়াস), যে কারণে সবচেয়ে বিপজ্জনক যে দ্বন্দ্ব সেই জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাতও দেশটিতে নেই বললেই চলে। মধ্যপ্রাচ্যীয় ধরনের সন্ত্রাসবাদ এদেশে কখনো দেখা দেয়নি।

এর অর্থ এই না যে, বিপদ দেখা দিতে পারে না। এর অর্থ এই যে, বিদেশীরা নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটন ডিসিতে যতটা নিরাপদে থাকতে পারেন ঢাকায় অধিকাংশ সময় তারচেয়ে বেশি নিরাপদে থাকবেন। তথাপি, মাঝে-মধ্যেই উত্তেজনা দেখা দেয়, বিশেষ করে সাধারণ ধর্মঘট বা হরতালের দিনগুলোতে। সাধারণত নির্ধারিত দিনের বেশ আগেই হরতালের তারিখ ঘোষণা করা হয়। সেদিন বড় বড় শহরে তো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও অধিকাংশ রাস্তা বন্ধ থাকে। এসব দিনে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বেরোনো অবশ্য পরিত্যাজ্য। বেরোলে ইটপাটকেল খাবার সমূহ আশঙ্কা আছে। বিবেচক বিদেশীরা হরতালের নির্ধারিত সময়ে আবাসস্থলেই থাকেন। তবে ঢাকা যাদের পরিচিত, বহুবার ঢাকায় গেছেন এমন বিদেশীদের অনেকেই পায়ে হেঁটে শহরে ঘোরেন এবং চলতি পথে বাংলাদেশী পথচারীদের সাথে আলাপ করে অভিজ্ঞতার ঝুলি সমৃদ্ধ করেন।

www.pathagar.com

কখনো কখনো সেখানে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী দাঙ্গা হয়; যেমন হয়েছিল উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আমেরিকান ক্লাবে হামলার সময়। এই ধরনের বিক্ষোভ-হাঙ্গামা সম্ভবত স্থানীয় অনুপ্রেরণায় হয় না, হয় বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা সমর্থিত মহলের উস্কানিতে। গাদ্দাফি বা সাদ্দাম হোসেনের মতো একনায়কদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্নদের অর্থের বিনিময়ে সমবেত করে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়। তবে ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে না, ঘটার আগে সতর্ক হওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে বিদেশীদের জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র এবং শিক্ষকমণ্ডলীকে অর্থ বা অন্য কোনো লোভের বিনিময়ে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে তা আগেই বলেছি। এই ক্ষমতা প্রদর্শনেরই কোনো পর্যায়ে শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা। এ ধরনের ঘটনা ঘটে আকস্মিক এবং অপরিকল্পিতভাবে। ফলে এরকম ক্ষেত্রে বিপদের আশঙ্কা প্রবল। তবে উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঝেমধ্যেই যেহেতু একটানা কয়েক মাস বন্ধ থাকে বা রাখতে হয় সেহেতু এরকম বিপদে পড়ার আশঙ্কাও খুব বেশি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ জাতির সবচেয়ে বড় লজ্জার বিষয়। বিদেশীরা সাধারণত সেগুলো দেখতে যান না।

মধ্যরাতের আগে ঢাকায় অপরাধ তেমন একটা ঘটে না। ঘটলেও বিদেশীদের জন্যে তা বিশেষ সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না। আর হরতালের দিন গণ্ডগোল হওয়ার আশঙ্কা টের পাওয়া গেলে সাধারণত দিনটি প্রায় সবার জন্যে একটি অতিরিক্ত ছুটির দিন হয়ে ওঠে। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরগুলোও নিরাপদ। আঞ্চলিক হোটেলগুলো সাধারণত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ এবং সড়ক ও রেলপথে ভ্রমণও অধিকাংশ দেশের মতোই নিরাপদ। তবে বন্যা বা ঝড়ের সময় নৌপথে ভ্রমণ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ অধিকাংশ নৌযানই পুরাতন এবং ভালোভাবে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। রেলগাড়ি প্রায়ই দেরিতে ছাড়ে এবং তেমন আরামদায়ক নয়। তবে রেলের প্রথম শ্রেণীতে তুলনামূলক কম ভাড়ায় নিরুপদ্রবে ভ্রমণ করা যায়। গ্রীষ্মের সময় বাংলাদেশ অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহে কোনো স্থিতিশীলতা থাকে না, প্রায়ই ঝড়-তুফান হয়। ফলে এই সময়ে বিমানে ভ্রমণ বিপজ্জনক হতে পারে।

কেন বাংলাদেশ ভ্রমণে যাবেন?

বুদ্ধিমান পরিব্রাজক, অর্থাৎ যেসব ভ্রমণকারী ভালো খাবার ও বিলাসবহুল হোটেলের খোঁজে থাকেন না তাদের কাছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের মতো দেশে, অধুনা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতেও ভ্রমণ বেশ রোমাঞ্চকর এবং মানসিকভাবে উদ্দীপক বলে বিবেচিত হতে পারে। এক ধরনের ভ্রমণকারী আছেন

www.pathagar.com

যারা দারিদ্র্য দেখার জন্যে ভ্রমণে যান। তারা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে এবং ধনীদের গালমন্দ করতে পারলে সুখ পান। এই ধরনের 'দারিদ্র্য দর্শক ভ্রমণকারী' ছাড়া অন্য বুদ্ধিমান ভ্রমণকারীদের অনেকেই (তারাও হয়তো ধনীদের গাল দেন এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখান) বাংলাদেশের মতো জায়গায় বেড়াতে যান জ্ঞানার্জনের জন্যে। তিনি বা তাঁরা শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতি নয়, দর্শন, শিল্পকলা, সঙ্গীত, ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা অথবা পুরনো ধাঁচের অভিযানের ব্যাপারেও আগ্রহী হতে পারেন। বুদ্ধিমান ভ্রমণকারী যেমন শুধু দরিদ্রদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন না তেমনি কেবল ধনী এবং সুশিক্ষিতরাই জ্ঞানী এমন মনোভাবও পোষণ করেন না। বরং সক্রেটিসের মতো তিনি বা তাঁরা প্রশ্ন করতে চান, শুনতে এবং জানতে চান। এই ধরনের ভ্রমণকারী সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের সন্ধান করেন এবং একইরকম দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষদের সাথে মিশতে চান।

আপনি যেখানে থাকেন সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেও জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ঘটনাচক্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবেন এবং সেই সংস্কৃতি থেকে কিছু শিখবেন তাদের জন্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করার জন্যে একটি ভালো জায়গা। আর যাঁরা বিশেষ করে দক্ষিণ এবং মধ্য এশিয়া সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদের আগ্রহের পরিপোষণে সূচনা স্থান হিসেবে বাংলাদেশ চমৎকার জায়গা। উত্তর ভারতের গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড (যে রাস্তার সূচনা হয়েছে ঢাকার কেন্দ্রস্থলের প্রথম শ্রেণীর হোটেল সোনারগাঁও-এর সামনে থেকে) ধরে এগোতে শুরু করলে পাওয়া যাবে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এক সভ্যতার ইতিহাসের সন্ধান। দার্শনিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সেই সভ্যতা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই ভ্রমণসূত্রে ভ্রমণকারী বেশ কিছু বিস্ময়কর দৃশ্যের দেখা পাবেন এবং সে সবের সূত্রে নতুন এক অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পাবেন। দেখতে পাবেন পূর্ণ প্লাবিত ব্রহ্মপুত্র নদের রূপ, দীন দরিদ্র কৃষক তার কুটিরের পাশে কর্মরত, কাছেই আছে তার স্ত্রী-সন্তানাদি এবং গরু-ছাগল; অক্টোবরে সাইবেরীয় হাঁসের ঝাঁক নদীমালার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। পাবেন দরিদ্র বস্তিবাসীদের অবিশ্বাস্য সাহসের পরিচয়। দেখবেন, বিশাল এবং গাম্ভীর্যময় বৌদ্ধ সৌধসমূহের ধ্বংসাবশেষ, এখন যেগুলোকে ঘিরে রেখেছে শ্যামল শস্যক্ষেত। দেখা পাবেন হাজার বছরের পুরনো ঐতিহাসিক শহরের; কেন্দ্রীয় মসজিদে হাজার হাজার মানুষের প্রার্থনা, বর্ষায় দেশটির অপরূপ সৌন্দর্য বা বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর নব প্রস্ফুটিত পুষ্পমঞ্জরীর ততধিক রূপ; জলে সাদা বকের সারির প্রতিফলন। রাতে বুড়িগঙ্গায় ভাসমান ফেরি থেকে ঢাকা শহরের ঝিকিমিকি প্রতিবিম্ব দেখা যাবে নদীতে, জংলা ভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু নদীপথে নৌকায় চলতে চলতে

www.pathagar.com

শোনা যাবে অসংখ্য পাখির কাকলি, রাতে চোখে পড়বে ছোট গ্রামের এখানে-ওখানে মিটমিটে আগুনের শিখা। গাড়িতে বরেন্দ্র সমভূমির বগুড়া থেকে রাজশাহী যাওয়ার সময় দেখতে পাবেন যতদূর চোখ যায় ধু ধু মাঠ; কুমিল্লার কাছে টিপরা সমভূমি; বিশ্বের সবচেয়ে উর্বরা, সবচেয়ে নিবিড় কর্ষিত ভূমি। দেখা যাবে চট্টগ্রামের মন উদাস করা গোসাই সমভূমি।

এসব দৃশ্যের মাঝে হয়তো দেখা পাওয়া যাবে এমন কিছু মানুষের, যাদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভ, সবচেয়ে বিতর্কপ্রবণ মানুষদের দলে ফেলা যায়। তারা বিদেশীদের জানতে চায়। হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা আলাপ করবে আপনার সাথে। বাংলাদেশীরা সাধারণত নিজের মতামতে অনড় থাকে এবং কথা বলতে ভালোবাসে। বিশ্বের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর জনগোষ্ঠী নির্বাচনের জন্যে যদি কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন হয় তবে হাস্যময় উজ্জ্বল দৃষ্টিসম্পন্ন, আগ্রহী এবং খোলা মনের এই মানুষগুলো যে অনায়াসে তার চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছাবে তাতে সন্দেহ নেই। তবে তাদের মধ্যে শঠ ও দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকও যে আছে, এ কথাটা তাদের কাছে উল্লেখ না করাই ভালো। তাদের বিদ্বজ্জনেরা আন্তরিক এবং প্রায়শই জ্ঞানী এবং তাদের শিল্পীরা প্রাজ্ঞ। বৃদ্ধরা চিন্তাশীল এবং প্রায়ই অপেক্ষাকৃত তরুণদের বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে উপকার করেন। তদুপরি তারা রসিক।

আর মহিলাদের প্রসঙ্গে বলা যায়, তাদের চালচলন অত্যন্ত মার্জিত। অধিকাংশ বাংলাদেশী মহিলাকেই বেশ অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীদের মতো প্রখর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এবং সুন্দর নারীর দেখা পাওয়া কঠিন। বাংলাদেশী নারীরা যে স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা ভোগ করে তা মুসলিম বিশ্বের অন্য কোথাও এমনকি হিন্দু বিশ্বেও বিরল। পরিবারে এবং সমাজে বাংলাদেশী মহিলাদের ক্ষমতা বাইরে থেকে যা মনে হয় তারচেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে কেউ যদি নারীদেরকে এবং তাদের মতামতকে উপেক্ষা করেন তবে তিনি কোনো ক্ষেত্রেই প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারবেন না।

একটি উদাহরণ দিই : যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থার প্রধান হিসেবে বর্তমান লেখক বিভিন্ন 'সমিতি' 'সংস্থা' বা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পরিচালনাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর উপলব্ধি হচ্ছে নারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংগঠন বা সেসব সংগঠনে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, গড়পড়তা হিসাবে, সেগুলোই সবচেয়ে সুপরিচালিত সংগঠন, সেগুলোর লক্ষ্য অর্জনের হার এবং সম্ভাবনাও বেশি। এর কারণ কি? কারণ সংগঠিত হয়ে একসাথে কাজ করায় বাংলাদেশের মহিলারা যতটা পারঙ্গম, পুরুষেরা ততটা নয়। বাংলাদেশী নারীরা ভীরু বা দুর্বল নয়, বরং তাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস প্রবল যে তারা লক্ষ্য অর্জনে

www.pathagar.com

সক্ষম। এই আত্মবিশ্বাসের জন্য নির্যাতন হতে নয়, এর জন্ম এমন এক সংস্কৃতি থেকে যার মর্মমূলে আছে স্বেচ্ছা-সহযোগিতার বোধ। এত বেশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দুনিয়ার আর কোনো সংস্কৃতিতে আছে কিনা সে ব্যাপারে বর্তমান লেখকের সন্দেহ আছে।

শেষত বলা যায়, বাংলাদেশের মহিলা ডাক্তার, শিক্ষাবিদ, লেখক, শিল্পোদ্যোক্তা এবং অন্য সব ধরনের পেশাজীবী মহিলা দুনিয়ার যে কোনো স্থানের মহিলা পেশাজীবীদের মতোই দক্ষ এবং প্রাণবন্ত ও গতিশীল।

অতএব, বাংলাদেশের আছে অসাধারণ দৃশ্যাবলী; উষ্ণহৃদয়, বন্ধুত্বপূর্ণ বুদ্ধিমান মানুষ; এবং এক প্রাচীন ইতিহাস যা মিশেছে আধুনিক ইতিহাসের সঙ্গে। এগুলো দেখবার এবং বুঝবার জন্যে বাংলাদেশ ভ্রমণে আসা যেতে পারে। তবে ভ্রমণের জন্যে বাংলাদেশ খুব সহজ জায়গা নয়। ঢাকা ছাড়া আর কোথাও প্রথম শ্রেণীর হোটেল নেই। খাবারের মানেরও কোনো স্থিরতা নেই। পানি অথবা খাবারের কারণে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রচুর। আবহাওয়া গরম, বর্ষণময় বা উভয়ই হতে পারে, অথবা হতে পারে ধূলিময়, আর্দ্র বা উভয়ই। বিভাগ বা জেলাগুলোতে ভ্রমণের সময় সঙ্গে একজন গাইড থাকা ভালো। আর কৌতূহলোদ্দীপক, সুশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে মিশতে চাইলে আগে থাকতে খোঁজ-খবর নিয়ে পরিচয়মূলক পত্র নিয়ে নেয়া উচিত। মোটকথা, আপনার লক্ষ্য যদি হয় কিছু শেখা এবং জানা তাহলে উল্লেখিত কষ্ট বৃথা যাবে না। আর যদি আপনি গতানুগতিক ট্যুরিস্ট হন তাহলে অন্য কোথাও গেলেই ভালো করবেন।

শেষ কথা হলো, আপনি যদি বাংলাদেশের চলাফেরার কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনো স্থানে নির্দ্বিধায় যেতে পারেন। সে কারণেই স্থানীয় এক জনপ্রিয় পোস্টারে ঘোষণা করা হয়েছে, 'ট্যুরিস্টরা এসে পড়ার আগেই বাংলাদেশ বেড়িয়ে যান' ('ভিজিট বাংলাদেশ ... বিফোর ট্যুরিস্টস কাম')।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাহায্যকারী গ্রন্থাদি সম্পর্কিত বিবরণ

এই তালিকা মূল নথিপত্রগুলোর একটা অংশ মাত্র; তবে আমি যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদের নামও এখানে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে আগ্রহী এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা, বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রস্তুত গবেষণাকর্ম এবং প্রতিবেদন, প্রচুর পুস্তিকা এবং *দি নিউ নেশন, অবজারভার, হলিডে, দি বাংলাদেশ টাইমস*-এর মতো সংবাদপত্রের বিভিন্ন আর্টিক্যাল থেকেও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছি। শেষদিকে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা এবং এ জাতীয় অন্যান্য উপাত্তের তালিকা দেয়া হলো।

সাধারণ

ভারত এবং বাংলাদেশের অতীত ঘটনাবলীর বিবরণ দেয়া হয়েছে ডব্লিউ.ডব্লিউ. হান্টারের *দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার* (লন্ডন: ওরিয়েন্টাল পাবলিশার্স পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৩) থেকে, বিশেষ করে প্রথম অধ্যায়ের নদ-নদী এবং ভূমির ক্ষেত্রে, আরো রয়েছে এইচ.জি. রলিনসনের *ইন্ডিয়া* (লন্ডন: ক্রিসেন্ট প্রেস, ১৯৬৫); রমেশ দত্তের *ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া আন্ডার আর্লি ব্রিটিশ রুল* (লন্ডন: কেগান পাল, ১৯০২;পুনর্মুদ্রণ আগাস্টাস কেলি, ১৯৬৯); অ্যানিসলি অমব্রে'র সংস্করণ, *আল-বিরুনী'স ইন্ডিয়া* (নিউইয়র্ক: নরটন, ১৯৭১); জ্যানসেন, ডলম্যান, জার্ভি এবং নজিবুর রহমানের *দি কান্ট্রি বোটস অব বাংলাদেশ* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯); কাজী এস. আহমদের *এ জিওগ্রাফি অব পাকিস্তান* (করাচী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৯); রিচার্ড এম ইটনের *ইসলামিক হিস্ট্রি এজ গ্লোবাল হিস্ট্রি* (ওয়াশিংটন ডিসি: আমেরিকান হিস্ট্রিক্যাল এসোসিয়েশন, ১৯৯০); ভবানী সেন গুপ্তের *দি ফালক্রাম অব এশিয়া* (নিউইয়র্ক: পেগাসাস, ১৯৭০); নিরোদ সি. চৌধুরী *কন্টিনেন্ট অব সার্সি* (Circe) (বোম্বে: জায়কো, ১৯৬৫); এলি কুরীর (Elie Kedouric) *ইসলাম ইন ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি* (নিউইয়র্ক: হল্ট, রাইনহার্ট অ্যান্ড উইন্সটন, ১৯৮০); উইলিফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ-এর *ইসলাম ইন দ্য মর্ডান ওয়ার্ল্ড* (নিউইয়র্ক: নিউ আমেরিকান লাইব্রেরি, মেন্টর বুক, ১৯৫৭); স্বামী

www.pathagar.com

প্রভানন্দের *স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ অব ইন্ডিয়া* (নিউইয়র্ক: ডাবলডে, ১৯৬৩); আইরা এম. লাপিদাস (Ira M. Lapidus)-এর *হিস্ট্রিজ অব ইসলামিক সোসাইটিজ* (কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০); দিলীপ চক্রবর্তীর *দি এক্সটারনাল ট্রেড অব ইন্ডোস সিভিলাইজেশন* (নিউ দিল্লী: মুন্সিরাম মনোহরলাল, ১৯৯০); ডায়েটম্যার রথারমাউন্ড (Dietmar Rothermund)-এর *ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* (লন্ডন: ক্রোম হেলম, ১৯৮৭); হারুন অর রশীদের *অ্যান ইকনমিক জিওগ্রাফি অব বেঙ্গল* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮১); আর. সি. জয়নার (R.C. Zaehner)-এর *হিন্দুইজম* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৯); ফজলুল রহমানের *ইসলাম* (দ্বিতীয় সংস্করণ, শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, ১৯৭৯)।

রমেশ দত্ত ছাড়া ভারতের ব্রিটিশ ভূমিকা সম্পর্কে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: মাইকেল এডওয়ার্ডস-এর *দি লাস্ট ডেজ অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* (লন্ডন: নিউ ইংলিশ লাইব্রেরি, ১৯৬৭); পি, ম্যাসন-এর *দি ম্যান হু রুল্ড ইন্ডিয়া সংক্ষেপিত* (লন্ডন: প্যান অ্যান্ড কেইপ, ১৯৮৫); রিজাইন্যাল্ড রেনল্ড-এর *হোয়াইট সাহিবস ইন ইন্ডিয়া* (ওয়েস্ট পোর্ট, কন.: গ্রীনউড প্রেস, ১৯৭০, ১৯৩৭ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ); জওহরলাল নেহরুর *গ্লিমপেজেস অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি* (নিউইয়ক: জন ডে, ১৯৪২); কে.কে. আজিজের *দি ব্রিটিশ ইন ইন্ডিয়া* (ইসলামাবাদ: ন্যাশনাল কমিশন অন হিস্ট্রিক্যাল রিসার্চ, ১৯৭৬); রামকৃষ্ণ মুখার্জির *দি রাইজ অ্যান্ড ফল অব দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি* (নিউইয়র্ক: মানথলি রিভিউ প্রেস, ১৯৭৪); ল্যান্স ই. ডেভিস এবং রবার্ট এ. হাটেনব্যাক-এর *ম্যামন অ্যান্ড দ্য পারসইট অব এম্পায়ার* (কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬); এডওয়ার্ড ইনগ্রাম-এর *টু ভিউস অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* সংস্করণ (বাথ: এডামস অ্যান্ড ডার্ট, ১৯৬২); জেমস মরিস-এর *প্যাক্স ব্রিটানিকা,* ভল্যুম থ্রি (নিউইয়র্ক: হারকোর্ট ব্রাস, ১৯৬৮); উইলিয়াম টেইলরের *থার্টি-এইট ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়া* (ক্যালকাটা: বিভাস গুপ্ত; ১৮৬১-১৯৮৭ সালের পুনর্মুদ্রণ); ব্রায়ান গার্ডনারের *দি ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি* (নিউইয়র্ক: ডরসেট প্রেস, ১৯৭১); জ্যাক রাসেলের *ক্লাইভ অব ইন্ডিয়া* (নিউইয়র্ক: পাটনাম, ১৯৬৫); নোয়েল বারবার-এর *ব্ল্যাক হোল অব ক্যালকাটা* (নিউইয়র্ক: ডরসেট প্রেস, ১৯৮৯); জিওফ্রে মুরহাউস-এর *ক্যালকাটা, দি সিটি রিভিল্ড* (লন্ডন: পেঙ্গুইন ট্রাভেল লাইব্রেরি, ১৯৮৮); মাইকেল গ্রীনবার্গের *ব্রিটিশ ট্রেড অ্যান্ড দি ওপেনিং অব চায়না* (নিউইয়র্ক: মানথলি রিভিউ প্রেস, ১৯৭৯); এইচ.এস. ভাটিয়ার *পলিটিক্যাল, লিগ্যাল অ্যান্ড মিলেটারি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* ভল্যুম ফাইভ (নিউ দিল্লী: দীপ অ্যান্ড দীপ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪); মরিস কলিস-এর *ফরেন মাড* (লন্ডন: ফ্যাবার, ১৯৬৯);

www.pathagar.com

এম. প্রভাকরণ-এর *হিস্ট্রিক্যাল অরিজিনস অব ইন্ডিয়া আনডেভলপমেন্ট* (নিউইয়র্ক: ইউনিভার্সিটি প্রেস অব আমেরিকা, ১৯৯০); সুহাস চক্রবর্তীর *দি রাজ সিনড্রোম* (ইন্ডিয়া: পেঙ্গুইন, ১৯৯১); ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আমরিকান বিদ্রোহ এবং বাংলার মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আয়ান আর ক্রিস্টি এবং বেঞ্জামিন ডব্লিউ ল্যাবারীর *এম্পায়ার অব ইন্ডিপেন্ডেস* (অক্সফোর্ড: ফাইডন প্রেস, ১৯৭৬); এম.এ. লেয়ার্ড-এর *মিশনারিজ অ্যান্ড এডুকেশন ইন বেঙ্গল, ১৭৯৩-১৮৩৭* (অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২); ননী গোপাল চৌধুরীর *কার্টিয়ার* (Certier), *গভর্নর অব বেঙ্গল,* **১৭৬৯-১৭৭২** (ক্যালকাটা: ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, ১৯৭০); মহিউদ্দীন আলমগীরের *ফেমিন ইন সাউথ এশিয়া* (কেমব্রিজ, মাস: গান অ্যান্ড হেইন, ১৯৮০); চার্লস রিচেসন-এর *ব্রিটিশ পলিটিক্স অ্যান্ড আমেরিকান রিভ্যুলিউশন* (নরম্যান: ইউনিভার্সিটি অব ওকলাহোম প্রেস, ১৯৬৪); আন্দ্রে ভ্যালেনটাইন-এর *লর্ড নর্থ* (নরম্যান: ইউনিভার্সিটি অব ওকলাহোমা প্রেস, ১৯৬৭); ভিনসেন্ট টি. হারল-এর *দি ফাউন্ডিং অব সেকেন্ড ব্রিটিশ এম্পায়ার* (লন্ডন: লংম্যান্স, ১৯৬৪); এরিক হবসবম-এর *ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এম্পায়ার* (লন্ডন: *পেলিক্যান ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটেন,* ভল্যুম থ্রি, ১৯৭৯); জন ক্যাম্পবেল, এফ.ই. স্মিথ-এর *দি ফার্স্ট আল অব বার্কেনহেড* (লন্ডন: জোনাথান কেপ, ১৯৮৩)।

অত্যন্ত সাহায্য পেয়েছি আর.সি. মজুমদারের *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (ক্যালকাটা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৪৩) এবং *দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* এবং *দি নিউ কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* বিশেষ করে ভল্যুম II-1 এবং II-2 থেকে। সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের *গৌড় অ্যান্ড হযরত পান্ডুয়া* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭); বুকানন (Buchanan's)-এর *জার্নি থ্রু চিটাগাং অ্যান্ড টিপরা,* হস্তলিখিত অনুলিপি, (ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, ১৭৯৮); জে.জে.এ. ক্যাম্পস-এর *হিস্ট্রি অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল* (ক্যালকাটা: বাটারওয়ার্থ, ১৯১৯); বাংলায় মুসলিম বিজয় এবং শাসনের সবচেয়ে ভালো গ্রন্থ হচ্ছে চার্লস স্টুয়ার্ট-এর *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (লন্ডন: ব্ল্যাক পারে, ১৮৪৭); অন্যান্যের মধ্যে সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *দেওয়ানী ইন বেঙ্গল,* ১৭৬৫ (বিশ্বরাধিকা প্রকাশন, ১৯৮০); শরৎচন্দ্র মিত্রের *দি কাল্ট অব দি সান গড ইন মেডিভেল ইস্টার্ন বেঙ্গল* (নিউ দিল্লী: নর্দান বুক সেন্টার, ১৯৮৬); *ফোক পোয়েমস ফ্রম বাংলাদেশ* (ঢাকা: কবীর চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও খোন্দকার আশরাফ হোসেন: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫); পি.সি. রায় চৌধুরীর *ফোক টেলস অব বাংলাদেশ* (নিউ দিল্লী: স্টার্লিং, ১৯৮২); মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং মুহম্মদ আবদুল হাই-এর *ট্রাডিশনাল কালচার ইন ইস্ট পাকিস্তান* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৬৩); কবীর চৌধুরীর *ফোক টেলস অব বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭২)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বিকাশের ক্ষেত্রে আমার চিন্তাকে বেশি প্রভাবিত করেছে লতিফা আকন্দের *সোশাল হিস্ট্রি অব মুসলিম বেঙ্গল* (লাহোর: আইসিসিডি পাবলিকেশন্স, ১৯৫৫); সুফিয়া আহমেদের *দি মুসলিম কম্যুনিটি ইন বেঙ্গল* (ঢাকা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪); রফিউদ্দীন আহমেদের *দি বেঙ্গল মুসলিমস* (নিউইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১); রফিউদ্দীন আহমেদের *রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ* (নিউ দিল্লী: সাউথ এশিয়ান পাবলিশার্স, ১৯৯০); কমরুদ্দীন আহমেদের *এ সোশিও পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল অ্যান্ড দি বার্থ অব বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইনসাইড লাইব্রেরি, রিভাইজড ১৯৭৫); কামরুন্নেসা ইসলামের *অ্যাসপেক্টস অব ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৪); এফ.বি. ব্রাডলে বার্ট-এর *দি রোম্যান্স অব অ্যান ইস্টার্ন ক্যাপিটাল* (দিল্লী: মেট্রোপলিটন বুক কোম্পানি, ১৯৭৫ পুনর্মুদ্রণ); ফজলুল রহমানের *কালচার কনফ্লিক্টস ইন ইস্ট পাকিস্তান* (ঢাকা: নাজনীন সেঁজুতি প্রকাশনী, ১৯৯০); এ.এম.এ. মুহিতের *ইমার্জেন্স অব এ নেশন* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭৮); শ্যামল ঘোষের *দি আওয়ামী লীগ* (ঢাকা: অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯০); আবু জাফরের *মুসলিম ফেস্টিভালস ইন বাংলাদেশ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০); মুহম্মদ এনামুল হকের *হিস্ট্রি অব সূফীজম ইন বেঙ্গল* (ঢাকা: এয়িশাটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৭৫); অসীম রায়ের *ইসলামিক সিনক্রিটিজম ইন বেঙ্গল* (প্রিন্সেটন: প্রিন্সেটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮); অজিত কে. নিয়োগীর *পার্টিশানস অব বেঙ্গল* (ক্যালকাটা: এ মুখার্জি, ১৯৮৭); নিমাই সাধন বসুর *দি ইন্ডিয়ান অ্যাওয়েকেনিং অব বেঙ্গল* (ক্যালকাটা: ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬); ডেভিড কফ-এর *দি ব্রাহ্ম সমাজ অ্যান্ড দি শেপিং অব দি মর্ডান ইন্ডিয়ান মাইন্ড* (প্রিন্সেটন: প্রিন্সেটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৯); রাজিয়া আহমেদের *ফাইন্যানসিং দি রুলাল পুওর* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩); হামিদা হোসাইনের *দি কোম্পানি অব উইভার্স অব বেঙ্গল* (অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮); রেহমান সোবহানের *দি ক্রাইসিস অব এক্সটারন্যাল ডিপেনডেন্স* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮২); রেহমান সোবহান এবং মোজাফফর আহমেদের *পাবলিক এন্টারপ্রাইজ ইন এন ইন্টারমিডিয়েট রেজিম* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ১৯৭৮); মুহম্মদ এইচ.আর. তালুকদারের *মেমরিজ অব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭); ক্রিস্টিন ওয়েস্টারগার্ড-এর *স্টেট অ্যান্ড রুরাল সোসাইটি ইন বাংলাদেশ* (লন্ডন: কার্জন প্রেস, ১৯৮৫); কামাল সিদ্দিকীর *দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব রুরাল*

www.pathagar.com

পোভার্টি ইন বাংলাদেশ (ঢাকা: ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ১৯৮২); লিওনার্দ এ, গর্ডন-এর *বেঙ্গল, দি ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট, ১৮৭৬-১৯৪০* (নিউইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪); মার্কাস এফ. ফ্রান্ডার *র‍্যাডিক্যাল পলিটিক্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল* (কেমব্রিজ: এম.আই.টি. প্রেস, ১৯৮১); *কারেন্ট ইস্যু ইন দি বাংলাদেশ ইকনমি* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ১৯৭৮); ব্লায়ার বি. ক্লিঙ-এর *পার্টনার ইন এম্পায়ার: দ্বারকানাথ ঠাকুর* এবং *দি এজ অব এন্টারপ্রাইজ ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া* (বার্কলে: ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৭৬); *ক্যালকাটা ইলাস্ট্রেটেড* (ক্যালকাটা: সেন্ট্রাল প্রেস, ১৯৪৫); এ. ফারুক-এর *চেঞ্জেস ইন দি ইকনমি অব বাংলাদেশ* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮২); লিওনার্দ এ. গর্ডন-এর *ব্রাদার্স অ্যাগেইনস্ট দি রাজ* (নিউইয়র্ক: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০); বি.এল.সি. জনসন-এর *বাংলাদেশ* (লন্ডন: হ্যানিম্যান এডুকেশন্যাল বুকস, ১৯৭৫); তপন রায় চৌধুরীর *ইউরোপ রিকনসিডার্ড* (অক্সফোর্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮); সুনীতিভূষণ কানুনগোর *এ হিস্ট্রি অব চিটাগাং*, ভল্যুম-১ (চিটাগাং: দীপঙ্কর কানুনগো, ১৯৮৮) এম. আতিকুল্লা এবং এফ. করিম খানের *দি গ্রোথ অব ঢাকা সিটি* (ঢাকা: সোশিয়্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৫); এ.কে. চৌধুরীর *দি ইনডিপেন্ডেন্স অব ইস্ট বেঙ্গল: আ হিস্ট্রিক্যাল প্রসেস* (জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ১৯৮৪)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এর ফলাফল সম্পর্কে নিম্নলিখিত নথিপত্রগুলো সাহায্য করেছে: সিদ্দীক সালিকের *উইটনেস টু সারেন্ডার* (করাচী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৮); ফজলুল কাদের কাদরীর *বাংলাদেশ, জেনোসাইড অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড প্রেস* (ঢাকা: দিল আফরোজা কাদরী, অ্যাবকো প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২); অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস-এর *দি রেপ অব বাংলাদেশ* (নিউ দিল্লী: বিকাশ পাবিলিকেশন্স, ১৯৭১); এম.ডি. হুসেইনের *ইন্টারন্যাশনাল প্রেস অন বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার* (ঢাকা: রাফাত এম. হুসেইন, ১৯৮৯); অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের *বাংলাদেশ লিগ্যাসি অব ব্লাড* (লন্ডন: হোডার অ্যান্ড স্টাউটন, ১৯৮৬); তালুকদার মরিনুজ্জামানের *বাংলাদেশ রিভলিউশন অ্যান্ড ইটস আফটার ম্যাথ* (ঢাকা: বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৮০); মওদুদ আহমদের *বাংলাদেশ: ইরা অব শেখ মুজিবুর রহমান* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩); পি. ডব্লিউ. চৌধুরীর *দি লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান* (লন্ডন: হার্স্ট, ১৯৭৪); লরেন্স জিরিং-এর *পাকিস্তান: দি ইনিগমা অব পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট* (বোল্ডার: ওয়েস্ট ভিউ প্রেস, ১৯৮০); মেজর (অবঃ) এস.সি. জিলানীর *ফিফটিন গভর্নর্স আই সার্ভিস উইথ: দি আনটোল্ড স্টোরি অব ইস্ট*

পাকিস্তান (লাহোর: বুকমার্ক, ১৯৭৯) বেটসে হার্টম্যান এবং জেমস কে. বয়েস-এর *আ কুইট ভায়োলেন্স* (লন্ডন: জেড প্রেস, ১৯৮৩), ক্রেগ ব্যাক্সটার, *বাংলাদেশ: এ নিউ ন্যাশন ইন অ্যান ওল্ড সেটিং* (বোল্ডার: ওয়েস্টভিউ প্রেস, ১৯৮৪); কর্নেল ফারুক এবং কর্নেল রশিদের *দি রোড টু ফ্রিডম* (ঢাকা: মেজর (অবঃ) সৈয়দ আতাউর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৪); এম. আতিকুল্লা এবং এফ. করিম খানের *দি গ্রোথ অব ঢাকা সিটি* (ঢাকা: সোশিয়্যাল সায়েন্স রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৭৫); কবীর চৌধুরীর সম্পাদিত *এ ন্যাশন ইজ বর্ন : ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন বাংলাদেশ* (ক্যালকাটা: ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ, সহায়ক সমিতি (Sahayak Samiti, ১৯৭৪); আবকর খানের *দি মিস্টি অব দি ভেবাকল অব পাকিস্তান* (করাচী: ইসলামিক মিলেটারি সায়েন্স এসোসিয়েশন, ১৯৭২-১৯৭৩); এস.এম. আলীর *আফটার দি ডার্ক নাইট: প্রব্লেমস অব শেখ মুজিবুর রহমান* (নিউ দিল্লী: থমসন প্রেস, ১৯৭৩); *এ ম্যাসাকার, মিডনাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা* (দিল্লী: বিকাশ প্রেস, ১৯৭৮); রিচার্ড এফ. নিওপ এবং অন্যান্যের *হ্যান্ডবুক ফর বাংলাদেশ* (ওয়াশিংটন ডিসি গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অফিস, ১৯৭৫); মার্কাস ফ্রান্ডার *বাংলাদেশ: দি ফার্স্ট ডিকেড* (হ্যানোভার এন.এইচ; সাউথ এশিয়ান পাবলিশার্স, ১৯৮২); *বাংলাদেশ কান্ট্রি: স্টাডি, ডিএ ৫৫০-১৭৫* (ওয়াশিংটন, ডিসি: গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং অফিস, ১৯৮৯) *স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুক অব বাংলাদেশ–১৯৮৯* (ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস)।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের কিছু তথ্য নির্দেশ নেয়া হয়েছে এ. কে. এম. শামসুল আলমের *ময়নামতি* (ঢাকা: ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়াম, গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২); *অ্যালবাম অব আর্কিওলজিক্যাল রেলিকস ইন বাংলাদেশ* (ঢাকা: ডাইরেক্টরেট অব আর্কিওলজিস অ্যান্ড মিউজিয়ামস, ১৯৮৪); নাজিমউদ্দীন আহমদের *মহাস্থান* (ঢাকা: ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামস, ১৯৭৫); এম.এ.এ. কাদিরের *পাহাড়পুর* (ঢাকা: ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজিস অ্যান্ড মিউজিয়ামস, ১৯৮০ পুনর্মুদ্রণ); সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের *ঢাকা সিটি অব মস্ক* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ১৯৮১); নাজিমউদ্দিন আহমদের *বিল্ডিংস অব খানজাহান ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড বাগেরহাট* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯); আনোয়ারুল করিমের *মিথস অব বাংলাদেশ* (কুষ্টিয়া: ফোকলোর রিসার্চ ইন্সটিটিউশন, ১৯৭৫); নাজিমউদ্দীন আহমদের *ডিসকভার দি মনুমেন্টস অব বাংলাদেশ* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৪); এম. আমিনুল ইসলাম এবং মনিরুজ্জামান মিয়ার *বাংলাদেশ ইন ম্যাপস* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ১৯৮১); *গৌড় ও হযরত পাভুয়া,* সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

www.pathagar.com

আমার ওপর সাংঘাতিক প্রভাব ফেলেছে নিরোদ সি. চৌধুরীর লেখা, বিশেষ করে বাংলার প্রতি তাঁর ভালোবাসা। একজন হিন্দু, ব্রাহ্ম এবং অ্যাংলো হওয়া সত্ত্বেও এই দেশটার প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং এ দেশটাকে নিয়ে তাঁর গর্ব, অবশ্য মুসলমানদের প্রতি তাঁর আগ্রহ খুবই কম, যারা এ দেশের মানুষ সম্পর্কে জানতে চায় তাদেরকে উদ্দীপ্ত করে। তাঁর লেখা অন্যান্য লেখকের চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে অনেক বেশি সাহায্য করেছে আমাকে, বিশেষ করে *চৌধুরীর অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান* (হোগার্থ প্রেস, ১৯৮৭) এবং *দাই হ্যান্ড, গ্রেট অ্যানার্ক!,* তাঁর আত্মজীবনীর অনুবর্তন (লন্ডন: এডিসন ওয়েসলি, ১৯৯০); তাঁর লেখা এমন কতগুলো দিক নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে আমাকে যেগুলো নিয়ে আমরা, পশ্চিমারা ভাবি না। নিরোধ সি. চৌধুরীর জন্ম এবং শৈশব কেটেছে পূর্ববঙ্গে, এখন যেটা বাংলাদেশ, কিশোরগঞ্জ শহরে। তাঁর স্মৃতি এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা সহজপাঠ্য এবং নির্ভরযোগ্য উৎস।

যেসব কবির লেখা থেকে উপকৃত হয়েছি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : ব্রাদার জেমস; *সংস অব লালন* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭); ব্রাদার জেমস, অনুবাদক, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতমালা* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৪); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *দি রিলিজিয়ন অব ম্যান* (লন্ডন: আনউইন পেপার ব্যাক, ১৯৮৮)।

কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোর প্রভাব সর্বাধিক : মিজানুর রহমান খানের *কাজী নজরুল ইসলাম* (ঢাকা: তরুণ পাকিস্তান পাবলিশার্স, ১৯৬৬ তৃতীয় সংস্করণ); গোপাল হালদারের *কাজী নজরুল ইসলাম* (নিউ দিল্লী: সাহিত্য একাডেমী, ১৯৭৩); এবং রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক, *কাজী নজরুল ইসলাম: এ নিউ অ্যান্থোলজি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০); ইকবালের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অনুবাদগুলো হচ্ছে মাইকেল অ্যারবেরির *ইকবাল, পোয়েট ফিলোসফার অব পাকিস্তান*, হাফিজ মালিক সম্পাদিত (নিউইয়র্ক: কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭১); এবং এ.আর. তারিক, *স্পিচেস অ্যান্ড স্টেটমেন্টস অব ইকবাল* (লাহোর: শাহ গোলাম আলী, ১৯৭৩)।

এই লেখায় যারা কোনো না কোনোভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের সবার নামের তালিকা দেয়া কার্যত অসম্ভব। কিন্তু যারা বিশেষভাবে হৃদ্যতা দেখিয়েছেন এবং কি কি পড়তে হবে এবং সেসব পঠনের উপর আলোচনা করে উপকৃত করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন: আহমেদুল কবীর (মনু মিয়া), প্রকাশক, *দৈনিক সংবাদ* এবং বেগম লায়লা কবীর; আনোয়ান হোসেন মঞ্জু, *ইত্তেফাক* সম্পাদক এবং বেগম তাসমিমা (টিপটিপ) হোসেন; এনায়েতউল্লা খান,

www.pathagar.com

প্রকাশক, *হলিডে*; মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপস অ্যান্ড প্রিজামের মোঃ ইকরামুল্লা এবং বেগম নেলী ইকরামুল্লা; ফজলুল হালিম চৌধুরী, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বিরাম দে (Boerum De), ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া আহমেদ; চিটাগাং এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিউদ্দীন আহমেদ; মার্কাস ফ্রানডা, আমরিকান ফিল্ড সার্ভিস; পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কান্তা ভাটিয়া; বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল (অবঃ) এন.আই. চিশতি এবং বেগম চিশতি; জুট বোর্ডের মরহুম জামিলুর রহমান খান এবং বেগম সারোয়ার; সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, গ্রন্থকার মওদুদ আহমেদ; কবি হাসনা মওদুদ; বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন; সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, উপদেষ্টা দাউদ খান মজলিশ; এ.এম.এ. মুহিত, সাবেক মন্ত্রী এবং বেগম সাবিহা মুহিত; সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব কাজী জালালউদ্দীন আহমেদ; সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং বেগম সীমা কাদের চৌধুরী; ফাইজার কর্পোরেশনের হুমায়ুন কবীর; অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড ব্যাক্সটার ইটন; শাহজাহান কবীর এবং বেগম ফারাহ কবীর, শরীফ আফতাবউদ্দীন, সামসুদ্দীন আহমেদ, নারগিস জাফর, ইমান আলী এবং মাহমুদ এশিয়া ফাউন্ডেশন; আলী বিরুজী ইস্পাহানী এবং আমেনা ইস্পাহানী; মহুতু দে (Mhuto De), এবং কবি ইরা দে, নতুন দিল্লী; অনীল পাল চৌধুরী এবং রুবী পাল চৌধুরী, ক্যালকাটা; মোজাফফর আহমেদ, ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ঢাকা; ইডেন প্রেসের আলীম-উর-রহমান খান এবং বেগম কোলেটী খান; জামায়াত-ই-ইসলামীর প্রেসিডেন্ট গোলাম আজম; হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সাবেক প্রেসিডেন্ট; প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রেস এইড মনিরুল ইসলাম চৌধুরী; প্রেসিডেন্ট জিয়ার মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রী, খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভার সাবেক তথ্যমন্ত্রী, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা; বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মুনএম; সাবেক প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাক আহমেদ; শেখ মুজিবের আমলে এটর্নি জেনারেল সৈয়দ ইশতিয়াক হুসেন; ইস্টার্ন মোটর্স-এর মোরশেদ খান; কর্নেল ফারুক এবং কর্নেল রশিদ, শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ প্রধান এবং শেখ মুজিবের কন্যা; কুমুদিনী ইন্ডাস্ট্রিজের জায়াপতি; শিল্পী রেখা কবীর; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কবীর চৌধুরী; আওয়ামী লীগের সাবেক ক্যাবিনেট মেম্বার আমিরুল ইসলাম; সিএসসি মানবাধিকার বাস্তবায়ন কর্মী ফাদার রিচার্ড টিম; নিউ ন্যাশনের প্রকাশক মইনুল হোসেন; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফারুক সোবহান চৌধুরী; বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ-এর ব্রিগেডিয়ার হাফিজ এবং ব্রিগেডিয়ার মোমেন; বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ-এর রেহমান সোবহান; বিশ্বব্যাংকের মাহবুব

www.pathagar.com

মতিন; প্রেসিডেন্ট জিয়ার এডিসি ক্যাপ্টেন মাজহারুল হক; সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুদ্দোহা; প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে পদত্যাগকারী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মুহম্মদ হোসেন; বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল আমজাদ চৌধুরী এবং বেগম আমজাদ; ইসমাইলী সম্প্রদায়ের নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রওশন আলী হিরজী ও বেগম হিরজী; শেখ মুজিবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন; পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির স্ট্যানলে কোচেনক এবং কুমকুম চ্যাটার্জি; অর্থ মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের মোঃ মহিউদ্দীন; এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের ড.এ.এম. মালিক; বহিঃসম্পদ বিভাগ ও ইয়াং ইকনমিস্ট এসোসিয়েশনের আবদুস সামাদ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদক, ঢাকা সেন্ট যোশেফ স্কুলের ব্রাদার জেমস; স্থপতি বশিরুল হক; সংস্কৃত পণ্ডিত ফাদার অ্যান্টনি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতা; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ঝরনা নাথ; দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সুজানি ওয়ালেন ও জিওফ টেলর।

www.pathagar.com

লেখক **জেমস জে. নোভাক** দীর্ঘ ত্রিশ বছর এশিয়ায় থেকেছেন এবং এই মহাদেশের অজস্র স্থান ভ্রমণ করেছেন। এক সময় ছিলেন একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশনের নির্বাহী কর্মকর্তা। ১৯৮২-'৮৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে এশিয়া ফাউন্ডেশনের আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 'এশিয়া মেইল', 'ওয়ার্ল্ড ভিউ' এবং 'ইস্টার্ন ফিনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকায় তিনি কলাম লেখক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্রে, যেগুলোর মধ্যে আছে 'আটলান্টিক মান্থলি', 'টাইমস অব ইন্ডিয়া', 'এশিয়ান ফিন্যান্স', 'আমেরিকা ম্যাগাজিন', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর', 'লসএঞ্জেলাস টাইমস', 'নিউজ ডে' এবং 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর মত পত্রিকা।

ISBN 978 984 506 184 1

www.pathagar.com

ইউপিএল প্রকাশনা

মঈদুল হাসান
মূলধারা '৭১

মহিউদ্দিন আহমেদ ও
মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত
পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর

মওদুদ আহমদ
গণতন্ত্র ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ
প্রেক্ষাপট: বাংলাদেশের রাজনীতি ও
সামরিক শাসন

•

বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা

জয়া চ্যাটার্জী
বাঙলা ভাগ হল
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও
দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭

এ. কে. নাজমুল করিম
অনুবাদ: রংগলাল সেন ও অন্যান্য
**পরিবর্তনশীল সমাজ: ভারত,
পাকিস্তান ও বাংলাদেশ**

রাও ফরমান আলী খান
শাহ্ আহমদ রেজা অনূদিত
বাংলাদেশের জন্ম

লে জেনারেল জেএফআর জেকব
সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা
একটি জাতির জন্ম

ISBN 978 984 506 184 1
9 789845 061841

www.pathagar.com